

ফ্রানৎস কাফকা'র
দি ত্রোমলা



অনুবাদ: জুলফিকার নিউটন

ভূমিকা

মুম্বই এক রুগ্ন কিশোরের গল্প আমরা জানি, বহিমুখী হয়ে সারাদিন বসে থাকত তার জানালার ধারে, তুচ্ছতম দৈনন্দিনের মধ্যে যে খুঁজে পেত তার অমোঘ আকর্ষণ। সে যে নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝতে পারে না নয়, কিন্তু নিবিড়ভাবে অনুভব করতে পারে যে রাজা যেন তার কাছে তাঁর দূত পাঠিয়ে দিয়েছেন অনেকদিন আগে, অনেক দূর থেকে, কত পাহাড়, প্রান্তর, নদী আর শস্যভূমি পেরিয়ে সে আসছে, আসছে, কেবলই আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা তখন শুনে থাকি ভিন্ন-একটা কবিতায় এই ধ্বনি 'সে যে আসে, আসে আসে' অথবা তার ইংরেজী প্রতিধ্বনি He comes Comes or comes। কেবলই এগিয়ে আসবার এই ছবির কথা ভাবতে ভাবতে সেই কিশোরটির তখন মনে হয়, তার রাজার কাছে সেও চেয়ে নেবে এমনি-কোনো দূতের কাজ, ডাকহরকরার কাজ, সময়ের নেমে আসার মতো জীবনভর কেবলই চলতে থাকবে সে, এই তার ব্রত। কাজ সে অবশ্য পায়নি শেষ পর্যন্ত, কেবল তার মৃত্যুশয্যায়, রাজদূত এসে পৌঁছেছিলেন রাজার খবর নিয়ে। ঘরের সমস্ত দেয়াল ভেঙে দিয়ে তার সামনে তখন খুলে দেওয়া হয়েছে তারায় ভরা মহাকাশের বিস্তার।

এই ছবিটি হয়ে যাবার অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই দূর দেশের আরেক রুগ্ন যুবকের কল্পনায় ভিন্ন এক রাজদূতের দেখা মিলল আবার। সামান্য এক প্রজা তুমি, সৌর প্রতাপের কাছে দূরতম এক ছায়ার চেয়ে ছায়া, তোমারই কাছে খবর পাঠিয়েছেন, রাজা, শুধু তোমারই কাছে খবর পাঠিয়েছেন, রাজা, শুধু তোমারই জন্য। তিনি শুয়ে আছেন তাঁর মৃত্যুশয্যায়, দূতকে কাছে ডেকে কানে কানে শুনিয়ে দিয়েছেন তাঁর খবর, ফিরে আবার কানে কানে শুনে নিয়েছেন সেটা। তাঁর মৃত্যুশয্যার চারপাশে সমস্ত দেয়াল তখন ভেঙে গেছে, যুক্ত বিশালতার মধ্যে উঁচু হয়ে গেছে সিঁড়ির পর সিঁড়ি, রাজদূত বেরিয়ে পড়ল পথে। ক্লান্তিহীন সে, শক্তিমান সে, বৃকে আঁটা আছে সূর্যচিহ্ন-সবাই তাকে ছেড়ে দেয় পথ। কত সহজ হতো যদি খোলা প্রান্তর দিয়ে চলত সে, অল্পসময়ের মধ্যে তোমার দরজায় তার কারাঘাত পৌঁছত হবে। কিন্তু কী নিষ্কলতার সে ঝরিয়ে দিচ্ছে তার শক্তি, কেননা সে কেবল ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রাসাদের ভিতরে ঘর থেকে ঘরে, তার কোনো শেষ পাবে না কখনো। আছে সিঁড়ি, আছে অঙ্গন, আছে বর্হিমহল, আবার সিঁড়ি আবার অঙ্গন আবার মহল; হাজার হাজার বছর কেবল এইরকম। সংযোগ হবে না, কিছুতেই মৃতেরও কাছ থেকে কোনো খবর নিয়ে পৌঁছবে না কেউ, শুধু সন্ধ্যাবেলায় তোমার জানালার ধারে বসে থাকবে তুমি, আর বসে বসে ভাববে আসতে- থাকা এই খবরের কথা।

একই রকম রাজা, দূত প্রতীক্ষা। কিন্তু সেই একই সঙ্গে, একেবারে ভিন্ন। প্রজাটি নয়, রাজা নিজেই এখানে আছেন মৃত্যুশয্যায়, আর রাজদূতেরও পথ অনেকটা অন্যরকম। বেরিয়ে আসতে পারত সে খোলা পথে, পাহাড়ে নদীতে প্রান্তরে, সহজ হতো তাহলে কাজ, দেখতে পেতাম আমরা অমলের সুন্দর, আমলের সময়। কিন্তু তার বদলে সে চলেছে কেবল ঘর থেকে ঘরে, মস্ত দেয়াল ভেঙে ফেললেও থেকে যায় তার দেয়াল আর তার থেকে আরেক দেয়াল, সিঁড়ির পর আর এই এক ভিন্ন প্রতীক্ষার ছবি আমরা পেলাম, যার মধ্যে রুদ্ধ হয়ে আছে শেষহীন কোনো মাথাখোঁড়ার আর্তি।

কার কাছে মাথাখোঁড়া? রাজা কি আছেন কোথাও? অমল সে প্রশ্ন না ভুললেও আরেক নাটকের কোনো কোনো ক্রান্ত নাগরিক এই প্রশ্ন জানিয়েছিল ঠাকুরদার কাছে, আর তিনি তাঁর নিজস্ব সান্ত্বনায় প্রশমিত করে এনেছিলেন তাদের উদ্যত ভয় আর অবিশ্বাস। মৃত্যুশয্যায্য ওই রাজকাহিনীতে উঠেছে এই একই জিজ্ঞাসা, ভয় আর অবিশ্বাস। কোথায় রাজা, কী তার বংশপরিচয়, আছেন তো তিনি? অন্য আরেক টুকরো কাহিনীতে এই লেখক— কাফকা, বলবেন নৌকোর কোনো অপরিচিতি মাঝির কথা, সে বলে গেছে সম্রাটকে বাঁচার জন্য তাঁর চারপাশে তৈরি করা হবে এক দেয়াল, কেননা প্রাসাদের সামনে জড়ো হয়ে কালো বাণ দিয়ে দানবেরা মেরে ফেলতে চাইছে সম্রাটকে। এও অবশ্য শেষ পর্যন্ত কোনো 'থাকারই কথা, কিন্তু সে-কথা প্রতিমূহূর্তে থমথম করছে না- থাকার সম্ভাবনায়, থাকা- না থাকার এক জটিল ভার নিয়ে এই ছবি আমাদের সামনে স্থির হয়ে আছে। থাকার মধ্যেই প্রতিমূহূর্তে এই না-থাকাকে দেখতে পাওয়া, অথচ কিছুই ছেড়ে-না-দিয়ে এই থাকাকেই প্রবলভাবে ছুঁতে চাইবার আবেগ, এর মধ্য দিয়ে তৈরি হয়ে ওঠে কাফকার জীবন, তাঁর শিল্প। ছুঁতে চাইবার এই আবেগ, যে অথেনটিসিটি তৈরি করে দেয়, তার থেকেই অনিবার্যভাবে তাঁর চোখে পড়ে অবাস্তব নির্মনন বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনের টুকরোগুলি আর তাদের যান্ত্রিকতা। 'এরা কেমন মানুষ? কখনো ভাবে এরা? না কি এই পৃথিবীতে কেবল নিরর্থক ছিটকে ছিটকে বেড়ায়? কালো লম্বা একজন লোক আঘাত করে হাত থেকে নিয়ে নেয় হার, পরাভূত মানুষটি তখন আর্তরবে সবাইকে জড়ো করে বলতে থাকে; দেখো তোমরা দেখো, আমিই কি নই কাগরি? কথাটার যুক্তি আছে ভেবে হালধরা নতুন আগন্তুককে ঘিরে দাঁড়ায় সকলে। কিন্তু যে-ই সে বলে 'বিরক্ত করো না না আমায়', মই বেয়ে নিঃশব্দে নেমে যায় সবাই। তাহলে, কেমন মানুষ এরা? কেমন এই আচরণ? বুঝতে-না-পারা দমবন্ধ এই আচরণের মধ্য দিয়ে গোটা জীবনের রূপটাকে এমনভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন কাফকা, অথবা দেখাতে চাইছিলেন আমাদের, যে তাঁর রচনায় অবক্ষয় ছাড়া আর কিছুই নেই বলে নিশ্চয় মনে হতে পারে। মানুষ শেষ পর্যন্ত অসহায় আর তার চারদিকে ঘিরে আছে এক বিরূপ বিশ্ব, এই বোধটাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে পারেন তিনি যে সেই থেকেই কারো মনে হতে পারে তাঁর রচনার আশাহীন আলোহীন কেন্দ্র আর সেইজন্য, এডমন্ড উইলসনের মতো যাঁদের মনের শিকড় আছে উনিশ শতকের স্ত্রৈর্যে, তাঁরা অগ্রাহ্য করতে চান এই জগৎ, তাঁরা মনে করেন যে শিল্পমহিমার বিচারে কাফকাকে জয়েস-গ্রন্থেরও কাছাকাছি নিয়ে আসা শক্ত, দান্তে তো অনেক দূরের কথা। তাঁকে সেইন্ট ভাববার চেষ্টা করাটা ভুল, কোনো আত্মিক উন্মোচনের সামনে নিয়ে আসে না তাঁর রচনা, দুর্বলমনা পস্ফুটিত মানুষের ভয়ের ছবিতে ভরে আছে তাঁর সৃষ্টি, যার ভিত্তিতে আছে পরিবার চাকরি এবং বুর্জোয়া সুখের সঙ্গে লগ্ন হতে পারবার যাবতীয় ইচ্ছে আর ব্যর্থতা। তাই উইলসনদের কাছে কাফকা হলেন 'সংশয়ার্ত দলিল আত্মার অর্ধক্ষুট শ্বাস' মাত্র, তিনি আমাদের নৈতিক নিয়ন্তা নন, মহৎ কোনো শিল্পীও নন তিনি।

অমলের আতুর বিশ্বাসভূমি থেকে বা উইলসনদের নিশ্চিত আশ্রয় থেকে কাফকার লেখা যে আমাদের অনেক দূরে নিয়ে আসবে সে তো স্বাভাবিক। এই শতাব্দীর যুদ্ধকালীন নতুন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যে সৃষ্টি, সেখানে আর পুরোনো ধরনের আশাবোধের ভরসাও রাখা যায় না। কিন্তু ভঙ্গুর পীড়িত দুর্বল ব্যক্তিজীবন থেকে উঠে এলেও তাঁর কলপনা যে আসন্ন সমাজ-আর রাষ্ট্র-দুর্বিপাকের গাঢ়তম চিহ্নগুলি তৈরি করে রেখেছিল, পরবর্তী

সোভিয়েত আর নাথসি হয়েছে তাঁকে। ফলে, যে অসহায়তা, যে বিচ্ছিন্নতার তীক্ষ্ণ স্বাদ আমরা পাই কাফকার রচনার, সে কেবল ব্যক্তিগতই নয়, বিশেষ একটা সময়ের চিহ্ন হিসেবেই তার সৃষ্টি, ভাবেন উইলসন।

১৮৮৩ সালে প্রাগে এক সচ্ছল মধ্যবিত্ত ইহুদি ব্যবসায়ী পরিবারে ফ্রানৎস কাফকা জন্মগ্রহণ করেন। প্রাগ তখন ছিল অষ্ট্রোহাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। প্রাগের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের পাঠ সমাপ্ত করে ১৯০৬ সালে কাফকা ডিগ্রি লাভ করেন এবং পরবর্তী কয়েক বছর একটি বিমা কোম্পানিতে চাকরি করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কাফকা অংশ নিয়েছিলেন। জীবনের অনিশ্চয়তা, বিষণ্ণ অর্থহীন অযৌক্তিক কাণ্ডকারখানা, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য তাঁকে পীড়িত করে। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে কাফকার। মানসিক দিক থেকেও তিনি বিধ্বস্ত বোধ করলেন। তাঁর মনে হলো এই জীবনের জন্য তিনি যথেষ্ট উপযুক্ত ও সক্ষম নন। তাঁর পিতাকে তিনি দেখেছেন কী সহজভাবে, প্রায় অবলীলাক্রমে, পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য অর্থ উপার্জন করছেন, নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন সাহসের সঙ্গে, সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন যথাসময়ে। প্রতিতুলনায় কাফকার নিজেকে মনে হলো অকর্মণ্য।

কিন্তু তাঁর হৃদয় জীবনের শেষ দিকে কাফকা এই বোধ কাটিয়ে উঠেছিলেন। ১৯২৩ সালে এক প্রতিভাময়ী ইহুদি অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। নাম ডোরা ডাইমাল্ট। হিব্রু ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ডোরার জ্ঞান ছিল প্রগাঢ়। প্রাগ ত্যাগ করে কাফকা এবার ডোরাকে নিয়ে বার্লিনে বাস করতে শুরু করলেন। এই পর্বে তাঁর মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা প্রায় অপসৃত। কিন্তু ততদিনে তাঁর স্বাস্থ্য আরো খারাপ হয়েছে। দুরারোগ্য যক্ষ্মা শেষ পর্যন্ত কাফকার জীবনীশক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়। অনেক কষ্ট ও যন্ত্রণাভোগের পর মাত্র একচল্লিশ বৎসর বয়সে ১৯২৪ সালের মাঝামাঝি ফ্রানৎস কাফকা মৃত্যুবরণ করেন।

কাফকার একচল্লিশ বছরের জীবনের কাজ পাশ্চাত্য গদ্যসাহিত্যের ভোল পালটে দেয়, যদিও তাঁর সবচেয়ে প্রভাবশালী লেখার একটা বড় অংশ তিনি মারা যাবার পর প্রকাশিত হয়েছিল। নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেট বা ইউজিন ইউনেস্কো থেকে ঔপন্যাসিক গেব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কের্জ এমন কি সালমান রুশদির কাজে কাফকার ছায়া দেখা যায়। ১৯৭১ সালে গার্সিয়া মার্কের্জ মিলান কুন্দেরাকে বলেছিলেন, “কাফকা পড়ে আমি প্রথম বুঝতে পারি যে অন্যভাবে লেখা যায়।”

কাফকার সবচেয়ে পরিচিত কাজ, যেমন গল্পের মধ্যে “মেটামরফোসিস”, “দ্য জাজমেন্ট”, “ইন এ পীনাল কলোনি” এবং উপন্যাসের মধ্যে “দি ট্রায়াল”, “দি ক্যাসল” এবং “আমেরিকা” পড়লে বিশ্বাস করা যায় না যে এর প্রেক্ষাপটে রয়েছে উনিশ শতকের ধ্রুপদী ইউরোপীয় গদ্যসাহিত্যের উপস্থিতি। ডিকেন্স বা দস্তয়েভস্কির লেখায় কাফকার কল্পজগৎ এবং আঙ্গিকের বীজ খুঁজে পাওয়া যাবে ঠিকই কিন্তু এঁদের সঙ্গে কাফকার মিলের চেয়ে তফাতটাই বেশি চোখে পড়ে। কাফকা ঠিক কী করে সামাজিক জীবনের বাস্তব বর্ণনার ভাষায় অদ্ভুত এক ফ্যান্টাসি চেতনার উপস্থাপনা করলেন এটা বলা মুশকিল। ব্যস্ত শহরে জীবনের খুঁটিনাটির আড়ালে লুকিয়ে আছে এক ভয়ঙ্কর দুর্বোধ্যতা, তো এই শতাব্দীর সব মানুষই আসলে নিজের নিজের মতো করে চেনে কিন্তু ভুলে থাকতে চায়। এই হেঁয়ালি জগতের অস্তিত্ব কাফকা যেন অতি সহজেই তাঁর লেখায় হাজির করলেন।

“দি ট্রায়াল” এক অদ্ভুত বিচারের গল্প। জনৈক জোসেফকে (লেখকের নামের আদ্যক্ষর “দি ক্যাসল”-এর নায়কের নামেও আছে) অজ্ঞাত কারণে ঘরে বসে গ্রেপ্তার হয়। সে ব্যাকের কর্মী, রোজকার কাজে তার বাধা পড়ে না। কিন্তু এরই ফাঁকে তার বিচার চলতে থাকে অদ্ভুত সর্বক্ষমতাসম্পন্ন এক আদালতে, যার দক্ষতার এবং বিচারকক্ষ শহরের বিভিন্ন বাড়ির চিলেকোঠায় ছড়িয়ে আছে। জোসেফ ক্রমশ বুঝতে পারে যে তার আত্মপক্ষসমর্থনের কোনো উপায় নেই, কারণ এই আদালত নাকি অপরাধী ছাড়া আর কাউকে তলব করে না। অথচ নিজের অপরাধও সে কিছুতেই বুঝতে পারে না, আত্মপক্ষসমর্থনের আশায় এর-ওর কাছে ছুটতে থাকে, অফিসের কাজ আস্তে আস্তে লাটে ওঠে। এরই মধ্যে রহস্যময় আদালত তাকে তার নিজের অপরাধ জেনে নেবার সুযোগ দেয় অন্তত দু’বার। জোসেফ কিন্তু সে সুযোগ নিতে অপারগ। কি একটা সাংঘাতিক সত্যের কাছ থেকে সে যেন পালিয়ে থাকে, সে যে নির্দেশ এই বিশ্বাসে অটল থাকতে চায়। অথচ শেষে যখন দুটো ভাঁড়ের মতো জ্বলাদ তাকে হাঁটিয়ে শহরের সীমানা ছাড়িয়ে নিয়ে যায় সে কিন্তু কোনও আপত্তি করে না। আবার জ্বলাদদের ইচ্ছে সত্ত্বেও নিজের হাতে তাদের ছুরিটা নিজের গলায় সে বসাতে পারে না। আত্মহত্যার দায়িত্বও সে নিতে পারল না, ঠিক যেমন তার অপরাধ: যে কি সেটা বোঝার দায়িত্ব সে নিতে পারেনি।

এই উপন্যাসের সরল কোনও অর্থ করা অসম্ভব। যে বিচারে সকলে শুরু থেকেই অপরাধী, যে আদালত ধরে বেঁধে না রেখেও যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়ে দিচ্ছে, সে বিচারব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের প্রতিভূ হতেই পারে। এই জন্যে অনেকেই কাফকাকে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা শিল্পী বলে মনে করেন। কারণ বিশ শতকে স্বৈরতন্ত্রের নানা রূপ উদ্ভবের আগেই কাফকা মারা যান। তবে আদালতের রহস্যময় প্রসার এবং দুর্বোধ্য কর্মপ্রণালীর মধ্যে যে কোনও রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্রের স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তাই জোসেফের পাকে পড়া বিমূঢ়তার সঙ্গে আমরা অত্যন্ত পরিচিত। এছাড়াও তার একাকিত্ব আর অসহায়তার সঙ্গে বিশ শতকের পাঠকের গভীর যোগ আছে। কিন্তু তার বিচ্ছিন্নতার একটা অন্য দিকও আছে। মনে হয় জীবনের কোন অতল সত্য থেকেও সে চিরতরে বিচ্ছিন্ন। হতে পারে এটা তার অপরাধ আর অপরাধবোধহীনতা দুটোরই মূল। এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা এক সর্বগ্রাসী ভয়কে জন্ম দেয়। এলিয়ট-এর “মার্ভার ইন দি ক্যাথিড্রাল”-এ ক্যান্টারবেরির নারীদের আত্মনাদে এটা প্রকাশ পায়, “We Are afraid in a fear which we cannot know, which we cannot face, which none understands”-এই পলাতক মনোভাবও কিন্তু আমাদের নিজস্ব, অভিজ্ঞতা দিয়ে চেনা, তাই জোসেফের আত্মবিশ্বাসের ভাঙনে আমরা খুব অবাক হই না। তার জীবন নিয়মে বাঁধা, আড্ডা এবং প্রেমের আলাদা আলাদা সময় আছে। অফিসের কাজে সে নিবেদিতপ্রাণ, অথচ তার আত্মমগ্ন সার্থকবোধে কি যেন নেই। সে যে কিছুতেই তার কি অপরাধ বুঝতে পারল না, অজ্ঞতার গোলকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে মরে গেল, সেটা এই বিরাট নেই-এর লক্ষণ।

কবিতার মতো বহুমাত্রিক এই উপন্যাস অনেকভাবে পড়া যায়। ঘটনাগুলো যে জোসেফের মনের ভেতর ঘটছে না সেটা জোর দিয়ে বলা যাবে না। হয়তো তার অবচেতন মনের বা আমাদের সকলের অবচেতন মনের অপরাধবোধের নাটক এটা। আবার এতগুলো চরিত্রের সঙ্গে আপতবাস্তব আদানপ্রদান, এত ঘর বাড়ি চেয়ার টেবিল রাস্তা বৃষ্টি এসবও তো উড়িয়ে দেবার উপায় নেই! “দি ট্রায়াল” পাঠককে তীব্র অস্বস্তিতে

ফেলে, যেন আধুনিক জীবন ও চেতনা সম্বন্ধে একটা সত্যকে নির্মমভাবে তার সামনে রাখা হচ্ছে। নায়কের মামুলিয়ানা আর নৈতিক কাপুরুষ তাতে আসলে আমাদের একধরনের সায় আছে। তার প্রেমহীন সাদামাটা যৌনতা সে সময়ের সাহিত্যে নতুন হলেও আধুনিক জীবনে অনেকদিনের পরিচিত। এই উপন্যাসে বাস্তব আর দুঃস্বপ্নের অপ্রত্যাশিত মিশ্রণের বীভৎস কৌতুক থেকে আমরা সিঁটিয়ে যাই।

রোমান্টিক রীতি বিরোধী শিল্পের প্রথম পর্যায়ে লেখা “দি ট্রায়াল”-এর “অন্তর্নিহিত অর্থ” ধরার জন্যে গবেষক আর সমালোচকরা কাফকার রাজনীতি, ধর্মবিশ্বাস, দর্শন, ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিগত জীবন সবই টেনে এনেছেন। এই ধরনের ব্যাখ্যার দাম অনস্বীকার্য। তবে এর কিছু সমস্যাও আছে। কবিতাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখতে গেলে যেমন তার অর্থ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়, “দি ট্রায়াল”-কে একপেশে ভাবে পড়তে গেলে তার প্রাণশক্তির রহস্য কি করে যেন হাত ফস্কে বেরিয়ে যায়। কাফকা পাপবোধ এবং পাপীর উত্তরণ নিয়ে কী চিন্তা করেছিলেন বা বানিয়ান-এর “পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস”-এর সঙ্গে “দি ট্রায়াল”-এর সম্পর্ক কী জানার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। উপন্যাসে কিয়েক্সগার্ড-এর আধিবিদ্যক শঙ্কার (metaphysical dread) প্রতিফলনের সম্ভাবনা বা তখনকার অস্থির প্রাণ শহরে জার্মান ভাষায় ইহুদি লেখক কাফকার বিচ্ছিন্নতাবোধের অভিজ্ঞতা সবই “দি ট্রায়াল” পড়ার পক্ষে প্রাসঙ্গিক। সেভাবেই কাফকার স্পর্শকাতরতা আর জীবনভর ব্যর্থতাবোধ, তাঁর বাবার সঙ্গে সংঘর্ষ, “দি ট্রায়াল” রচনাকালে তখনকার প্রেমিকা ফেলিসে বওয়ার-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ওঠানামা সবকিছুই উপন্যাসের ওপর ছায়া ফেলেছে। অন্যদিক থেকে আছে দস্তয়েভস্কি-র “ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট” বা টলস্টয়-এর “দি ডেথ অফ আইভান ইলিচ” ইত্যাদির সঙ্গে “দি ট্রায়াল”-এর জাতিগত মিল। কিন্তু এত কিছু মনে না রাখলেও উপন্যাসটা মনকে একই রকম ধাক্কা দেয়।

আরও আশ্চর্য যে উপন্যাসটা অসম্পূর্ণ। অসমাপ্ত নয়, শেষ পরিচ্ছেদে জোসেফ-এর মৃত্যুর দৃশ্য পরাবাস্তব শিল্পের এক অবিস্মরণীয় নিদর্শন। মাঝের কিছু অংশ হয় নেই অথবা অসম্পূর্ণ ছিল। ১৯১৪-য় শুরু করা উপন্যাস, হয়তো ১৯১৫-য় ছেড়ে দেওয়া অথবা তার কিছু পরে, কাফকা ১৯২৩ সালে ভাগ ভাগ করে তাঁর বন্ধু লেখক ম্যাক্স ব্রড-এর কাছে গাচ্ছিত রাখেন। ১৯২৪ তাঁর যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হয়, ব্রডকে বলে যান কোনও অপ্রকাশিত লেখা যেন না ছাপানো হয়। ব্রড অবশ্য নিষেধাজ্ঞা মানেন নি, অসম্পূর্ণ অংশগুলো প্রায় পুরোপুরি বাদ দিয়ে তিনি “দি ট্রায়াল” প্রকাশ করেন। তবে পরিচ্ছেদে বিন্যাস অনেকটাই ব্রড-এর স্মৃতিনির্ভর। কাফকা বন্ধু মহলে তাঁর লেখা পড়ে শোনাতে। সেই স্মৃতি থেকে ব্রড উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলো সাজিয়েছেন। স্রষ্টার উদ্দেশ্য বা authorial intention নিয়ে সাম্প্রতিক সাহিত্যতত্ত্বে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। এখানে “দি ট্রায়াল” বিতর্কের ইন্ধন যোগাতে পারে ভালো। “দি ট্রায়াল”-এর মতো ব্রড “দি ক্যাসল” এবং অন্য অনেক অপ্রকাশিত কাজ কাফকার ইচ্ছে অমান্য করে ছেপে দেন। যদিও ব্রড নিজের ধারণা মতো কাফকা-কে দেখাতে চেয়েছিলেন তাঁকে ছাড়া কিন্তু কাফকার সবচেয়ে শক্তিশালী কাজের অনেকটাই পাঠকের কাছে পৌঁছত না। Kafkaesque ব্যাপারটা কী-এই ধারণটাই মানুষের হত না হয়তো। ভার্গিস ব্রড বন্ধুর কথা রাখেননি।

চেনাজানা পরিচিত গতানুগতিকতার পাশাপাশি দুর্বোধ্য রহস্যময় অপ্রত্যাশিত ভয়াবহ বিপদের চিত্রাঙ্কনে কাফকার জুড়ি নেই। দি ট্রায়াল-এ আমরা পাই এক আতঙ্ক-

জাগানিয়া ভিত্তিহীন বিচারালয়। এখানে অব্যবহৃত দরজা এমন মুহূর্তে খুলতে পারে যখন তা আবির্ভূত হয় এক অমানবিক ও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে। আলবেয়ার কম্যু দি ট্রায়াল-এর আবহ ও পরিমণ্ডল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: “আমাদের এখানে নিয়ে যাওয়া হয় মানুষী চিন্তার শেষ সীমানা পর্যন্ত। এ রচনায়, যথার্থই, সত্যিকার অর্থে সব কিছু অপরিহার্য। এ্যাবসার্ডের সমস্যা এখানে তার সমগ্রতা নিয়ে ধরা দিয়েছে।”

দি ক্যাসল-কে একাধিক সমালোচক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রূপককাহিনী বলে আখ্যায়িত করেছেন। একটি অশান্ত যন্ত্রণাক্রিষ্ট আত্মা মুক্তির সন্ধানে তার দীর্ঘ পথপরিক্রমা শুরু করেছে, মুখোমুখি হচ্ছে নানা অযৌক্তিক দুর্বোধ্য রহস্যময় প্রতিকূলতার, অগ্রসর হচ্ছে এমন একটি অজানা-অচেনা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যা বানিয়ানের জগতের মতোই অচিহ্নিত, যেখানে পথিকের দিক-নির্দেশের জন্য কোনো চিহ্ন-ফলক নেই। এ-আত্মা আধুনিক মানুষের, যে-মানুষ তার বর্তমান পথপরিক্রমায় অতীতের সরল সুদৃঢ় বিশ্বাসবর্জিত, এবং সে-কারণেই তার যাবতীয় প্রয়াস এত দুরূহ ও বিঘ্নসঙ্কুল। উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে আমরা দেখি যে নায়ক তার অজস্র অবিরাম আশাভঙ্গের পর আবারও নতুন এক আশাভঙ্গের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। কিন্তু এ সত্ত্বেও অনেক পাঠকের কাছে কাফকা একজন দ্বিধাহীন নৈরাশ্যবাদী শিল্পী রূপে প্রতিভাত হন না। তাদের বরং মনে হয় কাফকা যেন বিশ্বাস করেন যে অস্তিত্বের সকল রহস্যের একটা চাবিকাঠি অবশ্যই আছে এবং মানুষের পক্ষে সে চাবিকাঠির সন্ধান লাভ করা সম্ভব। আবার অনেক পাঠক দি ক্যাসল-এর মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ভিন্ন একটি মাত্রিকতা লক্ষ করেছেন। তাঁরা এখানে দেখেছেন আধুনিক আমলাতান্ত্রিকতার দুর্ভেদ্য শ্বাসরোধকারী দুর্গের এক প্রতীক। মানুষ এই দুর্গে ভয়ঙ্কর একজালে আটকা পড়েছে। এই জাল সরকারি লাল-ফিতার, প্রাণঘাতী ব্যুরোক্রেয়াসির, মানুষের সৃষ্ট হাজারো প্রাতিষ্ঠানিক অনুশাসনের। কাহিনীর এই মাত্রিকতা বহু পাঠককে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। তবে শিল্পী হিসাবে কাফকার সার্থকতার মূল নিহিত তাঁর নিটোল কাহিনী নিমাণ-কৌশলে, তাঁর গল্প বলার দক্ষতায়, পুঞ্জানুপুঞ্জ বিশদ বর্ণনার মাধ্যমে একটা দৃঢ়, প্রায় স্পর্শগ্রাহ্য পরিমণ্ডল গড়ে তোলার অনবদ্য ক্ষমতায়। কাফকার বিষয়বস্তু দুর্বোধ্য ও রহস্যাবৃত হতে পারে, কিন্তু তাঁর রচনারীতি ও ভাষাপ্রকরণ সহজ, সাবলীল ও আকর্ষণীয়। দি ক্যাসলসহ কাফকার সব রচনাতেই-এ পরিচয় উজ্জ্বলভাবে বিদ্যুত।

এডুইন ম্যুর ও উইলা ম্যুর কর্তৃক অনূদিত হয়ে ‘দি ক্যাসল’ ইংরাজি ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। এই বইয়ের ভূমিকায় অনুবাদক কাফকাকে পাঠকদের সঙ্গে ‘পরিচিত’ করিয়ে দেন। উপন্যাসটি কাফকা তাঁর স্বভাবাসিদ্ধ ভাবেই সমাপ্ত করেন নি। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় সম্পাদক ম্যাক্স ব্রড জানান, ‘কাফকা উপন্যাসের শেষাংশ লেখেন নি। কিন্তু আমি যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করি উপন্যাসটি তিনি কীভাবে শেষ করতে চান তিনি জানান আমি শেষ পর্যন্ত কিঞ্চিৎ স্বস্তি খুঁজে পাবে। তার সংগ্রাম অবশ্য শেষ হবে না, ক্রমাগত লড়াই করতে করতে তার মৃত্যু হবে। তার মৃত্যুশয্যা ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকবে গ্রামবাসীরা ও দুর্গ থেকে বার্তা এসে পৌছবে। যে যদিও কে-র গ্রামে বাস করার কোনো দাবি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে তবু তাকে সেখানে বাস করে কাজ চালিয়ে যাবার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।’ লক্ষ্যণীয় এখানেও কিন্তু প্রশ্নচিহ্ন থেকেই গেল।

‘দি ক্যাসল’-এর প্রথম যে সংস্করণটি প্রকাশিত হয় তাতে আঠারো পরিচ্ছেদের মাঝামাঝি পর্যায়েই সমাপ্তি চিহ্ন দেওয়া হয়েছিলো। ম্যাক্স ব্রডের সম্পাদনায় যখন

পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হয় তখন তিনি অবশিষ্টাংশ, উনিশ ও কুড়ি পরিচ্ছেদের অস্তিত্ব বিস্তর অনুসন্ধান করে খুঁজে বার করেন ও সেই সংস্করণে যুক্ত করেন। ইংরাজিতে এই অতিরিক্ত অংশের অনুবাদ করেন এথনি উইলকনস ও আর্নস্ট কাইজার। অর্থাৎ একটি উপন্যাস অনুদিত হতে প্রয়োজন হল চারজন বিশ্বখ্যাত অনুবাদকের!

কাফকার 'ট্রাভেল ডায়েরি' থেকে জানা যায় যে ১৯১১ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি উত্তর বোহেমিয়ার ফ্রিডল্যাণ্ড ও লিবেরিক নামক দুটি পুরনো শহরে ভ্রমণ করেন, সম্ভবত ওয়াকার্স অ্যাকসিডেন্ট ইনস্টিটিউটের কর্মী হিসাবেই। ভ্রমণকালে ফ্রিডল্যাণ্ড-এ একটি পুরনো কেল্লা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি দিনলিপিতে লিখেছেন কেল্লাটির আকৃতি একেক দিক থেকে একেক রকম। 'The castle astonishes one by the way it is built one part above the other; long after one has entered the yard it still presents no unified appearance....

দুর্গটি তাঁর মনে এমনই ছাপ ফেলে যে ১৯১৪ সালে ১১ জুন তাঁর বিখ্যাত ডায়েরিটিতে একে কেন্দ্র করে একটি কাহিনীর খসড়াও রচনা করেন 'গ্রামের প্রলোভন' শিরোনাম দিয়ে। এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র উত্তম পুরুষে কাহিনীটি লিখেছে। এটা উল্লেখ করা জরুরী যে 'দুর্গ' উপন্যাসটির প্রথম দিকের পরিচ্ছেদের গোড়ার দিকে 'কে' উত্তম পুরুষেই তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে। পাণ্ডুলিপিতে দেখা গেছে পরে 'আমি'র জায়গায় কাফকা 'কে' বসিয়েছেন।

দি ক্যাসল এমনই বিশ্ববিখ্যাত 'অনন্তভাবে প্রহেলিকাময়' (Perennial Enigma), বিতর্কিত, বহুমাত্রিক উপন্যাস যে এর আলোচনা বিপজ্জনকভাবে অতি সরলিকরণ দোষে দুষ্ট হয়ে পড়তে পারে। ফ্রানৎস কাফকার সমগ্র জীবনের সারাংশের এই অলোকসামান্য গ্রন্থ। তাঁর সমস্ত জীবনের যত রচনা-তাঁর বিখ্যাত দিনলিপি, ছোট গল্প, বড় গল্প, ছোট রচনা, রূপক গল্প-সমস্ত কিছুই কোনো না কোনো ভাবে এই উপন্যাসে গ্রহিত হয়ে আছে ও অসামান্য ভাষার হীরকদ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কাফকার সুস্বাসনীয় হাস্যরস, যা এক অতি বিদগ্ধ মনের পরিচয় বহন করে। রচনার প্রতিটি অক্ষরে আত্মগোপন করে থাকে, পাঠকের আবিষ্কারের অপেক্ষায়।

'দি ক্যাসল' এমনি একটি উপন্যাস যে দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য তারতম্যেই ভিন্ন মাত্রা পেয়ে যেতে পারে। এখানে কাহিনী বিন্যাস, চরিত্রনির্মাণ, প্রেক্ষিত সমস্তই আলো আধারে অস্পষ্ট। মেটামরফোসিস বা ট্রায়ালে অস্তিত্বের যে বিভীষিকাময় রূপটি প্রতিভাত হয়েছিল 'দুর্গে' তা আরও তীক্ষ্ণ, গভীর, ভয়ানক। এক বিপুল, সর্বপরিব্যাপ্ত, সীমাহীন শক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে এগিয়ে যেতে চাইছে তার অনিষ্টের দিকে। সেই অনির্ণেয় শক্তি তাতে লক্ষ্য করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে, কখনও স্নিহভাবে প্রশয়ও দেয় হয়তো, তারপর তাকে হানে মর্মান্তিক আঘাত, তার থেকে কেড়ে নেয় তার সর্বস্ব-তার জীবিকা, প্রেমিকা, আশ্রয়। যে পথ ধরেই সে যাত্রা শুরু করুক না কেন আবার তাকে ঘুরে আসতে হয় আরম্ভে। এখানকার মানুষ হিংস্র, তাকে ঘৃণা করে মনপ্রাণ দিয়ে। যেন তারা সকলেই এক নির্মম অন্ধ শক্তির অংশ মাত্র। অন্তহীন প্রশ্নবলী পাঠককে আক্রমণ করতে থাকে- এই 'কে' আসলে কে? সে কেন দুর্গে ঢুকতে মরিয়া? দুর্গই বা কীসের প্রতীক? ক্ল্যাম কে? হেরনেহফ কী? আমলাবার্গ কারা? তারা কার স্বার্থসিদ্ধ করছে? কীভাবে? বার্তাবাহক ঝরনা বাস কার চিঠি বহন করে? এই সমস্ত প্রহেলিকার জবাব একমাত্র দিতে পারেন

কাফকাই। আমাকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন কাফকা উপমাকেই কাহিনী করে তোলেন তাতে অতি নগণ্য বাস্তবের মিশেল দিয়ে ও শেষে এই ভেদরেখা লুপ্ত করে দেন, উপমান ও উপমিত এক হয়ে যায়। এই বক্তব্য সমর্থিত হতে পারে যদি তাঁর দুটি প্যারার পাঠ করা যায়— ‘বিধানের সামনে’ ও ‘এক রাজকীয় বার্তা’। গ্রাম থেকে আগত এক সামান্য মানুষকে সারাজীবন কাটিয়ে দিয়ে হল বিধানের (Law) দরজার বাইরে বসে, ভিতরে ঢুকবার অনুমতি না পেয়ে। শুধুমাত্র মৃত্যুর আগেই তাকে প্রহরী জানালো যে দরজাটি এবার বন্ধ করে দেওয়া উপন্যাসের সাদৃশ্য অতি ঘনিষ্ঠ, কাফকা ব্যক্তিমানুষের আত্মিক সঙ্কট, শূন্যতাবোধ, শ্বাসরোধকারী পারিপার্শ্বিক, আমলাকেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পিস্ট মানুষের পরিত্যাগের কোনো তৃপ্তিদায়ক আশ্রয় উচ্চারণ করেন নি, তাঁর মতো সংক্রমাগত সুক্ষাতিসূক্ষ্ম ভাবে আত্মানুসন্ধানী লেখকের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না, কিন্তু তবু তার নায়ক কে কখনও নিশ্চেষ্ট, হতোদ্যম হয় না, রাজার বার্তাবহের মতো সে চলতেই থাকে, সিঁড়ির পর সিঁড়ি অতিক্রম করে যেতে থাকে, আবার উঠে আসে সিঁড়ি, সে তা আবার অতিক্রম করে— এভাবেই চলতে থাকে তার অন্তরীণ পদচারণা, শেষহীন এগিয়ে যাওয়া, ক্রমাগত। কোনো একটা লক্ষ্য স্থির করে শুধু এগিয়ে যাওয়া, তা যদি বহুকাল পরেও সমদূরত্বে অবস্থান করে, তবুও।

উপন্যাস ছাড়া ও ফ্রানৎস কাফকা কয়েকটি অত্যন্ত উন্নতমানের, গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণসমৃদ্ধ, আবেদনময় ছোটগল্প রচনা করেছেন। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মেটামরফোসিস, এ হান্সার আর্টিস্ট, এ্যান ওল্ড পেজ, দি হান্টার গ্রাকাস, কারা উপনিবেশে, রায়, এবং গ্রামীণ ডাক্তার। মেটামরফোসিস অথবা রূপান্তরকে অবশ্য ছোটগল্প না বলে উপন্যাসিকাও বলা চলে। বিশ্ব জুড়ে সাধারণ পাঠকের মনে কাফকার নামের সঙ্গে এই রচনাটি প্রায় অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। কেউ-কেউ এর প্রথম বাক্যটিকে বর্ণনা করেছেন আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের সবচাইতে চমক-জাগানো অবিস্মরণীয় বাক্য বলে।

রূপান্তর যথার্থই একটি অত্যাশ্চর্য গল্প। কাফকার প্রতিনিধিমূলক রচনাও বটে। তাঁর সাহিত্যকর্মের সবগুলি প্রধান লক্ষণ ও চরিত্র এর মধ্যে বিদ্যমান। মানুষের জীবন, কর্ম ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি দুর্ভাবনা দুঃস্বপ্ন, তার নিঃসঙ্গতা, বিচ্ছিন্নতা, অপরের সঙ্গে যোগাযোগস্থাপনে অক্ষমতা; নিজেকে অপরের কাছে স্পষ্ট করে তোলার অপরাগতা; নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভয়-ভাবনার কথা অন্যকে কিছুতেই বোঝাতে না পারা; মানুষের চরম ঔদাসীন্য ও নিস্পৃহতা; বিরাজমান বর্তমানের পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে অতীতের স্নেহমমতা সহানুভূতির অবসান; তারুণ্যের কাছে তাৎক্ষণিক জীবনের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ এবং তার ফলে জীর্ণ-অসুস্থ-মৃতকে দ্রুত বিস্মৃত হওয়া-এসবই কাফকা তুলে ধরেছেন তাঁর রূপান্তর গল্পে। গল্পটি কাফকার অন্যান্য রচনার মতোই একাধিক স্তরে বিন্যস্ত, বহুমাত্রিক অর্থ ও ব্যঞ্জনায ঋদ্ধ। এর মধ্যে ফ্যান্টাসি আছে, রূপক-প্রতীক আছে, আর তার আড়ালে আছে নির্মম সত্যের উপলব্ধি ও উদ্ভাসন। এখানে নাটকীয়তা আছে, নিখুঁত চরিত্রচিত্রণ আছে, সর্বোপরি আছে বিশদ বাস্তববাদী বর্ণনার ঐশ্বর্য। মেটামরফোসিস-এর কাহিনী সংক্ষেপে এই রকম: যুবক গ্রোগর সামসা এক মধ্যবিত্ত ভ্রাম্যমাণ সেল্‌সম্যান। কঠিন তার জীবনযুদ্ধ। বৃদ্ধ বাবা-মা আর তরুণী ছোটবোনকে নিয়ে সে থাকে। সংসারের সব দায়দায়িত্ব তার কাঁধে। নানা দৃষ্টিভঙ্গি-দুর্ভাবনা, ক্লাস্তিকর

নিয়ানন্দ কাজের বোঝা, চাকরিক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার ঔদাসীনা ইত্যাদি সত্ত্বেও তার মনে একটা গোপন গর্ববোধও আছে। সে-ই সংসারটা চালাচ্ছে। ছোটবোনকে সে ভালোবাসে। তাকে সঙ্গীতবিদ হবার সুযোগ সে অবশ্যই করে দেবে। এসব কথা অবশ্য গল্পের শুরুতেই আমরা জানতে পারি না। গল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানা তথ্য আমাদের চেতনায় ধরা পড়ে। কাহিনী শুরু হয় অবিশ্বাস্য, অদ্ভুত, চরম নাটকীয় একটি দৃশ্য দ্বারা। বাক্যটি এই: “একদিন নানা দুঃস্বপ্ন দেখার পর ভোরবেলা গ্রেগর সামসা রুমের ঘুম ভেঙে জেগে উঠল তখন সে দেখল যে সে একটা বিশাল পতঙ্গে পরিণত হয়ে তার বিছানায় শুয়ে আছে।” প্রথমে সে ভেবেছিল এটা হয়ত তার স্বপ্নেই সম্প্রসারণ, কিন্তু না, এ কোনো স্বপ্ন নয়। সত্যিই সে বিরাট একটা আরশোলায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এই অবিশ্বাস্য ঘটনার পটভূমিতে কাফকা তাঁর কাহিনীতে যে-বাস্তবতাবাদী পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার সমারোহ নিয়ে আসেন তা বিস্ময়কর। আরশোলা হয়ে যাবার পর গ্রেগর কীভাবে বিছানা থেকে উঠল, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করার কৌশল ও প্রতিরোধ কীভাবে আয়ত্ত করল, কীভাবে চলাফেরা করল, কী আহা করল ও কেমন ভয়-এসবের এমন বিশদ বর্ণনা কাফকা দিয়েছেন যে কাহিনীটি পাঠকমনে অবাস্তব ঘটনার পাশাপাশি একটি বাস্তববাদী স্তরও গড়ে তোলে। এ-প্রসঙ্গে কারও কারও হয়ত কোলরিজের বিখ্যাত কবিতাটির দুঃস্বপ্নের স্মৃতিতাজিত অদ্ভুত এক কাহিনী-বর্ণনাকারী বুদ্ধ দাবিকের কথা মনে পড়তে পারে। সেখানেও বিশদ বর্ণনা অবাস্তব ঘটনার মধ্যেও একটা বাস্তবতার আবহ নিয়ে আসে।

মেটামরফোসিস গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য। আরশোলায় রূপান্তরিত গ্রেগর সামসা ধীরে ধীরে অনিবার্যভাবে তার চেনা জগৎ থেকে, তার স্নেহশীল পারিবারিক বন্ধন থেকে, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই ট্র্যাজেডি আরো বেশনাঘন হয়ে ওঠে এই কারণে যে গ্রেগর নিজে সব বুঝতে পারে, অন্যের প্রতিটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তীক্ষ্ণ হয়ে তার চেতনায় ধরা পড়ে, কিন্তু প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও সে তার নিজের মনোভাব, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও আবেগ-অনুভূতি, কাউকে বোঝাতে সক্ষম হয় না।

কাহিনীর মধ্যে গ্রেগরের মা, বাবা, ভাই-বোন, পরিচারিকা প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্র এসেছে। তাদের প্রতিক্রিয়ার চিত্রায়ণে এবং সেইসব প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেগরের মনোজগতে যে ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হয় তার রূপায়ণে কাফকা উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণশক্তি, মনোবিশ্লেষণ-দক্ষতা এবং শৈল্পিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে ছোটবোনের আচার-আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির যে ক্রমবিবর্তন কাফকা পরিবেশন করেছেন তার মধ্য দিয়ে গ্রেগরের ট্র্যাজিক অবস্থা তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে।

কাহিনীর স্ট্রাকচার বা গঠন-কাঠামোও লক্ষ্য করবার মতো। এর মধ্যে তিনটি সুস্পষ্ট বিভাগ আমাদের চোখে পড়ে। প্রতিটি বিভাগের শেষে একটা ক্লাইমাক্স আছে। সব মিলিয়ে একটা প্যাটার্ন ও ছন্দ লক্ষ্য করি আমরা। গ্রেগর সামসা মারা যায় কাহিনীর শেষ পর্বে। কিন্তু তারপরও কাফকা আরো কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন। গ্রেগরের মৃত্যুর পর পরিবারের সবাই যে তাকে স্বল্পকালের মধ্যেই বিস্মৃত করে, একটা অসম্ভব ও অসহনীয় অবস্থার অবসানে মা-বাবা-বোনের জীবন যে আবার নতুনভাবে অর্থময় হয়ে উঠবে তার নির্ভুল ইঙ্গিত আমরা পাই কাহিনীর সর্বশেষ অনুচ্ছেদে।

একটি স্তরে গল্পটি অবিশ্বাস্য। কোনো মানুষই বাস্তব অর্থে আরশেলায় রূপান্তরিত হতে পারে না। সেদিক থেকে মেটামরফোসিস বাস্তবতাবিরোধী গল্প। কিন্তু আক্ষরিক বাস্তবতাকে অতিক্রম করে কি আমরা ভিন্ন ধরনের কোনো বাস্তবতার কথা ভাবতে পারি না? যদি পারি, তার হলে কি কাফকার এই গল্প আমাদের জন্য ভয়ঙ্কর সব বিচিত্র অর্থে পূর্ণ হয়ে ওঠে না?

তবে জীবনের আনন্দহীনতা, দুর্বোধ্যতা, নিষ্ঠুরতা ও হতাশা যে কাফকা-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সুর তা নিয়ে তর্ক তোলার অবকাশ নেই। আমলাতন্ত্রের অমানবিকতা, ব্যক্তিমানুষের নিরন্তর নিগ্রহ, স্বৈরাচারের সীমাহীন দাপট প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিতে অসামান্য শৈল্পিক দক্ষতার সঙ্গে যে-তীব্র প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে তার গুরুত্বও বিশাল। এটা বুঝতে অবশ্য স্বৈরতন্ত্রীদের দেরি হয় না। ইউরোপে নাৎসি অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই স্বৈরশাসিত অঞ্চলগুলিতে কাফকার সাহিত্যের উপর দমননীতির খড়গ নেমে এসেছিল।

এবার কাফকার রচনায় অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রতিফলন সম্পর্কে দু'একটি কথা। এই দর্শনের প্রতিফলন আর যে সব সাহিত্যিকের রচনায় আমরা বিশেষভাবে লক্ষ করি তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আলবেরার কাম্যু এবং জাঁ পল সার্ত্র। অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল কথাটি অল্প পরিসরে স্পষ্ট করে বলা খুব কঠিন। এই দর্শনের মূলে হচ্ছে অস্তিত্ব। আর এই অস্তিত্ব বলতে বোঝায় মানুষের অলঙ্ক সুপ্ত সম্ভাবনা। যে-বাস্তব পরিবেশ মানুষকে সর্বদা ঘিরে রাখে তাই এ অস্তিত্বের পূর্ণ স্বরূপ নয়। এ হচ্ছে অনিত্যঅস্তিত্ব। এ ছাড়াও আরেকটা নিত্যঅস্তিত্ব আছে। সেটা ব্যক্তির ভেতরকার লুকানো সম্ভাবনা। এই অস্তিত্ব বুদ্ধি ও জ্ঞানের বাইরে। আমাদের চেনাজানা পরিচিত যুক্তির মাধ্যমে এ অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা যায় না। অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের সঙ্কটসীমায় দাঁড়িয়ে ব্যক্তি আকস্মিকভাবে তাকে উপলব্ধি করে অভূতের মধ্যে, অসম্ভবের মধ্যে, স্বপ্ন-মায়া-কল্পনার মধ্যে, যুক্তিহীনতার মধ্যে। নৈরাশ্য, যন্ত্রণা, পাপবোধ, অসন্তোষ ও মৃত্যুর মধ্যে ব্যক্তি সেই সঙ্কট-সীমায় উপনীত হয়, যখন তার চিন্তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে এক তীব্র দার্শনিক আলোকরশ্মিতে এবং তখনই তার পক্ষে সম্ভব হয় সচেতনভাবে পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে, অমোঘ ও চরম এক সিদ্ধান্ত নেওয়া। এই দর্শনের নামই অস্তিত্ববাদী দর্শন। ফ্রানৎস কাফকার গল্প-উপন্যাসে এই দর্শনকেই আমরা বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হতে দেখি গভীর আবেদনময়তায়।

কাফকার সাহিত্যকর্ম বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা ও অর্থময়তায় সমৃদ্ধ। নানা স্তরে তাকে উপভোগ ও উপলব্ধি করা যায়। প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার তাঁর রচনাকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। তাঁর রচনা থেকে প্রায়ই যে-জগতের ছবি উঠে আসে তা পারস্পর্যহীন চরম নৈরাজ্যের, ধোঁয়াটে ধূসরতার। সেখানে মানুষের পক্ষে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। মানুষ শুধু সীমাহীন একাকীত্ব ও চরম শূন্যতার মধ্যে হাবুডুবু খায় যদিও তার মধ্যেও মাঝে মাঝে আশার চকিৎ আলো ঝলসে ওঠে। তবু বিপর্যস্ততার চিত্রই প্রধান।

জুলফিকার নিউটন

বাসা-১/এ, রোড-০৭,

সেক্টর-০৭, উত্তরা।

কে যখন পৌছল তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। গ্রামটি ঘন তুষারে আবৃত। দুর্গের পাহাড়টা লুকিয়ে পড়েছে, কুয়াশা ও অন্ধকারে এমনভাবে অবগুপ্তিত যে সামান্য আলোকবিন্দু পর্যন্ত দেখা যায় না যাতে মনে হতে পারে সেখানে একটা দুর্গ রয়েছে। যে কার্ঠের সেতুটি পার হয়ে বড়ো রাস্তা থেকে গ্রামে প্রবেশ করা যায় তার উপর কে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তার উপরিভাগে এক ঐন্দ্রজালিক শূন্যতার দিকে তাকিয়ে।

এরপর সে চলতে থাকল রাতের একটা আশ্রয়ের খোঁজে। একটা সরাইখানা তখনো জেগে আছে। আর যদিও পাহুনিবাসের অধিকারী তাকে একটাও ঘর দিতে পারল না ও বিচলিত হয়ে পড়ল এরকম বিলম্বিত ও অপ্রত্যাশিত আগমনে, তাকে ইচ্ছুকই দেখা গেল একটা খড়্‌ভরা বস্তার উপর তাকে শুতে দিতে। কয়েকটি কৃষক তখনো বিয়ার ঘিরে বসে ছিল কিন্তু কথোপকথনে তার কোনো রুচি ছিল না, চিলেকোঠা থেকে খড়ের একটা বস্তা নামিয়ে এনে সে অগ্নিকুন্ডের পাশে শুয়ে পড়ল। এই কোণটি বেশ গরম, কৃষককুল নিঃশব্দ এবং তার ক্লান্ত চক্ষুযুগলকে তাদের ওপর বিচরণ করতে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি কে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু একটু পরেই তাকে জেগে উঠতে হয়। শহুরে পোশাক পরা একটি যুবক, মুখটা অভিনেতার মতো, চোখ ছোটো, জুগল লক্ষণীয়, মালিকের সঙ্গে তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চাষিরা তখনো ঘরে। কয়েকজন আবার তাদের চেয়ারগুলো ঘুরিয়ে বসেছে যাতে তারা আরো ভালোভাবে কী হচ্ছে দেখতে ও শুনতে পায়। নিজে কে দুর্গাধ্যক্ষের ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে তরুণটি অতি সুভদ্রভাবে মার্জনা চাইল কে'র নিদ্রাভঙ্গ করার জন্য এবং বলল, 'এই গ্রামটা দুর্গের সম্পত্তি এবং যে কেউই এখানে বাস করুক বা রাত কাটাক না কেন ধরে নেওয়া হয় সে দুর্গের অনুমতিক্রমেই তা করছে। কিন্তু আপনার এধরণের কোনো অনুমতিপত্র নেই, কিংবা অন্তত এখন পর্যন্ত আপনি এমন কোনো কিছু দাখিল করেননি।'

কে নিজে কে অর্ধআসীন করেছিল, এবার চুল কিছুটা বিন্যস্ত করে দুটি লোকের দিকে চেয়ে বলে, 'ঘুরতে ঘুরতে এই যে গ্রামটিতে এসে পড়লাম এটার নাম কি? এখানে একটা দুর্গ আছে নাকি?'

'খুবই নিশ্চিতভাবে,' উত্তর দেয় যুবকটি আস্তে আস্তে, এই সময়টা এদিক ওদিক কয়েকটা মাথা কে'র মন্তব্যে বিচলিত হয়ে ওঠে, 'আমার প্রভু কাউন্ট ওয়েস্ট' ওয়েস্ট এর দুর্গ।'

'এবং এখানে ঘুমতে গেলে অনুমতিপত্রটি বাধ্যতামূলক?' কে জিজ্ঞাসা করে, যেন সে নিজে কেই নিশ্চিত করতে চায়, সে যা শুনেছে তা স্বপ্ন নয়। 'অনুমতিপত্র পেতেই হবে' উত্তর পাওয়া গেল এবং তরুণটির ভঙ্গিতে ব্যঙ্গমিশ্রিত ঘৃণাও ফুটে উঠল যখন সে

হাত ছাড়িয়ে দিয়ে অন্যদের দিকে চেয়ে আবেদন করে, 'কিংবা, অনুমতিপত্র বাধ্যতামূলক নয় কিনা?'

'ঠিক আছে, তাহলে তো আমাকে গিয়ে একটা যোগাড় করে আনতেই হয়,' বলে কে হাই তুলে ও কমল ঠেলে ফেলে যেন উঠতে চাইছে এমন ভাবে।

'কোথা থেকে, শুনি?' যুবকটি শুধায়।

'কাউন্টের থেকে' বলে কে, 'সেটাই তো একমাত্র কর্তব্য।'

'এই মাঝরাতে কাউন্টের থেকে অনুমতিপত্র?'

'চেষ্টায়ে ওঠে যুবকটি, একপা পিছিয়ে গিয়ে।

'সেটা কি অসম্ভব?' জিজ্ঞাসা করে কে ঠাণ্ডা ভাবে।

'তাহলে আমাকে জাগালে কেন?'

এই কথা শোনামাত্র যুবকটি উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। 'তোমার এ ধরনের আন্তর্কুণ্ডের ব্যবহার একদম চলবে না।'

সে চেষ্টায়ে উঠে, 'আমি দাবি করছি কাউন্টের মর্যাদার প্রতি সম্মান দেখিয়ে কথা বলতে। আমি তোমাকে ঘুম ভাঙিয়েছি শুধু তোমাকে জানাতে এই মুহূর্তে তুমি কাউন্টের এলাকা চেড়ে চলে যাও।'

'যথেষ্ট বোকামি হয়েছে,' বলে কে উল্লেখযোগ্য শাস্ত গলা আবার নিজেকে সটান শুইয়ে দিয়ে, কমলটা টেনে নিয়ে, 'তুমি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছ, বন্ধু আমার, আর কাল তোমার ব্যবহার বিষয়ে অনেক কিছু বলবার রয়ে গেল। প্রয়োজন হলে এই সরাইওয়াল ও আর অন্য সব ভদ্রলোকেরাও রইলেন আমার হয়ে সাক্ষ্য দিতে যদি প্রয়োজন হয়। তাহলে শোন বলি, আমি হচ্ছি জমির কানুনগো ও কাউন্ট আমাকে প্রত্যাশা করছেন, আমার সহকারীরা যন্ত্রপাতি নিয়ে গাড়ি করে কালই এসে হাজির হবে। তুষারের মধ্যে হাঁটার সুযোগটা আমি ছাড়তে চাইনি কিন্তু কপাল খারাপ, বেশ কয়েকবার রাস্তা হারাই ও ফলে এখানে এসে পৌছই অনেক দেরিতে। তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবার অনেক আগেই আমার ভালোভাবে জানা ছিল যে দুর্গে গিয়ে হাজির হবার ক্ষেত্রে অনেক দেরি হয়ে গেছে। সেই কারণেই রাত কাটাতে এই বিছানাটা বেছে নেই, যেখানে খুব হালকাভাবে বললেও তুমি আমাকে অত্যন্ত অভদ্রভাবে বিরক্ত করেছ। বলার কথা শুধুমাত্র এই। শুভরাত্রি ভদ্রমহোদয়গণ।' এবং কে এরপর আগুনের দিকে মুখ করে পাশ ফিরে শোয়।

'জমির আমিন?' সে শুনতে পায় সংশয়পূর্ণ প্রশ্নটি তার পিছনে, তারপর সার্বিক স্তব্ধতা নেমে আসে। কিন্তু একটু পরেই যুবকটি তার নিশ্চিত ভাবটি পুনরুদ্ধার করে ও কণ্ঠস্বর একটু নামিয়ে এনে, যাতে স্পষ্টই বোঝা যায় সে কে-র ঘুমের ব্যাপারে সংবেদনশীল, আবার সেই সঙ্গে ততটাই জোরে যাতে কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, বলে সরাইওয়ালকে, 'আমি এক্ষুনি ফোন করে খবর নিচ্ছি।'

তাহলে এই গ্রাম্য সরাইখানাটিতে একটা টেলিফোনও আছে? ব্যবস্থাপত্র সবই এখানে পূর্ণমাত্রায়। এই ব্যাপারটা বিশেষ করে কে-কে অবাক করল, অবশ্য মোটামুটি সে এটা আশাও করেছিল। দেখা গেল টেলিফোনটা তার ঠিক মাথার ওপরেই রাখা

ছিল। সে শুধু ভদ্ভাচ্ছন্ন হওয়ায় তার চোখ এড়িয়ে গেছে। এখন যুবকটি যদি সত্যিই টেলিফোন করতে চায় তাহলে, খুব সতর্কভাবে করলেও, কে-কে বিরক্ত না করে তার জ্ঞা করার উপায় নেই। এখন প্রশ্ন এই কে তা করতে দেবে কিনা। সে সিদ্ধান্ত নিল সে জ্ঞা বরদাস্ত করবে। সেক্ষেত্রে অবশ্য তার ঘুমের ভান করার কোনো মানে হয় না ও জ্ঞাই সে চিৎ হয়ে শোয়। সে দেখতে পেল চাষিদের মাথাগুলো একত্রিত হয়েছে। আমিনের উপস্থিতিকে ছোটোখাটো ব্যাপার বলা যায় না।

রসুইঘরের দরজাটা খোলা হয়েছে ও সমস্ত কপাট আগলে বিরাট চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িওয়ালী, যার দিকে পা টিপে এগোচ্ছিল বাড়িওয়ালী তাকে সবকিছু অবগত করতে। এবং এরপর টেলিফোনে কথোপকথন শুরু হলো, দুর্গাধিপতি এখন নিদ্রামগ্ন কিন্তু তার সহকারী, অনেক সহকারীর মধ্যে একজন, কোনো এক হের ফ্রিজকে পাওয়া গেল। যুবকটি নিজেকে স্কোয়ারজার বলে পরিচয় দিয়ে রিপোর্ট করল যে সে আবিষ্কার করেছে কে নামক বছর ত্রিশের দূর্বীণিত প্রকৃতির এক লোককে, যে তার রুকস্যাককে বালিশ বানিয়ে একবস্তা খড়ের উপর শুয়ে আরামে ঘুমোচ্ছিল। তার হাতের কাছে অসমান একটি গাঁটওয়ালা ছড়িও রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই লোকটার ওপর তার সন্দেহ হয়। বাড়িওয়ালী যেহেতু নিশ্চিত ভাবেই কর্তব্যে অবহেলা করেছে, সে, স্কোয়ারজার, ব্যাপারটা নিয়ে অনুসন্ধান করা অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করে; সে লোকটিকে ঘুম থেকে জাগিয়েছে, কাউন্টের এলাকা বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে, যেটাকে কে অত্যন্ত অশোভন ভাবে নিয়েছে, সম্ভবত কিছুটা সঙ্গতভাবেই, যেটা পরে ঘটনাচক্রে বোঝা গেছে, কারণ সে দাবি করছে কাউন্ট স্বয়ং নাকি তাকে আমিনের কাজে নিযুক্ত করেছেন।

অবশ্য বলা বাহুল্য, এই দাবিটি সরকারি ভাবে সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন। তাই স্কোয়ারজার হের ফ্রিজকে অনুরোধ করছে তিনি যেন দপ্তরে খবর নেন জমির আমিনকে সত্যিই আশা করা হচ্ছে কিনা ও তাকে টেলিফোন দ্রুত উত্তরটা জানান। হের ফ্রিজ যখন অনুসন্ধান চালাচ্ছিল ও যুবকটি উত্তরের অপেক্ষা করছিল তখন ঘরে নিস্তব্ধতা।

কে তার অবস্থান বদলায় না, এমনকি পাশ পর্যন্ত ফেরে না। সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে শূন্যের দিকে চেয়ে থাকে। স্কোয়ারজারের রিপোর্টটা, যা বিদ্রোহ ও সতর্কতার একটি সংমিশ্রণ, তাকে ধারণা দেয় দুর্গটিতে কূটনীতিগত কৌশল কি পরিমাণে রয়েছে যাতে, এমনকি স্কোয়ারজারের মতো তুচ্ছ একটা কর্মচারী পর্যন্ত এতটা দূরস্ত, কর্মতৎপরতায় তাঁদের এতটুকু ঘাটতি নেই, কেন্দ্রীয় দপ্তরে রাতে পর্যন্ত কাজকর্ম অব্যাহত চলে এবং স্পষ্টতই উত্তরও আসে চটপট, কারণ ফ্রিজ ইতিমধ্যেই রিং করছিল। তার উত্তর মনে হলো খুব সংক্ষিপ্ত কারণ স্কোয়ারজার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার নামিয়ে রাখল, চেষ্টা করে উঠল ত্রুণ্ডভাবে, 'ঠিক যা আমি বলেছিলাম, আমিনের চিহ্নমাত্র না। একটা সাধারণ, মিথ্যেবাদ চালচলোহীন ভবঘুরে। বোধহয় আরো খারাপ।'

এক মুহূর্তের জন্য কে'র মনে হলো ওরা সবাই, চাষিরা, বাড়িওয়ালী, বাড়িঅলি একসঙ্গে তার ওপর একত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং তাদের আক্রমণের অন্তত প্রথম দিক এড়াতে সে সরাসরি কন্সলের তলায় ঢুকে পড়ে, কিন্তু টেলিফোন আবার বেজে ওঠে,

যেন একটু বিশেষ অগ্রগতি ভাবে মনে হলো কে'র আস্তে সে মাথাটা বার করে। যে খবর আসতে তা কে'র বিষয়েই এমন সম্ভাবনা না থাকলেও সকলেই থমকে যায় ও স্কোয়ারজার রিসিভারটা আবার তোলে। সে অনেকক্ষণ অপূর্ণপক্ষের কথা শোনে তারপর নিচু গলায় বলে, 'ভুল হয়েছে? তাই নাকি? শুনে দুঃখিত হলাম। আধিকারিক এ কথা বলেছেন? খুবই অদ্ভুত, খুবই অদ্ভুত। আমি এখন কীভাবে এসব আমিনকে বোঝাই বলুন দেখি?'

কে কান খাড়া করে। তাহলে দুর্গ তাকে আমিন হিসাবে স্বীকার করে নিচ্ছে। এটা তার পক্ষে একদিকে প্রতিকূল কারণ, এর অর্থ হলো দুর্গ তার বিষয়ে সব খোঁজখবরই রাখে, সম্ভাব্য সমস্ত সম্ভাবনাই ছকে রেখেছে ও চ্যালেঞ্জটা সুস্মিতভাবে গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে অবশ্য এটা তার পক্ষে বেশ ভালোই বলা চলে, কারণ তার বিশ্লেষণ যদি সঠিক হয় তারা তার শক্তিকে খাটো করে দেখেছে এবং যতটা সে আশা করেছিল তার অনেক বেশি স্বাধীনভাবে কাজ করতে সে পারবে। তারা যদি আশা করে থাকে গগনস্পর্শী উল্লাসিকতা থেকে আমিন হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে তারা তাকে ভয়ে কুঁচকে দেবে তাহলে তারা মস্ত ভুল করেছে। তবে এতে তার তাকে সূক্ষ্ম একটা খোঁচা লাগে, এইমাত্র।

সম্ভ্রান্ত ভঙ্গিমায় স্কোয়ারজার যখন এগিয়ে আসছিল সে হাত নেড়ে খেদায়, বাড়িওয়ালার ঘরে নিজেকে স্থাপিত করনার সনির্বন্ধ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। সে গ্রহণ করে শুধু তার থেকে উত্তপ্ত পানীয় ও বাড়িওয়ালীর কাছ থেকে বেসিনে মুখ ধুতে এক টুকরো সাবান ও একটি তোয়ালে। ঘর খালি করে দেবার কথা এমনকি তাকে বলতে পর্যন্ত হয় না কারণ সমস্ত লোকগুলো হুড়মুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মুখ ফিরিয়ে পাছে সকালে সে আবার তাদের চিনতে পারে। আলোটা নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে সে শান্তিতে চোখ বোজে। ভোর পর্যন্ত সে অঘোরে ঘুমোয়। তার পাশ দিয়ে দু-একবার ইঁদুরের ঘোরাফেরা তার ঘুমে সামান্য বিঘ্নমাত্র ঘটায় না।

প্রাতরাশ সম্পন্ন হবার পরই, যার দাম সরাইওয়ালার কথামতো দুর্গ থেকে মেটানো হবে তার থাকা খাওয়ার খরচ সমেত, সে গ্রামে বেরোবার জন্য প্রস্তুত হলো। গৃহস্থামীর ওপর সে বেশ কড়া ব্যবহার করেছিল তার গতরাতের আচরণের কারণে। সে তার পায়ে পায়ে ঘুরছিল মুখ কাঁচুমাচু করে। সে তার ওপর সদয় হয় ও বসতে বলে কিছুক্ষণের জন্য।

'কাউন্টের সঙ্গে আমার এখনও সাক্ষাৎ হয়নি' বলে কে, 'কিন্তু ভালো কাজের জন্য তিনি পারিশ্রমিক দেন ভালোই, কি বল? আমার মতো কোনো লোক যখন বাড়ি থেকে এতটা পথ ভেঙে আসে সে তো আশা করতেই পারে পকেটে কিছু নিয়ে ফিরে যাবে।'

'সেরকম আশঙ্কায় বিচলিত হবার কোনো কারণ ভদ্রমহোদয়ের নেই। মন্দ পারিশ্রমিক পাবার অনুযোগ কেউ করেনি কখনও।'

'বেশ,' বলে কে, 'আমি তোমাদের মতো ভীতু লোকদের একজন নই, আর এমনকি একজন কাউন্টকেও উচিত কথা শোনাতে পারি দরকার হলে, তবে কিনা কোনোরকম ঝগড়া ছাড়া সব চুকে যাওয়াটাই তো সবচেয়ে ভালো, বাড়িওয়ালা কে'র

উল্টোদিকে জানালার নিচে ধার ঘেষে বসেছিল, আরো আরামদায়ক জায়গায় বসতে সাহস করেনি ও কে'র চোখে এক দৃষ্টিতে চেয়েছিল, তার দীর্ঘ ধূসর চোখে আশঙ্কার ছাপ! প্রথমদিকে সে কে'র সান্নিধ্যে নিজেকে গুঁজে দিয়েছিল বটে কিন্তু এখন সে পালাতে পারলে বাঁচে। তার ভীতির কারণ কি এরকম নাকি যে কে তাকে কাউন্ট সম্পর্কে উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করতে পারে? সে কি ভয় পাচ্ছে কে, যাকে সে 'ভদ্রলোক' হিসাবে ধরে নিয়েছে, অবিবেচনার কাজ কিছু করে বসতে পারে? তার মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া দরকার। সে তার ঘড়ির দিকে তাকায় তারপর বলে, 'আমার সহকারীরা এখনি এসে হাজির হবে। ওদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পাররে?'

'নিশ্চয়ই স্যার,' সে বলল, 'কিন্তু ওরা আপনার সঙ্গে দুর্গে থাকবে না?'

তাহলে কি বাড়িওয়ালার প্রবল ইচ্ছে শাঁশালো খদ্দেরদের, কে সুদ্ধ, ব্যবসার স্বার্থ ভুলে দুর্গে চালান করা?

'সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। আগে আমার জানা প্রয়োজন আমার থেকে কী ধরনের কাজ আশা করা হচ্ছে। আমাকে ধর যদি এই জায়গাটাতেই কাজ করতে হয় তবে আমার পক্ষে সুবিবেচনার হবে তোমার এখানেই বাস করা, তাছাড়া আমার আশঙ্কা হচ্ছে দুর্গে বাস করাটা আমার খুব পছন্দের হবে না। আমি নিজেই নিজের প্রভু হওয়াটা পছন্দ করি।' 'আপনি দুর্গকে চেনেন না,' বলল বাড়িওয়ালা শান্তভাবে।

'অবশ্যই' উত্তর দিল কে 'হট করে কোনো কিছু বিচার করাটা উচিত নয়। দুর্গ বিষয়ে এই মুহূর্তে আমি যা জানি তা হলো ওখানকার লোক জানে কিভাবে যোগ্য আমিন নিয়োগ করতে হয়। কে জানে দুর্গের হয়ত আরো কিছু আকর্ষণ আছে,' এরপর সে উঠে দাঁড়ায় বাড়িওয়ালাকে তার সঙ্গে থেকে মুক্তি দিতে, যেহেতু লোকটি খুব অস্বস্তির সঙ্গে ঠোট কামড়াচ্ছিল। অত সহজে ওর বিশ্বাস অর্জন করা যাবে না।

বেরিয়ে যাবার আগে কে'র নজরে পড়ল গাঢ় একটা হালকা ফ্রেমে বাঁধানো পোট্রেট বুলছে দেয়ালে, চুল্লির ধারে কোচের ওপর যখন সে শুয়ে ছিল তখনই সে এটা লক্ষ্য করেছিল কিন্তু অতটা দূরত্ব থেকে সে এর খুঁটিনাটি তেমন ভালো বুঝতে পারেনি। মনে করেছিল ফ্রেমের পেছনে সাধারণ একটা পশ্চদপট মাত্র কিন্তু আসলে এখানে একটা পুরোদস্তুর ছবিই রয়েছে। সে দেখতে পেল প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স্ক একটি লোকের কাঁধ পর্যন্ত পোট্রেট। বুকের ওপর লোকটির মাথা এতটাই নুয়ে পড়েছে যে তার চোখদুটি প্রায় দেখা যাচ্ছে না। আর মনে হচ্ছে তার উঁচু ভারি কপাল ও শক্তপোক্ত বাঁকা নাকের ভারই মাথাটাকে নিচে নামিয়ে এনেছে। এই ভঙ্গিটার দ্রুপ লোকটির ঘন দাড়ি থুতনি থেকে আরো নিচে ছড়িয়ে গেছে। তার বাঁ হাতটা বিপুল শৃঙ্খলার মধ্যে অদৃশ্য কিন্তু মনে হয় তা মাথাটাকে ঠিক খাড়া রাখতে অসমর্থ। 'লোকটা কে?' কে প্রশ্ন করল, 'কাউন্ট?'

সে পোট্রেটটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, পেছনে সরাইওয়ার দিকে তাকাল না। 'না,' অপরজন উত্তর দেয় 'দুর্গপ্রধান,' 'বেশ সুদর্শন দুর্গপ্রধান' বলল কে।

"দুঃখের ব্যাপার ওর ছেলোটা এমন দুর্বিণীত।" 'না, না' বলল দুর্গপ্রধান, কে-কে নিজের দিকে একটু আকর্ষণ করে ও কানে ফিসফিস করে, 'স্কোয়ারজার কালকে বাড়িয়ে বলেছে, ওর বাপ সামান্য একটা দুর্গরক্ষক মাত্র, একদম নিচুতলার কর্মচারী।'

এই সময় বাড়িওয়ালাকে একটা অবোধ শিশু বলেই কে'র মনে হয়। 'বদম্শ একটা,' বলে কে হাসতে হাসতে কিন্তু বাড়িওয়ালার সেই হাসিতে ফেণ ন' দিয়ে বলে, 'তা হলেও ওর বাবা খুব শক্তিশালী।'

'তোমার ব্যাপারটা বেশ মজার,' বলে কে, 'সকলেই তোমার কাছে শক্তিশালী, আমিও, বোধহয়?' 'না,' সে উত্তর দেয়।

'আমি আপনাকে ক্ষমতাবান মনে করি না।'

'তোমার দৃষ্টিশক্তি বেশ প্রখর হে,' বলে কে, 'কারণ নিজেদের মধ্যেই বলি আমার সত্যিই তেমন কোনো ক্ষমতা নেই। এই প্রসঙ্গে বলি ক্ষমতাবানদের সম্পর্কে তোমার চেয়ে আমার শ্রদ্ধা কম নয়, আমি শুধু তোমার মতো সং নেই ও তাই সবসময় এটা স্বীকার করতে দ্বিধা করি।'

এবং কে বাড়িওয়ালার গালে একটা টোকা দেয় তাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে ও তার মধ্যে বন্ধুত্ব সঞ্চার করতে। এর ফলে সে একটু হাসে। বাস্তবিকপক্ষে তাকে যুবকই বলা যায়, মুখটা নরম ও শূশ্ৰূহীন, তার ওরকম একটা পৃথুলা, বয়স্কা বউ জুটল কীভাবে? ছোটো একটা জানলার ভিথর দিয়ে বউটাকে দেখা যায় রান্নাঘরে দাপিয়ে বেড়োচ্ছে, পুরো বাছ দুটি প্রায় দৃশ্যমান। বাড়িওয়ালার আরো বিশ্বাস জোর করে অর্জন করার চেষ্টা কে করল না। তার মুখে যে শেষ পর্যন্ত হাসি ফোটাতে পেরেছে তা আবার ভয় পাইয়ে মুছে দেবার ইচ্ছা তার ছিল না। অতএব সে তাকে দরজা খুলে দিতে ইঙ্গিত করে এবং উজ্জ্বল শীতের ভোরে বেরিয়ে পড়ে।

এখন সে ঝকঝকে উজ্জ্বল বায়ুমণ্ডলে তার ওপরে স্পষ্টাকারে দুর্গটিকে দেখতে পেল, হাল্কা তুষারে আবৃত থাকায় এর প্রান্তরেখা আরো সুনির্দিষ্ট দেখাচ্ছিল। মনে হয় নিচের গ্রামে যতটা তুষারে ঢাকা তার চেয়ে পাহাড়ের ওপর বরফ অনেক কম। নিচে তুষারবৃত্ত গ্রামের তুলনায় কালকে বড়ো রাস্তায় হাঁটা যতটা কষ্টকর হয়েছিল এখানে সে দেখল তার চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রমসাধ্য এগিয়ে যাওয়া। এখানে প্রবল তুষারপাতের ফলে কুটিরের জানলা পর্যন্ত উঁচু হয়ে তুষার জমে রয়েছে, অথচ পাহাড়ে সবকিছুই মাথা উঁচু করে হালকা বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে, অন্তত নিচে এখান থেকে তেমনটাই দেখাচ্ছে।

সার্বিকভাবে বহুদূরে দুর্গের মহিমান্বিত আকৃতিটি কে'র প্রত্যাশা পূরণ করল। এটি প্রাচীন একটি গড়ের মতো নয় আবার নতুন অট্টালিকা সদৃশও নয়, বরং এলোমেলোভাবে বসিয়ে দেওয়া অসংখ্য গৃহের একটি সম্মিলিত রূপ, ঘনবিন্ধভাবে দু এক তলার মধ্যে সামগ্রিক একটা আকৃতি নিয়েছে।

কে যদি না জানত এটা একটা দুর্গ সে এটাকে একটা ছোটোখাটো শহর বলেই ভেবে নিত। যতদূর তার চোখে পড়ল তাতে একটিমাত্র টাওয়ার রয়েছে। যদিও সে স্থির করতে পারল না এটি কোনো গৃহের অংশ কিংবা চার্চের সঙ্গে সংলগ্ন। কাকের ঝাঁক দুর্গটির ওপর চক্রাকারে উড়ছিল।

দুর্গের ওপর দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে কে এগোতে থাকল সামনের দিকে, অন্য কোনো বিষয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে, কিন্তু দুর্গটির কাছে গিয়ে সে রীতিমতো আশাহত হয়ে

পড়ল; আসলে এটি একটি দুর্দশাগ্রস্ত ভাস্কাচোরা ছোটো শহর মাত্র, অনেকগুলো গ্রাম্য কুটির জড়াজড়ি করে রয়েছে, এর একমাত্র মাহাত্ম্য এগুলো পাথর দিয়ে গড়া যদিও এর সর্বদেহ থেকে প্লাস্টার অনেক আগেই খসে পড়েছে, প্রস্তরখন্ডগুলিও ধ্বসে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য কে-র মনে পড়ল নিজের শহরের কথা। এই তথাকথিত দুর্গটি থেকে তা কোনো অর্থেই হীন নয় আর শুধুমাত্র সৌন্দর্য্য উপভোগের দিক দিয়ে বিচার করলে তো এতদূরে আসার জন্য দুঃখই হয়। এর চেয়ে নিজের শহরটিতে আবার ফিরে গেলেই সে অনেক বুদ্ধিমানের কাজ করত।

বহুকাল সে তার জন্মস্থানটি দেখেনি। এবং সে মনে মনে তার নিজের শহরের চার্চের টাওয়ারের সঙ্গে তার সামনে উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকা টাওয়ারটির তুলনা করল। তাদের চার্চের টাওয়ারটি, দৃঢ়বদ্ধ রেখা নিয়ে সোজা উঠে গেছে বিশিষ্ট শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত। লাল টালিতে আবৃত, শীর্ষদেশ বিস্তৃত। একটি পার্থিব সৃষ্টি অবশ্যই কিন্তু মানুষ এর বেশি কী আর বানাতে পারে? শুধুমাত্র সাধারণ তুচ্ছ গৃহের অনেক, অনেক ওপরে কিছু সৃষ্টির আশ্চর্য্য এক প্রেরণা, যার স্পষ্টই এক অর্থ-সাধারণ জীবনযাত্রার বহু উচ্চে অবস্থিত কোনো কিছুর ধারণা। অথচ এখানকার টাওয়ারটি, যেটি দেখা যাচ্ছে, বোঝাই যায় একটি গৃহ থেকে উথিত, সম্ভবত মূল গৃত থেকেই ওপরে উঠে যাওয়া, সার্বিকভাবে গোলাকৃতি; মাঝে মাঝে গবাক্ষের ফোকর, সেটা তখন রোগে ঝলসাচ্ছে, কিছুটা দুর্বল প্রাচীর, এলোমেলো, অসমান, ভাঙা ফাটা, যেন কোনো শিশুর কাঁচা হাতের সৃষ্টি। এটি নীল আকাশের পটভূমিকায় তীক্ষ্ণ রেখায় পরিস্ফুটিত। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম-কোনো বিষণ্ণ উন্মাদ আবাসিক, যাকে বাড়ির উচ্চতম প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখা হয়েছিল, যেন হঠাৎ ছাদ ফুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ও পৃথিবীর দৃষ্টির সামনে নিজেকে সগর্বে ঘোষণা করছে।

কে-কে আবার থামতে হলো। যেন স্থির ভাবে দাঁড়ালে তার পর্যবেক্ষণটি যথার্থ হবে। কিন্তু এতে ব্যাঘাত ঘটল। গ্রাম্য চার্চের ঠিক পেছনে, যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল, এটি ক্ষুদ্র ভজনালয়ই বটে, এলাকার লোকদের স্থান সংকুলানের জন্য খামারের মতো বিস্তৃত একটি এলাকার সংযোজন ঘটেছে এখানে-রয়েছে একটি স্কুল, দীর্ঘ, নীচুতলার একটি বাড়ি, উল্লেখযোগ্যভাবে যা প্রাচীনতা ও গ্রামীণ পরিবেশের মিশ্রণ। স্কুলবাড়িটি বেড়া দিয়ে ঘেরা একটি বাগানের পেছনেই, বাগানটা এখন তুষারাবৃত, শিশুর দল বেরিয়ে আসছিল শিক্ষকদের সাথে, তারা তাকে ঘিরে ভিড় করল। তারা তার দিকে তাকিয়ে সমন্বরে এমনভাবে কলকাকলি জুড়ে দিল বিরামহীনভাবে যে কে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না তাদের বক্তব্য কী। শিক্ষকটি একটি যুবক, অপ্রশস্ত কাঁধ, খাড়া চেহারা। এর ফলে তাকে হালকা প্রকৃতির মনে হচ্ছিল না। দূর থেকেই কে-র দিকে সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই, কারণ বাচ্চাদের বাদ দিলে ধারে কাছে অন্য কোনো মানবসন্তান দেখা যাচ্ছিল না। সে এখানে একজন আগন্তুকমাত্র এটা ধরে নিয়ে কে-ই প্রথম এগিয়ে গেল। বিশেষ করে এইজন্য যে অপর ব্যক্তিটিকে বেশ কর্তৃত্বপরায়ণ ব্যক্তি বলেই তার মনে হলো ও বলল, ‘গুড মর্নিং, স্যার’। এই একটি বাক্যঘাতেই যেন দল নির্বাক হলো ও মাস্টারমশাইটিও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন পরবর্তী কথাগুলো সাজিয়ে নেবার জন্য।

‘আপনি দুর্গটা দেখছিলেন?’ কে যতটা আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক নম্রভাবে শিক্ষকটি জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু এই প্রশ্নের মধ্যে মিশে ছিল এমন একটা ভাব যাতে বোঝা গেল কে-র পর্যবেক্ষণটি তার পছন্দ নয়, ‘হ্যাঁ’ বলল কে, ‘আমি এখানে আগন্তুক, সবে মাত্র গতকাল রাতে এই গ্রামে এসেছি।’

‘দুর্গটি আপনার পছন্দ হয়নি?’ দ্রুত প্রত্যাঘাত করল শিক্ষকটি।

‘কী?’ কের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে, একটু চমকে উঠে, তারপর প্রশ্নটি করল পুনরায় কিছুটা শোভনভাবে, ‘আমি দুর্গটি পছন্দ করি কিনা? কেমন করে ধরে নিলেন করিনি?’

‘সদ্যাগতরা কখনও করে না।’ বলল শিক্ষক।

পাছে সে ভুল কিছু বলে ফেলে তার সম্ভাবনা এড়াতে কে প্রসঙ্গ বদলাল ও বলল, ‘আপনি সম্ভবত কাউন্টকে চেনেন?’

‘না,’ বলে শিক্ষকটি মুখ ফিরিয়ে, কিন্তু ‘কে-কে এতে দমানো গেল না।

‘সে আবার জিজ্ঞাসা করে, ‘সেকি? আপনি কাউন্টকে চেনেন?’ আমার চেনার দরকারট কী,’ উত্তর দেয় অপরজন নিচু স্বরে তারপর ফরাসিতে যোগ করে, ‘দয়া করে মনে রাখবেন এখানে অনেক সরল মতি শিশুরা রয়েছে।’

এতে কে-র মনে হলো সে সঙ্গতভাবে প্রশ্ন করতেই পারে, ‘তাহলে ভাই, আমি কি একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি?’

আমাকে বেশ কিছু সময় থাকতে হবে আর ইতিমধ্যেই আমার একটু একলা লাগছে। এইসব চাষি কিংবা ধরুন দুর্গ, কোনোটার সঙ্গেই আমার খাপ খাচ্ছে না,’ ‘এই চাষিরা কিংবা দুর্গের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, বলে শিক্ষক।

‘হতে পারে,’ বলে কে, ‘কিন্তু তাতে তো আমার অবস্থানটা বদলাচ্ছে না। আমি কি আপনার সঙ্গে একদিন দেখা করতে পারি?’

‘সোয়ান স্ট্রিটে কসাই বাড়িতে আমি থাকি।’ স্পষ্টই বোঝা গেল এটি যতটা না আমন্ত্রণমূলক তার চেয়ে বেশি বিবৃতিমূলক, কিন্তু কে বলে, ‘ঠিক আছে, আমি আসবো।’ শিক্ষকটি ঘাড় নাড়ে ও শিশুর দল নিয়ে এগিয়ে যায়, বাচ্চাগুলো আবার সঙ্গে সঙ্গে চোঁচাতে থাকে। তারা খুব তাড়াতাড়ি একটি উৎরাই গলিপথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিন্তু কে একটু দমে গিয়েছিল কথোপকথনের ফলস্বরূপ, এখানে উপস্থিত হবার পর এই প্রথম তার নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত মনে হয়। যে দীর্ঘ পথ তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে তাতে যেন তার কোনোই কষ্ট হয়নি প্রথম দিকে। কি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই না সে দিনের পর দিন একের পর এক পদক্ষেপ ফেলে টপকে এসেছে—কিন্তু এখন তার অতীত পরিশ্রমের ফল তাকে গ্রহীতে গ্রহীতে টের পেতে হচ্ছে, এবং ভুল সময়ে। তার প্রবল বাসনা এই মুহূর্তে নতুন কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো অথচ প্রতিটি নব্য পরিচিতই যেন তার ক্লান্তিতে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এখন অন্তত দুর্গের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত এগোনোর জন্য যদি সে নিজেকে বাধ্য করতে পারে তাহলে সেটাকে যথেষ্টরও বেশি বলে মনে করা যায়।

অতএব সে আবার পদচারণা শুরু করে, কিন্তু পথ দেখা গেল দীর্ঘ, কারণ, যে পথে সে ছিল, গ্রামের প্রধান পথ, তা অনুসরণ করে দুর্গের পাহাড়টিতে যাওয়া যায় না, বড়োজোর পথটা তার দিকে নিয়ে যায়, তারপর যেন ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্যদিকে ঘোরে, এপথ যেমন দুর্গ থেকে সরে যায় না তেমন আরো কাছেও যায় না। প্রত্যেকটা বাঁকের মুখেই কে আশা করছিল পথটা সোজা দুর্গে গিয়ে ঢুকবে। শুধু এই আশাতেই সে হাঁটছিল, তার তীব্র অনিচ্ছাই, ক্লান্ত হলেও, এই রাস্তা ত্যাগ করার, এবং সে বিস্মিত হচ্ছিল এই গ্রামটার দৈর্ঘ্য দেখে, যেন এর কোনো সীমানা নেই, বার বার ঘুরে আসে একই ছোটো বাড়িঘর, তুষারশ্রুত বুক নিয়ে জানলার পাল্লাগুলো। তুষার, শুধু তুষার এবং জনহীনতা— কিন্তু অবশেষে সে এই পথের মোহ থেকে নিজেকে ছিন্ন করে এবং ঢুকে পড়ে পাশের একটা গলিতে। তুষার সেখানে অত্যন্ত গভীর আর বার বার তা থেকে পা তুলে আনা অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য ও হতাশাজনক। তার সমস্ত শরীর ঘামে সপসপে হয়ে ওঠে। হঠাৎ সে থামে ও তারপর আর এগোতে পারে না।

যাই হোক, সে তো আর মরুদ্বীপে নেই, তার ডান-বাঁ দিকে রয়েছে অনেক কুটির। সে একটা তুষারের বল বানিয়ে একটা জানলার দিকে ছুঁড়ে মারে। নিমেষের মধ্যে দরজা খুলে যায়—পুরো গ্রামের মধ্যে এই দরজাই প্রথম খুলল এবং বেরিয়ে এল ধূসর চামড়ার জ্যাকেট পড়া এক বুড়ো চাষি, মাথাটা একদিকে হেলানো, ভঙ্গুর কিন্তু দয়ালু চেহারা।

‘আমি তোমার ঘরে একটু আসতে পারি?’

জিজ্ঞাসা করে কে, ‘আমি বড্ড ক্লান্ত,’ সে বৃদ্ধটির উত্তর শুনতে পায় না কিন্তু কৃতজ্ঞভাবে লক্ষ্য করে একটি কাঠের তক্তা তার দিকে ঠেলে দেওয়া হলো বরফ স্তুপ থেকে তাকে রক্ষা করতে, এবং কয়েক পা ফেলে সে রন্ধনশালায় গিয়ে ঢোকে।

রান্নাঘরটা বেশ বড়ো, স্বল্পালোকিত। বাইরে থেকে কেউ ভেতরে ঢুকলে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারবে না। কে হাঁচট খেল ধোয়াধুয়ি করার একটা গামলায়, একটা স্ত্রীলোক হাত ধরে তাকে সিঁধে করে। এক কোণ থেকে শোনা যাচ্ছিল উচ্চকণ্ঠে শিশুদের চিৎকার। অন্য কোণে বাষ্পের শীৎকার অনুজ্জ্বল ঘরটিকে অন্ধকার করে তুলেছিল।

কে দাঁড়িয়ে রইল যেন সে মেঘের মধ্যে রয়েছে। ‘লোকটা নিশ্চয়ই মাতাল,’ কেউ বলে উঠল।

‘কে তুমি?’ জিজ্ঞাসা করল একটি ঘ্যানঘ্যানে গলার মালিক, তারপর নিশ্চিতভাবে বুড়োকে, ‘ওকে ঢুকতে দিলে কেন? রাস্তায় যত হতচ্ছাড়া হেঁটে যাবে সবাইকে আমাদের এখানে ঢোকাতে হবে নাকি?’

‘আমি কাউন্টের কানুনগো।’

বলে কে অদৃশ্য কণ্ঠের অধিকারিণীর কাছে নিজের উপস্থিতিকে যুক্তিগ্রাহ্য করতে।

‘ও, এ তাহলে সেই কানুনগো।’ স্ত্রী কণ্ঠ আবার শোনা যায়। এবং তারপর নেমে আসে সার্বিক নিস্তব্ধতা। ‘তুমি তাহলে আমাকে চেন?’ জিজ্ঞাসা করে কে। ‘নিশ্চয়ই’ একই কণ্ঠ উত্তর দেয় ব্যঙ্গভরে। সে যে পরিচিত এই তথ্যটি মনে হলো না খুব সম্মানের ব্যাপার।

অবশেষে বাষ্পপুঞ্জ একটু হালকা হয়ে আসে ও ক্রমশ সবকিছু কে-র দৃষ্টিগোচর হয়। মনে হলো আজ সাপ্তাহিক কাপড় কাচার দিন। দরজার কাছে বস্ত্রাদি ধৌত হচ্ছে। কিন্তু বাষ্পের উৎস অপর কোণে, যেখানে কাঠের গামলায়, এত বড়ো গামলা কে আগে কখনো দেখিনি, প্রায় দুটো বিছানার মতো বড়ো, দুটি লোক স্নান করছিল বাষ্পপূর্ণ জলে।

কিন্তু আরো বিস্ময়ের ব্যাপার ছিলো-যদিও এতে বিস্ময়কর জিনিসটা কি তা কেউ বলতে পারবে না-ডানদিকের কোণের একটি দৃশ্য। বড়ো একটা ফাঁক দিয়ে, পেছনের দেওয়ালে এই একটাই ফাঁক আছে, বিবর্ণ বরফের মতো সাদা আলো আসছিল সম্ভবত উঠোন থেকে ও উঁচু একটা আর্মচেয়ারে অর্ধশায়িত এক রমণীর পোষাকটিকে সিল্কের মতো আভ্যময় করে তুলেছিল। সে একটি শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছিল। অনেকগুলো বাচ্চা তাকে ঘিরে খেলছিল, কৃষক সন্তান সব বোঝাই যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে মনে হলো অন্য শ্রেণীর, যদিও অবশ্য রোগ ও ক্লান্তি এমনকি কৃষকদের মধ্যেও একরকমের বনোদিভাব এনে দিতে পারে।

‘বসুন,’ বলে অন্য লোকটি। তার মুখভর্তি দাড়ি আর সে প্রবলভাবে খোলা মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছিল। সে নির্দেশ করে, দৃশ্যটা মজার-তার ভেজা হাত দিয়ে টাবের পাশে একটা সেটির দি়ে আর তা করতে গিয়ে উত্তপ্ত জলবিন্দু ছিটিয়ে কে-র মুখ ভিজিয়ে দেয়। সে বড়ো লোকটি কে-কে ঢুকতে দিয়েছিল, আগে থেকেই তার পাশে বসে ছিল গভীর শূন্যতায় ডুবে গিয়ে। শেষপর্যন্ত বসার একটা জায়গা পেয়ে কে খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করল। তার দিকে এরপর কেউ আর মনোযোগ দেয় না। কাপড় কাচা গামলাটার তরুণী, পুথুলা সুন্দর দেখতে মেয়েটি কাজ করতে করতে নিচু গলায় গান করছিল, লোকগুলো চানের গামলাটার ভিতর লাফালাফি গড়াগড়ি দিচ্ছিল, বাচ্চাগুলো প্রায়ই তাদের দিকে এগিয়ে আসতে চায় কিন্তু ক্রমাগত জল ছিটিয়ে তাদের নিরস্ত করা হয়। কিছু জল কে-র পায়েও লাগে। আর আর্মচেয়ার বসা স্ত্রীলোকটিও ছাদের দিকে প্রাণহীন চোখে চেয়ে থাকে এমনকি বক্ষলগ্ন শিশুর দিকে একবারও দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ না করে।

তাকে দেখাচ্ছিল অপূর্ব এক স্থিরচিত্রের মতো এবং কে তার দিকে নিশ্চয়ই দীর্ঘক্ষণ চেয়েছিল ও ঘুমিয়ে পড়েছিল কারণ এক জোর আওয়াজ তাকে জাগিয়ে তোলে ও সে দেখে বৃদ্ধ লোকটির কাঁধে তার মাথা ন্যস্ত রয়েছে। লোকদুটি মস্ত গামলায় তাদের স্নান শেষ করেছে ও সেখানে শিশুগুলো সুন্দর চুলো মেয়েটির তত্ত্বাবধানে দাপাদাপি করছে। তারা স্নান শেষ করে ফিটফাট পোশাক পরে কে-র সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মনে হলো ঝগড়াটে গলার দাড়িওয়ালা লোকটি অপরজনের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ। ধীর স্থির শ্রুত বুদ্ধি সম্পন্ন অপর লোকটি, যে মাথা ঝুঁকিয়ে রেখেছিল, তার সঙ্গীর চেয়ে দীর্ঘ নয়, দাড়িও স্বল্প, কিন্তু কাঁধ চওড়া, মুখটাও বড়োসড়ো, সেই বলল, ‘আপনি এখানে থাকতে পারবেন না, স্যার, অসৌজন্য ক্ষমা করবেন।’

‘আমি থাকতে চাই না,’ বলল কে, ‘আমি শুধু একটু বিশ্রাম চেয়েছিলাম, বিশ্রাম হয়ে গেছে। এবার আমি চলে যাব।’

‘আপনি হয়ত অবাক হচ্ছেন আমাদের আতিথ্যের অভাব দেখে,’ লোকটি বলল, ‘কিন্তু আমাদের এখানে আতিথ্যের প্রথা নেই, অতিথিদেরও দরকার নেই।’ কে মোটামুটি সতেজ বোধ করছিল ঘুমটা হবার পর ও এতে তার প্রতিক্রিয়াটিও দ্রুত হয়।

লোকটির খোলাখুলি কথা তার ভালোই লাগে। আড়ষ্টতাও তার কমে আসে। তার ছুড়ি দিয়ে এদিক ওদিক খোঁচায়, আর্মচেয়ারে বসা মেয়েটির দিকে এগিয়ে যায় ও লক্ষ্য করে এই ঘরে সেই একমাত্র দীর্ঘতম মানুষ। ‘তাতো বটেই’ বলে কে, ‘অতিথি টিতিথি দিয়ে আর তোমাদের কাজ কী? কিন্তু তবু তোমাদের মাঝে মধ্যে দু একটা দরকার হতে পারে, যেমন ধর, উদারহরণ স্বরূপ আমি, জমির কানুনগো।’

‘আমি ওসব বিষয়ে কিছু জানি না।’ উত্তর দেয় লোকটা ধীরে ধীরে, ‘আপনাকে যদি আসতে বলা হয়ে থাকে তবে সম্ভবত আপনাকে দরকার আছে, সেটা বিশেষ একটা ব্যাপার। কিন্তু আমরা ছোটোখাটো মানুষরা আমাদের প্রথা অনুসারেই চলি আর এজন্য আপনি আমাদের দোষ দিতে পারেন না।’

‘না, না,’ বলে কে, ‘আমি তোমার প্রতি ও এখনকার অন্যান্যদের ওপর কৃতজ্ঞ।’ এরপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে সে দ্রুত এক বাঁক নিয়ে হেলান দেওয়া মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ক্লান্ত নীল চোখে মেয়েটি তার দিকে তাকায়। স্বচ্ছ সিল্কের একটি রুমাল ঝুলছিল তার কপালের অর্ধেক পর্যন্ত। কোলের শিশুটি ঘুমন্ত।

‘কে তুমি?’ জিজ্ঞাসা করে কে এবং অবজ্ঞার সঙ্গে মেয়েটি উত্তর দেয়, হয় কে-র প্রতি ঘৃণাবশত কিংবা নিজের উত্তর অস্বচ্ছ বলে, ‘দুর্গ থেকে আগত এক মেয়ে।’

ঘটনাটা ঘটতে সময় লাগল সেকেণ্ডখানেক কিন্তু ইতিমধ্যেই দুটি লোক কে-র দুপাশে এসে দাঁড়ায় ও তাকে দরজার দিকে ঠেলতে থাকে নিঃশব্দে, যেন তাকে নিবৃত্ত করার আর কোনো উপায় না জানা থাকাতাই এমন করছে এবং ঠেলছিল তাদের সর্বশক্তি দিয়েই। এই পুরো প্রক্রিয়াটির কোনো একটা ব্যাপারে বুড়ো লোকটা খুব মজা পায় ও হাততালি দিতে থাকে। চানের গামলাটার কাছের স্ত্রীলোকটিও হেসে ওঠে ও বাচ্চাগুলো হঠাৎ পাগলের মতো চৈঁচাতে আরম্ভ করে।

কে তখনই পথে বেড়িয়ে পড়ে ও দরজার গোড়া থেকে দুটি লোক তাকে জরিপ করতে থাকে। আবার তুষারপাত শুরু হয়েছিল, যদিও আকাশ মনে হলো হঠাৎ উজ্জ্বলতর। দাড়িওয়ালা লোকটা চৈঁচিয়ে অধৈর্য্যভাবে বলে, ‘আপনি যেতে চাইছেন কোথায়? এটা দুর্গের রাস্তা আর ওটা হচ্ছে গ্রামে যাবার পথ।’

কে তার কথার কোনো উত্তর দেয় না। বরং সে অপরজনের দিকে ফেরে, যে লোকটা স্বভাবে লাজুক হলেও তার মনে হয় দুজনের মধ্যে বেশি সহৃদয় ও বলে, ‘তোমার পরিচয়টা কী? কাকে আমি ধন্যবাদ দেব আশ্রয়দানের জন্য?’

‘আমি হচ্ছি ট্যানার ল্যাসম্যান,’ উত্তর পাওয়া যায়, ‘কিন্তু আপনার কাউকেই ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই।’

‘ঠিক আছে,’ বলে কে, ‘আমাদের আবার দেখা হতে পারে।’

‘আমি তা মনে করি না’ বলে লোকটি। এই সময় অন্যজন চৈঁচিয়ে ওঠে ও হাত নাড়ায়। ‘সুপ্রভাত আর্থার, সুপ্রভাত জারমিয়া!’

কে পেছনে ফেরে। তাহলে এই গ্রামের পথটাতে মানুষের দেখাও সত্যি পাওয়া যায়! দুর্গেল দিক থেকে মাঝারি উচ্চতার দুটো লোক এগিয়ে এল। দুজনেই বেশ রোগা ও আটোঁসাঁটো পোষাক পরা। আর দুজনে একইরকম অন্যান্য দিক দিয়েও। তাদের ত্বক চাপা তামাটে হলেও তাদের মুখের কালো ছুঁচলো দাড়ি বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। রাস্তার অবস্থা বিবেচনা করলে তাদের গতি বেগ দ্রুতই বলা চলে। দাড়িওয়ালা লোকটা চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমরা চললে কোথায়? ওদের দিকে না চোঁচিয়ে উপায় নেই কারণ তারা যাচ্ছিল বড়োই দ্রুত ও না থেমে। ‘কাজে,’ তারাও উচ্চকণ্ঠে উত্তর দেয় হাসতে হাসতে।

‘কোথায়?’

‘সরাইখানায়।’

‘আমিও তো ওখানেই যাচ্ছি,’ হঠাৎ চিৎকার করে বলল কে, সকলের চেয়ে জোরে; তার তীব্র ইচ্ছা হলো তাদের সঙ্গে যাবার। তাদের থেকে বিশেষ কিছু পাবার আশা সে করেনি। শুধু নিশ্চিতভাবে মনে হয়েছিল লোকগুলো ভালো ও সঙ্গী হিসাবে ফুঁর্তিবাজ। তারা তার কথা শুনতে পায়। কিন্তু মাথা নাড়ে শুধু ও দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যায়।

কে তখনো তুমারের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল ও বরফ থেকে তার পা টেনে তোলবার অল্প ইচ্ছে হলো শুধুমাত্র তা আবার ডুবিয়ে দিতে। ট্যানার ও তার সঙ্গীদল তার হাত থেকে শেষ পর্যন্ত নিষ্কৃতি পেয়ে ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল দরজা দিয়ে। অন্তর্হিত হবার আগে কে-র দিকে পেছন ফিরে তারা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং আদর্শ পরিমণ্ডলী? তার মনে হলো, ‘শুধু যদি আমি পরিকল্পিত ঘটনাক্রমের বদলে দৈবক্রমে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম।’

ঠিক এই সময়ে তার বাঁদিকের একটি কুটিরের ছোটো একটা জানলা খুলে গেল। সেটাকে একদম নীল রঙের মনে হচ্ছিল বন্ধ অবস্থায়, সম্ভবত বরফের প্রতিফলনের কারণেই। জানলাটা এত ছোটো যে এর পেছনে যে লোকটি রয়েছে তার পুরো মুখটা দেখা গেল না, দেখা গেল শুধু দুটি চোখ, বয়স্ক ধূসর চোখ। ‘ঐ যে ওখানে রয়েছে,’ কে শুনতে পেল একটি স্ত্রীলোকের কাঁপা গলার আওয়াজ।

‘উনি তো জমির আমিন,’ উত্তর দিল একটি পুরুষকণ্ঠ। এরপর লোকটি জানলার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে; অসৌজন্যমূলকভাবে নয় কিন্তু বোঝাই যায় সে তার বাড়ির সামনে কোনো জটিলতা চায় না।

‘আপনি কি কারো জন্য অপেক্ষা করছেন?’

‘কোনো একটা শ্লেজের জন্য, আমাকে তুলে নিতে,’ বলে কে, ‘কোনো শ্লেজ এখান দিয়ে যায় না,’ লোকটি বলে, ‘এখানে ওর চলাচল নেই।’

‘কিন্তু এই পথই তো দুর্গে গেছে,’ কে প্রতিবাদ করে, ‘তা হলেও তা হলেও,’ লোকটি একধরনের নিশ্চিতভাবে সঙ্গে বলে, ‘এখানে শ্লেজ চলে না।’

এরপর তারা দুজনে চুপ করে থাকে। কিন্তু লোকটা স্পষ্টতই কিছু একটা ভাবছিল কারণ সে জানালাটা খুলেই রাখে, ‘রাস্তাটা খারাপ,’ বলে কে তাকে সাহায্য করতে।

এতে অবশ্য যে উত্তরটা সে লাভ করে তা শুধুমাত্র ‘তা তো বটেই,’ কিন্তু একটু পরেই লোকটি নিজে থেকেই বলে, ‘আপনি চাইলে, আমি আপনাকে নিজের শ্লেজে তুলে নিতে পারি।’

‘অনুগ্রহ করে তাই কর,’ বলল কে খুশির সঙ্গে।

‘কত দিতে হবে?’

‘কিছুই না’ লোকটা বলে। কে ভারি বিস্মিত হয়। “ব্যাপারটা হলো, আপনি হচ্ছেন গিয়ে কানুনগো মশাই,” লোকটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে থাকে, ‘আর আপনি দুর্গের লোক। আপনাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে?’

‘দুর্গেই’ ঝটতি দেয় কে। ‘আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারব না,’ লোকটি বল দ্বিধাহীনভাবে।

‘কিন্তু আমি তো দুর্গের লোক,’ বলল কে লোকটির কথারই পুনরুক্তি করে।

‘হতে পারেন।’ সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় সে।

‘আচ্ছা বেশ, আমাকে সরাইখানায় নিয়ে চল,’ বলল কে, ‘ঠিক আছে,’ বলে লোকটি, ‘আমি শ্লেজ নিয়ে এই এলাম বলে,’ বোঝাই যাচ্ছিল তার সমগ্র ব্যবহারটি কোনো রকম বন্ধুত্ব স্থাপনের ইচ্ছা থেকে উৎসারিত হয়নি বরং এর মূলে ছিল একধরনের স্বার্থপর আশঙ্কায় পূর্ণ জেদি মনোভাব-যে ভাবেই হোক কে-কেতার বাড়ির সামনে থেকে সরিয়ে দেবার।

উঠানের গেটটা খুলে গেল ও বেরিয়ে এল চ্যাপ্টামতন ছোটো হাক্কা একটা শ্লেজ। তাতে সিটের কোনো বালাই নেই ও এর সঙ্গে জোতা রয়েছে দুর্বল ছোটো এক ঘোড়া। এর পেছনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল একটা লোক অশক্ত ঝুঁকে পড়া দেহ নিয়ে। তার শীর্ণ শ্বাসটানা মুখটা লাল উলের আটোসাটো আবরণে ঢাকা থাকায় মুখটা দেখাচ্ছিল অদ্ভুতভাবে ছোটো। বোঝাই যাচ্ছিল সে রীতিমতো অসুস্থ। কোনোমতে অশক্ত দেহটাকে হিঁচড়ে বার করে এনেছে শুধুমাত্র কে কে সেখান থেকে বেরিয়ে নিয়ে যেতে।

কে এ বিষয়ে উল্লেখমাত্র করাতে লোকটা হাত নেড়ে উড়িয়ে দেয়। তাহা থেকে কে যেটুকু বার করতে পারল তা হচ্ছে এই যে সে একজন কোচোয়ান, নাম গারস্টেকার ও সে এই আরামের-বালাই-মাত্র-নেই এমন শ্লেজটি যে বার করে এনেছে তার একমাত্র কারণ এটাই শুধু প্রস্তুত অবস্থায় ছিল ও অন্য কোনো একটা বে রকতে হলে অযথা বহু সময় ব্যয় করতে হত।

‘বসে পড়ুন,’ সে বলে শ্লেজের দিকে ইঙ্গিত করে।

‘আমি তোমার পাশেই বসব।’ বলে কে।

‘আমি হাঁটব,’ বলল গারস্টেকার। ‘কিন্তু কেন?’ প্রশ্ন করল কে।

‘আমি হাঁটব,’ গারস্টেকার একই কথা বলে ও এই সময় তার কাশির দমক শুরু হয় যার ফলে তার দেহটি এমন প্রবলভাবে আলোড়িত হয় যে সে তার পা চেপে ধরে বরফের মধ্যে, হাত দিয়ে তাকে ধরতে হয় শ্লেজের প্রান্ত। কে আর বাক্যব্যয় না করে শ্লেজে উঠে বসে, লোকটার কাশির দমক কমে আসে ও তারা রওনা দেয়।

তাদের অনেক ওপরে খাড়া দুর্গাটিতে, যেখানে কে আশা করেছিল সেদিনই পৌছে যাবে, ইতিমধ্যে অন্ধকার নেমে আসছিল, ও তা আবার দূরে পিছিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু

যেন তার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হবার আগে বিদায়-চিহ্ন স্বরূপ সেখানে বেজে উঠল আনন্দময় ঘন্টাধ্বনি। সেই ঘন্টার শব্দ নিমেষের জন্য তার হৃদস্পন্দনকে দ্রুততর করে দেয় কারণ ধ্বনিটির মধ্যে একধরনের হিংস্রতাও মিশে ছিল, যেন তার অস্পষ্ট বাসনাপূরণের বিরুদ্ধে এক চাপা শাসানি এই আওয়াজের মধ্যে রয়ে গিয়েছে। বিপুল ঘন্টা ধ্বনি দ্রুত নিঃশব্দ হলো ও এর জায়গায় বাজতে লাগল অস্পষ্ট একঘেয়ে সুরে ধাতব এক শব্দ যেটি সম্ভবত দুর্গ থেকেই আসছিল, অবশ্য গ্রামের অন্য জায়গা থেকেও আসতে পারে। তাদের শ্রুত যাত্রার সঙ্গে তাল রেখে শব্দটি অনুরণিত হয়।

‘বলছি কি,’ হঠাৎ কে চোঁচিয়ে বলল, তারা ইতিমধ্যেই চার্চের কাছে পৌঁছে গেছে, সরাইখানা বেশি দূরেও নয় আর কে-র মনে হলো এবর একটু ঝুঁকি নেওয়া যেতেই পারে- ‘আমি অবাক হচ্ছি তুমি কী সাহসে নিজের দায়িত্বে একা আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। এর জন্য তোমার অনুমতি আছে?’ গারস্টেকার কোনো গা না দিয়েই ছোটো ঘোড়ার গা ঘেঁষে স্থিরভাবে হাটতে থাকে।

‘হাই’ চিৎকার করে কে শ্লেজ থেকে একদলা বরফ তুলে নিয়ে বল বানিয়ে ছুড়ে মারে যা গারস্টেকার কানে গিয়ে আঘাত করে, এর ফলে সে থামে ও ঘুরে দাঁড়ায়। কিন্তু কে যখন তাকে এত কাছ থেকে দেখতে পায়-শ্লেজটা একটু ভড়কে কাছে এগিয়ে এসেছিল-সে দেখে ঝুকে পড়া বরফবারে একটি দেহ, মুখটা শীর্ণ রক্তিম, ক্লান্ত, গাল দুটি ভিন্ন আকারের-একদিকেরটা চ্যাপ্টা অন্যটা গর্তে ঢুকে গেছে। সে মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনছিল ও এর ফলে তার অবশিষ্ট দু-চারটে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। সে বুঝতে পারল যে কথাগুলো সে বিদ্বেষের সঙ্গে বলেছিল সেগুলোই তাকে এবার করুণার সঙ্গে পুনরুচ্চারণ করতে হবে, অর্থাৎ গারস্টেকারকে শাস্তি পেতে হবে কিনা তাকে চালিয়ে নিয়ে আসার জন্য। ‘আপনি ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন?’ জিজ্ঞাসা করে গারস্টেকার, কে-র প্রশ্নটা তার হৃদয়ঙ্গম হয়নি এমন ভাব করে। কিন্তু কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে সে ঘোড়াকে কিছু একটা বলে ও আবার অগ্রসর হতে থাকে।

২

রাস্তাটা একটা মোড় নিতেই কে বুঝতে পারল তারা সরাইখানার কাছে পৌঁছে গেছে। তার বিস্ময়ের সীমা রইল না যখন সে দেখল ইতিমধ্যেই অন্ধকার নেমে এসেছে। সে এত দীর্ঘ সময়ে ধরে বাইরে ছিল নাকি? দু-এক ঘন্টার বেশি তো নয়ই তার হিসেব অনুযায়ী। এবং সে যখন বেরোয় তখন ছিল প্রভাত। খাদ্যের অভাব পর্যন্ত সে ইতিমধ্যে অনুভব করেনি। একটু আগে সব ভেসে যাচ্ছিল আলোয় অথচ এখন রাতের অন্ধকার আকাশের সমস্ত তারা গ্রাস করেছে। ‘ছোটো দিন, বড় ছোটো দিন,’ ভাবল সে, শ্লেজ থেকে লাফিয়ে নামল ও সরাইয়ের দিকে এগোল।

‘সিঁড়ির ঠিক মাথায়, ঘরে ঢোকার মুখে, জ্বলন্ত একটা হ্যারিকেন উঁচু করে ঝুলিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল গৃহকর্তা কাঙ্ক্ষিত নিয়ে। নিমেষের জন্য কে-র চালকের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সে স্থির দাঁড়িয়ে পরে কিছুক্ষণের জন্য, তার পেছনে অন্ধকারে কাশির আওয়াজ শোনা যায়। লোকটা ওখানেই এখনও! যাই হোক, একটু পরেই আবার ওর

সঙ্গে দেখা হবে। সে যখন গৃহস্বামীর উচ্চতায় উঠে আসে, যে তাকে বিনীতভাবে সম্বোধন করে, সে দুটি লোককে লক্ষ্য করে, প্রত্যেকে দরজার দুধারে দাঁড়িয়ে।

সে ইতিমধ্যেই তার সাক্ষাৎ হয়েছে, এদের নাম আর্থার ও জেরমিয়া। তারা তাকে অভিবাদন করে। লোকগুলো তাকে মনে করিয়ে দেয় সেনাবাহিনীতে কাটানো দিনগুলোর কথা, তার কাছে আনন্দের স্মৃতি ও সে হাসে, ‘তোমরা কে হে?’

সে জিজ্ঞাসা করে উভয়ের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে। ‘আপনার সহকারী’ তারা উত্তর দেয়।

‘আপনার সহকারী’ সমর্থন করে বাড়িওয়ালা নিচু গলায়। ‘কী’ বলে কে, ‘তোমরা আমার সেই পুরনো সহকারী, যাদের আমি বলেছিলাম আমাকে অনুসরণ করতে ও যাদের আমি আশা করছি?’ তারা ইতিবাচক উত্তর দেয়।

‘তা বেশ,’ বলে কে সৎক্ষিপ্ত বিরতির পর, ‘তোমরা আসায় খুশি হয়েছে। তবে, ‘সে বলল অল্প বিরতি দিয়ে, ‘এসেছ অনেক দেরি করে। বড়ো অলস হে তোমরা।’

‘আসতে হলো অনেকটা পথ হেঁটে,’ বলে তাদের একজন।

‘অনেকটা পথ,’ কে পুনরাবৃত্তি করে, ‘কিন্তু তোমাদের যে দেখলাম দুর্গ থেকে বেরোতে?’

‘হ্যাঁ,’ বলে তারা কোনো ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে। ‘যন্ত্রপাতিগুলো কোথায়?’ জিজ্ঞাসা করে কে।

‘আমাদের কাছে তো কিছু নেই।’ তারা জবাব দেয়।

‘যে যন্ত্রপাতি আমি তোমাদের দিয়েছিলাম?’ বলে কে।

‘আমাদের কিছুই নেই।’ তারা উত্তর দেয়।

‘বাঃ তোমরা তো দারুণ লোক দেখছি,’ কে বলে, ‘তা তোমরা জরিপের কাজ টাজ জানো তো?’

‘না,’ তারা বলে, ‘কিন্তু তোমরা আমার পুরনো সহকারী হলে এ ব্যাপারে তো কিছু জানা উচিত ছিল’ বলল কে। তারা চুপ করে থাকে। ‘ঠিক আছে, ভেতরে ঢোক’ বলে কে, তার আগে তাদের ঘরে ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে।

ছোটো একটা টেবিলে বিয়ার নিয়ে তিনজন গিয়ে বসে, কে মাঝখানে, দুধারে সহকারীবৃন্দ। কে প্রায় নীরব থাকে। আগের দিনের মতো অন্য একমাত্র টেবিলে কয়েকজন চাষি বসে ছিল। ‘তোমাদের নিয়ে বড়ো সমস্যা হলো হে,’ বলে কে দুজনের তুলনামূলক বিচার করতে করতে, এর আগে অনেকবার সে তাই করেছে।

‘তোমাদের একজনকে অন্যজন থেকে আলাদা করব কীভাবে? তোমাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য তোমাদের নামে, এ বাদ দিলে তোমাদের সাদৃশ্য হচ্ছে ঠিক,’ সে থামে, এরপর তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, ‘তোমরা হচ্ছে দুটো সাপের মতো একরকম।’

তারা মৃদুহাস্য করে, ‘লোকে আমাদের ঠিকই আলাদা করে চিনে নিতে পারে,’ তারা বলল আত্মসমর্থনে।

‘তাতো করেই,’ কে বলল, ‘আমি নিজের চোখেই তো দেখেছি কিন্তু ওদের মতো আমি তা পারছি না। সেই কারণে আমি তোমাদের দুজনে একজন হিসাবেই ধরে নেব

আর দুজনকেই আর্থার বলে ডাকব। এটাই তো তোমাদের মধ্যে একজনের নাম তোমার, তাই না?’

তাদের একজনকে সে প্রশ্ন করে। ‘না’। উদ্ভিষ্ট লোকটি বলে ‘আমি জার্মিয়া’।

‘তাতে কিছু যায় আসে না,’ বলে কে?

‘আমি তোমাদের উভয়কেই আর্থার বলে ডাকব। আমি যদি আর্থারকে কোনো জায়গায় যেতে বলি, তোমাদের দুজনকেই সেখানে যেতে হবে, আমি যদি আর্থারকে কিছু করতে বলি তোমরা দুজনেই তা করবে। এতে আমার অসুবিধা হলো আমি তোমাদের আলাদা কাজে পাঠাতে পারব না কিন্তু এর সুবিধার দিকটা হলো তোমরা দুজনেই আবদ্ধ থাকবে আমি যা করতে বলব তার জন্য। কীভাবে তোমরা কাজটা ভাগ করে ...নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। তোমরা শুধু একে অপরকে দোষারোপ করে ...দায় এড়াতে পারবে না। আমার কাছে তোমরা একই লোক।’

তারা ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবে তারপর বলে, ‘আমাদের এটা মোটেই পছন্দ না’।

‘আমিও তাই মনে করি’। বলল কে, ‘অবশ্যই তোমরা এটা পছন্দ করবে না, কিন্তু এটাই করতে হবে।’ কে লক্ষ্য করে কিছুক্ষণ ধরে একটা চাষি তাদের টেবিলের কাছে ঘুর ঘুর করছে। এবার লোকটা সাহস সঞ্চয় করে একজন সহকারীর কাছে গিয়ে তার কানে ফিসফিস করে কিছু বলে।

‘মাপ করো,’ বলে কে টেবিলের ওপর তার হাত সশব্দে নামিয়ে এনে ও উঠে দাঁড়িয়ে, ‘এরা আমার সহকারী আর আমরা ব্যক্তিগত বিষয়ে আলোচনা করছি। আমাদের বিরক্ত করার অধিকার কারো নেই। ‘দুঃখিত, স্যার, দুঃখিত।’

চাষিটি ভীতভাবে বিড়বিড় করে পেছনে তার বন্ধুদের কাছে ফিরে যায়।

‘এবং এটা আমার সবচেয়ে জরুরি নির্দেশ তোমাদের প্রতি,’ বলে কে, বসে পড়ে, ‘আমার অনুমতি ছাড়া তোমরা কারো সঙ্গে কথা বলবে না। আমি এখানে অপরিচিত। আমরা তিন আগন্তুক পরস্পরের পাশে বিশ্বস্তভাবে দাঁড়াব সেই কারণে, এ ব্যাপারে আমার হাতে হাত মেলাও।’ খুবই আশ্চর্যের সঙ্গে তারা কে-র হাতের দিকে হাত বাড়ায়।

‘আমার ধমকে কিছু মনে করো না। কিন্তু মনে রেখো আমার হুকুম বলবৎ রইল। আমি এখন বিছানায় শুতে যাচ্ছি, আমার পরামর্শ হলো তোমরাও তাই করো। আজকের দিনটা আমরা নষ্ট করেছি। কাল খুব ভোরে উঠে কাজ শুরু করতে হবে। আমাকে দুর্গে নিয়ে যাবার জন্য তোমরা কালকে ভোরে একটা শ্লেজগাড়ির বন্দোবস্ত করে রাখবে। ভোর ছটার সময় যেন সেটা বাইরে অপেক্ষা করে।’

‘ঠিক আছে’ বলে একজন কিন্তু অপরজন তাকে বাধা দিয়ে বলে, ‘তুই তো দুম করে বলে দিলি, ‘ঠিক আছে,’ অথচ তুই জানিস তা করা যাবে না।’

‘চুপ’ বলে কে।

‘ইতিমধ্যেই তোমরা নিজেদের মধ্যে আলাদা হয়ে যাচ্ছে’। কিন্তু এবার প্রথম জন বলে ওঠে, ‘ও ঠিকই বলেছে, এটা করা অসম্ভব। অনুমতিপত্র ছাড়া দুর্গে কেউ ঢুকতে পারে না।’

‘অনুমতি পত্রের জন্য কোথায় আবেদন করতে হয়?’

‘আমি জানি না, বোধ হয় দুর্গাধ্যক্ষের কাছে,’ ‘তাহলে আমরা তার কাছেই টেলিফোনে আবেদন করব। যাও গিয়ে দুর্গপ্রধানকে টেলিফোনে আবেদন কর। এফুনি, যাও; দুজনেই।’ তারা দুজনেই যন্ত্রটার দিকে ছোট্ট, ও সংযোগ দিতে বলে,-এ ব্যাপারে দেখা গেল তাদের অগ্রহ প্রবল ও বাহ্যিকভাবে তারা বাড়াবাড়ি রকম অনুগত।

তারা জিজ্ঞাসা করে পরের দিন ভোরে দুর্গে আসতে পারে কিনা। উত্তর স্বরূপ যে ‘না’ ভেসে আসে তা এমনকি কে-ও তার টেবিল থেকে শুনতে পায়। কিন্তু উত্তর আরো দাঁসিতে থাকল, আরো সুস্পষ্ট ভাবে, ‘আগামীকাল তো নয়ই ভবিষ্যতেও কখনো না।’ ‘আমি নিজেই টেলিফোন করব,’ বলে কে ও উঠে মনোযোগ দেয়নি। কিন্তু তার শেষ বাক্যটি সকলের কৌতুহল জাগিয়ে তোলে। কে উঠে দাঁড়ালে তারা সকলে উঠে দাঁড়ায়, ও যদিও বাড়িওয়ালা তাদের তাড়াতে চেষ্টা করে, তারা ঘন হয়ে কে-র অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে ধরে টেলিফোনের কাছে। তাদের সম্মিলিত ধারণা দেখা গেল এই যে কে কোনো উত্তরই পাবে না। কে তাদের কাছে মিনতি করে চুপ করতে ও জানায় তাদের মতামত শোনার কোনো ইচ্ছে তার নেই। রিসিভারে এমন এক ধরনের ধাতব শব্দ শোনা যায় যেমনটি কে টেলিফোনে এর আগে কখনো শোনেনি। শোনাচ্ছিল অনেকটা অজস্র শিশুদের সম্মিলিত কণ্ঠের গুঞ্জন-মতো-কিন্তু ঠিক গুঞ্জনও নয়। বরং বলা যায় বহুদূর থেকে ভেসে আসা সংগীত স্রোতের প্রতিধ্বনির মতো-এর সঙ্গে মিশে আছে সম্পূর্ণ অসম্ভব ধরনের এক উঁচু কিন্তু ঝঙ্কারময় শব্দ যেটা কানে এসে অনুরণিত হচ্ছিল এমনভাবে যেন শ্রবণ ভেদ করে আরো ভেতরে প্রবেশ করতে চায়। টেলিফোন না করে কে শুধু শব্দটা শোনে টেলিফোনের তাকের ওপর কনুই ন্যস্ত করে।

সে জানে না ঠিক কতক্ষণ সে সেখানে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সে দাঁড়িয়েই থাকে যতক্ষণ না বাড়িওয়ালা এসে তার কোট আকর্ষণ করে তাকে জানায় যে কোনো এক বার্তাবহ এসেছে, তার সঙ্গে কথা বলতে। ‘দূর হও,’ চিৎকার করে ওঠে কে এক ধরনের ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে, সম্ভবত মাউথপিসের সামনেই, কারণ সঙ্গে সঙ্গেই অপর প্রান্ত থেকে কেউ উত্তর দেয়। কথোপকথনটি হলো এই প্রকার: ‘অসওয়াল্ড বলছি, ওখানে কে আছেন?’ চিৎকার করে ওঠে একটি কঠিন উদ্ধত কণ্ঠ, কথনের মধ্যে অল্প ক্রটি রয়েছে মনে হলো কে-র, যার কারণে কণ্ঠস্বরের মালিক ইচ্ছাকৃত কাঠিন্য দেখিয়ে তা চাপা দেবার চেষ্টা করছে।

কে নিজেকে ঘোষণা করতে দ্বিধা করে, কারণ সে অনুভব করে তখন সে টেলিফোনের দয়ার উপর নির্ভরশীল। অপরজন তাকে ধমকে থামিয়ে দিতে পারে কিংবা টেলিফোন নামিয়ে রাখতে পারে এবং এর ফলে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টার ক্ষেত্রে যু্য বাধা আসবে তা উপেক্ষণীয় নয়। কে-র দ্বিধাশ্রুততা অপরপক্ষকে অধীর করে তুলল, ‘ওদিক কে?’ সে আবার জিজ্ঞাসা করে ও যোগ করে, ‘ওদিক থেকে যদি একটু কম টেলিফোন আসে তা বড়োই বাধিত হই। এক মিনিট আগেই কেউ রিং করেছিল।’ কে এই মন্তব্যটি অগ্রাহ্য করে এবং আকস্মিক একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘোষণা করে।

‘কানুনগোর সহকারী বলছি,’ ‘কে জমির কানুনগো? কোন সহকারী?’ গতকালের টেলিফোনের কথাবার্তা কে-র মনে পড়ে যায়। সে সংক্ষেপে বলে, ‘জিজ্ঞাসা করুন।’ এতে সে সফল হয়, নিজেরই বিস্ময় উৎপাদন করে। কিন্তু অধিকতর বিস্মিত হয় দুর্গের কর্মপদ্ধতির তৎপরতা দেখে, উত্তর এল, ‘ও হ্যাঁ, সেই অনড় অটল জমির আমিন তো! ঠিক আছে, তো কী হয়েছে? কোন সহকারী?’ ‘জোসেফ’ বলে কে। এই সময় তার পেছনে চাষিদের ফিসফিসানিতে একটু উত্থাপ্ত হয়। বোঝাই যাচ্ছিল তারা তার এই ধরনের ছলনা অনুমোদন করছে না। এখন তার সময় নেই এদের নিয়ে মাথা ঘামানোর যেহেতু বর্তমান কথোপকথনেই তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ হয়ে আছে।

‘জোসেফ?’ প্রশ্ন শোনা গেল, ‘কিন্তু সহকারীদের নাম তো...’ অল্প একটু বিরতি আসে, স্পষ্টই অন্য কারো থেকে নাম বিষয়ে অনুসন্ধান করতে, ‘আর্থার আর জেরমিয়া’।

‘এরা নতুন সহকারী’ বলে কে, ‘না তারা পুরনো।’

‘ওরা নতুন, আমিই পুরনো সহকারী। আমিনের পরেই আজ আমি এসে পৌঁছেছি।’

‘না’ তীব্র কণ্ঠ শোনা গেল। ‘তাহলে আমি কে?’ জিজ্ঞাসা করে কে আগের মতোই সাদা গলায়।

এরপর সামান্য বিরতির পর একই কণ্ঠ ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণে বলে আরো গভীর ও কর্তৃত্বপূর্ণভাবে ‘আপনি পুরনো সহকারী।’ কে এই নতুন সুর এত মন দিয়ে শুনছিল যে তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় সে তা শুনতেই পায়নি, ‘আপনি কী চান?’ কথোপকথন থেকে কিছু আশা করা সে ছেড়ে দিয়েছিল।

কিন্তু কোণঠাসা হয়ে সে দ্রুত উত্তর দেয়, ‘আমার প্রভু কখন দুর্গে আসতে পারবেন?’ ‘কখনই না,’ উত্তর এল।

‘ঠিক আছে,’ বলে কে ও রিসিভার নামিয়ে রাখে।

তার পেছনে কৃষকবৃন্দ ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল প্রায় গা ঘেঁষে। তার সহকারীরা তার দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে তাদের পেছনে আটকে রাখবার চেষ্টা চালাচ্ছিল তেমন কোনো গুরুত্ব না দিয়েই আর চাষিরা নিজেরাই কথোপকথনের পরিণামে সম্ভ্রষ্ট হয়ে ভিড় থেকে সরে যাচ্ছিল। একটি লোক দ্রুতপায়ে এই দলের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে কে-র কাছে এসে অভিবাদন করল ও তার হাতে একটা চিঠি দিল। কে চিঠিটা নেয় কিন্তু তাকায় লোকটার দিকে কারণ এই মুহূর্তে তার মনে হয় লোকটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই নবাগতর সঙ্গে তার সহকারীদের গভীর মিল রয়েছে। তাদের মতোই সে ছিপছিপে, পোষাকও পরে রয়েছে তাদেরই মতো আটোসাঁটো, তাদের মতোই চটপটে ও কর্মক্ষম অথচ তবুও সে সম্পূর্ণ অন্যরকম। একে সহকারী হিসাবে পেলে কে-র কতই না বেশি পছন্দ হতো। ট্যানারের ওখানে শিশুকালে মেয়েটির কথা একে দেখে কে-র অল্প মনে পড়ল।

প্রায় সমস্ত পরিচ্ছদটাই তার সাদা, সিল্কের নয় অবশ্যই। অন্যদের মতো তার গাঢ় ও শীতবস্ত্র কিন্তু সে যা গায়ে দিয়ে আছে তাতে সিল্কের মতোই একই ধরনের

কোমলতা ও মহার্ঘ্যতা মিশে আছে। তার মুখটি পরিচ্ছন্ন ও খোলামেলা প্রকৃতির, চোখ সাধারণের চেয়ে দীর্ঘ, তার হাসিটিও আশ্চর্যরকম আনন্দময়। মুখের ওপর সে হাতটি টেনে আনে যেন হাসি গোপন করতে চাইছে, কিন্তু বৃথাই। ‘তুমি কে?’ জিজ্ঞাসা করে কে, ‘আমার নাম বারনাবাস,’ সে বলে, ‘আমি একজন বার্তাবাতজ,’ তার ওষ্ঠ বেশ দৃঢ় অথচ কথা বলার সময় নরম দেখায়।

‘তুমি এই ধরনের ব্যাপার সমর্থন করে?’ কে প্রশ্ন করে চাষিদের দিকে ইঙ্গিত করে, যে লোকগুলোর কাছে সে একটা কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছে। তারা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মুখ হাঁ করে, তাদের ঠোঁটগুলো কর্কশ আর আক্ষরিক ভাবেই মুখমণ্ডল অত্যাচারপীড়িত। তাদের মাথাগুলো ও অন্যান্য প্রত্যঙ্গ দেখে মনে হয় কেউ যেন ওপর থেকে তাদের ভয়ানকভাবে পিটিয়েছে ও সেই প্রহারের যন্ত্রণায় তারা লুমড়ে মুচড়ে গিয়ে বর্তমান আকৃতি পেয়েছে।

কিন্তু তবু তারা ঠিক তার দিকে খোলা মুখে তাকিয়ে ছিল না, কারণ মাঝে মাঝেই তাদের চোখ তার মুখ থেকে সরে গিয়ে ঘরের তুচ্ছ জিনিসপত্র পর্যবেক্ষণ করছিল ও আবার ফিরে আসছিল তার মুখে, ও এইসময় কে তার সহকারীদের দিকেও ইঙ্গিত করে। তারা গালে গাল ঠেকিয়ে দেহ সংলগ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল মুখে হাসি মেখে। কিন্তু সেই হাসি বিনয়ের, নাকি বিদ্রূপের তা নির্ধারণ করা গেল না। এ সমস্ত কিছুর দিকেই কে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেন সে বোঝাতে চায় পরিস্থিতি তার ঘাড়ের কি ধরনের সব বস্তু চাপিয়ে দিয়েছে ও সে যেন আশা করে বারনাবাস-তাতে অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পেল বলেই কে-র মনে হলো-যেন তাদের ও তাকে সর্বদা আলাদা চোখে দেখে, কিন্তু বারনাবাস অত্যন্ত সরলভাবে, স্পষ্টই বোঝা গেল তার প্রশ্নটিকে অগ্রাহ্য করল, এড়িয়ে গেল সেটা, যেমনভাবে সুভাব্য ভৃত্য তার মনিবের নিজের প্রতি প্রযুক্ত কোনো কোনো মন্তব্য অগ্রাহ্য করে ও যেন প্রশ্নটির প্রতি মর্যাদা দেখাতেই ঘরটিকে শুধুমাত্র অবলোকন করে। সে উপস্থিত নানা পরিচিত কৃষকদের কারো কারো হস্ত মর্দন করে, খোঁজখবর নেয়, সহকারীদের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে, সব কিছুই করে সে স্বাধীন খোলামেলা একটা ভাব নিয়ে যা তাকে অপরদের থেকে বিশিষ্ট করে তোল। তিরস্কৃত অথচ অপমানিত না হয়ে কে তার হস্তধৃত পত্রটির দিকে মনোযোগ দেয় ও খোলে। এর বিষয়বস্তু ছিল এরকম-প্রিয় মহোদয়, আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে আপনাকে কাউন্টের সেবায় নিয়োগ করা হয়েছে।

আপনার উদ্বৃত্ত ব্যক্তিটি হচ্ছেন গ্রামপ্রধান। তিনি আপনাকে আপনার কর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে ও আপনার নিয়োগের শর্তগুলি সব কিছু অবগত করাবেন ও আপনি ঐরূপে দায়বদ্ধ থাকবেন। আমি নিজেও অবশ্য আপনাকে দৃষ্টিসীমার মধ্যেই রাখবার চেষ্টা করব। পত্রবাহক বারনাবাস মাঝে মাঝে আপনার কাছে নিজেকে হাজির করবে আপনার ইচ্ছা, পরিকল্পনা জানতে ও আবার তা আমাদের জানাবে। আপনাকে সাহায্য করতে আমি সদাপ্রস্তুত, আমার পক্ষে যতটা সম্ভব, আমি চাই আমার কর্মচারীরা যেন সদাসম্মত থাকে।’

আক্ষরিক অস্পষ্ট হলেও এর পাশেই স্ট্যাম্প রয়েছে একটা যাতে লেখা ‘এক্স বিভাগের প্রধান।’

‘একটু অপেক্ষা কর,’ বলে কে বারনাবাসের দিকে চেয়ে, সে তার দিকে ঝুঁকে অভিবাদন করে। এরপর কে বাড়িওয়ালাকে নির্দেশ দেয় তার ঘর দেখাতে কারণ সে চিঠিটি নিয় কিছুক্ষণের জন্য একা হত চাইছিল। সেই সঙ্গে সে চিন্তা করে বারনাবাস আকর্ষণীয় হলেও আসলে একজন বার্তাবাহক মাত্র ও তার জন্য এক মগ বিয়ারের অর্ডার দেয়। সে চেয়ে থাকে বারনাবাস ব্যাপারটা কিভাবে নেয় দেখতে কিন্তু বারনাবাস স্পষ্টতই খুব খুশি হয় ও তখনি বিয়ার পান করতে শুরু করে, এরপর কে বাড়িওয়ালাকে নিয়ে স্থানত্যাগ করে। বাড়িটা এত ছোটো যে কে’র জন্য চিলেকোঠার ক্ষুদে ঘরটি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না আর সেজন্য অনেক অসুবিধাও পোহাতে হলো।

কারণ দুটি স্ত্রীলোককে, যারা এতদিন এখানে শুয়ে এসেছে, অন্যত্র চালান করতে হলো। তাদের বিদায় করা ছাড়া আর কোনো ঝঞ্ঝাট পোহাতে হলো না। ঘরটা একদম অগোছালো, বিছানায় চাদরের কোনো বালাই নেই। শুধু কয়েকটা বালিশ, দলা হয়ে পড়ে আছে সস্তা একটা কম্বল, সকালে যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবেই। দেয়ালে ঝুলছে কিছু পবিত্র ছবি ও সৈনিকদের ফটো। ঘরটা পরিষ্কার পর্যন্ত করা হয়নি, বোঝাই যায় তারা আশা করেনি নতুন অতিথি বেশিক্ষণ এখানে থাকবে এবং তাকে উৎসাহিত করার জন্য তারা কিছু করতেও ইচ্ছুক নয়।

কে অবশ্য তেমন কোনো বিতৃষ্ণা অনুভব করে না। সে কম্বলে নিজেকে আবৃত করে, টেবিলে গিয়ে বসে ও মোমবাতির আলোয় চিঠিটি পড়তে শুরু করে দেয়।

চিঠিটার মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব রয়েছে। এর কিছু অংশে তাকে গ্রহণ করা হয়েছে একজন মুক্ত মানুষ হিসাবে, যার স্বাধীনতা স্বীকৃত, তাকে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ এবং তার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে স্বীকার করে নিয়ে। কিন্তু এমন কোনো কোনো জায়গা রয়েছে যেখানে তাকে খোলাখুলি বা ঘুরিয়ে এমন একজন তুচ্ছ কর্মচারী হিসাবেই দেখা হয়েছে যে বিভাগীয় প্রধানের কাছে কার্যত সে অদৃশ্যই। পত্রলেখক চেষ্টা করবেন যাতে সে ‘দৃষ্টিসীমার মধ্যেই’ থাকে। তার উদ্বৃত্তম শুধুমাত্র গ্রামের অধীক্ষক যার কাছে সে বাস্তবিকপক্ষে দায়ী থাকবে। সম্ভবত তার একমাত্র সহকর্মী গ্রামের চৌকিদার। এই সমস্ত অসামঞ্জস্য চিঠিটিতে রয়ে গেছে, কোনো সন্দেহ নেই তাতে। এগুলো এতই নিশ্চিত যে এদের সম্মুখীন না হয়ে উপায় নেই।

কে’র এটা মোটেই মনে হলো না এই অসামঞ্জস্য দ্বিধাভ্রান্ততার ফলশ্রুতি স্বরূপও হতে পারে। এরকম একটি জবরদস্ত সংগঠন সম্পর্কে এমনতর চিন্তা পাগলামিরই নামান্তর। বরং সে আকৃষ্ট হলো সেই জায়গাটায় যেখানে খোলাখুলিভাবে যে কোনো একটি বেছে নিতে বলা হয়েছে। হয় সে পছন্দ করুক গ্রামীণ কোনো কর্ম যার ফলে সে লাভ করবে দুর্গের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সম্ভাব্য সংযোগ কিংবা সে পছন্দ করতে পারে আড়ম্বরপূর্ণ গ্রামীণ এমন কোনো কাজ যার প্রকৃত কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত হবে বারনাবাসের সংযোগের মাধ্যমে। কে অবশ্য বাছাই করতে দ্বিধা করে না, হাজার অভিজ্ঞতার অভাব থাকলেও সে তাই-ই করত, একমাত্র গ্রামীণ কর্মী হিসাবেই, দুর্গের আওতা থেকে যত দূরে সম্ভব থেকেই, দুর্গ থেকে সে কিছু পাবার আশা করতে পারে। গ্রামের অধিবাসীরা,

দ্বারা এখন তার বিষয়ে খুবই সন্দিগ্ধ, তার সঙ্গে কথাবার্তা বরতে শুরু করবে যখন সে গারস্টেকার কিংবা ল্যাসম্যানের মতো অতি সাধারণ হয়ে উঠতে পারে-এটা যত শীঘ্র সম্ভব ঘটাতেই হবে।

সবকিছুই এর উপর নির্ভর করে আছে-তার সামনে বহু ধরনের পথ উন্মুক্ত হবে, যেগুলো শুধু তার কাছে চিরতরে বন্ধই থাকবে না, অদৃশ্যও থেকে যাবে সে যদি শুধুমাত্র দুর্গের কয়েকটি ভদ্রলোকের সহদয়তার উপর ভরসা রেখে বসে থাকে। অবশ্যই বিপদ রয়ে গেছে, ছিটিতে বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে, এমনকি এক ধরনের তত্ত্বের সঙ্গে ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে, এমনভাবে যে এ অবশ্যসম্ভাবী। তা হলো, নামতে হবে শ্রমিকের অগৌরবে-সেবা, উচ্চপর্যায়ের পরিশ্রম, নিয়োগের শর্ত, দায়বদ্ধ কর্মী-চিঠিটার অধিকাংশই এসবে পূর্ণ এবং এমনকি যদিও এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে কিছু ব্যক্তিগত মন্তব্য তাও লেখা হয়েছে নিয়োগকর্তার উচ্চাসন থেকে।

কে যদি শ্রমজীবী হতে প্রস্তুত থাকে তা সে হতে পারে কিন্তু তা তাকে হতে হবে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে, কোনোরকম উন্নতির আশা ত্যাগ করে। কে জানত বাধ্যতামূলক এমন কোনো নিয়ম নেই যা তার ভীতি উৎপাদন করতে পারে, সে এতে ভয় পায় না, এক্ষেত্রে একোবরেই নয়, কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশের চাপ, হতাশার হাতে ক্রমবর্ধমান নিজেকে সঁপে দেওয়া, প্রতিটি মুহূর্তের অপ্রত্যাশিত প্রভাবের চাপ-এগুলোকে সে অতি ভয় পায়।

কিন্তু এই বিপদগুলো থেকে তার নিজেকে সতর্ক রাখতে হবে। পত্রের এই অংশটিও উপেক্ষা করা যায় যে কে-কে যদি লড়াই লড়তেই হয় তাকেই প্রথম আক্রমণ করার কাঠিন্য দেখাতে হবে। খুব সূক্ষ্মভাবে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা শুধুমাত্র কোনো অশান্ত বিবেকের পক্ষেই অনুধাবন করা সম্ভব, অশান্ত বিবেক, নষ্ট বিবেক নয়,- তিনটি শব্দের মধ্যে এটি বিধৃত, হয়েছে 'আপনি তো অবগতই'-কাউন্টের কর্মে তার নিযুক্তির উল্লেখ করে। কে তার উপস্থিত হবার খবর জানিয়েছিল, এবং শুধুমাত্র তার পরেই, চিঠিটি উল্লেখ করেছে, সে জানতে পেরেছে যে তাকে কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছে।

কে দেওয়াল থেকে একটা ছবি নামিয়ে সেই জায়গায় পেরেকে লটকে দেয় চিঠিটাকে, এই ঘরেই এখন তাকে থাকতে হবে ও চিঠিটাও এখানে ঝোলা দরকার।

এরপর সে পাহুশালার প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করে। বারনাবাস সহকারীদের নিয়ে একটা টেবিলে বসেছিল। 'আ, তুমি এখানেই আছ দেখছি।' বলে কে, কোনো কারণ ছাড়াই, শুধুমাত্র বারনাবাসকে দেখে খুশি হয়েছে বোধহয়। বারনাবাস তখনি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

কে-র মুখে দেখামাত্রই চাষিরা উঠে দাঁড়িয়ে তাকে ঘিরে ধরে-তাদের এটা অভ্যাস হয়ে উঠেছে তাকে সবখানে অনুসরণ করা। 'তোমরা সবসময় আমার পেছনে ঘুর ঘুর করছ কেন বল দেখি।' চিৎকার করে বলে কে।

তারা অবশ্য এতে অপমানিত বোধ না করে ধীরে ধীরে আবার নিজেদের আসনে ফিরে যায়। তাদের একজন যেতে যেতে সাধারণ ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলে, এইসময়

তার মুখে লেগে থাকে এক রহস্যময় হাসি, যা অন্য কারো কারো মুখেও প্রতিফলিত হয়, 'সবসময়ই নতুন নতুন খবর শোনা তো যায়,' এই বলে সে ঠোঁট চাটে যেন খরব তার কাছে মাংস ও মদ।

কে আপোষমূলক কিছু বলে না, তার প্রতি ওদের একটু শ্রদ্ধা থাকা ভালো, কিন্তু বারনাবাসের কাছে পৌঁছা মাত্রই সে টের পেল এক চাষি তার ঘাড়ের পেছনে নিঃশ্বাস ফেলছে। সে এসেছে শুধু, সে জানাল, নুনদানটা নিতে কিন্তু কে ক্রুদ্ধ হয়ে এমনভাবে পা দাপায় যে সে নুনদান না নিয়েই ফিরে যায়। বাস্তবিক পক্ষে কে-কে ভাগে আনা খুব সহজ, শুধু যা করতে হবে তা হচ্ছে চাষিদের তার পেছন লেলিয়ে দেওয়া। তাদের ক্রমাগত বাগড়া দেওয়াটা তার কাছে অনেক বেশি আপত্তিকর মনে হয় অন্যদের গোমড়ামুখে থাকার চেয়ে। যদিও তারা অন্যদের চেয়ে কম বিরলবাক নয়, কারণ সে যদি তখন তাদের টেবিলে গিয়ে বসে তারা হয়ত উঠেই চলে যাবে।

শুধুমাত্র বারনাবাসের উপস্থিতির কারণেই সে অশান্তি করে না। তবুও সে ঘাড় ঘুরিয়ে তাদের দিকে বিষাক্ত চোখে তাকায় এবং সে দেখে তারাও তার দিকে চেয়ে আছে। যখন সে দেখল তারা ওইভাবে বসে আছে, প্রত্যেকটি লোক তার নিজের নিজের জায়গায়, পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা না বলে এবং স্পষ্টতই পরিকল্পিত কোনো মতলব ছাড়া, তারা সম্মিলিত শুধুমাত্র তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকায়, সে এই সিদ্ধান্তে এল যে কোনো বিদ্রোহবশত তারা তার পিছু নিচ্ছে না, সম্ভবত তার কাছে কিছু একটা আশা করছে কিন্তু তা প্রকাশ করতে অক্ষম। তা হলে তো একে একটা ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না, যা সরাইখানার দস্তুর। সরাইওয়ালার নিজেও কি ছেলেমানুষ নয়। হাতে একটা বিয়ারের পাত্র ধরে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে একদৃষ্টিতে কে-র দিকে চেয়ে। বিয়ারটি তার খরিদারের কাছে নিয়ে যাওয়া তার কর্তব্য এটা ভুলে গিয়ে কিংবা বউয়ের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে, যে রান্নাঘরের খুপরি থেকে শরীর বাঁকিয়ে তাকে ডাকছে।

কিছুটা শান্ত মনে কে বারনাবাসের দিকে ফিরল। সহকারীদের বিদায় করতে পারলে সে স্বস্তিবোধ করত কিন্তু সে কোনো ছুঁতো খুঁজে পায় না। তাছাড়া বিয়ারের সামনে তারা চূপচাপ বসে বিষণ্ণ চিন্তায় ডুবে ছিল।

'চিঠিটা' কে শুরু করে, 'আমি পড়েছি। বিষয়বস্তুটা তোমার জানা আছে?'

'না,' বলে বারনাবাস, তার কথার চেয়ে তার দৃষ্টি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ, যেন কিছু বলতে চায়। সম্ভবত সে বারনাবাসের ভালোত্ব বিষয়ে ততটাই ভুল করেছে যতটা কৃষকদের বিদ্রোহ বিষয়ে, কিন্তু তা হলেও তার উপস্থিতি তাকে আরাম দেয়।

'তুমিও চিঠিতে উল্লিখিত হয়েছে, আশা করা হয়েছে মাঝে মধ্যে তুমি আমার খবর প্রধানকে পৌঁছে দেবে। সেই জন্যই ভেবেছিলাম চিঠির বিষয়বস্তু তোমার জানা থাকতে পারে।'

'আমাকে শুধু বলা হয়েছিল আপনাকে চিঠিটা পৌঁছে দিতে। আপনার পড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে ও তারপর ফিরে যেতে আপনার লিখিত কিংবা মৌখিক উত্তর নিয়ে, যদি আপনি তা প্রয়োজন মনে করেন।'

‘বেশ’ বলে কে, কোনো কিছু লিখিত দেবার প্রয়োজন নেই; প্রধানকে বলো, -হ্যাঁ ভালো কথা-তাঁর, নামটা কী। তার সইটা আমি পড়তে পারলাম না।’

‘ক্ল্যাম,’ বলে বারনাবাস।

‘ঠিক আছে হের ক্ল্যামকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে স্বীকৃতি দেবার জন্য এবং তার অতি সহৃদয়তার জন্য, যাতে আমি অভিভূত বিশেষভাবে এই জন্য যে এখনও পর্যন্ত আমি আমার যোগ্যতা প্রমাণ করে উঠতে পারিনি। আমি বিশ্বস্তভাবে তাঁর নির্দেশ মেনে চলব। আজকের মতো আমার বিশেষ কিছু অনুরোধ জানানোর নেই।’

বারনাবাস, যে অখন্ড মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শুনছিল, কে-কে অনুরোধ করল তাকে যেন বার্তাটি মুখস্ত করে নিতে সাহায্য করা হয় ও কে তাতে রাজি হয়। বারনাবাস তার প্রতিটি শব্দ আবৃত্তি করে। এরপর সে উঠে দাঁড়ায় বিদায় নিতে।

পুরো সময়টা ধরে কে তার মুখটি নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল এবং তাতে শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নেয়। বারনাবাসে উচ্চতা কে-রই মতন কিন্তু তার চোখগুলো মনে হয় যেন কে-কে ওপর থেকে নিরীক্ষণ করছে।

কিন্তু দৃষ্টিটি বিনয়মণ্ডিত, এমনটা ভাবা অসম্ভবই যে এই মানুষ অন্য কাউকে কখনও লজ্জাজনক, অবস্থায় ফেলবে। অবশ্য সে তো সামান্য একজন বার্তাবহই ও যে চিঠি সে বয়ে নিয়ে আসে তার বিষয়বস্তু পর্যন্ত জানে না।

কিন্তু তার তাকানোর ভঙ্গি, তার মৃদুহাসি, তার চালচলন ইত্যাদিরও অন্য এক খবর বয়ে আনে, সে বিষয়ে সে যত সামান্যই জানুক না কেন। এবং কে তার হাত ধরে ঝাঁকায়, যাতে সে দৃশ্যতই মনে হয় বিস্মিত হয়েছে কারণ সে খুশিমনেই তখন অভিবাদন করতে যাচ্ছিল।

সে বিদায় নেবার পরেই-দরজা খোলার আগে সে তাতে হেলান দিয়ে চূড়ান্ত দৃষ্টিতে ঘরটাকে আলিঙ্গন করে-কে তার সহকারীদের বলে, ‘আমি আমার প্ল্যানটা ঘর থেকে নিয়ে আসছি, তারপর আমরা আলোচনা করব কোনো কাজটা আমরা আগে করব।’ তারা তার সঙ্গে যেতে চায়। ‘এখানেই থাক’ বলে কে। তবুও তারা তার পিছু ছাড়ে না। কে আরো কড়াভাবে আদেশটি পুনরায় উচ্চারণ করে। বারনাবাসকে হলঘরে আর দেখা গেল না। সে সদ্য নিক্রান্ত হয়েছে। অথচ বাড়ির সামনেও-নতুন করে তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে-তাকে কে দেখতে পেল না। সে চেষ্টা করে ডাকল, ‘বারনাবাস’। কোনো উত্তর এল না। সে কি এখনো বাড়ির ভেতরেই আছে? এছাড়া তো অন্য কিছু সম্ভব নয়। তথাপি কে ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে তার নাম ধরে চিৎকার করে। রাত্রির গভীরতায় তা বজ্রঘোষণার মতো শোণায় এবং দূর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর এসে পৌঁছয়।

বারনাবাস ইতিমধ্যেই এত দূরে চলে গেছে? কে তাকে ফিরে ডাকে ও সাথে সাথে নিজেও অগ্রসর হয় তার সঙ্গে মিলিত হতে। যে স্থানটিতে তারা উভয়ে মিলিত হলো সেটা সরাইখানা থেকে দেখা যায় না।

‘বারনাবাস,’ বলে কে’ এবং এই তার কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে, ‘আমার তোমাকে আরো কিছু বলার আছে। আমার মনে পড়ল দূর্গে খবর পাঠাবার জন্য আমাকে যে

তোমার অনিশ্চিত আগমনের ওপর নির্ভর করে বসে থাকতে হবে এটা অত্যন্ত বাজে ব্যবস্থা। আমি যদি এফ্রনি তোমায় ধরতে না পারতাম-তুমি তো উড়ে চল দেখছি, আমি ভেবোঁছলাম এখনো তুমি বাড়িতেই আছ-কে জানে তোমার সঙ্গে আবার সাক্ষাতের জন্য আরো কতোদিন আমাকে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হতো।’ ‘আপনি চিফ কে বলতে পারেন,’ বলে বারনাবাস, ‘আপনার নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ে যেন তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠান,’ তাও যথেষ্ট হবে না’ বলে কে, ‘হয়ত এক বছর ধরে আমার কিছু একটা মনে পড়ে গেল।’

‘ও,’ বলে বারনাবাস, ‘তাহলে কি আমি চিপকে বলব তিনি যেন তাঁর ও আপনার মধ্যে অন্য কোনো সংযোগ স্থাপনের উপায় নির্ধারণ করেন আমার পরিবর্তে?’

‘না, না’ বলে কে, ‘কোনো মতেই নয়। কথার কথা বলছি মাত্র, এইমাত্র আমি যে তোমাকে ধরতে পেরেছি তাই ভাগ্য।’

‘আমরা তাহলে সরাইখানায় ফিরে যাব।’

বলে বারনাবাস, ‘যাতে আপনি নতুন কোনো খবর দিতে পারেন।’ সে ইতিমধ্যেই সরাইয়ের দিকে এক পা এগিয়ে গিয়েছিল।

‘বারনাবাস’ বলে কে, ‘তার কোনো দরকার নেই। বরং চল আমিই তোমার পথে একটু হাঁটি।’

‘আপনি সরাইখানায় যেতে চান না কেন?’

প্রশ্ন করে বারনাবাস। ‘ওখানকার লোকজন’র কাছে বিরক্তিকর’ বলে কে, ‘তুমি নিজের চোখেই তো দেখলে চামিগুলো কেমন নাছোড়বান্দা,-‘আমরা তাহলে আপনার ঘরে গিয়ে বসতে পারি।’ বলে বারনাবা।

‘ঘরটা ঝিয়েদের।’ বলল কে, ‘নোংরা আরো গুমোট-সেটা এড়াতেই তো আমি অল্পক্ষণ তোমার সঙ্গী হতে চাই,’ সে যোগ করে বারনাবাসের অনিচ্ছা দূল করতে।

‘তুমি তোমার হাতটা আমাকে ধরতে দাও। কারণ, আমার চাইতে তোমার পদক্ষেপ অনেক সুনিশ্চিত।’ এবং কে তার হাত ধরে, অন্ধকার ঘন হয়ে আসায় কে বারনাবাসের মুখ দেখতে পেল না, তার দেহটিও খুব অস্পষ্ট বলে তার হাত খুঁজে পেতে কে কে দু-এক মিনিট হাতড়াতে হয়।

বারনাবাস মেনে নেয় ও তারা সরাই থেকে সরে যেতে থাকে। কে অনুভব করল যে তার আশ্রয় চেষ্টা সত্ত্বেও সে বারনাবাসের গতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না, সে যেন তার কাছে বোঝা স্বরূপ। সাধারণ পরিস্থিতিতে এই সামান্য ঘটনাই তাকে বিপর্যস্ত করে দিত পার্শ্ববর্তী ছোটো গলিগুলোর কথা বাদ দিলেও, যার একটাতে এই সকালেই সে আটকে পড়েছিল, যার থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত বারনাবাসের যদি তাকে টেনে বের করে না আনত। সে সমস্ত আশঙ্কা এখন বিসর্জন দেয় ও বারনাবাসের নৈঃশব্দে কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করে কারণ তারা যদি নিঃশব্দে পদচারণা করে তাহলে এমনকি বারনাবাসাও অনুভব করবে যে শুধুমাত্র একত্রে ভ্রমণ করবে বলেই দুজন একত্রিত হয়েছে।

তারা চলতে থাকে কিন্তু কে বুঝতে পারে না ঠিক কোনোদিকে, সে কিছুই চিনতে পারছিল না। এমনকি তারা চার্চটা পেরিয়ে এসেছে কিনা তাও সে বুঝল না। শুধুমাত্র

দ্রুত হাঁটতে তাকে যে চেষ্টা করতে হচ্ছিল তার মাণ্ডল স্বরূপ তার চিন্তাসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার পরিবর্তে তারা এদিক ওদিক স্নরে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝেই তার নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল ও মনকে অধিকার করে রাখছিল। সেখানেও বাজার এলাকা একটা গির্জা দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা কবরখানায় বেষ্টিত হয়ে। তাকে আবার ঘিরে রয়েছে একটা উঁচু পাঁচিল। খুব কম বালকই সেই পাঁচিল টপকাতে পেরেছে, কে-ও বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে হার মেনেছিল। তাদের প্রচেষ্টার পেছন কোনো কৌতূহল যে কাজ করেছে তা না, কারণ কবরখানাটায় তাদের পক্ষে রহস্যময় কিছু ছিল না। তারা প্রায়ই জায়গাটায় ঢুকত ছোটো মতন কাঠির গেট দিয়ে। আসলে তাদের লক্ষ্য ছিল মসৃণ উঁচু পাঁচিলটা জয় করা।

কিন্তু এক সকালে-ফাঁকা নিঃশব্দ বাজার এলাকাটা তখন রৌদ্রপ্লাবনে ভেসে যাচ্ছিল, এর আগে বা পরে এমন দৃশ্য কে আর কবে দেখল-সে বিস্ময়কর স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এর উঠে পড়ে। যে জায়গাটায় সে বহুবার হড়কে নেমে এসেছে সেখান দিয়েই দাঁতে একটা ছোটো পতাকা কামড়ে ধরে প্রথম চেষ্টাতেই সে একেবারে পাঁচিলের মাথায় চেপে বসে। তখনো তার পায়ের নিচ থেকে পাথর থরথর শব্দে খসে পড়ছিল।

কিন্তু সে তো তখন একদম ওপরে। সে পতাকাটাকে গাঁথে দেয়, সেটা হাওয়ায় পতপত করে ওড়ে, সে ঘাড় ঘুরিয়ে নিচে, চতুর্দিকে দেখে। মাটি ফুঁড়ে ক্রশগুলো যেন বেরিয়ে এসেছে। সেই মুহূর্তে সেই জায়গাটাতে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। ঘটনাক্রমে মাস্টারমশাই সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি কঠিনমুখে কে-কে সেখান থেকে নেমে আসতে বাধ্য করেন। লাফিয়ে নামতে গিয়ে তার হাঁটুতে আঘাত লাগে। বাড়ি ফিরতেও তাকে বেশ কষ্ট করতে হয় কিন্তু তবুও পাঁচিলের মাথায় তো সে উঠেছিল! সেই সময় এই জয়ের গৌরব তার কাছে মনে হয়েছিল সারা জীবনের সার্থকতা। ব্যাপারটাকে পুরোপুরি নির্বুদ্ধিতা বলা সঙ্গত হবে না। কিন্তু এখন, এত বছর পর তুমার ভরা রাতে বারনাবাসের বাহুবেষ্টিতে হয়ে চলবার সময় এই স্মৃতি তাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

সে আরো দৃঢ়ভাবে বারনাবাসকে আঁকড়ে ধরে, বারনাবাস তাকে টেনেই নিয়ে যাচ্ছিল। নৈঃশব্দ অটুট, যে রাস্তাটা ধরে তারা যাচ্ছিল তা থেকে কে-র মোটামুটি ধারণা হলো যে তারা এখনও কোনো গলি রাস্তায় ঢোকেনি। সে নিজের কাছেই প্রতিশ্রুত রইল পথ যতই দুর্গম ও তার প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা যতই ক্ষীণ হোক না কেন, সে এগিয়ে যাওয়া থামাবে না। অন্তত তার এইটুকু শক্তি অবশিষ্ট থাকবেই যাতে কেউ তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে, ও রাস্তাও একসময় শেষ হবেই। দিনের বেলা দুর্গটাকে তো ধরাছোঁয়ার মধ্যে বলেই মনে হচ্ছিল। আর অবশ্যই বার্তাবাহক সংক্ষিপ্ততম পথটিই নিঃসন্দেহে বেছে নেবে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই বারনাবাস থামল। তারা এল কোথায়? এই কি পথের শেষ? এবার কি বারনাবাস তাকে ছেড়ে যাবে? সে ব্যাপারে তাকে সফল হতে হচ্ছে না। এত দৃঢ়ভাবে কে তার হাত আঁকড়ে ধরল যে তার হাতে ব্যথা করতে লাগে। নাকি সবচেয়ে অসম্ভব ঘটনাটিই ঘটল? তারা ইতিমধ্যেই দুর্গের দরজার কাছে পৌঁছে গিয়েছে?

কিন্তু কে-র নিজের তো একবারও মনে হয়নি তারা তার ওপরে উঠেছে? নাকি বারনাবাস তাকে বোঝা যায় না এমন কোনো মসৃণভাবে ধীরে উঠে আসা কোনো পথ ধরে নিয়ে এসেছে? 'আমরা কোথায় এলাম?' বলে কে নিচুস্বরে এমনভাবে যেন বারনাবাসকে নয় নিজেকেই প্রশ্ন করছে।

'বাড়িতে' বলে বারনাবাস একই স্বরে। 'বাড়িতে'?

'সতর্ক হন স্যার, না হলে আছাড় খাবেন। আমরা এখানে নিচে নামব।'

'নিচে'? 'দু-একটি ধাপ শুধু।' বলে বারনাবাস ও ইতিমধ্যেই সে একটি দরজায় টোকা মারে।

একটি মেয়ে এসে দরজা খুলে দেয় ও তারা মস্ত যে ঘরটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল তা প্রায় অস্বকার কারণ পেছনের দেওয়ালে বুলন্ত একটা তেলের বাতি ছাড়া ঘরে আর কোনো আলোই ছিল না। 'তোমার সঙ্গে কে বারনাবাস?' মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে।

'কানুনগো বাবু' বলে সে, 'কানুনগো?' একটু উঁচু গলায় মেয়েটি পুনরাবৃত্তি করে টেবিলের দিকে ফিরে গিয়ে।

দুজন বয়স্ক লোক উঠে দাঁড়ায়। একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক, অন্য একটা বালিকাও। তারা কে-কে অভ্যর্থনা করে। বারনাবাস তার সমস্ত পরিবারটির সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়। তার বাবা, মা ও বোন ওলগা ও অ্যামেলিয়ার সঙ্গে, কে অন্যমনস্কভাবে তাদের দেখে ও তার ভিজে কোটটি নিতে দেয় ফায়ার প্রেসের ওপর শুকতে।

তাহলে বারনাবাসই স্বগৃহে পৌঁছল, সে নিজে নয়। কিন্তু এখানে সে এল কেন? কে বারনাবাসকে একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে, 'তুমি এখানে এসে কেন? তোমাদের বাসস্থানটা দুর্গেরই একটা অংশ নাকি?'

'দুর্গের অংশ?' বারনাবাস কথাটা আওড়ায় যেন সে বোঝেনি এমনভাবে।

'বারনাবাস' বলল কে, 'তুমি তো সরাইখানা থেকে বেরুলে দুর্গে যাবে বলেই?'

'না' বলল বারনাবাস, 'আমি বেরিয়েছিলাম বাড়ি আসব বলে। খুব ভোর হবার আগে আমি দুর্গে দুর্গে যাই না। আমি কখনো সেখানে ঘুমই না।'

'ও' বলে কে, 'তাহলে তুমি দুর্গে যাচ্ছিলে না, এখানেই আসছিলে?' এখন লোকটির মৃদুহাস্যটি তার খুব উজ্জ্বল মনে হলো না, তাকে মনে হলো আরও বেশি অকিঞ্চিৎকর।

'তাহলে তুমি আমাকে সেটা বললে না কেন?'

'আপনি তো আমায় জিজ্ঞাসা করেন নি স্যার।' বলে বারনাবাস।

'আপনি শুধু আমাকে বলেছিলেন আপনি একটা বার্তা দিতে চান।

কিন্তু সেটা সরাইখানার বড়ো ঘরটাতে বা আপনার ঘরে দেবেন না। তাই আমি ভেবেছিলাম আপনি নিশ্চিন্তে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন এখানে, আমার বাড়িতে। আপনি চাইলে বাকিরা এখন ঘর ছেড়ে চলে যাবে, আর আপনি চাইলে রাতটাও এখানে অনায়াসে কাটাতে পারেন। আমি ঠিক কাজ করিনি?' কে কোনো উত্তর দিতে পারল না। ব্যাপারটা একটা ভুল বোঝাবুঝি মাত্র, সাধারণ বিশ্রী একটা ভুল ও কে তাতে জড়িয়ে গেছে একেবারে।

বারনাবাসকে আটোসাটো সিন্ধের মতো উজ্জ্বল জ্যাকেটে দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু জ্যাকেটের বোতাম খোলা মাত্র বেরিয়ে পড়ল সস্তা নোংরা বর্ণহীন একটা শার্ট, সমস্তটা তালি মারা। আর তার নিচে মজুরসুলভ পেশীবহুল বুক। চারদিকের পরিবেশ তার এই অবস্থার সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়ে তা আরো বাড়িয়ে দিল। তার বেতো বাবা অশক্ত পায়ে বদলে হাত দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে এগোচ্ছিল। আর তার মা-ও বুকুর কাছে হাত ভাঁজ করে রেখে অশক্ত শরীর নিয়ে অতি শ্রুত পদবিক্ষেপে এগিয়ে আসছিল। তারা দুজনেই, বাবা ও মা, কোণের দিক থেকে কে-র দিকে এগিয়ে আসছিল কে ঘরে ঢোকার সময় থেকেই অথচ কে থেকে অনেক দূরেই রয়ে গেছে এখনও। তার পীতকেশী বোনেরা, দুজনে প্রায় একইরকম দেখতে, একদম বারনাবাসের মতো, যদিও তাদের ভাইয়ের চেয়ে অনেক শক্তপোক্ত, ছিপছিপে এই দুই তরুণী, তাদের বাবা মার কাছে কাছেই ছিল ও কে-র কাছ থেকে। কোনোরকম সম্ভাষণ আশা করছিল।

কিন্তু তা সে উচ্চারণ করতে পারে না। তার বিশ্বাস ছিল এই গ্রামের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো দরকার রয়েছে তার কাছে, এতে তার খুব একটা ভুলও হয়নি। শুধুমাত্র এই লোকগুলির প্রতিই তার কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। তার যদি সরাইখানায় ফিরে যাবার মতো সামর্থ্য বাকি থাকত তাহলে এফুনি এ জায়গাটা ত্যাগ করত। প্রত্যুষে বারনাবাসকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গে যাবার সম্ভাবনাটি তাকে তেমন আকৃষ্ট করল না। সে চেয়েছিল রাতেই বারনাবাসের বাহুল্য হয়ে সকলের অগোচরে দুর্গের অন্দরে পৌঁছে যেতে। বারনাবাসের বাহুতে ভর দিয়ে সে কল্পনা করেছিল লোকটি অন্যান্যদের চেয়ে তার কাছে বহুগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বারনাবাসকে সে মনে করেছিল তার আপাত পদমর্যাদার চেয়ে অনেক উঁচুতে ও দুর্গের ঘনিষ্ঠ বিশ্বাসভাজন। কিন্তু এমন, এরকম এক পরিবারের সন্তানের সঙ্গে, যে ওদেরই একজন, এই মুহূর্তে সে অন্যদের সঙ্গে টেবিলে বসে আছে, যে লোকটাকে রাতে দুর্গে শুতে মাত্র দেওয়া হয় না- এরকম লোকের সঙ্গে কোনো মতেই স্পষ্ট দিনের আলোয় সে দুর্গে যেতে পারবে না। ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াবে হাস্যকর ও অর্থহীন এক প্রচেষ্টা মাত্র।

কে জানলার কাছে একটা জায়গায় বসে সিদ্ধান্ত নিল সেখানেই সে রাতটা কাটিয়ে দেবে এই পরিবারের থেকে অন্য কোনো সুবিধা না নিয়ে। এই গ্রামের অন্য লোকেরা, যারা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে ও তার সম্পর্কে ভীত, তারাও এদের চেয়ে অনেক কম বিপজ্জনক কল্পণ তারা শুধু তাকে ছুঁড়ে দিয়েছে তার নিজের কর্মপটুতার ওপর, তার নিজের শক্তির উপর, ও তার বুদ্ধি কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করেছে।

কিন্তু তাদেরই মধ্যে একজন শুধুমাত্র এক তুচ্ছ বার্তাবাহক হবার অধিকারেই দুর্গে না গিয়ে এই বাড়িতে টেনে নিয়েছে। তাকে বিপথচালিত করেছে, ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছায়, যাই হোক না কেন, তার উদ্দেশ্য থেকে, ও তার বিনষ্টির সহায়ক হচ্ছে মাত্র। সে টেবিলে যোগদান করার অনুরোধ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, জেদির মতো তার বেঞ্চে বসে থাকে মাথা ঝুকিয়ে।

এইসময় ওলগা, বোনেদের মধ্যে বেশি অমায়িক, উঠে দাঁড়ায় তরুণীসুলভ কোনো জড়তা ছাড়াই, কে-র কাছে আসে ও পারিবারিক খাদ্য রুটি ও বেকন গ্রহণ করতে

অনুরোধ করে ও এরপর যোগ করে সে এখনই বিয়ার আনতে যাবে। 'কে'থা থেকে,' কে প্রশ্ন করে, 'সরাইখানা থেকে,' সে বলে। কে তাকে সানুনয় অনুরোধ করল তার পরিবর্তে সে যেন তাকে সরাইখানায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

কিন্তু কথা প্রসঙ্গে বোঝা গেল সে তার সরাইখানাটির মতো অত দূরের কোনো পাহুনিবাসে যাবে না, সে যাবে কাছাকাছি একটিতে, নাম হেরেনহফ। তা সত্ত্বেও কে অনুনয় করতে লাগল সে যেন তাকে সঙ্গে নেয়, এরকম স্থির করে যে সে সেখানে সম্ভবত কোনো মতে রাতের একটা আশ্রয় পেয়ে যাবে। তার অবস্থা যতই জঘন্য হোক না কেন সে বরং সেখানেই থাকবে এদের দেওয়া সর্বোত্তম শয্যার পরিবর্তে। ওলগা তখনি কোনো উত্তর দিল না, বরং টেবিলের দিকে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করল। তার ভাই উঠে দাঁড়ায়, সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে, বলে, 'যদি ভদ্রলোক তাই ইচ্ছা করেন।' এই সম্মতি কের পক্ষে, তার অনুরোধ প্রত্যাহার করে নেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

বারনাবাস যাতে সম্মতি দেয় তার কোনো মূল্য থাকতেই পারে না। কিন্তু যেহেতু তারা আবার ভাবতে শুরু করেছিল কে-কে সরাইখানায় জায়গা দেবে কিনা, সে জেদ ধরে বসল সে ওখানেই যাবে, তাঁর এই ধরনের আগ্রহের কোনো রঙিন ছুতো দেখাবার কষ্ট স্বীকার না করেই। 'সে যেমন তাকে সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে, এই পরিবারকেও, তাতে তারা কী ভাবে তা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। তবুও অ্যামেলিয়ার সোজাসুজি গভীর দৃষ্টি তাকে একটু অস্বস্তিতে ফেলে দিল। দৃষ্টিটা ছিল নিষ্ফলক ও সম্ভবত কিছুটা নির্বোধ ধরনেরই।

সরাইখানার দিকে তাদের সংক্ষিপ্ত পদচারণার সময়ে ওলগা -কে ওলগার বাহর ওপর নিজের সমস্তভার ন্যস্ত করেছিল, তার আগে বারনাবাসের ওপর যেভাবে ভর দিয়েছিল, এছাড়া তার এগোনোর উপায় ছিল না-জানল এই সরাইখানাটি শুধুমাত্র দুর্গ থেকে আসা ভদ্রলোকদের জন্যই সংরক্ষিত থাকে। তারা এখানেই খাওয়া সারেন, গ্রামে কাজ থাকলে রাত্রিবাসও করেন মাঝে মধ্যে। ওলগা কে-র সঙ্গে কথা বলছিল নিচু ঘনিষ্ঠ গলায়। তার সঙ্গে পদচারণা বেশ আরামদায়ক তার ভাইয়ের সঙ্গে হাঁটার মতোই। তার সঙ্গে কে-কে যে স্বস্তি দিচ্ছিল তা কে ঝেড়ে ফেলতে চাইল। কিন্তু সেটা থেকেই গেল।

বাইরে থেকে পাহুনিবাসটিকে দেখাচ্ছিল যে সরাইখানায় কে উঠেছে তার মতোই। গ্রামের সব বাড়িগুলোই প্রায় একরকম দেখতে। কিন্তু ছোটো একটা তফাত এখানে স্পষ্টই চোকে পড়ছিল। ঢোকের মুখে সিঁড়ির সামনে একটা থাম রয়েছে, তার দরজার মুখে আটকানো রয়েছে দারুণ দেখতে একটা লণ্ঠন। তারা ঢোকবার সময় মাথার ওপর কিছু একটা পতপত করে উড়ছিল, দেখা গেল সেটা একটা পতাকা, তাতে কাউন্টের প্রতীকবর্ম রয়েছে। হলঘরে তাদের সঙ্গে এখানে দেখা হয়ে গেল সরাই মালিকের, লোকটা বোঝাই গেল তদারকিতে বেরিয়েছে। সে কে-র দিকে তাকায় চোখ ছোটো করে। হয় কে-কে বুঝে নিতে নয়ত অর্ধঘুমন্ত অবস্থা বলে ও বলে, 'আপনি কিন্তু মশাই-বারে ছাড়া অন্য কোথাও যাবেন না।' 'নিশ্চয়ই' বলে ওলগা, সে তখনি কের পক্ষ নেয়। 'উনি শুধু আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছেন।' কিন্তু কে অকৃতজ্ঞের মতো

ওলগার হাত ছেড়ে দিয়ে সরাই মালিককে একপাশে টেনে নেয়, এই সময় ওলগা ধৈর্য্য ধরে হলের একপ্রান্তে, অপেক্ষা করে।

‘রাতটা আমার এখানেই কাটাবার ইচ্ছা’ বলে কে।

‘আমি দুঃখিত, তা অসম্ভব।’ বলে মালিক।

‘আপনি হয়ত জানেন না এই বাড়িটা সম্পূর্ণভাবে দুর্গের ভদ্রলোকের জন্য প্রস্তুত,’ ‘বেশ তো সেটা নিয়ম হতে পারে,’ বলল কে ‘কিন্তু কোনো একটা কোণ-টোনে আমায় ঘুমতে দিতে তোমার নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না।’

‘তা করতে পারলে আমি খুবই খুশি হতাম।’ বলল মালিক।

‘কিন্তু এই নিয়মটা কঠোরভাবে আমার পালন করার বাধ্যবাধকতা বাদ দিলেও-আপনি এ নিয়ম বিষয়ে যত হস্তাক্ষেপে বললেন তা শুধু কোনো আগন্তকের পক্ষেই বলা সম্ভব-আপনার এখানে থাকা যে অসম্ভব তার অন্য একটা কারণ আছে। দুর্গের ভদ্রলোকেরা এতই স্পর্শকাতর আমার স্থির বিশ্বাস যে কোনো অপরিচিতের উপস্থিতি পর্যন্ত তাঁদের কাছে অসহ্য, অন্তত যদি না তাঁরা তার জন্য প্রস্তুত থাকেন। এখন আমি যদি আপনাকে এখানে ঘুমতে দিই আর দৈবক্রমে-ভদ্রলোকদের এসে পড়ার সম্ভাবনাই প্রবল-তারা আপনাকে আবিষ্কার করেন তাহলে আমার তো সর্বনাশ হবেই আপনিও রেহাই পাবেন না। এসব শুনতে হাস্যকার মনে হতে পারে কিন্তু একশোভাগ সত্যি।’ এই দীর্ঘদেহী, শক্ত করে বোতাম আঁটা লোকটি, যে দাঁড়িয়েছিল আড়াআড়িভাবে, একটা হাত দেয়ালে ভর দেওয়া অন্যটা তার পাছায়, কের দিকে একটা ঝোঁকে কে-কে গোপন কিছু বলার ভঙ্গিতে।

এই গ্রামের লোকের সঙ্গে তার কোনো মিল আছে বলে মনে হল না, যদিও তার গাঢ় রঙের পোশাকের সঙ্গে কৃষকদের পোশাকের মিল রয়েছে। ‘আমি তোমার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছি,’ বলল কে, ‘আর তোমাদের নিয়মের বিরুদ্ধে লড়াই করাও আমার উদ্দেশ্য নয়, যদিও আমি নিজেকে ঠিকভাবে বোঝাতে পারিনি। আমি শুধু একটা ব্যাপার বলতে চাই। দুর্গে আমার একটু আধুটু প্রভাব আছে, ক্রমশঃ আরো বাড়বে। যে কারণে আমাকে এখানে রাত্রিবাস করতে দেওয়ার তোমার কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। এছাড়া তুমি যদি আমার আরো কোনো উপকার করো আমি পুরোপুরি পুষিয়ে দেব।’

‘হ্যাঁ,’ সেসব ‘আমি জানি,’ বলে মালিক ও আবার বলে, ‘ওসব আমার জানা।’ এবার কে-র প্রয়োজন হয়ে পড়ল তাকে আরো খোলাখুলিভাবে বুঝিয়ে বলার, কিন্তু সরাইমালিকের উত্তরে সে একটু দমে গিয়েছিল ও ভাই সে শুধু জিজ্ঞাসা করে, ‘আজ রাতে দুর্গের অনেক ভদ্রলোক থাকছেন বুঝি?’

‘সে দিক দিয়ে বলতে গেলে বলা যায় আজ রাতটা বেশ সুবিধেরই,’ উত্তর দিল মালিক, যেন কিছুটা উৎসাহ দেবার মতো করে, ‘শুধু একজন ভদ্রলোকই আছেন।’ তবু কে ব্যাপারটা নিয়ে পীড়াপীড়ি করার জোর পেল না।

কিন্তু তবু সে প্রায় গৃহীত হয়েছে এই ভরসায় সে শুধু ভদ্রলোকের পরিচয়টুকু জানতে চায়। ‘ক্ল্যাম’ বলে সরাই মালিক হালকাভাবে, ইতিমধ্যেই বউয়ের দিক ফিরে,

সে খসখস শব্দ করে তার কাছে এসে হাজির হয়েছিলো চোখে পড়ার মতো নোংরা পুরনো ধরনের একটা গাউন পরে। গাউনটা ভাঁজ ও কুচিতে ভরা যদিও কেতা দূরস্ত শহুরে ছাঁট। সে সরাই মালিককে ডাকতে এসেছিল কারণ বড়োকর্তা তাকে কি একটা কারণে ডাকছেন। ডাকে সাড়া দেবার আগে সে আরো একবার কে-র দিকে ফেরে যেন রাত্রিবাসের বিষয়ে কে-কেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

কিন্তু কে একটা কথাও বলতে পারে না। তারই পৃষ্ঠপোষক এই বাড়িতেই অধিষ্ঠান করছেন এটা আবিষ্কার করে সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। নিজের কাছেই সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাভীত ভাবে দুর্গের অন্যান্যদের ক্ষেত্রে যেমন ক্ল্যাম বিষয়ে ঠিক তেমনভাবে স্বচ্ছন্দবোধ করল না এবং এই সরাইখানায় ক্ল্যামের হাতে সে ধরা পড়ে যেতে পারে এমন সম্ভাবনায় যদিও সরাইওলার মতো তার তেমন আতঙ্কের সঞ্চার হলো না, তবু এক ধরনের অস্বস্তি লেগেই রইল এবং এর অধিকাংশটাই এমন যেন যার কাছে তার কৃতজ্ঞ থাকার কথা বুদ্ধিহীনতার কারণে তার আঁতে ঘা দিয়ে বসেছে; একই সময়ে অবশ্য এই সঙ্গে সে কিছুটা বিহ্বল বোধ করে এই ভেবে যে এই বিবেকদংশনের মধ্যে স্পষ্টতই একধরনের হীনমন্যতা কাজ করেছে।

তার আগে থেকেই তার মধ্যে এক ধরনের আশঙ্কা কাজ করছিল আর এসব এমনই সম্ভাব্য যে তার বিরুদ্ধে যাবার অবস্থায় পর্যন্ত সে নেই। তাই সে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে ঠোট কামড়ে, কিছু না বলে। দরজা গলে অদৃশ্য হবার আগে সরাইমালিক ঘাড় ঘুরিয়ে আবার তার দিকে তাকায় আর কে-ও তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয় সেখান থেকে না নড়ে যতক্ষণ না ওলগা এসে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে না নিয়ে যায়।

‘সরাই মালিকের সঙ্গে আপনার কী দরকার ছিল?’ সে জিজ্ঞাসা করল।

‘আমি রাতের জন্য একটা বিছানা চেয়েছিলাম।’ বলে কে। ‘কিন্তু আপনি তো আমাদের সঙ্গে থাকবেন।’ অবাক হয়ে বলল ওলগা।

‘নিশ্চয়ই’ বলল কে, এমনভাবে যেন ওলগা এর অর্থ হিসাবে যা ইচ্ছে ভেবে নিতে পারে।

৩

বারটা বড়োসড়ো একটা ঘরের মধ্যে মাঝখানটা একদম ফাঁকা। দেয়ালের ধার ঘেঁষে কয়েকটা পিপের ওপর বসে ছিল কয়েকটা চাষি। কিন্তু এ লোকগুলো সরাইখানার লোকগুলো থেকে আলাদা ধরনের। এদের হলুদ ধূসর রঙের পোষাক অনেক বেশি কেতাদূরস্ত ও পরিচ্ছন্ন। গায়ে ঢিলে কামিজ আর ট্রাউজার আঁটোসাটো ধরনের। লোকগুলো বেঁটেখাঁটো। প্রথম দর্শনে এদের প্রায় একরকম বলেই মনে হয়, মুখমণ্ডল আস্থাপূর্ণ, গাল বর্তুলাকার। তারা সকলেই চুপচাপ বসে ছিল, একটুও নড়াচড়া না করে। শুধু তাদের চোখ অনুসরণ করছিল নবাগতদের কিন্তু সেটাও নির্লিপ্তভাবে। এসব সত্ত্বেও তাদের সংখ্যা ও তাদের নৈঃশব্দ্য কে-র ওপর একধরনের প্রভাব ফেলে। সে আবার ওলগার বাহু ধরে, যেন তার সেখানে উপস্থিতির ব্যাখ্যা দিতে। এক কোণ থেকে একটি লোক উঠে দাঁড়ায়, ওলগার এক পরিচিত, ও তার দিকে এগিয়ে আসে

কিন্তু ওলগার বাহু ধরে অন্য এক দিকে ঘুরে যায়। ব্যাপারটা ওলগা ছাড়া অন্য কেউ লক্ষ্য করে না, ও একটা পার্শ্ব কটাক্ষ নিষ্ক্ষেপ করে ওলগা সেটা মেনে নেয়।

বিয়ার দিচ্ছিল ফ্রিডা নামে একটা মেয়ে, সাধারণ, ছোটো খাটো একটি মেয়ে, লালো, সুন্দর, বিষণ্ণ চোখ, কোটরেগত, একধরনের সচেতন উন্মাদিকতা তার চোখের স্পষ্ট।' কে-র চোখে যখন তার চোখ পড়ল কে-র মনে হলো মেয়েটির দৃষ্টি তার বিষয়েই এমন একটা কিছু খুঁজে নিল যা তার নিজের মধ্যে আছে বলে সে কখনো ভাবেনি, কিন্তু মেয়েটির দৃষ্টি বলে দিল তা নিশ্চিতভাবে আছেই। কে তাকে পাশ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে, এমনকি সে যখন ওলগার সঙ্গে কথা বলছিল, তখনো। অস্বাভাবিকভাবে বোঝা গেল ওলগা ও ফ্রিডা ঘনিষ্ঠ নয়, কয়েকটি সাধারণ কথার শীতল আদানপ্রদান হলো মাত্র।

কে-র বাসনা সে তাদের আরো কথা শোনে, তাই সে নিজে থেকেই এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে, 'তুমি হের ক্ল্যামকে চেন?'

ওলগা জোরে হাসতে থাকে।

'কী নিয়ে হাসছ এত?' বলে কে।

'আমি তো হাসছি না' সে প্রতিবাদ করে কিন্তু হাসি থামায় না।

'ওলগা একেবারে ছেলেমানুষ,' বলে কে কাউন্টারে ওপরে অনেকটা ঝুঁকে পড়ে আবার ফ্রিডার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে, কিন্তু সে চোখ নামিয়ে লাজুক হাসে।

'আপনি হের ক্ল্যামকে দেখতে চান?' এবং কে তাকে দেখবার আকুলতার কথা জানান। সে তার ঠিক বাঁদিকে একটি দরজার দিকে ইঙ্গিত করে, 'ওখানে একটা ছোটো চোরফুটো আছে, ওখান দিয়ে আপনি দেখতে পারেন।'

'অন্যান্যরা কী ভাববে?' জিজ্ঞাসা করে কে।

সে তাঁর নিচের ঠোঁট বাঁকায় ও কে-কে আশ্চর্য কোমল হাত দিয়ে দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ছোটো ফুটোটা বোঝায় যায় গোয়েন্দাগিরি করার জন্যই তৈরি করা হয়েছিল। ফাঁক দিয়ে পাশের ঘরটা প্রায় পুরোটাই দেখা যায়। ঘরের মাঝখানে এক আরামদায়ক চেয়ারে বসে ছিলেন হের ক্ল্যাম, মুখটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল ওপর থেকে ঝুলন্ত সাদা ল্যাম্পের আলোয়। দোহারা গড়নের চেহারার পৃথুল চিত্তাশীল দর্শন লোকটি। তার মুখটা এখনও মসৃণ যদিও বয়সের ভারে গালগুলো কিছুটা ফোলা। তার কালো গোঁফের অগ্রভাগ বেশ সূচালো। তার চোখ ঢাকা পড়েছে ঝকঝকে চশমার আড়ালে। তার বাঁ হাতটি টেবিলের ওপর রাখা ও ডান হাতটি, যাতে ধরা ছিল একটা ভার্জিনিয়া সিগার, রাখা ছিল তার জানুতে। ডেস্কের ওপর রাখা একটা বিয়ার গ্লাস। ডেস্কের ধার ঘেষে সুরু একটা আবেষ্টনী থাকায় কে বুঝতে পারল না তার ওপর কোনো কাগজ আছে কিনা। তার অবশ্য ধারণা হলো সেরকম কিছু ওখানে নেই।

এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে সে ফ্রিডাকে জিজ্ঞাসা করল ফুটো দিয়ে দেখে সে যেন তাকে বলে তা আছে কিনা। কিন্তু যেহেতু ওই ঘরে একটু আগেই ছিল সে সহজভাবেই জানাল ডেস্ক খালি। কে ফ্রিডাকে জিজ্ঞাসা করল তার দেখার সময় ফুরিয়েছে কিনা কিন্তু ফ্রিডা ঢালাও অনুমতি দিল সে যতক্ষণ ইচ্ছা দেখতে পারে। কে এখন ফ্রিডার

সঙ্গে এক। একপাশে দ্রুত দৃষ্টিপাত করে সে নিশ্চিত হলো ওলগা এখন তার পরনো পরিচিতিটির কাছে ফিরে গেছে ও উঁচুমতো একটা পিপের ওপর বসে পা দোলাচ্ছে। 'ফ্রিডা' কে ফিসফিস করে বলল, 'তুমি হের ক্ল্যামকে ভালোভাবে চেন?'

'নিশ্চয়ই,' সে বলল, 'খুবই ভালোভাবে।'

সে 'কের দিকে একটু ঢলে পড়ে ও কে হঠাৎ খেয়াল করে সে ছেনালের ভঙ্গিতে আঙুল বোলাচ্ছে তার নিচু গলা মাখন রঙের ব্লাউজের উপর। সেটা তার শুকনো অপুষ্ট দেহের ওপর বেচপভাবে চেপে বসেছিল।

এরপর সে বল, 'আপনি লক্ষ্য করেননি ওলগা কেমনভাবে হাসছিল?'

'হ্যাঁ, অসভ্য প্রাণী একটা।' বলে কে।

'সে যাই হোক' বলে ফ্রিডা আবহাওয়া একটু হাল্কা করতে, 'হাসির একটা কারণ ছিল। আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি ক্ল্যামকে চিনি কিনা, আসলে কি জানেন,' আমি, এই সময় সে অজান্তেই খুঁতনিটা একটু তুলে ধরে ও আবার তার বিজয়িনী হাসি হাসে, যার সঙ্গে সে যা বলছে তার আপাত কোনো সম্বন্ধ নেই, তা কে-কে আপুত করে।

'আমি তার রক্ষিতা।' ক্ল্যামের রক্ষিতা?' কে বলে, সে মাথা হেলায়।

'সেক্ষেত্রে', হাসিমুখে বলে কে, আবহাওয়া যাতে ভারি না হয়ে ওঠে সেই চেষ্টা করে, 'তুমি আমার কাছে অতি সম্মানের পাত্রেী।'

'শুধু আপনার কাছেই নয়,' বলে ফ্রিডা অমায়িকভাবে কিন্তু কে-র হাসি ফিরিয়ে না দিয়ে। তার অহংকারে ঘা দেবার অস্ত্র কে-র কাছে মজুত ছিল ও সে সেটা প্রয়োগ করে।

'তুমি কখনো দুর্গে গিয়েছ?'

কিন্তু দেখা গেল অস্ত্রটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে কারণ সে উত্তর দেয়, 'না, কিন্তু আমি যে এই বারে রয়েছি এটাই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট না?'

বোঝাই যাচ্ছিল তার গর্ব সীমাহীন আর সে চেষ্টা করছে, এমনটাই কে-র মনে হলো, কে-র ওপর বিশেষভাবে তা ফলাতে।

'তা তো ঠিকই,' বলে কে, 'এখানে এই বারে তুমি মালিকের জায়গা নিয়েছ।'

'ঠিক তাই,' সে মেনে নেয়।

'আর আমি শুরু করেছিলাম একজন বারমেড হিসাবে সেতুর কাছে সে সরাইখানাটা আছে তাতে।'

'ওই সুন্দর হাতগুলো দিয়ে,' বলে কে, কিছুটা প্রশ্নবোধকভাবে -ঠিক বুঝতে না পেরে সে তার তোষামোদ করছে নাকি মেয়েটার কোনো কিছু তার কাছে অপ্রতিরোধ্য মনে হচ্ছে। তার হাতগুলো অবশ্যই ছোটো ছোটো আর খুব কমণীয় কিন্তু আবার একইভাবে বলা চলে কৃশ ও বেশিষ্ট্যহীন। 'তখন এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না,' সে বলে 'এমনকি এখনো...।'

কে তার দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকায়, ফ্রিডা শুধু মাথা ঝাঁকায়। আর কিছু তার কাছ থেকে জানা যায় না।

‘তোমার কিছু গোপন কথা থাকতেই পারে, স্বাভাবিক ভাবেই,’ বলে কে, ‘আর এটা অশা করা যায় না তুমি সেসব বলে দেবে এমন একজনকে যাকে তুমি মাত্র আধঘণ্টা আগেও চিনতে না আর যে লোকটার সুযোগও হয়নি তোমাকে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলার।’ মন্তব্যটি দেখা গেল ভুল প্রতিক্রিয়াই ঘটাল কারণ এটা শোনার পর ফ্রিডা একটা ঘোর থেকে যেন জেগে উঠল, যে ঘোরটা কে-র পক্ষে সুবিধাজনক ছিল।

কোমারের ঝোলা চামড়ার একটা ব্যাগ থেকে ফ্রিডা এক টুকরো ছোটো মতো কাঠ বের করল। সেটা গুঁজে চোরাফুটোটা বন্ধ করল তারপর কে-কে বলল, ‘হ্যাঁ আমি আপনার সম্বন্ধে সবই জানি, আপনিই তো জমির আমিন।’ এরপর যোগ করল, ‘কিন্তু এখন আমাকে কাজে ফিরে যেতে হতে হবে যে।’

সে বার কাউন্টারের পেছনে চলে যায়। এখান ওখান থেকে লোক এগিয়ে আসে খালি গ্লাস ভর্তি করতে। কে-র ইচ্ছে ছিল তার সঙ্গে আরো বাক্যালাপ চালিয়ে যাবে। তাই সে একটি শূন্য গ্লাস হাতে নিয়ে তার কাছে গিয়ে হাজির হয় ও বলে, ‘আরো একটা কথা, ফ্রাউলিন ফ্রিডা, সামান্য বারমেড থেকে এই যে বিপুল মর্যাদায় তুমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছ এই বারে তা অসাধারণ কীর্তি ও মনের প্রচণ্ড ক্ষমতার জোরে তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু তোমার মতো একটা মেয়ের সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার কি এখানেই শেষ? সম্পূর্ণ অবাস্তব ধারণা। তোমার চোখদুটো, হেসো না ফ্রাউলিন ফ্রিডা, আমায় বলছে আরো অনেক বড়ো কীর্তির কথা, যা এখনো আসতে বাকি, তোমার অতীতের সমস্ত কীর্তিকে যা বহুগুণ ছাপিয়ে যাবে। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষকে বহু বাধা অতিক্রম করতে হয় আর যত উঁচুতে মানুষ উঠতে চায় তত বড়ো বাধারও তাকে সম্মুখীন হতে হয় আর কোনো লজ্জা নেই যদি এক্ষেত্রে এমন কোনো লোকের সাহায্য নিতে হয় যে নিজেও উপরে ওঠার লড়াই চালাচ্ছে, এমনকি যদি লোকটা খুব তুচ্ছও হয়, তার যদি সামান্য প্রতিপত্তিও না থাকে। আমরা দুজন বোধহয় কিছুক্ষণ কোনো নির্জন জায়গায় গিয়ে কথা বলতে পারি, চতুর্দিকে এত কৌতূহলী দৃষ্টি এড়িয়ে।’ ‘আপনি ঠিক কি চাইছেন বুঝতে পারছি না।’

সে বলে ও এইবার তার সুরে মনে হলো, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, ধ্বনিত হলো অন্ত হীন হতাশা তার আগের বিজয়িনীর ভাবটার স্থানে।

‘ক্ল্যামের কাছ থেকে আমাকে কেড়ে নেবার মতলব বুঝি আপনার? হায় ভগবান,’ ও এই সময় সে হাতে হাত চাপড়ায়। ‘তুমি একেবারে আমার মনের কথাটি ধরেছ।’ বলল কে, যেন সে এতটা অবিশ্বাসে মর্মাহত হয়েছে। ‘আমার গোপন অভিপ্রায় ঠিক তাই। তোমার উচিত ক্ল্যামকে তাগ করা আর আমার প্রেমিকা হওয়া। তাহলে এবার আমরা যেতে পারি। ওলগা,’ সে চিৎকার করে, ‘আমরা বাড়ি যাব।’

বাধ্যভাবে ওলগা পিঁপে থেকে নিচে নামে কিন্তু সাথে সাথে বন্ধুবলয় থেকে বেরোতে পারে না। এই সময় ফ্রিডা নিচু গলায় কে-কে বলে, ‘আমি তোমার সঙ্গে কখন কথা বলতে পারব? আমি রাতটা এখানে কাটাতে পারি?’ কে জিজ্ঞাসা করে।

‘হ্যাঁ,’ ফ্রিডা জবাব দেয়। ‘আমি এখানে থাকতে পারি?’

‘প্রথমে ওলগার সঙ্গে বেরিয়ে যাও যাতে আমি এ লোকগুলোকে হালকা করতে পারি। তারপর একটু পরে তুমি ফিরে আসতে পার।’

‘ঠিক,’ বলে কে ও ওলগার জন্য অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করে। কৃষ্ণরা তাকে আসতে দেবে না, তারা নাচতে থাকে ও সে তাদের মক্ষিরানি হয়ে থাকে, তারা তাকে ঘিরে নৃত্য করতে থাকে সম্মিলিত স্বরে চৈঁচিয়ে। মাঝে মাঝে তাদের একজন বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসে, ওলগার কোমর দৃঢ়ভাবে ধরে পাক খায়। খেতেই থাকে। গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়, চিৎকার আরো ক্ষুধার্ত কোলাহলমুখর যতক্ষণ না সব ডুবে যায় অর্থহীন কুকুরের ডাকের মতো ঘেউ ঘেউ এক বৃন্দতানে, শুধু বলয় ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টাতেই হাসিমুখে ওলগা নাচতে শুরু করেছিল।

কিন্তু এখন সে শুধু পাক খেয়েই চলেছে একজনের থেকে অন্যজনের হাতে, তার চুল উড়ছে শূন্যে, ‘এইসব লোকের সঙ্গে আমায় জুতে দেওয়া হয়েছে,’ বলে ফ্রিডা, ঘৃণায় পাতলা ঠোঁট কামড়ে ধরে, ‘লোকগুলো কে?’

জিজ্ঞাসা করে কে, ‘ক্ল্যামের সব চাকর বাকর।’ বলে ফ্রিডা, ‘ও এই লোকগুলোকে সবসময় নিজের সঙ্গে নিয়ে আসে, লোকগুলো আমার মেজাজ বিগড়ে দেয়। আমি যে তোমার কাছে মাথাঝুগু কী বকছি নিজেই জানি না, যদি কোনোভাবে তোমাকে ক্ষুধা করে থাকি তো মাপ করো। এই লোকগুলোই যত নষ্টের গোড়া, যত প্রাণী দেখেছি এদের মতো ঘৃণিত আর আপত্তিজনক আর দেখিনি, আর আমাকেই কিনা ওদের বিয়ারের গ্রাশ ভরে দিতে হয়। কতবার আমি ক্ল্যামকে অনুন্নয় করেছি ওদের যেন না আনে, কারণ যদিও অন্য ভদ্রলোকদের চাকর টাকরও আমাকে সহ্য করতে হয়, ওর তো অন্তত আমার জন্য আলাদা একটু ক্ষমাঘৃণা থাকবে। কিন্তু বলে কিছুই লাভ হয়নি, ওর আসার ঠিক একঘন্টা আগে হুঁমুড় করে গরুর দলের মতো ওরা এসে এখানে ঢোকে।

কিন্তু এবার ওদের খোঁয়ারে ঢুকতেই হবে, ওদের সেটাই জায়গা। তুমি এখানে না থাকলে এর মধ্যেই আমি দরজা হাট করে খুলে দিতাম আর ক্ল্যামকে বাধ্য করতাম এগুলোকে নিজে তাড়াতে,’ ‘উনি কি তাহলে ওদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছেন না?’ জিজ্ঞাসা করে কে।

‘না’ বলে ফ্রিডা, ‘ও ঘুমচ্ছে।’ ‘ঘুমচ্ছে?’ কে চৈঁচিয়ে উঠল।

‘কিন্তু আমি যখন উঁকি মারলাম উনি তো জেগে ছিলেন আর ডেস্কের সামনে বসে ছিলেন।’

‘ও সবসময় ঐ ভাবেই বসে থাকে।’ বলে ফ্রিডা, ‘তুমি যখন দেখলে ও ঘুমোচ্ছিল। ও যদি না ঘুমত আমি কি তোমাকে উঁকি দিতে দিতাম? ওভাবেই উনি ঘুমোন, ভদ্রলোক ঘুমোতেও পারেন! কি করে যে পারেন! অবশ্য অত না ঘুমলে এই চাকরগুলোকে বরদাস্ত করা ওর পক্ষে সম্ভব হতো না।

কিন্তু এখন আমাকে ওদের তাড়াতেই হবে।’ সে কোণ থেকে একটা চাবুক হাতে নিয়ে এক লাফে নতর্কদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়, লাফটা হলো একটু আনাড়ি, অনেকটা ছাগল ছানার মতো। প্রথমটা তারা তাকে এমনভাবে নেয় যেন সে আরেকজন নাচের দোসরমাত্র, আর বাস্তবিকপক্ষে ফ্রিডাও মুহূর্তের জন্য চাবুকটা নামিয়ে নেয় কিন্তু সে আবার তা উঁচিয়ে ধরে, চিৎকার করে, ‘ক্ল্যামের নামে বলছি, সব খোঁয়ারে ঢোক, সবকটা খোঁয়ার।’

যখন তারা বুঝল সে তামাশা করছে না, তারা হুড়োহুড়ি করে দেয়ালের পিছন
কে এগোতে লাগল এমন আতঙ্কের সঙ্গে যেটা কে-র কাছে দুর্বোধ্য বলেই মনে হলো
প্রথম কয়েক দলের ধাক্কায় একটা দরজা খুলে গেল, এক দমক রাতের বাতাস তা
ঘরে ঢুকল। এরই মধ্য দিয়ে তারা অদৃশ্য হয়। তাদের পেছনে ফ্রিডা তাদের
তাই তড়িয়ে নিয়ে গেল উঠোন পার হয়ে পশুশালার ভিতর।

এর ফলে যে আকস্মিক নৈঃশব্দের সৃষ্টি হয় তার ফলে কে শুনতে পায় সরু
সান্দা ধরে করো এগিয়ে আসার পদশব্দ। আত্মগোপনের তাগিদে সে বার
উন্টারের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নেয় কারণ এ জায়গাটা ছাড়া ঘরে অপ্রকাশ্য হবার
কোনো স্থান ছিল না। বারে উপস্থিত থাকার অধিকার হয়ত তার ছিল কিন্তু যেহেতু
এখানে রাত কাটাতে চায় তার ধরা পড়লে চলবে না। তাই যখন দরজাটা সতিই
ল গেল সে কাউন্টারে নিচে লুকিয়ে পড়ে। সেখানে আবিষ্কৃত হবার বিপদও অবশ্য
কেই গেল কিন্তু সে অন্তত এই অজুহাত দিতে পারবে চাষিদের ভয়াবহ উন্মত্ততার
থেকে প্রাণ বাঁচাতেই তার এরকম আত্মগোপন। কিন্তু ঢুকল আসলে সরাইমালিক।
'ফ্রিডা,' বলে ডাকতে ডাকতে সে ঘরের এদিক থেকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করে বেশ
স্নেহবান।

ভাগ্যক্রমে ফ্রিডা শীঘ্রই ফিরে এল, সে কে-র কথা উল্লেখ করল না, খালি চাষিদের
ঘরে নালিশ করতে লাগল ও কে-র খোঁজে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে
উন্টারের পেছনে গিয়ে হাজির হয়। এর ফলে কে তার পদস্পর্শ করতে সক্ষম হয়।
ই মুহূর্ত থেকেই সে নিজেই নিরাপদ বলে মনে করে। যেহেতু ফ্রিডা কে-র কথা
উল্লেখ করে না মালিক নিজেই তা করতে বাধ্য হলো। 'তাহলে আমিন মশাই গেলেন
কাথায়?' সে জিজ্ঞাসা করে।

সম্ভবত লোকটি প্রকৃতিগতভাবেই সুভদ্র, তার উদ্বর্তন মানুষজনের সঙ্গে ক্রমাগত
মলামেশায় তার চরিত্র যথেষ্ট পরিমাণে মার্জিত হয়েছে কিন্তু এ সত্ত্বেও দেখা গেল
তার প্রতি তার ডাকটা একটু বেশি রকম সহানুভূতিশীল। ব্যাপারটা অবাক করার
তোই, বিশেষ করে এই কারণে যে কথোপকথনের সময়ে তার ভঙ্গিটা কিন্তু সবসময়ই
রিচারিকার প্রতি মালিকের ব্যবহারের মতোই থাকে, ধৃষ্ট পরিচারিকার প্রতি।

'জমির আমিন? আমি ওনার কথা তো একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।' বলে ফ্রিডা,
তার ছোটো পা-টি কে-র বুকে স্থাপন করে।

'অনেক আগেই হয়ত উনি চলে গেছেন।'

'কিন্তু আমি তো ওঁকে দেখলাম না।' বলে মালিক, 'প্রায় পুরো সময়টাই তো আমি
লঘরে ছিলাম।'

'সে যাই হোক, উনি এখানে নেই,' বলে ফ্রিডা ঠাণ্ডা গলায়।

'তাহলে বোধ হয় কোথাও লুকিয়ে টুকিয়ে আছেন।' বলল মালিক, 'ওঁকে দেখে
আমার যা ধারণা হয়েছে উনি এসব ভালোই পারেন।'

'ওরকমটা করার সাহস ওর হবে বলে আমার তো মনে হয় না।' বলল ফ্রিডা, কে-
উপর পা আরো চেপে ধরে। তার ব্যবহারে এক ধরনের ফূর্তি ও স্বকীয়তা প্রকাশ
যায় যেটা কে আগে লক্ষ্য করেনি। আর হঠাৎ তার উজ্জ্বলতা আরো বেড়ে উঠল।

সে আকস্মিকভাবে হাসতে হাসতে কে-র উপর ঝুঁকে পড়ে এই কথা বলে, 'তাহলে নোধ হয় এই নিচেই লুকিয়ে আছেন'ও হাল্কাভাবে তাকে চুমু দিয়েই সটান খাড়া হয়ে যেন বিপন্ন মুখে বলে, 'যাঃ, এখানে তো নেই।' তখন সরাইমালিকও কে-কে বিস্মিত করে বলে, 'তিনি সত্যি সত্যি গেছেন কিনা জানতে না পেরে আমার দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল।

শুধু হের ক্ল্যাম-এর জন্যই না, এ জায়গাটার নিয়মের কারণেই আর এই নিয়ম আমার ক্ষেত্রে যতটা খাটে তোমার ক্ষেত্রেও ততটাই ফ্রাউলিন ফ্রিডা। ঠিক আছে তুমি যখন বারের ব্যাপারে কথা দিচ্ছ আমি অন্য ঘরগুলো খুঁজে দেখি গে। শুভরাত্রি, সুনিদ্রা হোক।' সে ঘর থেকে বেরোতে না বেরোতেই ফ্রিডা ইলেকট্রিক আলো নিভিয়ে দেয় ও কাউন্টারের নিচে কে-র পাশে নামে।

'আমার সোনা, আমার সোনা,' সে ফিসফিস করে বলে কিন্তু তাকে হোঁয় না। যেন গভীর ভালোবাসায় মুচ্ছা যাচ্ছে এমন ভাব সে চিৎ হয়ে গুয়ে পড়ে ও বাহু প্রসারিত করে। উজ্জ্বল মুখের স্বপ্নে বিভোর হয়ে তার কাছে সময় নিশ্চয়ই অন্তহীন মনে হয়েছিল ও তার জানা কোনো গানের কলি গুনগুন করে, গাইবার পরিবর্তে। এইসময়, কে যখন চিন্তায় বিভোর, তাকে ঠিক শিশুর মতো আকর্ষণ করতে আরম্ভ করে: 'এসো এখানে আমরা একদম একা' ও তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে, কে-র হাতে তার ছোটো দেহটা উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছিল।

কে প্রবল শক্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তারা পাক খেতে খেতে কিছুটা এগিয়ে গেল ও ক্ল্যামের দরজায় বাধা পেয়ে শব্দ করে থামল। সেখানে তারা মেঝেতে জমে থাকা বিয়ার ও অন্যান্য বর্জিত জিনিসের মধ্যে পড়ে রইল। সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়, তারা শ্বাস নেয়, একসঙ্গে হৃদয় স্পন্দিত হয় এক ছন্দে। এই সেই প্রহর যখন কে এক বিস্ময়ভর্য আক্রান্ত হয়, যেন সে এক বিস্মৃতির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে কিংবা সে ভ্রাম্যমান এমন এক আশ্চর্য প্রদেশে, এত দূরে, মানুষ যতটা সীমা অতিক্রম করতে পারে তার চেয়েও বহুদূরে, সেই ভূখন্ড এমন আশ্চর্য যে সেখানকার বাতাসের সঙ্গে তার পরিচিত বাতাসের কোনো মিল নেই। সেখানে মানুষ শুধু বিস্ময়ে অভিভূত হয়েই মারা যেতে পারে অথচ সেই আশ্চর্যের মোহ এমনই যে মানুষ আরো এগিয়ে যায়, আরও দূবে যায় বিস্ময়প্রবাহে। তাই তার চেতনায় রুঢ় আঘাতের মতো না এসে বরং কিছুটা স্বস্তিরই কারণ ঘটল যখন ক্ল্যামের ঘর থেকে এক গভীর, কর্তৃত্বপূর্ণায়ণ, নির্বিকার কণ্ঠস্বর ফ্রিডাকে ডাকল।

কে ফ্রিডার কানে ফিসফিস করে 'ফ্রিডা' বলে সেই আহ্বান পৌঁছে দেয়। একাধরণের যান্ত্রিক তৎপরতার সঙ্গে বাধা ফ্রিডা এমন ভাব করল যেন সে লাফিয়ে উঠবে কিন্তু সে কোথায় রয়েছে মনে পড়ায় পা ছড়িয়ে বসে, শান্তভাবে হাসে ও বলে, 'আমি যাব না, ওর কাছে আর কখনো যাব না।' কে আপত্তি করতে চাইল, তাকে ক্ল্যামের কাছে পাঠাতে তাড়া দিতে চাইল ও সেই উদ্দেশ্যে তার শিথিল ব্লাউজ ঠিকঠাক গুছিয়ে দিল কিন্তু মুখ ফুটে ফ্রিডাকে সেই কথাগুলো তার বলা হয় না।

ফ্রিডাকে তার বাহুবন্ধনে পেয়ে তার সুখের সীমা ছিল না, কিন্তু এই সুখের মধ্যেও তার গভীর আশঙ্কা থেকে গিয়েছিল যে সে যদি ফ্রিডাকে যেতে দেয় তাহলে এখন

পর্যন্ত সে যা অর্জন করেছে সব হারাবে। আর যেন তার সমর্থনেই হঠাৎ সাহসী হয়ে ফ্রিডা দরজায় মুঠাঘাত করে চিৎকার করে বলে, 'আমি, আমি কে-র সঙ্গে আছি।' এই উত্তর আপাতত ক্ল্যামকে নিশুপ করে দেয় যে কোনো কারণেই হোক কিন্তু কে চমক উঠে উঠে বসে ও ভোরের অস্পষ্ট আলোয় চতুর্দিকে তাকায়। এটা কী ঘটল? তার আশাই বা কী ছিল? ফ্রিডা যখন সবকিছুই ফাঁস করে দিয়েছে সে আর কী আশা করতে পারে তার থেকে? তার নিজের পদমর্যাদা ও তার মহান শত্রুর বিপরীতে যথোচিত বিচক্ষণতা দেখানোর পরিবর্তে সে কিনা রাতে গড়াগড়ি দিল বিয়ারে ভাসা মেঝেতে, যার গন্ধে টেকা দায়?

'তুমি করলেটা কী?' সে যেন নিজেকেই বলল, 'এবার আমাদের দুজনেরই সর্বনাশ হবে।'

'না, বলল ফ্রিডা, 'ক্ষতি হবে শুধু আমার। কিন্তু তোমার তো জয় করেছে, দুশ্চিন্তা করো না, দেখো দেখি ঐ দুজন কেমন হাসছে,' 'কে?' বলে কে ও পেছন ফিরে তাকায়। বার কাউন্টারে বসে আছে দুই সহকারী।

ঘুমের অভাবে অল্প চোখ ফোলা, কিন্তু স্মৃতিপূর্ণ। কর্তব্য খুব ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারলে যে একধরনের আনন্দ হয়, সেরকম। 'তোমরা এখানে কী করছ?' যেন যত গুণগোলের গোড়া তারাই, 'আমরা আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম,' সহকারীটি ব্যাখ্যা করে, 'আপনি সরাইখানায় ফেরেন নি বলে আমি বারনাবাসের বাড়িতেও গিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত আপনাকে এখানে পেলাম। আমরা এখানে সারারাত বসে আছি। আমাদের কাজটা তো সোজা না।'

'তোমাদের আমার দরকার দিনের বেলা।' কে বলল, 'রাতে না, কেটে পড়।' 'কিন্তু এখন তো দিনই,' বলে তারা, একটুও না নড়ে। সত্যিই সকাল হয়ে গেছে, উঠোনের দরজা খুলে গেল, হুড়মুড় করে চাষাগুলো এসে ঢুকল, তাদের সঙ্গে ওলগাও। তার কথা কে একদম বিস্মৃত হয়েছিল। তার চুল ও পোষাক বিস্মৃত হলেও গত সন্ধ্যার মতোই তার ভঙ্গি সতর্ক ও চোখাটে পা দেবার আগেই তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল কে-র ওপর, 'কাল আপনি আমার সঙ্গে বাড়িতে গেলেন না কেন?' সে বলে এবার, প্রায় কেঁদে ফেলে।

'সব ঐ জন্তটার জন্য।' সে বলল তারপর, ও মন্তব্যটির বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করে। ফ্রিডা কয়েক মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হয়েছিল। সে একটা কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে আসে, ওলগা বিষণ্ণভাবে এক কোণে সরে যায়, 'এবার আমরা যেতে পারি।' বলল ফ্রিডা। তার কথায় স্পষ্টই বোঝা গেল সে বোঝাতে চায় সেতুর কাছে সরাইখানাটায় তাদের এবার ফিরে যাওয়া দরকার। কে ফ্রিডার সঙ্গে চলতে শুরু করে, তার সঙ্গে সহকারীরা, বেশ ছোটোখাটো শোভা যাত্রার মতো দেখার ব্যাপারটা। চাষীদের মধ্যে ফ্রিডার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা দেখা গেল। কারণটা বোঝাই যায়, কারণ এতদিন সে তাদের ওপর কর্তৃত্ব চালিয়েছে, একজন তো এমন কী একটা লাঠি বাগিয়ে ধরে, যেন সে ফ্রিডাকে যেতে দেব না যদি না সে সেটা লাফিয়ে পার হয় কিন্তু ফ্রিডার চাউনির সামনে সে কুঁকড়ে যায়। বাইরে তুমারে বেরিয়ে এসে কে অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস

ছাড়ে। খোলা বাতাসে বেরিয়ে এমন আরাম লাগে যে লম্বা পথ অতিক্রম করাটা তার কাছে অনেক কম পরিশ্রমের মনে হয়। সে যদি একা থাকত তাহলে আরও ভালো লাগত। সরাইখানায় পৌঁছে সে সোজা তার ঘরে গিয়ে ঢোকে ও খাটে সটান শুয়ে পড়ে। তার পাশেই ফ্রিডা নিজের জন্য একটা বিছানা পাতে। সহকারীরাও ভেতরে ঢুকে পড়েছিল কিন্তু তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হলে তারা জানালা দিয়ে আবার ফিরে আসে।

কে-র এত ক্লান্ত লাগে যে তাদের আবার বিতাড়িত করার উৎসাহ পায় না। বাড়িওয়ালা এসে ঢুকল বিশেষ করে ফ্রিডাকে অভ্যর্থনা জানাতে। তাকে সে 'মা' বলে সম্বোধন করে। তাদের মিলন দৃশ্যটি অভিনীত হলো ব্যাখ্যাগত বাৎসল্য রসের মধ্যে, চুপন ও দীর্ঘ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। এসবের পরেও ঘরে শান্তি নির্জনতা পাওয়া গেল না। ভারি বুটের শব্দ তুলে দাপাতে দাপাতে ঘরে ঢুকল পরিচারিকারা। হয় তারা কিছু নিয়ে আসে কিংবা খোঁজা-খুঁজি করে নানান টুকটাকি, আর যখনই তাদের বিছানার উপর স্থপিত নানা জিনিসের মধ্যে কিছুর দরকার হয় তারা শুধু কে-র নিচ থেকে তা টেনে বের করে। তারা ফ্রিডাকে অভ্যর্থনা করে এমনভাবে যেন সে তাদেরই একজন। এই আসা যাওয়ার পালা সারাদিন চললেও কে তার বিছানায় চেপে বসে থাকে। দিনে ও সমস্ত রাতে। তার জন্য ফ্রিডা অল্পস্বল্প কাজ করে। পরের সকালে সে যখন শয্যাভ্যাগ করে সেটা তার গ্রামে এসে উপস্থিত হবার চতুর্থ দিন।

8

ফ্রিডার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে পারলে তার ভালো লাগত কিন্তু তার ইচ্ছায় বাদ সাধল সহকারীদের অকাম্য উপস্থিতি। আর ফ্রিডাও মাঝে মধ্যে তাদের সঙ্গে হাসি মস্করা করছিল। এ বাদ দিলে তাদের চাহিদা খুব সামান্য। এক কোণে মেঝের ওপর দুটো পুরনো স্কার্ট বিছিয়ে তারা গুছিয়ে বসেছিল। তারা যেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, ফ্রিডাকে তারা সেই বিষয়েই বারবার বলছিল, কোনোভাবেই কানুনগোকে বিরক্ত না করতে ও যত কম সম্ভব জায়গা এই ঘরে নিতে। এই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য তাদের প্রচুর ফিসফাস ও চাপা হাসাহাসি বাদ দিলে, তারা চেষ্টা চালাচ্ছিল আরো ক্ষুদ্র ব্যাসের মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে ফেলতে, আরো কোণের দিকে গুড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে। এর ফলে স্বল্পালোকে তাদের দেখাচ্ছিল মস্ত একটা পুঁটুলির মতো।

দিনের আলোয় তাদের ভালোভাবে দেখতে পেয়ে কে প্রবলভাবে সচেতন হয়ে উঠল এই বিষয়ে যে তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অতি তীক্ষ্ণ ও তারা তাকে নিমিষেবে দেখছে, লক্ষ্য করছে, যদিও তারা বাহ্যত শিশুর মতো ভাঁড়ামো করছে, হাতগুলো স্পাইগ্রাশের মতো ব্যবহার করছে কিংবা এক চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে যে সময়টা তারা সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে, দাড়িতে হাত বোলাতে থাকে যে দাড়ি তাদের সমস্ত চিন্তা অধিকার করে রেখেছে। তাদের দৈর্ঘ্য ও ঘনত্ব নিয়ে উভয়ের ক্রমাগত তুলনা চলতে থাকে, কখনো তারা ফ্রিডাকেও ডাকে, তাদের উভয়ের এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে। বিছানা থেকে কে তিনজনের এই সমস্ত ছেলেমানুষি লক্ষ্য করে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে।

শয্যাভ্যাগ করার মতো সমর্থ যখন তার মনে হলো নিজেকে তারা দৌড়ে এল তার সেবায়। তাদের এই সেবা অগ্রাহ্য করার মতো সামর্থ্য এখনো তার এসেছে বলে মনে

হয় না, সে বুঝতে পারছে সে তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে এইভাবে যার ফলাফল খুব মারাত্মক হয়ে দাড়াতে পারে পরবর্তীকালে, কিন্তু এখন তার কিছুই করার নেই। বাস্তবিক পক্ষে তার ভালোই লাগছিল টেবিলে বসে ফ্রিডার আনা গরম কফিতে মুগ দিতে, ফ্রিডার জ্বালানো আগ্নিকুণ্ডে নিজেকে উত্তপ্ত করতে আর তার সহকারীদের স্নান গ্রহণ করতে। তারা অজস্রবার সিঁড়ি দিয়ে প্রবল উৎসাহে বিদ্যুটে ভঙ্গিতে ঠানানামা করে তার জন্য আনছিল সাবান, জল চিরুনি ও আয়না। একবার নিয়ে এল এমন কী একগ্লাস রাম কারণ সে শুধু একবার নিচু গলায় এক পাত্র পেলে ভালো হয় এ ধরনের ইঙ্গিত করছিল।

এই ধরনের ক্রমাগত হুকুম করা ও তাদের ক্ষেত্রে হুকুমের প্রতীক্ষায় থাকা কলাকালীন কে বলল, যতটা না পালিত হবে এই আশায় তার চেয়ে বেশি মজার গলায়, এবার তোমরা বিদায় হও। তোমরা দুজনই, এই মুহূর্তে আমার আর কিছু দরকার নেই, আর আমি ফ্রাউলিন ফ্রিডার সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই।

এবং তাদের মুখে বিরূপ কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে আরো যোগ করল, তাদের দৃষ্টি দিতে। 'পরে আমরা তিনজন গ্রামের মোড়লের কাছে যাব। তাই নিচে বারে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করো। আশ্চর্যের কথা তারা তার আদেশ পালন করে, শুধু যাবার আগে পেছন ফিরে জানতে, 'আমরা এখানেও তো অপেক্ষা করতে পারতাম।'

কিন্তু কে উত্তরে বলে 'আমি জানি, কিন্তু আমি চাই না তোমরা এখানে অপেক্ষা করো।'

সে কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু একধরনের তৃপ্তিও লাভ করে যখন ফ্রিডা, যে সহকারীরা ঘর থেকে নিষ্কাশিত হওয়া মাত্রই তার হাঁটুর ওপর এসে বসে বলল, 'ডার্লিং, এই সহকারীদের বিষয়ে তোমরা আপত্তিটা কোথায়? ওদের সামনে আমাদের কোনো কিছু রহস্যময় করে তোলার দরকার নেই। ওরা আমাদের যথার্থ বন্ধু।'

'ও, আমাদের যথার্থ বন্ধু' বলে কে, 'সব সময় তাই আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছে, একধরনের বোকামি কিন্তু আপত্তিজনক।' 'তুমি যা বলতে চাইছ তা আমি বুঝছি।' সে বলে ও তার গলা জড়িয়ে ধরে আরো কিছু বলতে যায় কিন্তু বলতে পারে না, ও যেহেতু তাদের চেয়ার প্রায় সংলগ্ন ছিল তারা গড়িয়ে পড়ে বিছানার ওপর। সেখানেই তারা পড়ে থাকে কিন্তু গতরাতের কথা বিস্মৃত হয়ে নয়।

ফ্রিডা খুঁজছিল ও সেও খুঁজছিল, তারা উন্মত্ত হয়ে মুখ বিকৃত করে পরস্পরকে খুঁড়তে থাকে, বুকে মুখ ঘষে যেন তাদের তখনি কিছু খুঁজে বার করা আশু প্রয়োজন, আর তাদের আলিঙ্গন, তাদের উত্তেজিত বিক্ষিপ্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাদের বিস্মৃতির অতলে না নিয়ে গিয়ে তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় কী তাদের অস্বিষ্ট, যেন দুটো কুকুর মাটি বিদীর্ণ করেছে, এমনভাবে তারা পরস্পরের দেহকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করতে থাকে এবং প্রায়শই অসহায় বিব্রতভাবে সুখলাভের অন্তিম প্রচেষ্টায় পরস্পরের মুখ লেহন করে। বিপুল ক্লান্তিতে তারা অবশেষে স্তব্ধ হয় ও প্রত্যেকে অপরের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। এরপর পরিচারিকারা ঘরে এসে ঢোকে।

'দ্যাখ, কেমনভাবে ওর দুজন পড়ে আছে ওখানে,' বলে একজন ও সদয়ভাবে তাদের দেহের ওপর কোনো আচ্ছাদন বিছিয়ে দেয়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কে আচছাদন থেকে নিজেকে মুক্ত করে চারপাশে তাকালো। দুজন সহকারী -এতে কে অবাক হলো না-আবার তাদের কোণটিতে ফিরে গেছে, তারা আঙুল দিয়ে পরস্পরকে ধাক্কা দিয়ে তাকে স্যালুট করার চেষ্টা করছিল। তাদের পাশে বিছানার কাছে বসে সরাইমালিকের বউ তার বিপুলায়তনের তুলনায় অসম্ভব ছোটো একটা মোজা বুনছিল। তার দেহ এত পৃথুল যে ঘরটা প্রায় অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল আলো চাপা পড়ে।

‘আমি এসেছি এই ঘরে অনেকক্ষণ,’ বলল সে তার বলিরেখায় পূর্ণ বিশাল মুখটা তুলে ধরে। মুখটা এখনো সুগোল আর এককালে হয়ত সুশীও ছিল। কথাগুলো ভর্ৎসনার মতো বোধ হলো, অসমোয়োচিত কারণ তার উপস্থিতি কে’র কাম্য ছিল না। তাই সে মাথা নেড়ে তাদের উপস্থিতি স্বীকার করে মাত্র ও উঠে বসে। ফ্রিডাও ওঠে ও কে-কে ছেড়ে মালিকানের চেয়ারে হেলান দেয়।

‘আপনি যদি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।’ বলে কে, একটু বিব্রতভাবে, ‘তাহলে মোড়লের সঙ্গে দেখা করে আসা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করতে পারবেন না? ওর সঙ্গে আমার একটা দরকারি কাজ আছে।’ ‘এটাও জরুরি, বিশ্বাস করুন স্যার,’ বলল সরাইমালিকের বউ, ‘আপনার প্রয়োজনটা সম্ভবত আপনার কাজ সম্পর্কিত কিন্তু এ ব্যাপারটা একটা জীবন্ত ব্যক্তিকে নিয়ে, ফ্রিডা, আমার প্রিয় পরিচারক।’

‘ও, তাই যদি হয়,’ বলে কে ‘তাহলে আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না আমাদের ব্যাপারটা আমাদেরই হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে না কেন।’

‘কারণ আমি ওকে ভালোবাসি আর ওর ব্যাপারে আমার মাথ্যাব্যাথা রয়েছে।’ বলে বাড়িওয়ালি ফ্রিডার মাথা নিজের দিকে টেনে নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে ফ্রিডা উঠে দাঁড়ানোয় তার মাথা বাড়িওয়ালীর কাঁধ স্পর্শ করে। ‘ফ্রিডার যখন আপনার ওপর এত বিশ্বাস’ বলে ওঠে কে, ‘আমারও তাই করা উচিত আর যেহেতু ফ্রিডা একটু আগেই আমার সহকারীদের সত্যিকারের বন্ধু বলে স্বীকার করেছে, আমরা সকলেই এখানে বন্ধু। সেক্ষেত্রে আপনাকে বলতে বাধা নেই আমার ও ফ্রিডার পক্ষে সবচেয়ে ভালো হলো বিবাহিত হওয়া, যত আগে হয় ততই মঙ্গল। আমি জানি, হ্যাঁ, আমি জানি, আমার জন্য ফ্রিডা যা কিছু হারিয়েছে। হেরেনহফে তার পদমর্যাদা, ক্ল্যামের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব- আমি কখনোই সেসব পূরণ করতে পারব না।’

ফ্রিডা এই সময় তার মুখ তোলে, তার চোখ জলে ভরা, মুখে ঔদ্ধত্যের চিহ্নমাত্র নেই। ‘কেন? এত লোক থাকতে আমাকেই বাচা হলো কেন?’

‘কি?’ জিজ্ঞাসা করে কে ও বাড়িওয়ালী একসঙ্গে। ‘মেয়েটির মন খারাপ হয়ে গেছে, বেচারী।’

‘বলে সে, ‘এত বেশি সুখ আর অসুখ মিলেমিশে ওর মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে।’ এবং এই কথাগুলোর সমর্থনেই সম্ভবত ফ্রিডা কে-র ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাগলের মতো চুমু খেতে থাকে যেন ঘরে তারা দুজন চাড়া অন্য কোনো লোক উপস্থিত নেই।

তারপর কঁাদতে কঁাদতে তাকে আঁকড়ে ধরেই হাঁটু মুড়ে তার সামনে নত হয়। দু হাতে ফ্রিডার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে কে বাড়িওয়ালীকে বলল, ‘আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে না আপনার কোনো আপত্তি আছে।’

‘আমি একজনর সম্ভ্রান্ত মানুষ।’ বলে বাড়িওয়ালী। তার চোখও জলে পূর্ণ। তাকে এইসময় ক্লান্ত দেখায়, শ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল। তবু শক্তি সঞ্চয় করে সে বলে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে কী নিশ্চয়তা আপনি ফ্রিডাকে দিতে পারেন কারণ, আপনার উপর আমার গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বলছি, এখানে আপনি একজন অপরিচিত মানুষ। আপনার হয়ে কথা বলতে পারে এমন কেউ নেই, আপনার পারিবারিক পরিস্থিতিও কলের অজানা। তাই নিশ্চয়তার কথাটা বড়ো হয়ে উঠেছে। আপনি নিজেই এসব ক্ষেত্রে পারছেন, আপনি একটু আগেই বলেছেন আপনার সঙ্গে মিশে ফ্রিডা কত কিছু শিখিয়েছে।’

‘অবশ্যই, নিশ্চয়তা দান, নিশ্চিতভাবে।’ বলল কে, ‘কিন্তু তা তো দেওয়া দরকার মাটারির কাছে আর অন্য কোনো কাউন্টের অফিসারদের কাছেও। তাছাড়া বিয়ে করার আগে আমাকে আরো একটা কাজ করতেই হবে, ক্ল্যামের সঙ্গে আমার কথা বলাটা স্মারি।’

‘তা অসম্ভব,’ বলে ফ্রিডা একটু খাড়া হয়ে ও কে-র দেহলগ্ন হয়ে, ‘কি যে বলো?’

‘আমাকে এটা করতেই হবে।’ বলল কে, ‘যদি আমার পক্ষে তা করা অসম্ভব হয় তাহলে তোমাকে তা করতে হবে।’

‘আমি পারব না কে, আমি পারব না।’ বলল ফ্রিডা, ‘ক্ল্যাম কখনো তোমার সঙ্গে কথা বলবে না?’ জিজ্ঞাসা করে ক্ল্যাম কে। ‘আমার সঙ্গেও না,’ বলে ফ্রিডা, ‘তোমার সঙ্গে না, আমার সঙ্গেও না। এটা একদম অসম্ভব,’ হাত ছাড়িয়ে দেয় সে বাড়িগুলির দিকে, ‘দেখছ, কেমন অদ্ভুত কথা বলে ও!’

‘আপনি আশ্চর্য মানুষ’ বলে বাড়িওয়ালী, এখন সে আরো খাড়া হয়ে বসায় তার দৃষ্টি ভীতিকর হয়ে ওঠে, তার পা ফাঁক করা ও পাতলা স্কাটের তলা থেকে তার বিপুল জঘন্য প্রায় দৃশ্যমান।

‘আপনার চাহিদা পূরণ অসম্ভব।’

‘অসম্ভব কেন?’ বলে কে।

‘সেটাই তো আমি আপনাকে বলতে যাচ্ছি,’ বলে বাড়িওলি এমন একটা সুরে যেন বন্ধুত্বের দাবি মেটানোর জন্য যতটা না তার চেয়ে অনেক বেশি বন্ধুত্বের ঝঞ্ঝাট পোহানোর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তাকে এটা করতে হচ্ছে।

‘সেটাই আমি আপনাকে বোঝাতে চাই। যদিও দুর্গের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই, আর আমি সামান্য একজন মেয়েমানুষ, খুব তুচ্ছ এক সরাইখানার মালিকের বউ মাত্র একেবারেই তুচ্ছ বলা চলে না অবশ্য কিন্তু তার কাছাকাছিই— সেই জন্য আমার কথায় আপনি তেমন গুরুত্ব নাও দিতে পারেন, তা সত্ত্বেও বলব-সারাজীবন আমি চোখ খোলা রেখেছি, নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছি আর এই সরাইখানার সমস্ত ঝঙ্কি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি। মার্টিন তো সরাইমালিক না, যদিও মানুষ হিসাবে সে খুবই ভালো। কিন্তু দায়িত্ব কাকে বলে ও কখনই বুঝল না। উদাহরণস্বরূপ, ওর কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকে আপনার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, কারণ যেই সন্ধ্যায় আমি ক্লান্তিতে মড়ার মতো হয়েছিলাম, ওকে ধন্যবাদ দিন আপনি আদৌ যে গ্রামের এখানে আসতে পেরেছেন, এই যে শান্তিতে, আরামে বিছানায় বসে থাকতে পারছেন এসবের জন্য।’

‘কি?’ বলে কে, একধরনের অন্যান্যনক বিশ্বস্তি বোধ থেকে জেগে উঠে, ক্রোধের চেয়ে কৌতুহলই তাকে খোঁচায় বেশি করে।

‘এসবের জন্য ওর কাণ্ডজ্ঞানের অভাবকেই আপনার কৃতজ্ঞতা জাননো উচিত।’ আবার বলে বাড়িওয়ালী তার আঙুল কে-র দিকে তুলে ধরে।

ফ্রিডা তাকে চুপ করাবার চেষ্টা করে। ‘আমি না বলে পারছি না।’ বলে বাড়িওয়ালী, তার দেহটি দ্রুত ঘুরিয়ে।

‘কানুনগো মশাই আমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন আর আমাকে তার জবাব দিতেই হবে। এছাড়া আমরা ওকে কিছুতেই বোঝাতে পারব না আমরা কেন ধরে নিয়েছি যে হের ক্ল্যাম কখনো ওর সঙ্গে কথা বলবেন না। কথা বলবেন না-‘বললাম কি? আসলে কথা বলতে পারেন না। আমার কথা মন দিয়ে শুনুন স্যার। এই ভদ্রলোক হের ক্ল্যাম এসেছে দুর্গ থেকে আর শুধু এই জন্যই, দুর্গে তার পদমর্যাদার কথা চিন্তা না করেই, বুঝে নিতে হবে তিনি অনেক উঁচু পর্যায়ের মানুষ। কিন্তু আপনি নিজে কী? আপনার বিয়ের জন্য পর্যন্ত আমাদের বিব্রত হয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে কোন উপায়ে অনুমতি জোগাড় করা যেতে পারে। আপনি দুর্গ থেকে আসেননি, গ্রাম থেকে আসেননি, আপনি কিছুই না। কিংবা বরং দুর্ভাগ্যক্রমে, বলা যেতে পারে আপনি একজন কেউ, কিন্তু অজানা এক লোক মাত্র। এমন একজন যাকে কেউ চায় না, যে প্রত্যেকের পথের বাধা, যে সব সময় ঝগড়াট পাকায়, যে লোক ঝি-দের ঘরে এসে উঠেছে, যে লোকের উদ্দেশ্য পর্যন্ত অস্পষ্ট, যে লোক আমাদের সবার প্রিয় ফ্রিডার জীবনটা পর্যন্ত নষ্ট করেছে, যাকে দুর্ভাগ্যক্রমে এখন তার স্বামী বলে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। আমি এ সমস্তর জন্য আপনাকে দোষ দিচ্ছি না, আপনি যা, আপনি তা-ই, আর সারাজীবনে আমিও কম দেখিনি যে বাস্তবকে স্বীকার করে নিতে আমার বাধবে।

কিন্তু ভেবে দেখুন আপনি কী চাইছেন। ক্ল্যামের মতো মানুষ কিনা আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। আমি তো শুনে হতভম্ব যে ফ্রিডা আপনাকে চোরাফুটো দিয়ে দেখতে দিয়েছে। আমায় যখন সে এটা বলল তখনই বুঝেছি আপনি ওর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আপনি আমায় একবার বলুন দেখি, কোন আক্কেলে আপনি ক্ল্যামকে দেখলেন। আপনাকে জবাব দিতে হবে না, আমি জানি আপনি নিজেকে সবসময় মস্ত তালেবর ভাবেন। ক্ল্যাম এমন একজন মানুষ যে তাঁকে দেখবার কোনো যোগ্যতা পর্যন্ত আপনার নেই, আমি একচুল বাড়িয়ে বলছি না, আমারও কোনো অধিকার নেই। ক্ল্যাম নাকি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন, সেই মানুষ যিনি গ্রামের মানুষের সঙ্গে পর্যন্ত কথা বলেন না, আজ পর্যন্ত তাদের কারো সঙ্গে কখনো বাক্যালাপ করেননি। একমাত্র ফ্রিডারই হয়েছে সেই দুর্লভ সৌভাগ্য, এ বিষয়ে আমি মৃত্যুদিন পর্যন্ত গর্ববোধ করব, যে তিনি অন্তত তার নাম ধরে ডাকতেন, সে যখন খুশি তার সঙ্গে কথা বলতে পারত। এছাড়া তারই একমাত্র অধিকার ছিল ফুটো দিয়ে তাঁকে দেখার।

কিন্তু ফ্রিডার সঙ্গে পর্যন্ত তিনি কখনো কথা বলেননি। আর শুধু এই যে উনি ওর নাম ধরে ডাকতেন তা যে কোনো প্রয়োজনে তা না, কেউ কেউ তা ভেবে নিতে পারে,

তিনি শুধু তাকে ডাকতেন নাম ধরে-কী ভেবে তা আর আমরা জানব কেমন করে? - আর ফ্রিডা যে সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে যেত সেটা তার নিজের ব্যাপার-আর তাকে যে তার কাছে যেতে কোনো বাধা পেতে হতো না, সেটাও ক্ল্যামের বদান্যতা-কিন্তু তিনি যে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে ডাকতেন তার চেয়ে বড়ো গৌরব আর কী হতে পারে? অবশ্য এসবের ইতি চিরদিনের মতো হয়ে গেল। আগের মতোই ক্ল্যাম 'ফ্রিডা', বলে ডেকে উঠতে পারেন, সেটা খুবই সম্ভব।

কিন্তু সে ক্ল্যামের সামনে যাবার অনুমতি আর কখনো পাবে না। সে তো তাকে ছেড়ে আপনার গলায় ঝুলে পড়েছে। আর এখানেই পুরো ব্যাপারটা ঘটে গেল, এটা হাঁদা মেয়েটা বুঝলও না, যে মেয়ের ক্ল্যামের রক্ষিতা হিসাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল- আমার মতে এটাও বাড়াবাড়ি রকম কল্পনা মাত্র-সে কেমন করে আঙুল দিয়েও তাকে স্পর্শ করার অধিকার দিতে পারল অন্য কাউকে।

'নিশ্চয়ই, খুবই প্রাসঙ্গিক' বলে কে, ফ্রিডাকে তার বুকে টেনে নিয়ে, সে নিঃশব্দে আত্মসমর্পণও করে যদিও তার ঘাড়টা নিচু হয়, 'কিন্তু আমার মতে আপনার বোধহয় কোনো কোনো জায়গায় ভুল হচ্ছে। আপনি সম্পূর্ণ ঠিক, উদাহরণস্বরূপ, যখন আপনি বললেন যে ক্ল্যামের তুলনায় আমি প্রায় কিছু নয়, যদিও তা সত্ত্বেও ক্ল্যামের সঙ্গে কথা বলার জেদ আমি ছাড়িনি-আপনার যুক্তি আমার মত পরিবর্তন করতে পারেনি এ বিষয়ে,-তবুও ঠিকই বলেছেন তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে তার ও আমার মধ্যে একটা দরজার আড়াল ঠিকই থেকে যাবে কিংবা তাকে ঘরে দেখা মাত্রই আমি পালিয়ে যেতে পারি।

কিন্তু এরকম অনুমান, তার সে বিষয়ে কোনো চেষ্টা থেকে বিরত থাকার। আমি যদি আমার জায়গা থেকে একচুলও না নড়লে সফল হই তাহলে আর আমার সঙ্গে তাঁর কথা বলার দরকারই হবে না। আমার কথার কী প্রভাব তাঁর ওপর পড়ল সেটা লক্ষ্য করাই আমার পক্ষে যথেষ্ট, কোনো প্রভাব যদি না-ও পড়ে কিংবা যদি সব কিছুই অগ্রাহ্য করেন আমার অন্তত এটুকু সাত্বনা থাকবে যে আমি মন খুলে এক বিরাট পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছি।

কিন্তু আপনার তো বিশাল অভিজ্ঞতা রয়েছে মানুষজন, জগৎ, ফ্রিডা বিষয়ে, গতকাল পর্যন্ত যে ক্ল্যামের রক্ষিতা ছিল-এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো কারণ আমি দেখি না-আপনি তো সহজেই ক্ল্যামের সঙ্গে আমার একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন অন্য কোনো উপায়ে যদি তা সম্ভব না হয়। আমি নিশ্চিতভাবে হেরেনহফে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে পারি। সম্ভবত উনি এখনো ওখানে রয়েছেন।' 'সে অসম্ভব' বলে গৃহকত্রী, 'আমি বুঝতেই পারছি না আপনি বুঝছেন না কেন। কিন্তু আমায় বলুন তো আপনি ক্ল্যামের সঙ্গে কী বিষয়ে কথা বলতে চান?'

'ফ্রিডা বিষয়ে, অবশ্যই,' বলে কে।

'ফ্রিডা বিষয়ে?' বাড়িওলি পুনরাবৃত্তি করে, যেন সে কিছুই বোঝেনি এমনভাবে ও ফ্রিডার দিকে ফেরে।

'শুনতে পাচ্ছিঁস ফ্রিডা, তোর বিষয়ে উনি কথা বলতে চান ক্ল্যামের সঙ্গে! ক্ল্যামের সঙ্গে।'

‘আর,’ বলে কে, ‘আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী ও প্রশংসনীয় মহিলা অতঃপর তবু ছোটোখাটো বিষয়ে বিচলিত হয়ে ওঠেন, যাই হোক, ঘটনাটা তাই, আমি ওঁর সঙ্গে ফ্রিডা বিষয়ে কথা বলতে চাই, এর মধ্যে সাংঘাতিক কিছু নেই, এটাই স্বাভাবিক, আর আপনাদের এই ধারণাও ভুল যে আমি আসা মাত্রই ফ্রিডা ক্ল্যামের কাছে সমস্ত গুরুত্ব হারিয়েছে।

তাই যদি ভেবে থাকেন তাহলে ওর ক্ষমতাকে আপনি ছোটো করে দেখেছেন। আমি ভালোই জানি এ বিষয়ে নিয়ম কানুন আপনাকেই বোঝানোটা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হচ্ছে, কিন্তু আমাকে তা করতেই হবে। ফ্রিডার প্রতি ক্ল্যামের মনোভাব যদি বদলে গিয়ে থাকে তার কারণ আমি হতে পারি না। হয় তাদের মধ্যে সত্যিকার সম্পর্ক কিছু ছিল না-একরমই হওয়া স্বাভাবিক যদি কেউ অস্বীকার করতে থাকে যে সে তার সম্মানীর প্রেমিক-সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এখনো কোনো সম্পর্ক নেই-কিংবা তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল।

তা যদি হয় তাহলে কেমন করে ক্ল্যাম আমার মতো একটা পোকার কারণে তাঁর মনোভাব বদলাবেন? আতঙ্কের মুহূর্তে প্রথমে লোকে এই ধরনের কিছু একটা ধরে নিতেই পারে, কিন্তু পরে একটু চিন্তা করলেই এই ধারণার ভুল ভ্রান্তিগুলো ধরা পড়ে যায়। যাকগে এখন শোনা যাক এ বিষয়ে ফ্রিডার কি বক্তব্য আছে।’

চোখে সুদূরের দৃষ্টি নিয়ে ও কে-র বুকে গাল ঠেকিয়ে ফ্রিডা বলল, ‘এটা ঠিকই, মা যেমন বলছিল, এর পরে ক্ল্যামের আর আমার সঙ্গে কোনো কিছু করার থাকবে না। কিন্তু আমিও মনে করি তা তোমার কারণে নয়-ডারলিং, ওসবে উনি বিচলিত হবার লোক নন। উল্টে আমার বরং মনে হয় বার কাউন্টারের তলায় আমাদের দু-জনের যে দেখা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ তাঁরই কাজ, আমাদের সেই মুহূর্তকে ভাগ্য বলেই মানতে হবে, তাকে অভিশাপ না দিয়ে।’

‘তাই যদি হয়ে থাকে,’ কে ধীরে ধীরে বলে, কারণ ফ্রিডার কথাগুলো তার কাছে সুমিষ্ট লাগছিল, কয়েক মুহূর্ত সে চোখ বুজে থাকে সেই মিষ্টতাকে নিজের গভীর প্রবেশ করতে দিয়ে, ‘তাই যদি হয়ে থাকে ক্ল্যামের সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনায় আগের চেয়ে এখন বিচলিত হবার কারণ আরো বরং কমে এল।’

‘সত্যি বলছি’ বলে সরাইমালিকের বউ, বাতাসে নাক ঠেকিয়ে, ‘আপনি আমায় আমার স্বামীর কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছেন। আপনি ঠিক ওরই মতো শিশু আর জেদি। মাত্র কয়েকদিন গ্রামে কাটিয়েই আপনার মনে হচ্ছে এখানে যারা সারা জীবন কাটালো তাদের চেয়ে সব বিষয়েই বেশি জানেন, আমার মতো বয়স্ক স্ত্রীলোকের চেয়েও বেশি, ফ্রিডার চেয়েও, যে হেরেনহফ-এ-কত কিছু দেখেছে, শুনেছে। আমি অস্বীকার করছি না মাঝে মাঝে সমস্ত ঐতিহ্য, নিয়মকানুনের মধ্যে পালিত হওয়া কোনো কোনো মানুষ নিমেষেই অনেক কিছু বুঝে নিতে পারে। আমার নিজের অবশ্য সেরকম অভিজ্ঞতা কখনো হয়নি, তবে আমার বিশ্বাস কেউ কেউ হয়ত পেরেছে, অতীতের এমন নমুনা বিরল না।

এমন হতেই পারে, কিন্তু নিশ্চিত ভাবে আপনি যেভাবে করতে চাইছেন সেভাবে হয় না, সব সময় ‘না, না’ বলে আর নিজের মতে অনড় থেকে আর অন্যদের সুপরামর্শ

ঠেলে ফেলে দিয়ে। যতক্ষণ আপনি আপনার ব্যাপার নিয়ে ছিলেন আমি কি আপনাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে গেছি? যদিও অবশ্য তা করলেও ভালোই হতো, অনেক ঝামেলার হাত থেকে বাঁচা যেত। আপনার বিষয়ে আমি আমার স্বামীকে শুধু যে কথাটা বলেছিলাম তা ছিল, ‘ওঁর সমস্ত ব্যাপার থেকে দূরে থেক।’ আর আমি নিজেও তাই করতাম যদি না ফ্রিডা আপনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ত। ওকেই আপনার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত-আপনি তা পছন্দ করুন বা না করুন- এই জন্য যে আমি আপনার বিষয়ে কৌতূহল দেখাচ্ছি অথবা অস্তিত্ব আদর্শেই লক্ষ্য করছি, আর আপনি সহজে আমাকে ঝেড়ে ফেলতেও পারবেন না কারণ আমাদের ছোট্ট ফ্রিডার ভালোমন্দ একমাত্র আমিই দেখি, আর আমার ক্ষেত্রে আপনি কোনোভাবেই দায়বদ্ধ নন।

হয়ত ফ্রিডা ঠিকই বলেছে, যা কিছু ঘটেছে সব ক্ল্যামের ইচ্ছেতেই। কিন্তু এখন এখানে ক্ল্যামের বিষয়ে আমার কিছু বলার বা করার নেই। আমি ওনার সঙ্গে কখনো কথা বলতে পারব না। উনি আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু আপনি তো এখানে বসে আছেন, আমার ফ্রিডাকে সামলে, নিজেকে সামলে- আপনাকে না বলার কারণ দেখি না- আমার দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে। হ্যাঁ, আমার দ্বারা, যুবক, কারণ আমি যদি আপনাকে তাড়িয়ে দেই আপনি গোটা গ্রামে আর একটা আশ্রয় খুঁজে বার করুন তো দেখি, অন্তত একটা কুকুরের থাকার ঘর।’

‘ধন্যবাদ,’ বলে কে, ‘বললেন বেশ খোলাখুলি আর আপনার সব কথাই আমি সম্পূর্ণ সম্বন্ধ নেই। ফ্রিডা আমার বাড়ির মেয়ে, তার এখানে থাকাটাকে কারো অনিশ্চিত বলার অধিকার নেই।’

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে,’ বলে কে, ‘আপনার এই কথাটাও আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। বিশেষ করে ফ্রিডা, আমি অবশ্য বুঝতে পারছি না কী কারণে, যখন আপনার কথায় বাধা দিতে ভয় পেয়ে চূপ করে আছে। তাহলে আপাতত আমার ব্যাপারটা নিয়েই কথা বলুন। আমার অবস্থাটা যে খুবই অনিশ্চিত আপনি তো অস্বীকার করেননি বরং সেটাকে বড়ো করে দেখাতে অধিকারকে মাত্রা ছাড়িয়ে ফেলেই আপনি যা যা বললেন তা মোটামুটি সত্যি কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। নমুনাস্বরূপ বলতে পারি, আমার জানা আছে কোথায় গেলে উৎকৃষ্ট বিছানা আমি পেতে পারি, যদি আমি চাই।’

‘কোথায়? কোথায়?’ চিৎকারে করে উঠল ফ্রিডা ও বাড়িওয়ালী একসাথে এবং এত উদাসীনভাবে যেন দুজনেরই জিজ্ঞাসার পেছনে একই স্বার্থ কাজ করছে।

‘বারনাবাসের বাড়িতে,’ বলল কে।

‘ও সেই, আবর্জনাটা।’ চোঁচিয়ে বলল বাড়িওয়ালী, ‘সেই হতচ্ছাড়া আবর্জনাটা। তোমরা শুনলে’ বলে সে কোণের দিকে ফেরে কিন্তু সহকারীরা ইতিমধ্যে সেই স্থান পরিত্যাগ করে হাত ধরাধরি করে তার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। আর তাই যেন তার সমর্থন পাওয়াটা জরুরি এমনভাবে সে তাদের এজনের হাত আঁকড়ে ধরে।

‘শুনলে এই লোকটি পিরীত করতে কোথায় যেতে চায়। বারনাবাসের পরিবারের কাছে। ও, সে-তো একটা বিছানা সেখানে পাবেই। তা হেরেনহফে না থেকে সে তো সেখানেই রাতটা কাটাতে পারত। কিন্তু তোমরা দুজন ছিলে কোথায়?’

‘ম্যাডাম,’ বলল কে, সহকারীরা উত্তর দেবার সময় পাবার আগেই, ‘এরা’ আমার সহকারী, কিন্তু আপনার ভাবটা এরকম যেন ওরা আপনারই সহকারী আর আমার রক্ষী, যে কোনো বিষয়েই আমি অন্তত আপনার সঙ্গে, ভদ্রভাবে তর্ক করতে রাজি আছি। কিন্তু যাতে আমার সহকারীরা জড়িত সেই সম্পর্কে নয়, এটা বোঝা তো খুব শক্ত নয়। আমি তাই আপনাকে অনুরোধ করছি আমার সহকারীদের সঙ্গে কথা না বলতে আর আমার অনুরোধ যদি ব্যর্থ হয় আমি ওদের বারণ করে দেব আপনার কথার উত্তর না দিতে।’

‘তাহলে দেখা যাচ্ছে তোমাদের সঙ্গে আমার কথা বলা চলবে না।’ বলে বাড়িওয়ালী এবং তারা তিনজনই হাসে। বাড়িওয়ালী ঘৃণায়, কে যতটা আশা করেছিল তারা চেয়ে কম ক্রোধের সঙ্গে, আর সহকারীরা তাদের স্বাভাবিক ক্রেতায়, অর্থাৎ কম বেশি ফুর্তিতে দায়িত্বজ্ঞানহীন মতো।

‘রাগ করো না,’ বলে ফ্রিডা ‘আমরা কেন এত বিচলিত হচ্ছি একবার বোঝার চেষ্টা কর। ব্যাপারটা এভাবে বলতে পারি শুধু বারনাবাসের জন্যই আমরা এখন পরস্পরের হতে পেরেছি। আমি যখন তোমায় প্রথম বারে দেখলাম। ওলগার হাতে হাত জড়িয়ে তুমি এসে ঢুকলে— তখনই তোমার বিষয়ে কিছু বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি তোমার ব্যাপার সম্পূর্ণ নির্বিকার রইলাম। খালি তোমার ওপরেই না, প্রায় সবকিছু সম্পর্কেই আমি উদাসীন ছিলাম। হ্যাঁ, প্রায় সবকিছুতেই, কারণ সেই সময়টাতে আমি অনেক কিছুতেই অতৃপ্ত ছিলাম ও প্রায়ই ক্ষুব্ধও, কিন্তু এই অতৃপ্তি আর ক্ষুব্ধতা ছিল অদ্ভুত ধরনের। উদাহরণস্বরূপ: বারে কোনো খন্দের যদি আমাকে অপমান করত-ওরা তো সবসময় আমার পিছনে লেগেই থাকত-কী ধরনের সব প্রাণী তুমি তো নিজের চোখেই দেখেছ, কিন্তু ওদের চেয়েও পাজি অনেকে ছিল, ক্ল্যামের চাকরগুলোই যে সবচেয়ে মন্দ তা না-যাই হোক, তাদের কেউ যদি আমায় অপমান করত, আমার প্রতিক্রিয়া কেমন হতো? আমি এটাকে নিতাম যেন তা বহুবছর আগে ঘটেছে, কিংবা ঘটেছে অন্য কারো ক্ষেত্রে বা কারো মুখে ঘটনাটা আমি শুনেছি মাত্র কিংবা এর সবকিছুই ভুলে বসে আছি। কিন্তু এসব আমি গুছিয়ে বলতে পারছি না। আমি কল্পনাও করতে পারি না কিছু, ক্ল্যামকে হারানোর পর কোনো কিছুই আর আগের মতো নেই।’ বলতে বলতে ফ্রিডা থেমে গেল, বিষণ্ণতায় মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে, বুকের উপর হাত ভাঁজ করে।

‘দেখলেন’ চিৎকার করে ওঠে বাড়িওয়ালী যেন নিজের থেকে নয়, বরং ফ্রিডাকে তার স্বর ধার দিচ্ছে এমনভাবে। সে নিজেই কাছে এগিয়ে আসে ও ফ্রিডার গা ঘেঁষে বসে, ‘দেখতে পাচ্ছেন ভাই, আপনার কাজের ফল, আপনার সহকারীদেরও, ওদের সঙ্গে তো আমার কথা বলার অধিকারই নেই। খালি দেখেই মস্ত লাভ। জীবনের যে চূড়ান্ত সুখটুকু ফ্রিডা পেয়েছিল তার থেকে আপনি তাকে কেড়ে এনেছেন, আর আপনি তা করতে পারলেন শুধু সে বাচ্চাদের মতো ঈর্ষাক তার হয়ে আপনাকে ওলগার সঙ্গে হাত জড়াজড়ি করে আসতে দেখে সহ্য করতে পারে নি বলে আর এইভাবে তাকে হাত পা বেঁধে বারনাবাস পরিবারে আপনি তাকে বিসর্জন দিলেন। ও আপনাকে রক্ষা করতেই নিজেকে বলি দিল। তা সব কিছু যখন আপনি পেয়ে গেছেন আর শুধু আপনার

ল বসবার লোভে ফ্রিডা যখন তার সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছে তখন আপনি মোক্ষম ঠা চলে বসলেন, যে বারনাবাসের ওখানে নাকি আপনি রাতে শুতে পারতেন। আমাকে দেখাতে চাইছেন আমার ওপর আপনি নির্ভরশীল নন। আমি আপনাকে ত করতে পারি আপনি যদি ওই বাড়িতে শুতেন তাহলে আমার ব্যাপারে এতটাই ন হতে পারতেন যে নিমেষের মধ্যে এই জায়গাটা থেকে আপনাকে বের করে যা হতো।’

‘আমি জানি না বারনাবাসের পরিবার কী পাপ করেছে’ বলল কে, সাবধানে াকে তুলে ধরে সে মৃতের মতো ঝুঁকে পরেছিল-তাকে ধরে বিছানায় শুইয়ে, পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ‘ওদের ব্যাপারে আপনি হয়ত ঠিকই বলছেন কিন্তু আমিও করেনি যখন আমি আপনাকে বলেছিলাম ফ্রিডা আর আমার ব্যাপারটা আমাদেরই ৫ ছেড়ে দিতে সমাধানের জন্য। ফ্রিডার ওপর আপনার স্নেহ যত্নের কথা বলছিলেন। আমি তো সেরকম কিছু দেখলাম না। বরং দেখলাম প্রচুর তাচ্ছিল্য, ঘৃণা আর াকে এখন থেকে তাড়াবার চেষ্টা। আপনার যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ফ্রিডাকে আমার ৫ কিংবা আমাকে ফ্রিডার থেকে আলাদা করার তাহলে বলতেই হবে আপনার ঠা খুবই ভালো হয়েছে কিন্তু তা হলেও বলি তা সফল হবে না আর যদি সফল হয়ও লে -এবার আমার পালা আপনাকে ভয় দেখাবার -তার জন্য আপনাকে অনুতাপ ত হবে। আর আশ্রয় দিয়ে আমার যে মন্ত উপকারের কথা বারবার বলছেন- এই য না, খুব সম্ভবত কর্তৃপক্ষ আপনার মুখ দিয়ে বলতে বাধ্য করেছে। এবার আমি াই তাদের জানাব যে আমাকে এখান থেকে যেতে বলা হয়েছে-আর এর ফলে যদি াকে একটা বাসস্থান বরাদ্দ করা হয় তাহলে বোধহয় আপনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন। আমার থেকে বেশি না। এবার আমি প্রধানের সঙ্গে এই বিষয় ও অন্যান্য বিষয় । আলোচনা করতে চললাম। দয়া করে অন্তত ফ্রিডাকে একটু দেখবেন, ওর অবস্থা নি খুবই কাহিল করে এনেছেন আপনার তথাকথিত মাতাসুলভ পরামর্শ দিয়ে।’

এরপর সে সহকারীদের দিকে ফেরে, ‘আসতে চাইলে এস’ বলে সে ও ক্ল্যামের টা পেরেক থেকে খুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোয়। বাড়িওলি তাকে নিঃশব্দে লক্ষ্য ও যখন সে দরজার হাতল ধরেছে তখন বলে, ‘আরো একটা জিনিস আপনার নিয়ে যাওয়া উচিত। কারণ আপনি যাই বলুন না কেন, আর আমার মতো এক স্ত্রীলোককে যে ভাষাতেই অপমান করুন না কেন আপনি তো ফ্রিডার ভাবী স্বামী। সেই কারণেই এখন আপনাকে বলছি স্থানীয় ব্যাপার ট্যাপারে আপনার অজ্ঞতা এত ৫কর যে আপনার কথাবার্তা শুনলে আমার ভিরমি খাবার জো হয় আর আপনার া, নীতির সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির তুলনা না করে থাকতে পরি না। আপনার এই তা একবারের চেষ্টায় দূর করা যাবে না, কিংবা হয়ত কখনোই না, কিন্তু আপনি বহু শিখতে পারবেন যদি আপনি আমাকে একটুখানি অন্তত বিশ্বাস করেন আর াময় নিজের অজ্ঞতার কথাটা মনে রাখেন। উদাহরণ দিতে গিয়ে বলি আপনি ার ওপর এতটা অন্যায্য করতে পারতেন না, আর আমার মতোই ধাক্কা খেতেন- যা । এখনো সামলে উঠতে পারিনি- যখন আমি অনুভব করলাম আমার ছোট ফ্রিডা

ঈগলকে ছেড়ে দিয়েছে ঘাসের ওপর একটা সাপের জন্য যদিও বাস্তব পরিস্থিতি আরো অনেক খারাপ, আর আমি এ সব কিছু ভুলে যেতে চাইছি শুধুমাত্র আপনার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলতে। আ, আপনি আবার রেগে যাচ্ছেন, না। শুনুন যাবেন না, আমার এই আবেদনটা অন্তত শুনুন। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আপনি কখনো ভুলে যাবেন না আপনি এই গ্রামের সব চেয়ে অজ্ঞ লোক ও সতর্ক হবেন। এখানে, এই বাড়িতে ফ্রিডার উপস্থিতি আপনাকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করছে। যে কারণে আপনি মনের সুখে হাবার মতো কথা বলতে পারেন। যেমন ধরুন বলতে পারেন ক্ল্যামের সঙ্গে দেখা করার বিষয়ে আপনার প্ল্যানটা কী, কিন্তু আমি অনুময় করছি, বাইরে সত্যিই এমন করতে যাবেন না।’

সে উঠে দাঁড়ায়, উত্তেজনায় অল্প একটু কেঁপে কে-র কাছে যায় ও তার হাত ধরে অনুময়ের চোখে তাকায়। ‘ম্যাডাম’ বলল কে, ‘আমি তো বুঝছি না এত ছোটো ব্যাপারে অনুরোধ করতে আপনি আমার কাছে ছোটো হচ্ছেন কেন। আপনি যেমন বললেন, ক্ল্যামের সঙ্গে কথা বলাটা যদি আমার পক্ষে অসম্ভব হয় তাহলে আমি যতই চেষ্টা করি না কেন তা করতে ব্যর্থ হব, কেউ অনুময় করুক বা না করুক কিন্তু যদি দেখা যায় তা করা সম্ভব আমি তা করব না কেন, বিশেষ করে যখন তাতে আপনার আপত্তির মূল কারণই দূর হয়ে যাবে আর অন্যান্য যুক্তিরও ভিত দুর্বল হয়ে পড়বে। এটা তো ঠিকই, আমি মূর্খ, আমার পক্ষে দুঃখজনক সত্য।

কিন্তু তা আমাকে অজ্ঞতার সমস্ত সুযোগ সুবিধাও দিয়েছে। যার একটা হলো দুর্জয় সাহস, আর তাই আমি আমার অজ্ঞতা, তার মন্দ ফলাফল, সবই মাঝে মধ্যে মেনে নিতে রাজি আছি যতক্ষণ আমার শক্তি শেষ না হয়।

কিন্তু যা কিছু, ফলাফল হোক না কেন তা তো আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে স্পর্শ করবে না। সেই কারণেই আপনার অণুনের মর্ম ঠিক বুঝলাম না। আমি নিশ্চিত আপনি সবসময় ফ্রিডার দেখাশোনা করবেন, আর আমি যদি ফ্রিডার জীবন থেকে অদৃশ্য হয়েই যাই তা আপনার কাছে সৌভাগ্য ছাড়া আর কিছু বলে মনে হবে না। সুতরাং আপনার ভয়টা কী? নিশ্চয়ই আপনি ভয় পাচ্ছেন না-অজ্ঞ লোকেরা সবই সম্ভব মনে করে’- এখানে কে দরজাটা হাট করে খোলে- ‘নিশ্চয়ই আপনি ক্ল্যামের জন্য ভয় পাচ্ছেন না?’ সে যখন সহকারীদের পেছনে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে নেমে গেল বাড়িওয়ালী নিঃশব্দে হাঁ করে চেয়ে রইল।

৫

কে নিজেই ভারি অবাক হয়ে গেল যখন প্রধানের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারটা ঘটাতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। সে নিজেকে বোঝাতে চাইল বিশেষ করে এই বিষয়টা যে এখন পর্যন্ত তার অভিজ্ঞতা অনুসারে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার সমস্ত সরকারি যোগাযোগ সবসময়ই খুব সহজে ঘটেছে। এর কারণ স্বরূপ একদিকে রয়েছে এই ঘটনা যে নিশ্চিতভাবে এই আদেশ চূড়ান্তভাবে চলে গেছে সর্বত্র যে তার সমস্ত বিষয়টা যেন বিশেষ প্রশ্রয়ের চোখে দেখা হয়, অন্যদিকে এর কারণ প্রশংসনীয় স্বায়ত্বশাসিত

কর্মবিভাজন। যেটা কেউ এমনভাবে বিন্যস্ত করেছে যে তা অতি তৎপরতায় কাজ করে চলেছে কিন্তু যাকে বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

শুধুমাত্র এই তথ্যগুলি চিন্তা করেই কে এই বিপজ্জনক সিদ্ধান্তে ঢুকে যাচ্ছিল যে তার অবস্থাটি বেশ আশাপ্রদ। তা সত্ত্বেও সহজ আত্মবিশ্বাসের আবেগ প্রশমিত হলে সে দ্রুত নিজেকে বোঝায় যে এই বিশ্বাসের মধ্যেই তার সঙ্কটটি রয়ে গেছে।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করাটা বিশেষ করে এই সময়ে কঠিন ছিল না কারণ তারা সুসংগঠিত হওয়ায় তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দূরের, অদৃশ্য প্রভুদের সুদৃঢ় ও অদৃশ্য স্বার্থগুলো রক্ষা করা, ঠিক যখন কে লড়াই করছিল নিজেরই কোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ও অন্তত প্রথম দিকে, সে নিজেই উদ্যোগ নিয়ে তাদের প্রথম আঘাত হানে। এছাড়া সে যে শুধু নিজের জন্যই যুদ্ধ করছিল তা না, অন্যান্য শক্তির অনুকূলে সে লড়াই করত তাই সে চেনে না কিন্তু যাদের, কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বকে সংকুচিত না করেও, তার ওপর বিশ্বাসস্থাপনের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু এখন এই তথ্যটির দ্বারা যে তারা সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই আগ্রহের সঙ্গে তার সমস্ত ইচ্ছাপূরণ করে চলেছে— অবশ্য এখন পর্যন্ত সমস্ত গুরুত্বহীন বিষয়ই সামনে এসেছে— এটা বোঝা যায় এইভাবে তারা তার সহজেই যুদ্ধ জয়ের সমস্ত সম্ভাবনা কেড়ে নিয়েছে ও এর ফলে নিশ্চিতভাবে তাদের সেই আত্মসন্ত্রস্তি আরো যুক্তিসংগত গভীর আত্মবিশ্বাস এনেছে ও তা থেকে আরো অনেক বড়ো ধরনের সংঘাত জন্ম নিতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে তারা কে-কে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে দিয়েছে— অবশ্যই গ্রামের মধ্যে এইভাবে তাকে খুঁচিয়েছে ও নিস্তেজ করে এনেছে। তার লড়াইয়ের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছে আর তাকে নির্বাসন দিয়েছে সম্পূর্ণ বেসরকারি ফালতু ঝামেলায় ভরা, অজানা, অচেনা এক অস্তিত্বে।

জীবনে খুব সহজেই এমনটা ঘটে যেতে পারে, সে যদি প্রতি মুহূর্তে সতর্ক না থাকে, সে যে কোনোদিন কর্তৃপক্ষের আপাত স্নেহদৃষ্টিতে ও হিসেবিভাবে তার সমস্ত ছোটোখাটো ইচ্ছাপূরণে বা এই ধরনের উদারতার প্ররোচিত হয়ে, কোনো একদিন কোনো হঠকারিতা করে ফেলে পতিত হতে পারে অবশেষে। আর যে কর্তৃপক্ষ এখনো মৃদু ও বন্ধুত্বপূরণ, যেন তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, তার অজানা কোনো আইন পালন করতেই তাদের পথ থেকে তাকে সরিয়ে দিতে পারে। আর এটাই বা কী, যে সে অন্য জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল? এর আগে কখনো এখানকার মতো পেশা ও জীবনের বুনুনি দেখিনি, বয়ন এমনভাবে হয়েছে কারো মন হতে পারে তাদের স্থান বদল হয়ে গেছে।

উদাহরণস্বরূপ, ক্ল্যাম যে প্রতিপত্তি কে-র কর্মের ওপর প্রয়োগ করেছে, এমন পর্যন্ত খুবই নিয়মানুগভাবে অবশ্য, তার তুলনায় কি সে প্রকৃত ক্ষমতা কে-র শেষার ঘরে অনেক বেশি প্রয়োগ করেনি তুলনামূলকভাবে? তাই যদি মনে হয় যে হাক্কা, তুচ্ছ ভাব নিয়ে, ইচ্ছাকৃত অন্যমনস্কতা নিয়েই এই কর্তৃপক্ষের মুখোমুখি হওয়া যথেষ্ট, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি বিষয়ে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন ও চতুর্দিকে সাবধানে তাকিয়ে তবেই সংক্ষিপ্ততম লাফ মরা উচিত।

কে র কর্তৃপক্ষ সম্পর্কীয় এই ধারণা আরো বন্ধমূল হলো যখন সে গ্রামের প্রধান-এর সঙ্গে দেখা করতে গেল। প্রধান লোকটি বেশ দয়ালু ধরনের, শক্তপোক্ত, পরিষ্কার কামানো মুখ। সে শুয়েছিল; ভালো রকম বাতের আক্রমণে প্রায় কাতর, সে বিছানায় শুয়ে কে-কে অর্জাথনা জানায়।

‘তাহলে এই হচ্ছেন আমাদের জমির আমিন’ সে বলে, ও উঠে বসার চেষ্টা করে, চেষ্টায় ব্যর্থ হয় ও আবার নিজেকে কুশনের ওপর ফেলে দেয়, মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতে তার পায়ের দিকে ইঙ্গিত করে। ঘরের স্বল্পালোকে, ঘরটা আরো অন্ধকার লাগছিল ছোটো ছোটো জানলার ওপর পরদা টেনে দেওয়ায়। নিঃশব্দে ছায়ার মতো এক স্ত্রীলোক কে-র বসার জন্য একটা চেয়ার ঠেলে দেয় বিছানার দিকে।

‘আসুন গ্রহণ করুন আমিনমশাই, চেয়ার গ্রহণ করুন।’ বলে প্রধান, ‘তারপর বলুন আপনার প্রয়োজনটা কী।’ কে ক্র্যামের চিঠি পড়ে ও তার সঙ্গে নিজের কিছু মন্তব্য যোগ করে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করাটা যে কী আশ্চর্য রকম সোজা তা আবার তার মনে হয়। আক্ষরিক অর্থেই তারা যেন সমস্ত ভারই বহন করেছে, যে কেউ তাদের কাঁধে যত খুশি বোঝা চাপিয়ে দিয়ে — স্বাধীন ঝাড়া হাত পা হয়ে যেতে পারে। যেন সেও সেরকম বোধ করেছে এমন ভাবে প্রধান তার বিছানায় অস্বস্তির ভঙ্গি করে, কিছুক্ষণ পরে সে কথা বলল। ‘আপনি যা যা বললেন সে সমস্ত বিষয়েই আমি অবগত আছি। আমি যে কিছু করিনি তার কারণ প্রথমত আসি অসুস্থ ছিলাম, আর দ্বিতীয়ত আপনি আসতে অনেক দেরি করেছেন, আমি তো ভাবলাম শেষ পর্যন্ত আপনি কাজটাই ছেড়ে দিলেন বুঝি। তা শেষ পর্যন্ত আপনি যখন আমাকে খুঁজেই বার করেছেন, আমি আপনাকে সোজা সাপটা সত্যি ব্যাপারটাই বলব। আপনাকে জমির আমিনের কাজ দেওয়া হয়েছে, আপনার কথা অনুযায়ী, কিন্তু আমাদের আমিনের কোনো দরকার নেই। ওরকম কোনো পদ এখানে একদম অপ্রয়োজনীয়, আমাদের এই ছোটো দেশের সীমা সমস্তই চিহ্নিত ও সরকারিভাবে নথিভুক্ত হয়ে আছে। আমিন দিয়ে আমরা করবটা কি বলুন।’

এক মুহূর্ত আগেও কে এ বিষয়ে ভাবেনি যদিও, মনের গভীরে সে নিশ্চিতভাবে এরকম একটা উত্তরই আশা করেছিল। সে কারণেই সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারল, ‘আমার কাছে তো এরকম কথা খুবই আশ্চর্যের। আমার সমস্ত হিসেবের বাইরে। আমার একমাত্র আশা বোধহয় আমাদের কোথাও ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে।’

‘না, দূর্ভাগ্যজনক হলেও’ বলল প্রধান, ‘আমি যা বলছি ব্যাপারটা তাই-ই।’

‘কিন্তু তা কি করে সম্ভব হতে পারে।’ চেষ্টা করে উঠল কে, ‘আমি নিশ্চয়ই অন্তহীন পথ অতিক্রম করে আসিনি শুধুমাত্র এইজন্য যে আমাকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে?’

‘সেটা অন্য প্রশ্ন’, উত্তর দিল মোড়ল, ‘তা আমার দেখার কথা না, কিন্তু কি করে এই ভুল বোঝাবুঝি সম্ভব হলো, আমি তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি।’

কাউন্টের বিশাল সরকারি অফিসে মাঝে মাঝে এরকম ঘটে যায় যে এক দপ্তর কোনো বিষয়ে কোনো একটা আদেশ জারি করল তো অন্য দপ্তর অন্য একটা। এক দপ্তর অন্যকে চেনে না। যদিও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় অত্যন্ত দক্ষ, তাদের কাছে

নিয়মতান্ত্রিক ভাবে ব্যাপারটা গিয়ে পৌঁছয় অনেক দেরিতে আর তাই মাঝে মধ্যে ছোটোখাটো হিসেবের ত্রুটি ঘটে যায়।

বলা বাহুল্য এরকমটা ঘটে খুব সামান্য ছোটোখাটো বিষয়ে, যেমন ধরুন আপনার ঘটনাটা। এখন পর্যন্ত বড়ো কোনো ব্যাপারে কোনো ত্রুটি আমার চোখে তো অন্তত পড়েনি। কিন্তু হ্যাঁ, ছোটোখাটো বিষয়ে ভুলেও প্রায়ই যথেষ্ট বেদনার কারণ হতে পারে। এখন আপনার বিষয়টা ধরা থাক। এর পুরো ইতিহাসটাই আমি খোলাখুলি বলতে চাই, এ বিষয়ে আমি কোনো সরকারি রহস্য সৃষ্টি করতে চাই না-আমি এমন কোনো সরকারি তালবেরও নই, একজন সামান্য চাষা মাত্র আর তাই থাকব।

বহুদিন আগে মোড়ল হয়েছি মাত্র কয়েক মাস আগে,-হঠাৎ একটা হুকুম এল। কোন দপ্তর থেকে এমন ঠিক স্মরণ হচ্ছে না, ওখানকার ভদ্রলোকদের দস্তরমতো স্পষ্টভাবে জানানো হলো যে একজন জমির কানুনগো আনা হবে ও পৌরবিভাগকে আদেশ দেওয়া হলো তারা যেন এর জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র, যন্ত্রপাতি নিয়ে তার কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে। এই আদেশ অবশ্যই আপনার বিষয়ে ছিল না কারণ ঘটনাটা বহুকাল আগের। আমারও এটা মনে পড়ত না যদি না এই মুহূর্ত আমি অসুস্থ থাকতাম আর প্রচুর সময় বিছানায় না কাটাতে হতো, যে সময়টা আমার যত আজগুবি চিন্তা মাথায় আসে—‘মিজ্জি,’ সে বলে উঠল তার বক্তৃতায় ছেদ দিয়ে, সেই স্ত্রীলোকটির উদ্দেশ্যে যে তখনো ঘরে প্রায় অদৃশ্যভাবে তার কাজ করে যাচ্ছিল, ‘প্লিজ, ক্যাবিনেটটা একবার দেখ তো, ওখানেই বোধহয় অর্ডারটা পাবে। বুঝলেন, এটা ঘটে আমার এখানে প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই।’

সে ব্যাখ্যা করে কে-র কাছে, ‘সেই সময় আমি সবকিছু ফাইলে ভরে রাখতাম।’

স্ত্রীলোকটি তৎক্ষণাৎ ক্যাবিনেট খোলে। কে ও গ্রামপ্রধান চেয়ে থাকে। ক্যাবিনেটটা নানা কাগজে ঠেসে আছে। খোলামাত্র দুটো বড়ো কাগজের প্যাকেট গড়িয়ে পড়ল। চুল্লির কাঠ যেমন করে বাঁধা থাকে তেমন করে গোল বাঙিল করে বাঁধা। স্ত্রীলোকটি চকিতে সন্ত্রস্ত ভাবে লাফিয়ে পিছিয়ে যায়।

‘ওটা নিশ্চয়ই একদম নিচে আছে, তলার দিকে,’ বলল মোড়ল, বিছানা থেকে সে নির্দেশাবলী পাঠাতে থাকে। দুহাতে কাগজপত্র জড়ো করে বাধ্য মেয়ের মতো স্ত্রীলোকটি ক্যাবিনেট থেকে সেগুলো সরায় যাতে নিচের লেখাগুলো পড়তে পারে।

‘এগুলো প্রচুর কাজের চিহ্ন,’ বলে মোড়ল মাথা নাড়তে নাড়তে।

‘কিন্তু আসলের তুলনায় ভগ্নাংশ মাত্র, সবচেয়ে দরকারি কাগজগুলো আমি ছাউনিতে চালান করেছি। আর প্রচুর নষ্ট হয়েছে। সব একসঙ্গে রাখা কি সম্ভব। ছাউনিতে কাগজের স্তুপ জমে আছে -অর্ডারটা খুঁজে পেলেন কী?’ বলে সে আবার তার স্ত্রীর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে, ‘এমন একটা নথি খোঁজ নীল পেন্সিল দিয়ে যাতে দাগ দিয়ে লেখা আছে-‘জমির আমিন।’

‘বড্ড অন্ধকার,’ বলে স্ত্রীলোকটি, ‘আমি একটা মোমবাতি নিয়ে আসি।’ বলে সে ও কাগজপত্র মাড়িয়ে দরজার দিকে এগোয়। ‘আমার স্ত্রী আমাকে খুব সাহায্য করে,’ বলে মোড়ল ‘এইসব কঠিন সরকারি কাজকর্মে, অথচ কখনোই ওনাদের সঙ্গে

তালরেখে চলতে পারি না। ঠিক, যে আমার আরো একজন সহকারী আছে আমাকে লেখাটেখায় সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে, শিক্ষক একজন। কিন্তু এ সত্ত্বেও সবকিছু যথাযথ রাখা আমার পক্ষে অসাধ্য, সবসময় কোনো না কোনো কাজ ফেলে রাখতে হচ্ছেই, ওই সিঁদুকটায় সেগুলো ভরে রাখা আছে।

এবং সে অন্য একটি ক্যাবিনেটের দিকে কে-র দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ‘আর ঠিক এখন যখন আমি পড়ে রয়েছি, সব কিছুর আরো বাড়বৃদ্ধি ঘটে চলেছে,’ বলে সে ও একধরনের ক্লান্তি ও অহংকারের সঙ্গে গুয়ে পড়ে।

‘আমি কি পারি না,’ জিজ্ঞাসা করল কে, যখন দেখল স্ত্রীলোকটি বাতি নিয়ে ফিরেছে ও সিঁদুকের সামনে হাঁটু মুড়ে কাগজটি খুঁজছে, ‘আমি কি আপনার স্ত্রীকে সাহায্য করতে পারি না ওটা খুঁজে বার করতে?’

মোড়ল স্মিতহাস্যে মাথা নাড়ে, ‘আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, দণ্ডের সমস্ত গোপনীয়তার মিছিল আপনার সামনে হতে দিতে আমি পারি না। কিংবা নিজের চোখে ওই কাগজগুলো পড়ে নেবেন-তাও করতে দেওয়া সম্ভব নয়।’

এবার ঘরে নৈঃশব্দ নেমে আসে, শুধু কাগজের খসখস আওয়াজ শোনা যায়। মনে হলো কয়েক মুহূর্তের জন্য মোড়ল ঘুমিয়ে পড়েছে। এই সময় মৃদু টোকার শব্দে কে মাথা ঘোরায়। বলা বাহুল্য, তার সহকারীরা। তবে দেখা গেল তাদের ওপর প্রশিক্ষণের ফল ফলতে শুরু করেছে, তারা ছড়োতাড়া করে একসঙ্গে ঘরে তাকে না, পরিবর্তে প্রথমে অল্প ফাঁক দরজার থেকে ফিসফিস করে কথা বলে, ‘এখানে বাইরে কত ঠাণ্ডা।’

‘কে ওখানে?’ জিজ্ঞাসা করে মোড়ল চমকে উঠে।

‘শুধু আমার সহকারীরা,’ বলে কে, ‘জানিনা ওদের কোথায় আমার জন্য অপেক্ষা করতে বলা যায়। বাইরে খুব ঠাণ্ডা আবার এখানে ঢুকতে দিলে আমাদের কাজে বিঘ্ন হবে।’ ‘ওরা এলে আমার কোনো বিঘ্ন হবে না।’ বলে গ্রাম প্রধান প্রশ্রয়ের সুরে, ‘ওদের আসতে বলুন, তাছাড়া আমি ওদের চিনি। পুরনো পরিচয়।’

‘কিন্তু ওরা আমার কাজে তো বাগড়া দেবে।’ বলল কে স্থূলভাবে, এই সময় তার দৃষ্টি সহকারী থেকে মোড়লের ওপর ও আবার তাদের কাছে ফিরে যায় ও এইসময় তিনজনের মুখে একই স্মিত হাসি দেখতে পায়।

‘এখানে যখন এসেই পড়েছ তোমরা,’ পরীক্ষামূলকভাবে সে বলে, ‘তখন প্রধানের স্ত্রীকে একটা নথি খুঁজে বার করতে সাহায্য করো। কাগজটার ওপরে লেখা আছে ‘জমির আমিন।’ তলায় নীল পেন্সিলে দাগ দেওয়া রয়েছে।’ মোড়ল কোনো আপত্তি করে না।

কে-কে যে বিষয়ে অনুমতি দেওয়া হলো না তা দেওয়া হলো তার সহকারীদের। তারা তখনই কাগজের স্তূপে নিজেদের নিষ্ক্ষেপ করে কিন্তু তাদের কাছে কিছু খোঁজা মানে কাগজের স্তূপ হাটকানো মাত্র। কেউ যদি একটা নথি তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে তো অপর জন তখনই নিমেষের মধ্যে তার হাত থেকে কেড়ে নেয়। ইতিমধ্যে স্ত্রীলোকটি খালি সিঁদুকের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ছিল। মনে হলো খোঁজাখুঁজি চেষ্টা সে একেবারে বিসর্জন দিয়েছে। যাই হোক, মোমটা তার থেকে বেশ দূরে দাঁড় করানো।

‘সহকারীরা,’ বলল প্রধান আত্মতুষ্টির হাসি হেসে, যেন সেই সবকিছুর মূলে এমন এক ভাব করে যদিও কারো তা একবারও মনে হয়নি, ‘তাহলে বলছেন আপনার পথের বাধা? অথচ ওরাই আপনার সহকারী,’ ‘না,’ বলল কে ঠাণ্ডা গলায়, ‘ওরা এখানে আমার ঘাড়ে এসে চেপেছে।’

‘ঘাড়ে চেপেছে’ বলল সে, ‘মানে নিশ্চয়ই বোঝাতে চাইছেন, ওদের আপনার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে?’

‘ঠিক আছে, তাহলে তাই, আমার সঙ্গে নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ওরা আকাশ থেকেও তাহলে পড়তে পারত। অনেক চিন্তা করে যদি এরকম জিনি পাঠানো হয়ে থাকে।’

‘কোনো কিছুই এখানে চিন্তা ভাবনা না করে করা হয় না,’ বলে মোড়ল তার পায়ে ব্যথার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে ও উঠে বসে।

‘করা হয় না?’ বলে কে ‘তাহলে আমাকে ডেকে পাঠানোর কারণ কী?’

‘আপনাকে ডেকে পাঠানোর বিষয়টা খুব চিন্তা করেই করা হয়েছে।’ বলে মোড়ল, ‘শুধু অন্য কিছু অপ্রধান বিষয় মূলের সঙ্গে মিশে গিয়ে পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছে মাত্র। আপনাকে আমি এক্ষুনি এটা প্রমাণ করে দিচ্ছি সরকারী কাগজ দেখিয়ে।’

‘ওসব কাগজ আর পাওয়া যাবে না।’ বলে কে।

‘পাওয়া যাবে না?’ বলল মোড়ল, ‘মাজ্জি, তাড়াতাড়ি করো একটু দয়া করে। তা কাগজ ছাড়াও গল্পটা আমি আপনাকে বলতে পারি। অর্ডারটা পেয়ে, এই বিষয়ে আগেই বলেছি, আমরা ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম যে আমাদের আমিনের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু মনে হয় না আমাদের জবাবটা মূল দপ্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল, আমরা একে ‘ক’ বলব, বরং ভুল অন্য দপ্তরে গিয়ে পৌঁছয় ‘খ’ তে, তাই ‘ক’ দপ্তর আমাদের থেকে কোনো উত্তর পেল না আর দূর্ভাগ্যবশত ‘খ’ ও আমাদের পুরো উত্তর পেল না।

এখন, আমাদের উত্তরের সঙ্গে মূল যে নির্দেশ জুড়ে দেওয়ার কথাটা তা আদপেই হয়নি নাকি পথেই হারিয়ে যায়-আমাদের দপ্তরে হারায়নি তা আমি দায়িত্ব নিয়েই বলতে পারি তা বলা শক্ত। সে যাই হোক, ‘খ’ দপ্তরে গিয়ে পরিপূরক চিঠিটা পৌঁছল, তাতে শুধু লেখা ছিল, আদেশের পক্ষে যেটা দূর্ভাগ্যজনকভাবে অবাস্তব, ‘জমির আমিন নিয়োগ সংক্রান্ত,’ ইতিমধ্যে ‘ক’ আমাদের উত্তরের প্রতীক্ষা করছিল। তারা নিশ্চয়ই এই বিষয়ে সরকারি নোট রেখে দিয়েছিল কিন্তু ক্ষমনীয়ভাবেই, যেমনটা প্রায়ই ঘটে থাকে, মনে করেছিল আমাদের উত্তর তারা পাবেই আর তখনই তারা কানুনগোকে ডেকে পাঠাবে কিংবা প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে আমাদের আরো কিছু নির্দেশ পাঠাবে।

এর ফলে তারা আর তার কথা উল্লেখ করল না ও পুরো ব্যাপারটাই বিস্মৃতির অতলে চলে গেল। কিন্তু ‘খ’ দপ্তরে আমাদের উত্তরটা গিয়ে পৌঁছল এক সংযোগকারীর হাতে, লোকটি খুব বিবেকবান। নাম সরডিনি, ইটালিয়ান। আমার কাছে পর্যন্ত দুর্বোধ্য মনে হয় এরকম অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন লোককে কেন এমন একটা তুচ্ছ পদে ফেলে রাখা হয়েছে। এই সরডিনি স্বাভাবিকভাবেই অসম্পূর্ণ চিঠিটা ফেরত পাঠাল পুরো করে পাঠাতে। এমন বেশ কয়েক মাস, বছর যদি নাও হয়, কেটে গেছে ক দপ্তর থেকে এন

নির্দেশটি আসার পর থেকে। ব্যাপারটা অবশ্য সহজেই বোঝা যায় কারণ এটাই নিয়ম, কোনো নথি যখন ঠিকঠাক পথ ধরে যাত্রা করে তখন বাইরের কোনো দপ্তরে এক দিনের মধ্যেই গিয়ে পৌঁছয় কিন্তু মাঝে মাঝে যখন বিপথগামী হয় তখন আমাদের মতে সুদক্ষ প্রশাসনকে পর্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠতে হয় তাকে খুঁজে বার করতে আর তারপর বাস্তবিকই বহুদিন ধরে তার খোঁজ চলতেই থাকে তা না হলে সেটা জনের মতো হারিয়েই যাবে।

সেই কারণে সরডিনির নোটটা যখন হাতে এল তখন পুরো ব্যাপারটা বিষয়ে আমাদের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে এসেছে, সেই সময়ে কাজটা করার জন্য শুধু দুজন আমরা ছিলাম, মজ্জি-আর আমি নিজে। তখনো শিক্ষককে আমাদের সঙ্গে নিযুক্ত করা হয়নি। আমরা শুধু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নকলই রাখতাম। তাই অত্যন্ত ঝাপসা ভাবে উত্তরে লিখলাম যে আমিন নিয়োগের ব্যাপার আমরা কিছুই জানি না আর আমাদের জ্ঞানত ওরকম নিয়োগের কোনো প্রয়োজনই আদ্যে নেই।

‘কিন্তু,’ এখানে মোড়ল নিজেকেই বাধা দিল, যেন নিজের গল্পেই মোহিত হয়ে তার মনে হলো সে বড্ড দূর এগিয়েছে, কিংবা এমনও হতে পারে সে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, ‘গল্পটা আপনার একঘেয়ে লাগছে না তো?’

‘না,’ বলল কে, ‘আমার মজা লাগছে।’

মোড়ল বলল, ‘আমি আপনাকে এটা বলছি কিন্তু মজা দিতে না।’

‘আমার মজাই লাগছে,’ বলল কে; ‘কারণ পুরো বিষয়টা থেকে এমন এক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করছি যাতে বুঝতে পারি কোনো ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা কেমনভাবে একটা মানুষের ভাগ্য স্থির করে দেয়।’

‘এ বিষয়ে কোনো অন্তর্দৃষ্টি আপনি এখনও লাভ করেননি।’ বলে মোড়ল গম্ভীরভাবে। ‘আর আমিও গল্পটা চালিয়ে যেতে পারি। স্বাভাবিকভাবেই সরডিনি আমাদের উত্তরে সন্তুষ্ট হলো না, লোকটাকে আমি শ্রদ্ধা করি, যদিও অবশ্য আমাদের ক্ষেত্রে ও একটা আপদ হয়ে উঠল।

আক্ষরিক ভাবেই ও প্রত্যেককে অবিশ্বাস করে, এমনকি যদি, উদাহরণস্বরূপ, ও ভালোভাবে বোঝে অজস্র ঘটনার মধ্য দিয়ে যে কোনো বিশেষ একটা লোক পৃথিবীতে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য, সে তাকেও অবিশ্বাস করবে নতুন কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হলেই, যেন সে কোনো দিন তাকে চিনতেই না। কিংবা বলা ভালো সে বিশ্বাস করতে চাইছে লোকটা একটা বদমাশ। আমি একে যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করি। কর্মচারীদের ব্যবহার এমন হওয়াই উচিত। দূর্ভাগ্যের কথা আমার নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী ওরকম কোনো আদর্শ আমার পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। আপনি নিজেই তো দেখছেন আপনার সঙ্গে, একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে আমি কেমন খোলামেলা কথা কইছি এসব বিষয় নিয়ে। অন্যরকম হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু সরডিনি, ঠিক উল্টোভাবে সন্দেহ হয়ে উঠল আমাদের উত্তর পড়ে। এবার আমাদের চিঠিচাপটি বাড়তে লাগল দ্রুতহারে। সরডিনি জিজ্ঞাসা করে পাঠাল আমি কেমন করে স্মরণ করলাম যে কোনো কানুনগো ডাকা অনুচিত হবে। আমি উত্তর দিলাম, মজ্জির

অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ওপর নির্ভর করে, এ ব্যাপারে এমন ইঙ্গিত এসেছিল প্রধান কার্যালয় থেকেই (কিন্তু এটা যে অন্য দপ্তর থেকে এসেছিল তা আমরা এর আগেই ভুলে গিয়েছিলাম) সরডিনি আক্রমণ করল, এতদিন পরে আমি কেন শুধু ওই সরকারি আদেশের কথা উল্লেখ করলাম?’ আমি বললাম, কারণ এইমাত্র আমার সেটা মনে পড়ল।’

সরডিনি: ‘এটা খুবই অসাধারণ,’

আমি: ‘এটা মোটেই অসাধারণ নয় এত দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে।’ সরডিনি : হ্যাঁ এটা অসাধারণই কারণ যে নির্দেশের কথা আমি উল্লেখ করেছি তার কোনো অস্তিত্বই কখনো ছিল না।

‘আমি: ‘অবশ্যই, এর অস্তিত্ব ছিল না কারণ পুরোটাই তো হারিয়ে গেছে।’

সরডিনি: ‘কিন্তু প্রাথমিক পত্রাবলির স্মারকলিপির একটা খসড়া তো থাকবে, তা গেল কোথায়?’ এখানে আমি নড়ে চড়ে বসলাম। কারণ সরডিনির দপ্তরেই কোনো ভুল হয়েছে এটা না পারলাম সাহস করে বলতে না পারলাম বিশ্বাস করতে। সম্ভবত আমিন মশাই, আপনি মনে মনে সরডিনিকে তিরস্কার করবেন সে কেন আমার থেকে নিশ্চয়তা পাওয়ার পর অন্য দপ্তরে এটা নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করল না। কিন্তু আপনার ভুল হবে যদি তা করেন। ঐ লোকটিকে আমি কোনো দোষ দিতে পারি না। না, মনে মনেও না। প্রধান দপ্তরের চলতি নীতিই হলো-কোনো ভুলের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে হবে। বিশাল সংগঠনের জটিল কর্তৃত্ব কেন্দ্রিক সমস্যার দিকে তাকালে স্বীকার করতেই হবে এই বাস্তব নীতিটি খুবই যুক্তিযুক্ত আর এ খুবই জরুরি যদি অজস্র কাজকে দ্রুততম গতিতে সম্পন্ন করতে হয়।

তাই অন্য দপ্তরে অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে সরডিনির কোনো ক্ষমতা ছিল না। তাছাড়া তারা তার অনুসন্ধানের কোনো উত্তরও দিত না কারণ তারা ঠিকই অনুমান করে নিতে তৎক্ষণাৎ যে কোনো সম্ভাব্য ভ্রান্তির নির্ণয়ের খোঁজ চলছে।’ ‘মাপ করবেন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বাধা দিচ্ছি।’ বলল কে’ ‘একবার আপনি কি উল্লেখ করেছিলেন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব? আপনার বর্ণনার সারাৎসার থেকে কেউ হয়ত কেন্দ্রের গলদ বিষয়েও আশঙ্কিত হয়ে উঠতে পারে।’

‘আপনি খুব কঠোর’ বলল মোড়ল, ‘কিন্তু আপনি যদি আপনার কঠোরতাকে হাজার দিয়েও গুণ করেন তা কেন্দ্র যে কঠোরতা নিজের ওপর আরোপ করেছে তার ধারে কাছে গিয়ে পৌঁছবে না। আপনার মতো সম্পূর্ণ একজন আগন্তুকই এরকম একটা প্রশ্ন করতে পারে কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব আছে কিনা। এ রকম বহু কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব রয়েছে। সত্যি বলতে কী, মোটা অর্থে আমাদের গলদ খুঁজে বার করা তাঁদের কাজ না, ভুল হয়ই না, আর এমনকি মাঝে মধ্যে যদি কোনো ভুল ঘটেই যায়, যেমন আপনার ক্ষেত্রে, তাকে চূড়ান্ত অর্থে ভুল বলেই বা কে আখ্যা দেবে?’

‘এটা একটা খবর বটে!’ বলল কে চোঁচিয়ে। ‘এটা আমার কাছে খুব পুরনো খবর।’ বলল মোড়ল, ‘ঠিক আপনার মতোই আমিও নিশ্চিত, ভুল একটা হয়েছে, এর ফলে হতাশায় সরডিনি প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছে আর প্রাথমিক কেন্দ্রীয় অধিকারিকরাও,

যাদের আমাদের ধন্যবাদ দিতে হবে ভুলের উৎস খুঁজে বার করার, স্বীকার করেছেন যে কোথাও ত্রুটি ঘটেছে। কিন্তু কে নিশ্চয়তা দেবে যে দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় আধিকারিকরাও একই রকম সিদ্ধান্তে আসবেন ও তৃতীয়বার অন্যান্যদের মতামত এ বিষয়ে কী হবে?

‘তা হতে পারে’ বলল কে, ‘আমি এ সমস্ত অনুমানের সঙ্গে আমার নিজেকে না জড়ানোটাই আপাতত ভালো, তাছাড়া আমি এই প্রথম কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের কথাটা শুনলাম, তাই তাদের ব্যাপারটা আমার জন্যে ঠিকঠাক অনুধাবণ করা কঠিন, কিন্তু আমার মনে হয় দুটো জিনিস এখানে স্পষ্ট করে আলাদা করা জরুরি। প্রথমত অফিসগুলোতে কর্মপ্রক্রিয়া কী রকম, তা কীভাবে ক্রিয়া অনুসারে পূর্ণগঠন করা যায় ও দ্বিতীয় আমার নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে, আমার দপ্তরের বাইরে অবস্থানটিকে তারা ক্রমাগত বিপজ্জনকভাবে সঙ্কুচিত করে আনছে। সেটা এতই অর্থহীন যে আমার পক্ষে ভাবা পর্যন্ত অসম্ভব যে বিপদটা সত্যিই রয়েছে।

প্রথমে উত্তর তো আপনি দিলেনই মোড়ল মশাই, বিস্তৃতভাবে ও পুঙ্খন পুঙ্খভাবে মন অশান্ত হয়ে ওঠার মতো প্রচুর তথ্য সরবরাহ করে। এবার আমার নিজের সম্বন্ধে দু-একটা কথা শুনতে পেলে বাধিত হই।’ ‘আমি সে বিষয়েই এক্ষুনি আসছি।’ বলে মোড়ল, ‘কিন্তু আমি যদি প্রাথমিক কিছু তথ্য না দিই আপনি তা বুঝতে পারবেন না। একটু আগেই যে আমি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বিষয়ে বলেছিলাম তা অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তাই আমাকে আবার সরডিনির সঙ্গে আমার অনৈক্যের বিষয়টায় ফিরে যেতেই হবে। আগেই বলেছি, আমার প্রতিরোধ ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। কিন্তু সরডিনি যদি কারো ওপর সামান্যতম থাবাও বসাতে পারে, ধরে নেওয়া যায় সে জিতে গেছে কারণ তখন তার নজরদারী, সামর্থ্য ও সতর্কতা বহুগুণ বেড়ে যায়। তার শিকারের পক্ষে এ এক সাংঘাতিক মুহূর্ত আর শিকারের শত্রুদের কাছে চরম আনন্দের। অন্যান্য পরিস্থিতিতে আমার শেষোক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে বলেই তার সম্বন্ধে এসব কথা বলতে পারছি। এ সব সত্ত্বেও তাকে দেখার সুযোগ আমার কখনো হয়নি। ও এখানে আসতে পারে না, কাজ নিয়ে এত মেতে থাকে, তার ঘরের যে বর্ণনা শুনেছি তা অনুযায়ী প্রত্যেকটি দেয়াল নাকি ঠাসা শুধু উঁচু উঁচু নথিপত্রে, একসঙ্গে বাঁধা, একটা স্তূপের ওপর আরেকটা, সরডিনি যা নিয়ে কাজ করছে এগুলো শুধু তার জন্য প্রয়োজনীয় নথি আর যেহেতু ধারণা তাড়াহুড়ো করে বাতিল কাগজ সবসময় নেওয়া হচ্ছে, বা রাখা হচ্ছে, স্তূপ স্তূপ কাগজ মাটিতে পড়ে। এই ক্রমাগত নথির স্তূপের পতন, একটার ওপর আরেকটা পড়ছে-এর থেকে সরডিনির কাজের ঘরটার একটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

হ্যাঁ, সরডিনি একজন সত্যিকারের কর্মী। ক্ষুদ্রতম কাজে তার যতটা বিচক্ষণ যত্ন খুব বড়ো কাজেও ঠিক ততটাই।

‘মোড়লমশাই’-বলল কে, ‘আপনি সবসময় বলে চলেছেন আমার বিষয়টা খুব ছোটো অথচ এটাই অজস্র কর্মচারীর ঘাম ছুটিয়েছে। আর গোড়ার দিকে যদি এটা গুরুত্বহীন হয়েও থাকে তবু সরডিনির মতো কর্মচারীর জৎপরতায় এখন তা একটা মস্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দুর্ভাগ্যবশত, কারণ আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এমন নয় যে আমি চাই আমাকে নিয়ে নথিপত্রের পাহাড় তৈরি হোক, এর

ঘাড়ে অন্য কাগজের বোঝা এসে পড়ুক। আমি চেয়েছিলাম আমার ড্রয়িং বোর্ডের সামনে তুচ্ছ এক জমির কানুনগো হয়েই কাজ করতে।’

‘না,’ বলল গ্রামপ্রধান, ‘এটা মোটেই মস্ত কোনো ব্যাপার না। সেই ক্ষেত্রে আপনার নালিশ করার কোনো ভিত্তি নেই। অত্যন্ত গুরুত্বহীন বিষয়ের মধ্যেও এটা সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কেস এর-গুরুত্ব নির্ভর করে না তার সঙ্গে কতটা কাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে তার ওপর। আপনি আমাদের কর্তৃপক্ষকে কিছুই বোঝেন নি যদি এরকম বিশ্বাস করে থাকেন। কিন্তু কাজের বহরের প্রশ্নটা মাথায় রাখলেও আপনার কেসটা খুবই তুচ্ছ। ছোটোখাটো বিষয় ও তথাকথিত ভুলভ্রান্তি ছাড়া বিষয়গুলিই আমি বোঝাতে চাইছি। তাছাড়া আপনার কেস-এর ব্যাপারে আসল কাজ কতটা করতে হয়েছে সে বিষয়েও আপনি একেবারে অজ্ঞ। এখন এ বিষয়ে আপনাকে কিছু বলব।

বেশ, কিছুদিনের মধ্যে সরডিনি আমাকে তার হিসেব থেকে বাদ দিল, কিন্তু কেরানিরা এসে হাজির হলো আর তারপর এলাকার কেউ বিষ্টুদের নিয়ে হেরনহফ এ তদন্ত শুরু হয়ে গেল। অধিকাংশই আমার পক্ষে রইল। কয়েকজন শুধু সরে রইল জমির আমিন সংক্রান্ত ব্যাপারের একটা আগ্রহ তো আছেই চাষিদের কাছে-গোপন ষড়যন্ত্রের গন্ধ, অন্যায় অবিচার এই আরকি। তারা নেতাও খাড়া করল, তারপর তারা সরডিনিকেও আশ্বস্ত করে বুঝতে বাধ্য করলো। যদি আমি টাউন হলো-এ আমিন বিষয়ক প্রশ্নটা রাখতাম তাহলে তারা সকলে আমিনকে আহ্বান করার বিষয়ে সম্মিলিত আপত্তি তুলত না। তাই সাধারণ একটা বিষয়, যেমন ধরুন, ‘আমিন টামিনের কোনো প্রয়োজন নেই,’ এই তুচ্ছ বিষয়টাই একটা বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত। ব্রুনসউইক নামে একটা লোক তো এক্ষেত্রে নিজেকে বিশেষ একটা মাতব্বর বানিয়ে ফেলল, আপনি অবশ্য তাকে চেনেন না। লেকাটা খারাপ নাও হতে পারে, শুধু বোকা আর কল্পনাপ্রবণ, ল্যাসম্যান-এর জামাই,’ ‘ও, সেই মাস্টার ট্যানার?’ বড়ো মুচি?’ জিজ্ঞাসা করল কে। সে ল্যাসম্যান-এর বাড়িতে দেখা মস্ত দাড়িওয়ালা লোকটার বর্ণনা দেয়।

‘হ্যাঁ, সেই লোকটাই।’

‘আমি লোকটার বউকেও চিনি।’ বলে কে একটু আলগাভাবে। ‘তা সম্ভব,’ বলল প্রধান, সংক্ষেপে।

‘মেয়েটা খুব সুন্দর।’ বলে কে, ‘কিন্তু একটু ফ্যাকাশে আর অসুস্থ ধরনের। ও নিশ্চয়ই দুর্গ থেকে এসেছে?’ এটা একটা অর্ধেক প্রশ্ন। মোড়ল কে-র দিকে তাকায়, চামচে খানিকটা ওষুধ ঢালে ও ব্যস্ততার সঙ্গে গেলে।

‘দুর্গে খালি দণ্ডরের দিকটাই আপনি চেনেন বুঝি?’

কে স্থলভাবে প্রশ্ন করে। ‘ঠিক তাই’ বলে গ্রামপ্রধান এক ধরনের বিদ্রূপ অথচ কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত হাসি থেমে, ‘আর সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবার ব্রুনসউইক এর কথায় আসা যাক। ওকে যদি আমরা সভা থেকে বাদ দিতে পারতাম তাহলে প্রায় সকলেই খুশি হতাম, ল্যাসম্যানও কম না। কিন্তু সেই সময় ব্রুনসউইক কিছুটা প্রভাব সঞ্চয় করে ফেলেছিল। ও অবশ্য খুব ভালো বক্তা না, কিন্তু চোঁচাতে পারে ভালো আর

তাতেও কাজ কম হয় না। এবং ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে আমি গ্রামীণ সভার কাছে বিষয়টা পেশ করতে বাধ্য হলাম। এতেই ব্রুনসউইকের তৎক্ষণিক সাফল্য এল কারণ বলা বাহুল্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা আমিন নিযুক্তি বিষয়ে কোনো আলোচনাই প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেটাও অনেক আগের ব্যাপার অবশ্য।

কিন্তু কখনোই বিষয়টা খিতিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি, অংশত সরডিণির বিবেকবোধের কারণে, যে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে নানা তথ্য একত্র করে বিরুদ্ধপক্ষের মতোই সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের পিছনের আসল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করছিল, আর অংশত ব্রুনসউইকের নির্বুদ্ধিতা ও তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে। কর্তৃপক্ষের অনেকের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। তাদের সে কাজে লাগালো নানা কাল্পনিক ক্রুটি বিষয়ক তদন্তে। সরডিণি অবশ্য কোনোভাবেই ব্রুনসউইকের দ্বারা নিজেকে প্রবঞ্চিত হতে দিল না-ব্রুনসউইকের মতো লোক সরডিণিকে আর ঠকাবে কিভাবে-কিন্তু ব্রুনসউইকের দ্বারা বঞ্চিত না হতে হলে তার আরো তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। আর সেটা শেষ হবার অনেক আগেই ব্রুনসউইক নতুন একটা অজুহাত খুঁজে বার করল। লোকটার ক্ষমতা বহুমুখী। কোনো সন্দেহ নেই তাতে, তার নির্বুদ্ধিতা সত্ত্বেও। এবার আমি আসছি আমাদের শাসনযন্ত্রের একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আলোচনায়। এ শুধু যথার্থ নয়, অতি মাত্রায় সংবেদনশীল।

কোনো ঘটনা যদি দীর্ঘকাল ধরে বুলে থাকে তখন, বিষয়টা পুরোপুরি বিবেচিত হবার আগেই, হঠাৎ কোনো অজানা জায়গা থেকে আকস্মিক সিদ্ধান্ত সমস্ত কেসেরই সমাধান করে দেয় ন্যায়সঙ্গতভাবে, আর চূড়ান্তভাবে, ব্যাপারটা এমন যেন শাসনযন্ত্রটি নিজেই বছরব্যাপী একই বিষয় নিয়ে তুচ্ছ বাকবিত্তভার লড়াইয়ের দীর্ঘ উৎকণ্ঠা আর সহ্য করতে না পেরে নিজেই কোনো সিদ্ধান্তে স্থিত হয়। কোনো অধিকারিকের সহায়তা ছাড়াই। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে অলৌকিক কিছু নেই। নিশ্চিতভাবে কোনো কেরানির মাথাতেই সমাধানটা কিংবা অলিখিত কোনো সিদ্ধান্ত এসেছি, সে যাই হোক, আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি অন্তত এখানে নয়, প্রধান দপ্তরও খুঁজে বার করতে পারিনি কোন কেরানি বিশেষ করে এই কেসটাতে, সিদ্ধান্ত নিল আর কিসের ভিত্তিতে। কার্যালয় অনেক পরে জানতে পারে, কিন্তু আমরা আর কখনোই জানতে পারব না। এছাড়া এত পরে কারো জানার কৌতূহল থাকারও কথা না।

আবার, আমি যা বলছিলাম, এই অজানা সূত্র থেকে আসা সিদ্ধান্তগুলো সাধারণত অপূর্ব। এসবের একমাত্র বিরক্তিকর দিকটি হলো এই যে লোকে জানতে পারে অনেক দেরিতে আর ইতিমধ্যে গভীর আবেগের সঙ্গে অর্থহীনভাবে প্রচার করে চলে সেইসব বিষয় যা অনেক আগেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এখন, আপনার কেসটাতে এরকম কোনো সিদ্ধান্ত এসেছিল কিনা আমার জানা নেই-কোনো কোনো লোক বলে হ্যাঁ, কেউ না—কিন্তু এরকম যদি কিছু ঘটত তাহলে আপনাকে ডাক পাঠানো হতো। অনেক পথ অতিক্রম করে আপনাকে এখানে এসে পৌঁছতে হতো। আরো সময় কেটে যেত আর সরডিণি পুরো সময়টা এখানে বসে কাজ করে চলত একই বিষয়ে যতক্ষণ সে ক্লাান্তিতে ঝিমিয়ে না পড়ে। ব্রুনসউইক এই সময়ে পঁচাত্তর করে চলত আর আমাকে এই দুজনের

স্বামেলা সামলাতে হতো। এসব আমি সম্ভাবনার কথা ইঙ্গিত করলাম মাত্র। এবার আমি যেটা তথ্য হিসাবে জানি সেটা বলি।

ইতিমধ্যে এক কেন্দ্রীয় আধিকারিক আবিষ্কার করেছেন যে ‘ক’ দপ্তর থেকে নাগরিক সভায় কোনো কানুনগো বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে, এ বিষয়ে তখন পর্যন্ত কোনো উত্তর না পাওয়ায়। আমার কাছেও কিছু নতুন প্রশ্ন পাঠানো হয়েছে আর এখন পুরো ব্যাপারটারই জট একেবারে খুলে গেছে। ‘ক’ দপ্তর আমার এই জবাবে খুশি যে কোনো জমির আমিনের প্রয়োজন নেই আর সরডিনিকেও মেনে নিতে হয়েছে যে এই কেসে সে কোনো যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেনি এবং সত্যি সত্যিই কিছু না জেনে খামোকেই পাগলের মতো অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছে। চতুর্দিক থেকে যদি আবার অজস্র নানা কাজ তাড়া করে না আসত, আর আপনার বিষয়টা যদি খুব খুব গুরুত্বহীন না হতো-প্রায় বলঅ যায় গুরুত্বহীনের মধ্যেও সবচেয়ে কম গুরুত্বহীন-আমরা সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচতাম। আমার তো মনে হয়, সরডিনি নিজেও। একমাত্র ব্রনসউইক গজরাতে রাগে, কিন্তু সেটা তো হাস্যকর। আর এখন নিজেই একবার কল্পনা করুন আমিন মশাই, আমার কী বিপুল সময়ই না ব্যয় হয়েছে এর জন্য, তখন আপনি হঠাৎ এসে হাজির হলেন। যার মানে হচ্ছে পুরো ঘটনাটা আবার আরম্ভ থেকে আরম্ভ হবে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আমি তা আবার কিছুতেই হবে দেব না।’

‘নিশ্চয়ই বলল কে, ‘কিন্তু আমি ভালোভাবেই বুঝতে পারছি আমার কেসটার আর সম্ভবত আইনেরও চূড়ান্ত অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আমার নিজের দিক থেকে আমি ঠিকই জেনে নেব কি করে এ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়।’

‘কিভাবে তা করবেন?’ জিজ্ঞাসা করে মোড়ল।

‘আমার পক্ষে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়’ বলে কে।

‘আমি আপনাকে চাপ দিতে চাই না।’ বলে মোড়ল।

‘শুধু আপনাকে ভাবতে বলি যে আমার মধ্যে আপনি একজন -না বন্ধু বলব না কারণ আসলে তো আমরা দুজন সম্পূর্ণ অপরিচিতই -না বন্ধু না, কিছু পরিমাণে একদম ব্যবহারিক বন্ধুকে খুঁজে পাবেন। আপনাকে কানুনগো হিসাবে মেনে নিতেই আমার আপত্তি, এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে আপনি আমার উপর নির্ভর করতে পারেন, আমার যতটা শক্তি অন্তত তার উপর, যদিও তা খুব বেশি না।’

‘আপনি শুধু একটা কথাই বলে চলেছেন,’ বলে কে, ‘যে আমাকে আমিন হিসাবে মেনে নেওয়া হবে না। কিন্তু আমি ইতিমধ্যেই আমিনের পদ পেয়ে গেছি,’ এই যে ক্ল্যামের চিঠি।

‘ক্ল্যামের চিঠি,’ বলল মোড়ল, ‘এ খুবই মূল্যবান ও সম্মানের যোগ্য। শুধু এতে তাঁর স্বাক্ষর আছে বলেই, আসল স্বাক্ষর বলেই তো মনে হচ্ছে, কিন্তু তা হলেও-না আমি আর এ বিষয়ে আমার এলোমেলো কথা চালিয়ে যেতে চাই না।’ সে মিজ্জিকে ডাকে ও তারপর: ‘কিন্তু তুমি করছটা কী?’

মিজ্জি ও তার সহকারীরা, এতক্ষণ তাদের কেউ লক্ষ্যই করেনি, স্পষ্টতই তাদের অনিষ্ট কাগজ খুঁজে পায়নি। এরপর তারা সব ক্যাবিনেটে ঢোকাবার চেষ্টা করে কিন্তু

সবাই এলোমেলো হয়ে যাওয়ার ও বিপুল কাগজের বোঝার জন্য তাতে সকল হয় না। এরপর সহকারীদের মাথায় একটা বুদ্ধি আসে ও তারা সেটাকেই অনুবাদ করতে যাচ্ছিল বাস্তবে। তারা ক্যাবিনেটটাকে মেঝেতে চিৎ করে শোয়ায়, তার ভেতর নথিপত্র ঠেসে ঢোকায়, মিঞ্জি সঙ্গে নিজেরা ক্যাবিনেটের দরজার উপর চেপে বসে। এই মুহূর্তে তারা দরজা বন্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছিল।

‘তাহলে কাগজটা পাওয়া গেল না’ বলল মোড়ল। ‘দুঃখের কথা, তবে গল্পটা তো জানলেনই, এখন তার কাগজের দরকার কী, তাছাড়া কখনো না কখনো ওটা তো পাওয়া যাবেই, বোধহয় শিক্ষকের বাড়িতে রয়ে গেছে, ওর বাড়িতেও তো কাগজের স্তূপ কম জমে নেই। মিঞ্জি এখানে একবার এসো তো মোমবাতিটা নিয়ে আর আমাকে এই চিঠিটা পড়ে শোনাও দেখি।’

মিঞ্জি তার কাছে গেল। তাকে আরো বয়স্ক ও গুরুত্বহীন মনে হচ্ছিল যখন বিছানার প্রান্তে বসে দৃঢ় শক্তিশালী লোকটির গায়ে হেলান দেয়। সে তাকে হাত দেয় বেঁট করে। মোমের আলোয় তার মুখের কর্কশতা কিছুটা চাপা পড়লেও কঠিন বলিরেখা নরম হলো না। চিঠির ওপর দৃষ্টিপাত মাত্র করে সে বলে হালকাভাবে চাপড় দিয়ে বলে উঠল।

‘ক্ল্যামের থেকে।’ এরপর তারা দুজন একসঙ্গে চিঠিটা পড়ে, এক মুহূর্ত কি একটা ফিসফিস করে বলাবলি করে আর অবশেষে যখন সহকারীরা চেষ্টায়ে ওঠে, ‘হররে’ বলে কারণ তারা অবশেষে ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ করতে পেরেছে, এর ফলে মিঞ্জি তাদের দিকে কৃতজ্ঞ চোখে তাকায়, গ্রামপ্রধান বলল, ‘মিঞ্জিও আমার সঙ্গে একমত যে এখন আমি কী ভাবছি এটা খোলসা করে বলা যেতে পারে। এই চিঠিটা কোনো অর্থেই সরকারি চিঠি নয়। ব্যক্তিগত একটা চিঠিমাত্র। স্পষ্টই এটা বোঝা যাচ্ছে সম্বোধনের ধরনটা দেখে।

‘প্রিয় মান্যবরেষু।’ এছাড়া পুরো চিঠিটাতে কোথাও একটা শব্দ নেই যাতে মনে হতে পারে আপনাকে কানুনগো পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। বরং উল্টোভাবে এখানে সাধারণ কাজের নানা বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে ও তাতেও কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন আপনাকে নেওয়া হলো কিনা সেটা আপনাকেই প্রমাণ করতে হবে। অবশেষে, আপনাকে সরকারিভাবে দ্রুত পাঠানো হয়েছে আমার কাছে, গ্রামপ্রধানের কাছে, আপনার নিকটতম উর্দ্ধতন, আরো তথ্য সংগ্রহের জন্য, ইতিমধ্যেই যার অধিকাংশ আপনাকে সরবরাহ করা হয়ে গেছে। সরকারি চিঠির ধরনের সঙ্গে যার পরিচয় আছে ও যে বেসরকারি চিঠিও কী ভাবে পড়তে হয় জানে তার কাছে এর চেয়ে সহজ আর কিছুই নেই। আপনি, একজন আগন্তুক মাত্র, যে এটা জানেন না তাতে অবশ্য আমি অবাক হচ্ছি না। সাধারণভাবে চিঠিটা এর চেয়ে বেশি কিছুই বোঝায় না যে সরকারি কাজে যদি আপনাকে গ্রহণ করা হয় তাহলে ক্ল্যাম আপনার ব্যাপারে ব্যক্তি উৎসাহ দেখাতে ইচ্ছুক।’

‘মোড়লমশাই’ বলল কে, ‘আপনি চিঠিটার ব্যাখ্যা এমন চমৎকারভাবে দিলেন যে সাদা কাগজে শুধু সইটুকু ছাড়া আর কিছুই রইল না। আপনি কি বুঝলেন না এরকম

করে আপনি ক্ল্যামের নামের অমর্যাদা করলেন। অথচ তাকে শ্রদ্ধা করার ভান করেন আপনি।’

‘আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন।’ বলল মোড়ল, ‘আমি চিঠির অর্থ মোটেই বিকৃত করিনি, বরং ঠিক তার উল্টো। সরকারি কোনো চিঠির চেয়ে ক্ল্যামের ব্যক্তিক গত চিঠির তাৎপর্য স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি, কিন্তু এর তাৎপর্য ঠিক সেরকম নয় আপনি নয় আপনি যেমনটা ভাবছেন।

‘আপনি স্কোয়ারজারকে চেনেন?’

জিজ্ঞাসা করল কে, ‘না’ উত্তর দিন মোড়ল। বোধহয় তুমি তাকে চেনো মিজ্জি? তুমিও তাকে চেননা বলছ? না আমরা ওকে চিনি না মশাই।’

‘খুবই অদ্ভুত কথা’ কে বলল।

‘সহকারী দুর্গাধ্যক্ষের ছেলে সে।’

‘প্রিয় আমিন মশাই’ উত্তর দিল মোড়ল, ‘আপনি কী করে আশা করেন যত সহ দুর্গাধ্যক্ষ আছে তাদের সমস্ত ছেলেদের আমি চিনব?’

‘ঠিক কথা,’ বলল কে, ‘সেক্ষেত্রে আপনাকে আমার কথা মেনে নিতে হবে যে সে ওরকমই একজন। আমার এখানে আসার প্রথম দিনেই স্কোয়ারজার এর সঙ্গে তুমুল বচসা হয়। তখন সে ফ্রিজ নামে এক সহ দুর্গাধ্যক্ষের কাছে টেলিফোনে খবর নেয় ও এই তথ্য জানতে পারে যে আমাকে আমিন হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। এমন এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন মোড়ল মশাই?’

‘খুব সহজভাবেই,’ বলল মোড়ল। ‘এখন পর্যন্ত আপনি একবারও আমাদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করতে পারেননি। আপনি যাকে যোগাযোগ বলছেন তা সম্পূর্ণ কাল্পনিক কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ায় তাকেই আপনি আসল বলে মনে করেছেন। আর টেলিফোনের বিষয়টা? আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যদিও আমাকে প্রচুর যোগাযোগ করতে হয় তবুও আমার এখানে কোনো টেলিফোন নেই। সরাইখানা বা ঐ সমস্ত জায়গায় টেলিফোন কোনো কাজেটাজে লাগতে পারে যেমন বাজনা শোনার যন্ত্রের স্লটে পেনি ঢোকাতে হয়।

কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। আপনি এখানে কখনো টেলিফোন করেছেন? হ্যাঁ? বেশ তাহলে আপনি হয়তো আমার কথাটা বুঝতে পারবেন। দুর্গের ভিতর অবশ্য টেলিফোন ভালোভাবে কাজ করে, শুনেছি ওখানে সবসময়ই ওর ব্যবহার হয়। সঙ্গতভাবেই কাজের গতিও সেকারণে ওখানে অনেক দ্রুত হয়। আমাদের এখানে সেখানকার টেলিফোনের ব্যবহার এসে পৌঁছেয় সুর ও সংগীতের রূপে, আপনি নিজেও বোধহয় তা শুনেছেন। এখন এই যে সুরেলা আওয়াজ ও গান আমাদের দূরভাষে বাহিত হয় তাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য জিনিস যা আপনি শোনেন। বাকি সমস্তটাই ছলনাময়। দুর্গের সঙ্গে বাস্তবিক কোনো নির্দিষ্ট সংযোগ নেই। আসল কোনো এক্সচেঞ্জ নেই যা আমাদের কল সেখানে পৌঁছে দিতে পারে। এখন থেকে যখন কেউ দুর্গে ফোন করে তখন সমস্ত অপ্রধান দপ্তরগুলোতে যন্ত্রগুলো একসঙ্গে বেজে ওঠে।

কিংবা বলা ভালো সমস্ত দপ্তরেই বেজে উঠা উচিত। আমি এটা ভালোভাবে জেনেই বলছি, যদি সমস্ত দপ্তর তাদের রিসিভার তুলে না রাখে। মাঝে মধ্যে কোনো

ক্লান্ত কর্মচারীর হয়ত একটু হাঁফ ছাড়বার ইচ্ছে হয় সন্ধ্যাবেলা বা রাতে। তখন সে রিসিভার ঝুলিয়ে রাখে। তখন আমার হয়ত কোনো উত্তর পাই কিন্তু তা শুধু বাস্তব ঠাট্টা ছাড়া আর কিছু না। তা বোঝাও খুব কঠিন নয়। আমি তো ভাবতেই পারি না এমনকী কেমন করে কোনো একজন আগন্তুকও মনে করতে পারে যে সে যখন সরডিনিকে ডাকছে তখন বাস্তবিক পক্ষে যে উত্তর দিচ্ছে সে সরডিনিই। সম্ভাবনা এই যে হয়ত উত্তরদাতা আসলে সম্পূর্ণ অন্য দণ্ডের কোনো এক নকলনবীশ কেয়ানি।

কিংবা হয়ত ঠিক উল্টোভাবে আকস্মিকভাবে এমন ঘটল যে কেউ ক্ষুদ্রে কেয়ানিকে ফোন করলে উত্তর দিল খোদ সরডিনি। তাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হলো ওপন থেকে কোনো শব্দ আসার আগেই টেলিফোন নামিয়ে সরে পড়া।

‘আমি জানতাম না ব্যাপারটা সত্যি এরকম।’ বলল কে, ‘এ সমস্ত আশ্চর্য ঘটনা জানা আমার তো সম্ভব ছিল না, কিন্তু আমিও টেলিফোনে কথাবার্তার ওপর খুব একটা বিশ্বাস স্থাপন করিনি আর আমি সবসময় জানতাম একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে ঠিক দুর্গের ভিতরে আসলে কি ঘটেছে তাই।’

‘না’ বলল মোড়ল, ‘কে-র শেষ শব্দটা আঁকড়ে ধরে, ‘এই টেলিফোন উত্তরগুলোর অর্থ রয়েছে’ না থাকবে কেন? দুর্গ থেকে কোনো কর্মচারী যে বার্তাই পাঠাক না কেন তা গুরুত্বহীনই বা হবে কেন? ক্র্যামের চিঠি প্রসঙ্গে আমি তো এই কথাই বলেছিলাম। ঐ সমস্ত কথার কোনো সরকারি তাৎপর্য নেই। ওতে যদি আপনি সরকারি তাৎপর্য বসাতে যান আপনার সর্বনাশ হবে। অন্য দিকে তাদের ব্যক্তিগত তাৎপর্য, বন্ধুত্বপূর্ণ বা শত্রুতাপূর্ণ যাই হোক না কেন, সরকারি কোনো চিঠি থেকে বেশি, বহুগুণ বেশি।’

‘ভালো,’ বলল কে, ‘তা যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে দুর্গে আমার প্রচুর ভালো বন্ধু থাকার কথা। অত দিন আগে ওই দণ্ডের আকস্মিক অনুপ্রেরণার কথা মনে রাখলে, যে একজন আমিনকে আনা দরকার-ভাবা যেতেই পারে তাদের আমার প্রতি বন্ধুত্বপরায়ণ হবারই কথা, কিন্তু ঘটনা পরস্পরায়, একটার পর আর একটা অঙ্ক দ্রুত ঘটে যাওয়ার পর শেষ পর্যন্ত এক মন্দ দিনে আমাকে লোভ দেখানো হচ্ছে।’

‘বিষয়টাকে আপনি যেভাবে দেখলেন তাতে কিছু পরিমাণে সত্য রয়েছে।’ বলল প্রধান, ‘আপনার এই ভাবনাটা যথার্থ যে দুর্গ যা বলে তাকে আক্ষরিক অর্থে নেওয়াটা ঠিক না। খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত এ ব্যাপারে, শুধু এখানেই নয়, আর দুর্গের বক্তব্য কোনো বিতর্কিত বিষয়ে যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তত বেশি সতর্কতার প্রয়োজন। কিন্তু আপনাকে প্রলুব্ধ করার ব্যাপারটা বলে যে ঠিক কী বোঝাতে চাইলেন তা আমার মাথায় আসছে না। আপনি যদি আমার ব্যাখ্যা মন দিয়ে অনুধাবন করে থাকেন তাহলে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে আপনাকে এখানে ডেকে আনার প্রশ্নটা এখানে স্থির করা কত কঠিন শুধু গল্প আলোচনার মাধ্যমে।’

‘তাহলে শেষ পর্যন্ত পড়ে রইল শুধু এই উপসংহার যে,’ বলল কে, ‘এখানে সবকিছুই অনিশ্চিত ও সমাধানের অতীত, আমাকে বিভ্রান্তির ব্যাপারটা শুদ্ধ।’

‘আপনাকে তাড়ানোর ঝুঁকিটা নেবে কে আমিন মশাই? জিজ্ঞাসা করে মোড়ল। ‘আপনাকে ডেকে আনার বিষয়ে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে তাই-ই নিশ্চয়তা দিচ্ছে

মানবতার প্রতি সকলের গভীর সৌজন্যমূলক ব্যবহারের। আপনি নিজেই শুধু নানাভাবে
ঝিয়ে দিচ্ছেন এ বিষয়ে আপনি অকারণে কত বেশি সংবেদনশীল। আপনাকে কেউ
এখানে আটকে রাখেনি কিন্তু তার অর্থ নিশ্চয়ই এই না যে আপনাকে তাড়াতে সকলে
ঠে পড়ে লেগেছে।’

‘ওঃ,’ প্রধান মশাই,’ বলল কে, ‘আপনি আবার বিষয়টাকে অত্যন্ত লঘু করে
ফেলছেন। আপনার সুবিধার জন্য আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই আপনাকে বোঝাতে
নি কারণে আমি এখানে পড়ে আছি। বাড়ি ছেড়ে আসতে আমাকে যে আত্মত্যাগ
করতে হয়েছে, দীর্ঘ ক্লান্তিকর পথশ্রম যা আমাকে সহ্য করতে হয়েছে, আমার এখানে
রাজ্য পাবার যে যুক্তিযুক্ত আশায় যেভাবে আমি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলাম, চূড়ান্ত অসচ্ছল
বাবস্থা, এর পরে আমার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে কোনো কর্মসংস্কারের সুদূরতম
দৃষ্টাব্যবহারের অভাব এবং শেষ কিন্তু কোনো অর্থেই লঘুতম নয় আমার প্রেমিকা, যে
এখানেই বাস করে।’

‘ওঃ ফ্রিডা,’ বলল প্রধান কোনো বিস্ময় না দেখিয়ে, ‘আমি জানি। কিন্তু ফ্রিডা তো
আপনাকে সব জায়গাতেই অনুসরণ করবে। আর বাকি যা সব আপনি আমাকে বললেন
না নিয়ে ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন রয়েছে। আমি দুর্গের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করব।
কোনো সিদ্ধান্ত যদি আসে কিংবা আপনাকে প্রশ্ন করার যদি প্রয়োজন হয় আমি
আপনাকে ডেকে পাঠাব। ব্যবস্থাটা আপনার মনমতো হলো তো?’

‘না, একদম না।’ বলল কে, ‘দুর্গ থেকে আমি চাই আমার অধিকার, কোনো রকম
মানুকূল্য না।’

‘মিজ্জি,’ মোড়ল বলল তার বউকে, যে তখনও তার ওপর চেপে বসেছিল ও যেন
দীর্ঘশ্বাসে মগ্ন হয়ে ক্ল্যামের চিঠিটা হাতে নিয়ে খেলা করছিল ও একটা নৌকাই বানিয়ে
ফলল কাগজটা ভাঁজ করে। কে সম্ভ্রান্ত হয়ে সেটা ছিনিয়ে নেয় ‘মিজ্জি, আমার পয়ে
আবার ব্যথাটা চাগাড় দিয়েছে, পুলটিসটা আবার শুরু করতে হবে।’

কে উঠে দাঁড়াল, ‘তাহলে এবার বিদায় নিচ্ছি,’ সে বলল। ‘হুম,’ বলল মিজ্জি-।
সে আর একটা পুলটিস তৈরি করছিল।

‘আগেরটা বড্ড আঁট করে বাঁধা হয়েছিল।’ কে পিছনে ফিরল। তার শেষ কথা
শোনা মাত্রই সহকারীরা স্বভাবসিদ্ধ অতিরিক্ত উৎসাহে কাজে লাগবার ব্যগ্রতায় দরজার
টুটো পাল্লা হাট করে খুলে দিল। বাইরে থেকে ছুটে আসা ঠান্ডা বায়ুপ্রবাহ থেকে অসুস্থ
লাকটাকে রক্ষা করতে কে-কে অত্যন্ত সংক্ষেপে মোড়লকে অভিবাদন করে সম্ভ্রান্ত
থাকতে হলো। এরপর সম্মুখবর্তী সহকারীদের ঠেলতে ঠেলতে সে ঘর থেকে দ্রুত
নিষ্ক্রান্ত হয় ও দরজার পাল্লা টেনে দেয়।

৬

গারাইখানার সামনে মালিক তার জন্য অপেক্ষা করছিল। তাকে প্রশ্ন না করলে সে
কোনো কথা বলবে না এটা অনুমান করে কে জিজ্ঞাসা করল সে কী চায়। ‘আপনি
আমার নতুন কোনো জায়গা খুঁজে পেয়েছেন কি?’ প্রশ্ন করল সরাই মালিক, মাটির
পেঁচকে তাকিয়ে।

‘তোমরা বউ বুঝি এটা জিজ্ঞাসা করতে বলেছে?’ বলে কে, ‘তোমাকে দেখছি বউ-ই-চালায়।’ ‘না’ বলল সরাইওয়াল। ‘আমি আমার স্ত্রীর কারণে জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু এটাও ঠিক ও আপনাকে নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ও অসুখী। ও কাজ করতে পারছে না, বিছানায় শুয়ে আছে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে আর সব সময় নানা অনুযোগ করছে।’

‘আমি কি ভিতরে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করব?’ জিজ্ঞাসা করে কে।

‘তা করলে খুব ভালো হয়,’ বলল মালিক।

‘এর মধ্যেই আমি গ্রামপ্রধানের বাড়িতে গিয়েছিলাম আপনাকে ডেকে আনতে। এখানে আমি দরজায় কান ঠেকিয়েও ছিলাম কিন্তু শুনলাম আপনি ওনার সঙ্গে কথা বলছেন। আমি আর আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি, এছাড়া স্ত্রীকে নিয়ে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম, তাই ছুটে ফিরে আসি। কিন্তু দেখলাম ও আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় না, আর তাই এখানে দাঁড়িয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কী করব?’

‘তাহলে চল এখনি যাই,’ বলল কে, ‘আমি ওকে সহজেই শান্ত কবে দেব।’

‘দেখুন যদি করতে পারেন,’ বলে মালিক।

তারা উজ্জ্বল আলোকিত রান্নাঘর দিয়ে চলতে থাকে। সেখানে তিনি চারটি পরিচারিকা, ভিন্ন ভিন্ন কোণে সেই মুহূর্তে কাজে ব্যস্ত। কে-কে দেখে স্পষ্টতই তারা শক্ত হয়ে গেল। রান্নাঘর থেকেই কতীর দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যাচ্ছিল। রান্নাঘর সংলগ্ন একটা জানলাহীন ঘরে সে শুয়ে। তার ঘর ও রান্নাঘরের মধ্যে একটা কাঠের বিভাজন রয়েছে। একটা মস্ত পারিবারিক বিছানা আর একটা সিন্দুকেই ঘরটা পূর্ণ হয়ে গেছে। বিছানাটা এমনভাবে পাতা হয়েছে যে এখান থেকে কেউ পুরো রান্নাঘরটা দেখতে পারে ও প্রায় কিছুই দেখা যায় না। ঘরটা প্রায় অন্ধকার, শুধু গোলাপি বেডকভারের হাক্কা একটা আভা চোখে পড়ে মাত্র। ঘরে ঢুকে অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হয়ে এলে তবেই কেউ ভিতরের বিশেষ কোনো কিছু দেখতে পায়।

‘শেষ পর্যন্ত তাহলে আপনি এলেন।’ বলে গৃহকর্ত্রী। দুর্বলভাবে শুয়ে ছিল সে চিং হয়ে। দেখাই যাচ্ছিল শ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছে, পালকের লেপ ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। পোষাকি চেহারার চেয়ে বিছানায় তাকে কমবয়স্ক মনে হচ্ছিল। কিন্তু লেসের কাজ করা তার মুখের তুলনায় যথেষ্ট ছোটো একটা রাতটুপি পরে থাকায় তার মুখ ছোটো হয়ে গিয়ে খুব করুণ মনে হচ্ছিল। ‘আমি আসব কেন,’ বলল কে মৃদুভাবে, ‘আপনি তো আর আমাকে ডেকে পাঠাননি।’

‘আমাকে এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখাটা আপনার উচিত কাজ হয়নি।’ বলে বাড়িওয়ালী পঙ্গু মানুষের মতো খেয়ালিপনা নিয়ে, ‘বসুন’ সে বলল, বিছানা দেখিয়ে।

‘আর তোমরা এখান থেকে যাও।’ ইতিমধ্যে পরিচারিকা ও সহকারীরা ঘরে ভিড় জমিয়েছিল। ‘আমিও যাচ্ছি গারডেনা,’ বলল সরাইওয়াল। এই প্রথম কে তার নাম উচ্চারিত হতে শুনল।

‘নিশ্চয়ই’ বলে গৃহকর্ত্রী ধীরে, যেন অন্য চিন্তায় মগ্ন। একইভাবে অন্যমনস্কভাবে সে যোগ করে, ‘অন্যদের বাদ দিয়ে শুধু তুমি থাকবেই বা কেন?’

কিন্তু যখন সকলে রান্নাঘরে ফিরে যায়, সহকারীরা পর্যন্ত সরে পড়ে, তাদের পেছনে একটা ঝি যায়, গারডেনা সতর্ক হয়ে ওঠে। তার মাধ্যম ঢুকল যে তার সমস্ত

কথাই তাদের জায়গা থেকে শোনা যাবে। কারণ সংলগ্ন এই ঘরটাতে কোনো দরজা নেই, তাই সে সকলকে রান্নাঘর থেকেও সরে যেতে বলে। সঙ্গে সঙ্গে তার আদেশ পালিত হলো।

‘আমিন মশাই,’ বলল গারডেনা, ‘সিন্দুকের পাশে একটা আলোয়ান রয়েছে, দয়াকরে ওটা আমাকে এনে দেবেন, শরীরে বিছিয়ে নেব। এই পারকের লেপ আমার সহ্য হয় না, আমার শ্বাসের গভগোল আছে।’ এবং কে যখন তার হাতে আলোয়ানটা সাধারণ বলেই মনে হলো।

তবু ভদ্রতাবশত সে এর উপর আঙুল বোলায় কিন্তু উত্তর দেয় না। ‘হ্যাঁ, আলোয়ানটা দারুণ।’ বলে গারডেনা নিজেকে আচ্ছাদিত করে। এবার সে গুয়ে পড়ে আরামে। মনে হরো তার সব ব্যথা ট্যাথা অদৃশ্য হয়েছে। মনে হলো গুয়ে থাকার ফলে তার কেশরাশি যে অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে এটা মনে করার মতো যথেষ্ট শক্তিও তার রয়েছে। সে নিজেকে উঠে বসায় ও রাতটুপির পার্শ্ববর্তী কেশ গুলি বিন্যাস করে। চুলও একমাথা।

কে অর্ধৈর্ধ্য হয়ে আরম্ভ করে। ‘আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন আমি অন্য কোনো থাকবার জায়গা যোগাড় করে উঠতে পেরেছি কিনা?’ ‘আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছি?’ বলে গৃহকর্ত্রী, ‘না আপনার ভুল হয়েছে।’ ‘আপনার স্বামীই কয়েক মিনিট আগে জিজ্ঞাসা করেছে।’ তা হতে পারে’ বলল গৃহকর্ত্রী, ‘ওর সঙ্গে আমার মতের কোনো মিল নেই। আমি যখন চাইনি তখন ও আপনাকে এখানে ঠাঁই দিল, আর এখন যখন আপনাকে এখানে পেয়ে আমি খুশি ও আপনাকে তাড়াতে চায়। চিরটাকাল ও এক রকম রইলো।’ ‘আমার ব্যাপারে আপনার মতো এতটাই তাহলে বদলে গেছে?’ জিজ্ঞাসা করল কে, ‘ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই?’ ‘আমি আমার মতো বদলাইনি।’ বলল গৃহকর্ত্রী আবার খোলাখুলি ভাবে, ‘আপনার হাতটা আমার দিল, এইসে, আমার প্রতিজ্ঞা করুন, আমাকে সরলভাবে সব বলবেন। তাহলে আমি তাই করব।’ ‘ঠিক আছে,’ বলল কে, ‘কিন্তু কে প্রথমে শুরু করবে?’ ‘আমি করব,’ বলল গৃহকর্ত্রী, ‘তাহলে দেখে মনে হলো না কে-র সঙ্গে তার সম্পর্কটা সে মধ্য পথেই ছিঁড়ে দিতে চায়।’

বালিশের নিচ থেকে সে একটা ফটোগ্রাফ বার করে। ‘এই ছবিটার দিকে একবার দেখুন।’ সে উদগ্রীবভাবে বলল।

ছবিটা ভালো করে দেখতে কে রান্নাঘরে পা রাখে কিন্তু সেখানেও ফটোটাতে কিছু ভালো চেনা গেল না। কারণ ছবিটা পুরনো হয়ে গিয়ে ঝাপসা হয়ে এসেছে, কোনো কোনো জায়গায় ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। দলামোচড়া নোংরা আকৃতি সেটার, ‘এর অবস্থাটা খুব সুবিধের না।’ বলল কে।

‘দুর্ভাগ্যের কথা, না,’ বলল গৃহকর্ত্রী, ‘কেউ যদি কোনো জিনিস বহু বছর বয়ে বেড়ায় তার অবস্থা তো ওরকমই হবে। কিন্তু আপনি যদি ওটা মন দিয়ে দেখেন আপনি খুব বুঝতে পারবেন, বিশ্বাস করুন। ওই পোট্রেট বিষয়ে কেউ কিছু বললে আমার শুনতে খুব ভালো লাগে। কি দেখলেন?’

‘একটি তরুণ মনে হচ্ছে।’ বলে কে।

‘ঠিক,’ বলে গৃহকর্ত্রী।

‘ও নী করছে?’

‘আমার মনে হয় কোনো তক্তার উপর হাত পা ছড়িয়ে হাই ভুলেছে।’ এখানে গৃহকর্ত্রীটি হেসে ফেলে।

‘একদম ভুল,’ বলল সে ‘কিন্তু এই যে দেখা যাচ্ছে তক্তাটা আর এই তো দেখা যাচ্ছে সে শুয়ে আছে।’ কে জেদির মতো বলল।

‘আরো একটু ভালো করে দেখুন’ একটু বিরক্তভাবে গৃহকর্ত্রী বলল, ‘ও কি সত্যিই শুয়ে আছে?’

‘না’ বলল কে এবার, ‘ও ভাসছে, এখন দেখতে পাচ্ছি ওটা কোনো তক্তাই না, খুব সম্ভবত একটা দড়ি আর তরুণটি একটা লম্বা লাফ দিচ্ছে।’

‘দেখলেন তো!’ গৃহকর্ত্রী বলল বিজয়িনীর মতো, ‘ও লাফাচ্ছে, ওই ভাবেই সরকারী বার্তাবহরা অনুশীলন করে। আমি জানতাম আপনি ঠিকই বিব্রত পাবেন। আচ্ছা এবার দেখুন তো ওর মুখটা চিনতে পারেন কিনা।’

মুখটা খুব আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছি।’ বলে কে, ‘স্পষ্টতই ও দারুণ কোনো কিছু চেষ্টা করছে, মুখটা হাঁ হয়ে গেছে, চোখ শক্ত করে বন্ধ করা আর চুল উড়ছে।’

‘দারুণ বলেছেন,’ বলল গৃহকর্ত্রী প্রশংসা করছে এমনভাবে, ‘ওকে যে কখনো দেখিনি সে কিছুতেই আপনি যা বললেন, তার বেশি বলতে পারবে না।’

কিন্তু ও ছিল অপূর্ব এক যুবক। মাত্র এক সেকেন্ডের জন্য আমি ওকে দেখেছিলাম। কিন্তু কখনো ভুলতে পারলাম না।’

‘তাহলে ও কে?’ জিজ্ঞাসা করল কে।

‘ও ছিল এক বার্তাবহ, ক্ল্যাম ওকে দিয়েই আমাকে তাঁর কাছে প্রথম ডেকে পাঠান।’ কে তার কথা ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছিল না। কারণ তার মনোযোগ ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল কাঁচের বনবন আওয়াজে। এই বিঘ্নের কারণ সে তখনই আবিষ্কার করল। তার সহকারীরা বাইরে উঠোনে দাড়িয়ে। বরফের ওপর একবার একপা তারপর অন্য পা তুলে লাফাচ্ছে। তাদের আচরণ এমন যেন তাকে আবার দেখতে পেয়ে তাদের ফুঁতির আর শেষ নেই।

আনন্দের চোটে তারা পরস্পরকে আঙুল তুলে দেখার আর রান্নাঘরের জানলার ওপর টেকা মেরে যায়। কে-র চোখে শাসানির দৃষ্টি দেখে তারা তখনি টোকা দেওয়া বন্ধ করে পরস্পরকে টেনে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একে অন্যের হাত ছাড়িয়ে নেয় ও দুজনেরই আবার জানালার কাছে আবির্ভাব ঘটে। কে সংলগ্ন ঘরের একদিকে সরে আসে যেখানে থেকে সহকারীরা তাকে দেখতে পাবে না আর তাকেও ওদের দেখতে হবে না। কিন্তু সেখানেও বহুক্ষণ ধরে মৃদু, যেন অনুনয়মূলক টোকা তাকে অনুসরণ করতে থাকে।

‘আবার আমার সঙ্গীরা,’ কে গৃহকর্ত্রীকে বলে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে ও বাইরে দেখায়। কিন্তু সে তার কথায় কান দেয় না। কে-র হাত থেকে পোট্রেটটা নিয়ে সে তা দেখে, হাত দিয়ে মসৃণ করার চেষ্টা করে ও আবার বালিশের নিচে ঢুকিয়ে দেয়।

মহিলার নড়াচড়া অনেক শ্রুত হয়ে এসেছে এখন কিন্তু তার ক্লান্তি কমেনি, স্মৃতিভারেই, তার ইচ্ছে ছিল কে-কে তার জীবনের গল্প বলার কিন্তু সেই গল্পের কথাই ভাবতে গিয়ে সে বলার কথা ভুলে যায়। সে তার আলোয়ানের ধারটা ধরে নড়াচড়া করছিল।

কয়েক মুহূর্ত কেটে যাবার পর সে মুখ তোলে। চোখের ওপর হাতচাপা দেয় ও বলে, 'এই আলোয়ানটা আমায় দিয়েছিলেন ক্ল্যাম, এই রাতটুপিটাও। তাঁর স্মৃতিস্বরূপ আমার কাছে পড়ে রয়েছে শুধু এই ছবিটা, আলোয়ান আর রাত টুপি। ফ্রিডার মতো আমি তরুণী নই। ওর মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার নেই, অভিমানীও নই, খোলাখুলি বলতে গেলে ও খুবই অভিমানী, কি করে জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয় আমার জানা, কিন্তু একটা কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে, এই তিনটে জিনিস না থাকলে আমি এখানে এতদিন টিকতে পারতাম না। বোধহয় জিনিসগুলো আপনার কাছে খুব তুচ্ছ মনে হচ্ছে?

কিন্তু আপনাকে বলি শুনুন, ফ্রিডা, যার সঙ্গে ক্ল্যামের বহুদিনের সম্পর্ক, ওঁর থেকে একটাও স্মরণীয় কিছু পায়নি। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছি। ও তো দারুণ কল্পনাপ্রবণ আর এছাড়া ওকে সন্তুষ্ট করাও প্রায় অসম্ভব। অন্যদিকে আমি, যদিও মাত্র তিনবার ক্ল্যামের সঙ্গ ছিলাম, পরে আর তিনি আমাকে কখনো যেতে বলেন নি, জানি না কেন, - তার থেকে তিন তিনটে জিনিস নিয়ে ফিরি, আমার তখনই কেমন একটা আশঙ্কা ছিল তাঁর কাছে আমার স্থায়িত্ব দীর্ঘ হবে না।

বলা বাহুল্য এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে। ক্ল্যাম নিজে থেকে কখনো কিছু দেয় না। কিন্তু কেউ কিছু তাঁর কাছে পড়ে থাকতে দেখে যদি পছন্দ করে ফেলে তাহলে তার থেকে তা আদায় করা যায়।

এই কাহিনী শুনতে কে-র অস্বস্তি হয়েছিল তার কৌতূহল জাগ্রত হলেও, 'এসব কত আগের ঘটনা।' সে জিজ্ঞাসা করল দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'কুড়ি বছরের ওপর হলো।' বলল গৃহকর্ত্রী, 'কুড়ি বছরের অনেক বেশিই হবে।'

'এত কাল ধরেও তাহলে কেউ ক্ল্যামের অনুরক্ত থাকতে পারে?' বলল কে, 'কিন্তু ম্যাডাম আপনি বুঝতে পারছেন কি এই ধরনের গল্প আমাকে কেমন ভয় পাইয়ে দিতে পারে আমার ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের কথা ভাবতে গেলে?'

গৃহকর্ত্রীর কাছে কে-র ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অযাচিত উত্থাপন অযৌক্তিক মনে হলো ও সে রাগী আড়চোখে তাকায়। 'রাগ করবেন না ম্যাডাম' বলে কে, 'ক্ল্যামের বিরুদ্ধে আমার কোনো অনুযোগ নেই। কিন্তু ঘটনাক্রমে ক্ল্যামের সঙ্গে আমার এক ধরনের সম্পর্ক হয়েছে বলা যায়, তার সবচেয়ে বড়ো ভক্তও এটা অস্বীকার করতে পারবে না। এর ফলে হয়েছে কি, ক্ল্যামের কথা উঠলেই আমি নিজের কথা ভাবতে বাধ্য হই। এটা বদলানো আমার সাধ্যতিরিক্ত।

এছাড়া ম্যাডাম,' এখানে কে তার অনিচ্ছুক হাত ধরে,' 'একবার চিন্তা করুন শুধু- আমাদের আলোচনা কত খারাপ দিকে মোড় নেয়। এবার আমি চাই যেন শান্তিতে আমরা পরস্পরকে বিদায় জানাতে পারি।'

‘ঠিকই বলেছেন,’ বলে গৃহকর্ত্রী মাথা ঝুঁকিয়ে ‘কিন্তু আমাকে ছাড়ান দিন, অন্য লোকেদের চেয়ে আমি বেশি স্পর্শকাতর নই। বরং উল্টোই। কিন্তু প্রত্যেকেরই একটা স্পর্শকাতর জায়গা থাকে, আর আমার কাছে এটা।’

‘দুর্ভাগ্যের কথা, আমার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।’ বলল কে, ‘কিন্তু আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতিশ্রুত। এবার আমায় বলুন তো ম্যাডাম, আমি বিবাহিত জীবন সহ্য করব কেমন করে এরকম সাংঘাতিক আনুগত্যের কথা মনে রেখে? ফ্রিডার মধ্যেও তাহলে বোধহয় ধরে নেওয়া যায় আপনার মতোই অতীতের প্রতি আনুগত্যবোধ রয়েছে।’

‘সাংঘাতিক আনুগত্য?’ পুনরুচ্চারণ করে গৃহকর্ত্রী গর্জন করে।

‘একি আনুগত্যের প্রশ্ন? আমি, আমার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত, কিন্তু ক্ল্যাম? কোনো একদিন ক্ল্যাম আমাকে রক্ষিতা হিসেবে পছন্দ করেছিলেন, এই সম্মান আমি কোনোদিন ভুলতে পারি? আর জিজ্ঞাসা করছেন ফ্রিডাকে সহ্য করবেন কি করে? আমিন মশাই, আপনি কে যে এরকম একটা প্রশ্ন করার সাহস আপনার হতে পারে।’

‘ম্যাডাম,’ কে সতর্ক করার ভঙ্গিতে বলে।

‘আমি জানি,’ বলে গৃহকর্ত্রী আত্মসংবরণ করে নিয়ে। ‘কিন্তু আমার স্বামী পর্যন্ত এ প্রশ্ন কখনো আমাকে করেনি। আমি জানি না কে বেশি অসুখী, তখনকার আমি নাকি এখন ফ্রিডা। ফ্রিডা, যে তেজ দেখিয়ে ক্ল্যামকে ত্যাগ করে এল, নাকি যাকে ক্ল্যাম নিজেই ডাকা বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু বোধ হয় ফ্রিডাই, যদিও মেয়েটা এখনও পুরোপুরি বুঝতে পারেনি তার অসুখ কত গভীর।

কিন্তু তখন সবচেয়ে বড়ো দুঃখ যে আমার মন সবসময় অধিকার করে রাখত, এখনও আমি তার থেকে মুক্ত হতে পারিনি। শুধু একটা প্রশ্ন, এরকম ঘটল কেন? তিনবার আমার ক্ল্যাম ডেকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু চতুর্থবার আর ডাকেননি। চতুর্থবার আর কখনো এল না। ওই দিনগুলোতে আমি আর কী-ই বা ভাবতে পারতাম। আমার স্বামীর সঙ্গে এ ছাড়া আলোচনার আর কী থাকতে পারত, যে স্বামীকে আমি সামান্য পরেই বিয়ে করি? দিনের বেলা আমাদের হাতে সময় থাকত না। তখন এই সরাইটা আমরা নিয়েছি অত্যন্ত জঘন্য অবস্থায় আর এটাকে ভদ্ররূপ দিতে প্রচণ্ড খাটতে হচ্ছে, কিন্তু রাতে?

বহু বছর ধরে আমাদের সব আলোচনাই ঘুরেফিরে ক্ল্যামকে নিয়ে হতো। তাঁর মন পরিবর্তন হলো কেন হঠাৎ, তা নিয়ে। আর এইসব বকতে বকতে আমার স্বামী যদি ঘুমিয়ে পড়তে আমি আবার তাকে জাগিয়ে দিতাম। আবার আমরা সেই আলোচনায় ফিরে যেতাম।

‘এবার,’ বলল কে, আপনি অনুমতি দিলে ‘আমি আপনাকে একটা বড়ো প্রশ্ন করব।’ গৃহকর্ত্রী নীরব রইল।

‘আমাকে জিজ্ঞাসা করতেই হবে।’ বলল কে, ‘তাতে আমার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে।’

‘হ্যাঁ’ বলল গৃহকর্ত্রী ‘তাতে আপনার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে। আর তাই তো দরকার শুধু, আপনি সবকিছু ঘুলিয়ে দেখেন, মানুষের নৈঃশব্দ পর্যন্ত। আপনি আর কিছুই পারেন না।’

আমি আপনাকে প্রশ্ন করার অনুমতি দিলাম।’

‘আমি যদি সবকিছুই ভুলভাবে দেখি তাহলে প্রশ্নটাও নিশ্চয়ই ভুল করব। বোধ হয় প্রশ্নটা মোটেই রুঢ় হবে না। আমি শুধু জানতে চাই আপনার স্বামীর সঙ্গে আপনার দেখা হলো কোথায় আর সরাইটাই বা আপনাদের হাতে এল কী করে?’

গৃহকর্ত্রী কপাল কোঁচকায়, কিন্তু উত্তর দেয় উদাসীনভাবে, ‘এই গল্পটা খুব সরল। আমার বাবা ছিল কামার আর হানস, আমার বর, তার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে আসত। ক্ল্যামের সঙ্গে আমার শেষ মিলনের পরের ঘটনা। তখন আমি অত্যন্ত অসুখী যদিও তা হবার কোনো অধিকারই আমার ছিল না। যেমনটা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। ক্ল্যামকে যে আর আমি কখনো দেখতে পাব না সেটা ক্ল্যামের নিজেরই সিদ্ধান্ত, সে মূহুর্তে তাই হওয়া উচিত ছিল, যদিও তার কারণ আমার কাছে ধোঁয়াটে। সে বিষয়ে খোঁজ করার অধিকার আমার ছিল কিন্তু অসুখী হবার কোনো অধিকার আমার ছিল না। তবুও আমার দুঃখ হয়েছিল। কোনো কাজ করতে পারি না, সামনের বাগানে সারাদিন থাকি। সেখানেই হ্যানস আমাকে দেখতে আসত, প্রায়ই বসে থাকত-আমার পাশে। আমি ওর কাছে কোনো অনুযোগ করিনি কিন্তু ও আমার দুঃখ ঠিকই বুঝত। খুব সুন্দর যুবক বলে আমার সঙ্গে কাঁদত। সরাই মালিকের বউটা এই সময় মারা যায় আর সেও ঠিক করে ব্যবসা তুলে দেবে। বুড়োও হয়ে পড়েছিল অবশ্য সে এর মধ্যে।

যাই হোক, একবার আমাদের বাগানের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে আমাদের বসে থাকতে দেখে থামল। তারপর বেশি কথা না বলে সোজা এই সরাইটা আমাদের সামান্য ভাড়ায় দেবার প্রস্তাব দিল। কোনো আগাম টাকা চাইলো না। আমাদের বিশ্বাস করত তো, আর ভাড়াও চাইল খুব সামান্য। আমার ইচ্ছে ছিল না বাবার কাঁধে বোঝা হয়ে থাকি, আর কিছু ভাবার ইচ্ছেও ছিল না, সরাইটা নিয়ে নতুন কাজের চাপে হয়ত দুঃখ একটু ভুলতে পারব এই ভেবে হ্যানসকে আমার হাত দিলাম। এই হলো পুরো গল্প।’

কিছুক্ষণ নিঃশব্দ, তারপর কে বলল, ‘সরাইমালিকের ব্যবহার তো খুবই উদার, যদিও তাতে হঠকারিতাও রয়ে গেছে, নাকি আপনাদের বিশ্বাস করার তার বিশেষ কোনো কারণ ছিল?’

‘ও হ্যানসকে চিনত বইকি,’ বলে গৃহকর্ত্রী, ‘সে হ্যানসের কাকা তো।’

‘তার অর্থ হলো,’ কে বলে, ‘হ্যানসের পরিবার আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলো?’

‘তা হতে পারে,’ বলে বাড়িওয়ালি, ‘আমি বলতে পারব না।’ এ নিয়ে কখনো ভাবিনি।’

‘তা হলে ও এ হতেই হবে।’ বলে কে ‘যখন দেখা যাচ্ছে তার পরিবার এরকম একটা ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল আর সরাইটা কোনো কিছু বন্ধক না রেখেই দিয়ে দিলো।’

‘তাদের সিদ্ধান্তটা সে হটকারি ছিল না তা পরে প্রমাণিত হয়েছিল।’ বলল বাড়িওয়ালি।

‘আমি নিজেকে কাজে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম, তখন তো বেশ শক্তপোক্ত আমি, তাছাড়া কামারের মেয়ে। আমার কোনো ঝি চাকরের দরকার হলো না। সব জায়গায় আমি লাটুর মতো ঘুরছি, মদ রাখার ঘরে, পাকশালায়, আস্তাবলে, উঠোনে। রান্না করতাম এত ভালো যে হেরেনহফ থেকে বেশ কয়েকটা খদ্দেরও ভাঙিয়ে আনতে পেরেছিলাম। দুপুরের খাবার সময় আপনি এখনো সরাইখানায় কাটাননি, আমাদের দিনের খদ্দেরদের আপনি চেনেন না। সেই সময় খদ্দের আরো অনেক বেশি ছিল, তারপর থেকেই অনেকে আসা বন্ধ করে দেয়। তার ফল হলো এই ভাড়া তো আমরা নিয়মিত দিতে পারলামই তার সাথে কয়েক বছরের মধ্যেই পুরো জায়গাটা আমরা কিনে নিলাম আর আজ আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। এর ফলে, আমাকে স্বীকার করতে হবে আমার স্বাস্থ্যের বারোটা বাজে, বুকের দোষ ধরে, আর এখন তো আমি বুড়ি-ই। আপনার মনে হতে পারে হ্যানসের চেয়ে আমার বয়স বেশি কিন্তু ঘটনা হলো ও আমার চেয়ে দু-তিন বছরের বেশি ছোটো হবে না।

বয়স ওর আর বাড়বেও না কারণ ওর যা কাজ, পাইপ টানা, খদ্দেরদের কথা শোনা, পাইপ ঝাড়া ঘনঘন, আর মাঝে মধ্যে দু-এক পাত্র বিয়ার নিয়ে আসা-তাতে কেউ বুড়ো হয় না।’

‘আপনি যা করেছেন তা এককথায় অসাধারণ।’ বলে কে ‘একমুহূর্তও আমি তাতে সন্দেহ করি না কিন্তু আমরা আপনার বিয়ের আগের কথা আলোচনা করছিলাম। সেই পর্যায়ে হ্যানসের পরিবারের দিক দিয়ে দেখলে খুবই অবাধ লাগে যে বিয়ে দেবার জন্যে তারা এমন ক্ষেপে উঠেছিল। এতটাই যে তারা বিপুল আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতেও রাজি ছিল তার জন্য। সরাইটা হস্তান্তরের মস্ত ঝুঁকিটা তো ছিলই। তাও আবার আপনার কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে, যে ক্ষমতা তারা প্রত্যেকে নিশ্চিতভাবে জানত শূন্য।’

‘ঠিক আছে,’ বলল বাড়িওয়ালি।

‘আপনি কী বোঝাতে চান তা বুঝেছি যদিও আপনার অনুমান কষ্টকল্পিত মাত্র। সমস্ত ঘটনায় ক্ল্যামের কোনো হাতই ছিল না। তাছাড়া আমাকে নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে যাবেনই বা কেন। কিংবা আরে বড়ো কথা হলো আমার ব্যাপারে তিনি ভাববে তেমন পরিস্থিতিই বা এল কোথায়? সেই সময় আমার বিষয়ে তিনি কিছুই জানতেন না। আমাকে যে তিনি আর স্মরণ করেননি তার অর্থই হলো তিনি আমার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। কাউকে ডাকা বন্ধ করলেই তিনি তার কথা একেবারে ভুলে যান। ফ্রিডার সামনে আমি এসব আলোচনা করতে চাই নি। শুধু ভুলে যাওয়া না, আরো বড়ো কিছু আছে। কাউকে ভুলে গিয়ে আবার তার কথা কখনো কারো আবার মনে পড়তেই পারে। ক্ল্যামের ক্ষেত্রে তা অসম্ভব।

কাউকে যখন তিনি আর ডাকেন না তখন বুঝতে হবে তাকে তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন, শুধু তার অতীত সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়েই নয়, আক্ষরিক অর্থেই তার ভবিষ্যৎ বিষয়েও। খুব চেষ্টা করলে আমি হয়ত আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে পারি। সেই দৃষ্টিকোণ আপনি যে ভিন্ন জায়গা থেকে আসছেন সেখানেই খাটে। কিন্তু এরকম ভাবাটা

শ্রীফ পাগলামি যে ক্ল্যাম আমার হাতে হ্যানসকে তুলে দেবেন শুধু এইজন যে যাতে ভবিষ্যতে তিনি যদি কখনো ডাকেন তখন আমার তার কাছে যেতে তেমন বড়ো কোনো অসুবিধা না হয়। ক্ল্যাম যদি কড়ে আঙুল তুলেও আমা ডাকেন আমাকে তাঁর কাছে যেতে বাধা দেবে এমন কোনো পুরুষ আছে? পাগলামি, একেভারেই পাগলামি। এছাড়া আর কিছু না যদি কেউ পাগলের মতো এমনভাবে ভাবে। সব গুলিয়ে ফেলে।’

না,’ বলল, ‘সব গুলিয়ে ফেলার আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই। আর আপনি যতটা কল্পনা করছেন আমার চিন্তা অতটাও যায়নি। যদিও সত্যি বলতে কি চিন্তা পথটা সৈদিকেই ছিল। এই মুহূর্তে শুধুমাত্র যে ব্যাপারটা আমাকে অবাক করছে তা হলো হ্যানসের স্বজনরা এই বিয়েতে এত কিছু আশা করেছিল আর বাস্তবিক তাদের সমস্ত আশাই পূর্ণ হয় যদিও তার জন্য আপনার সুস্থ হার্ট ও শক্তপোক্ত শরীরটা দুর্বল করে ফেলতে হলো। আমি স্বীকার করছি এসবের সঙ্গে ক্ল্যামের সংযোগ থাকতে পারে-এমন কথা আমার মাথায় এসেছিল কিন্তু ততটা মন্দভাবে নয় যতটা মন্দভাবে আমি ভেবেছি বলে আপনি কল্পনা করছেন। অবশ্য আপনার এরকম ভাবার কারণও আমাকে খোঁচানো ছাড়া আর কিছু নয়, আর আমাকে খুঁচিয়ে আপনি ভারি আনন্দ পান। তা, যত পারেন আনন্দ করে নিন।

আমার চিন্তাটা কিন্তু এরকম ছিল: প্রথমদিকে আপনার বিয়ের কারণ স্পষ্টতই ক্ল্যাম। ক্ল্যাম না থাকলে আপনি অসুখীও হতেন না ও কোনো কাজ টাজ না করে বাগানে গিয়ে বসেও থাকতেন না। ক্ল্যাম না থাকলে হ্যানস আপনাকে বাগানে বসে থাকতে দেখত না, আপনি অসুখী না হলে হ্যানসের মতো লাজুক একজন লোক আপনার সঙ্গে কথা বলতে সাহস করত না।

ক্ল্যাম যদি এসবের মধ্যে না থাকত হ্যানস আপনাকে কাঁদতে দেখত না ক্ল্যাম না থাকলে হ্যানসের সুভদ্র বৃদ্ধ কাকা আপনাদের দুজনকে শান্তিতে বাগানে বসে থাকতে দেখত না, ক্ল্যামের ছায়া না পড়লে পার্থিব আরে যা পাবার আছে সে বিষয়ে আপনি নির্লিপ্ত হতে পারতেন না ও তার ফলে হ্যানসেও কখনো বিয়ে করতেন না। তাই আমার তো মনে হয় সমস্ত কিছুর মধ্যেই কোনো না কোনোভাবে ক্ল্যাম ছিলেনই। শুধু তাই সব নয়। আপনি সমস্ত কিছু ভোলার চেষ্টা না করলে আপনি নিশ্চয়ই সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে সরাইটা এত চমৎকারভাবে দাঁড় করাতে পারতেন না। এখানেও ক্ল্যাম রয়েছে।

কিন্তু এসব বাদ দিলেও আপনার স্বাস্থ্যভঙ্গের মূল কারণ বিয়ের আগেই আপনার হৃদয়টি ক্ষয়ে গিয়েছিল তাঁর প্রতি আপনার একমুখী তীব্র প্রেমে। তাহলে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে হ্যানসের আত্মীয়রা কী কারণে আপনাদের বিয়ে দিতে এত অধীর হয়ে উঠল। একটু আগে আপনি নিজেই বলেছেন ক্ল্যামের রক্ষিতা হয়ে বিশিষ্ট হবার গৌরব কোনো মতেই হাতছাড়া করা যায় না। সেটাই তাদের আকর্ষণ করে থাকতে পারে। এছাড়া আমার মনে হয় তাদের আশা ছিল যে সুগ্রহটি আপনাকে ক্ল্যামের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, যদি অবশ্য ধরে নেওয়া যায় তা সুগ্রহই ছিল, আপনি নিজে তাই-ই বলেছেন-তা আপনাকে দ্রুত ও আকস্মিক ত্যাগ করেন।’

‘আপনি যা বললেন তা বিশ্বাস করেন?’ বলল গৃহকর্ত্রী।

‘হ্যাঁ,’ বিশ্বাস করি’ বলল কে। একমুহূর্ত না ভেবে।

‘শুধু মনে করি হ্যানসের আত্মীয়দের আশা পুরোপুরি ভ্রান্ত ছিল না আবার সঠিকও নয়। আর এও মনে করি তাদের ভুলটা কোথায় হয়েছিল তা ধরতে পেরেছি। বাহ্যত অবশ্য সর্বকিছু সফলভাবেই ঘটেছিল। হ্যানসের অর্থচিন্তা প্রায় রইল না। সে সুন্দরী স্ত্রী পেল, তার দেখাশোনার মানুষ এল, সরাইটাও ঋণমুক্ত হলো। তবু বাস্তবে কিন্তু সব ঠিকঠাক হলো না। সে অবশ্যই অনেক বেশি সুখী হতে পারত কোনো সহজ সরল মেয়েকে পেয়ে, যে তাকে দিত জীবনের প্রথম প্রেমের আনন্দ আর সে যদি কখনো সরাইখানায় আত্মবিস্মৃত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত,-আপনি যেমনটা নালিশ করেছে, তার পিছনে কোনো অসুখী মনোভাব কাজ করত না, এ আমি আপনাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, তার বিষয়ে এসব আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি-তার মতো এক সুদর্শন, বুদ্ধিমান যুবক অনেক বেশি সুখি হতে পারত অন্য কাউকে বিয়ে করলে।

‘আরো সুখি,’ বলতে আমি বোঝাতে চাইছি আরো বেশি স্বাধীন, পরিশ্রমী পৌরষদৃষ্ট আর আপনি নিজেও তো সুখি হতে পারেননি। নিজেই তো বললেন তিনটে বিদায়বেলার উপহার চাড়া জীবনধারণ করতেই পারতেন না। হার্টও আপনার বড়োই খারাপ। তাহলে হ্যানসের আশায় কি কোনো গলদ ছিল? আমি তা মনে করি না। আশীর্বাদ ছিল আপনার ওপর কিন্তু তাকে কিভাবে ফলপ্রসূ করতে হবে সেটা তাদের জানা ছিল না।

‘তাহলে কোনো ব্যাপারটা তাদের চোখ এড়িয়ে গেল?’ জিজ্ঞাসা করল বাড়িওয়ালি,’ ‘এখন সে চিৎ হয়ে শুয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়েছিল।

‘ক্ল্যামকে জিজ্ঞাসা করতে।’ বলল কে।

‘তার মানে ঘুরেফিরে আমরা আবার আপনার প্রসঙ্গটাতেই ঘুরে এলাম?’ ‘কিংবা, আপনার’ বলল কে, ‘আমাদের দুজনের ঘটনা তো সমান্তরালে চলছে।’

‘ক্ল্যামের থেকে আপনি চানটা কী,’ জিজ্ঞাসা করে বাড়িওয়ালি, সে এতক্ষণে উঠে বসেছে, বালিশ খাড়া করেছে তাতে হেলান দিতে। এবার সে কে-র চোখে পূর্ণদৃষ্টি স্থাপন করে।

‘আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা খোলাখুলি আপনাকে বলেছি যার থেকে আপনার কিছু শিক্ষা হওয়া উচিত। ঠিক একই রকম সোজাভাবে আমায় বলুন তো ক্ল্যামকে আপনি কী জিজ্ঞাসা করতে চান। যথেষ্ট কষ্ট করে বুঝিয়ে সুজিয়ে আমি ফ্রিডাকে তার ঘরে যেতে রাজি করেছি শুধু ভেবে সে এখানে থাকলে আপনি খোলাখুলি কথা বলবেন না।’

‘আমার গোপন করার কিছু নেই’ বলল কে, ‘কিন্তু প্রথমেই আমি আপনার দৃষ্টি একটা ব্যাপারে আকর্ষণ করতে চাই। আপনি বললেন ক্ল্যাম ভোলেন দ্রুত। কিন্তু প্রথমত আমার কাছে তা কিছুতেই সত্যি বলে মনে হয় না। আর দ্বিতীয়ত, এটা প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই, খুব সম্ভব এটা একটা কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই না। ক্ল্যামের অনুগ্রহ নিয়ে যারা বাঁচে তাদেরই ভৈরবী অলস মনের কারিকুরি মাত্র। এসব হেঁদো কথায় আপনার বিশ্বাস দেখে অবাক লাগছে।’

‘এটা কোনো কিংবদন্তী না,’ বলল সরাই মালিকের বউ, ‘এ বরং সাধারণ লোকের অভিজ্ঞতা।’

‘তার মানে, আরো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন এই অভিজ্ঞতাকে বানচাল করতে।’ বলল কে, ‘এছাড়া আপনার ও ফ্রিডার অভিজ্ঞতার মধ্যে আরো একটা ফারাক আছে। ফ্রিডাকে ক্ল্যাম আর ডাকবেন না এমন ঘটেনি, তিনিই বরং ডেকেছেন কিন্তু সে তার প্রত্যাখান করেছে। এমনও হতে পারে তিনি এখনও তার প্রতীক্ষা করে রয়েছেন।

বাড়িওয়ালি চুপ করে থাকে ও চিন্তিতভাবে কে-কে আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে, অবশেষে বলে, ‘আপনার বক্তব্য আমি শান্তভাবে শোনার চেষ্টা করব। আপনার যা মনে হয় সোজাসুজি বলুন, আমার অনুভূতির কথা দিন। আমার শুধু একটা অনুরোধ। ক্ল্যামের নাম ঘরে কিছু বলবেন না। ওকে ‘উনি’ বা অন্য কিছু বলে সম্বোধন করুন, কিন্তু ওকে নাম উচ্চারণ করে উল্লেখ করবেন না।’

‘সানন্দে,’ বলল কে, ‘কিন্তু ওনার কাছ থেকে আমি কী চাই তা বোঝানো শক্ত। প্রথমে আমি ওনাকে খুব কাছ থেকে দেখতে চাই। তারপর আমি ওঁর কণ্ঠস্বর শুনতে চাই। এরপর জানতে চাই আমাদের বিয়ের বিষয়ে ওর দৃষ্টিভঙ্গিটা কী। এরপর আমি কী প্রশ্ন করব তা নির্ভর করবে আমাদের সাক্ষাৎকারের ফলাফলের উপর। আলোচনার সময় অজস্র বিষয় উঠে আসতে পারে। কিন্তু তবু আমার কাছে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ হলো ওঁর মুখোমুখি হওয়া।

আমি এমন পর্যন্ত সত্যিকারের কোনো আধিকারিক দেখিনি, বুঝলেন। এখন মনে হচ্ছে দেখা হলে সামলাতে পারব না বোধ হয়। আর এখন এমন অবস্থায় পড়েছি যে ওর সঙ্গে আমাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কথা বলতে হবে। সেটা অবশ্য অনেক সোজা হবে। কারণ আধিকারিক হিসাবে আমাকে ওর সঙ্গে কথা বলতে হতো ওর দপ্তরে, দুর্গের ভেতর, যেখানে ঢোকাটাই অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে, আর হেরেনহফে যদি হয় তাও সহজ হবে না। কিন্তু সাধারণ লোক হিসাবে ওর সঙ্গে আমি যেখানে খুশি কথা বলতে পারি, কোনো বাড়িতে, রাস্তায়। যেখানেই আমাদের দেখা হোক না কেন। কোনো আধিকারিককে সামনে দেখলেও আমি তাকে স্বাগত জানাব, কিন্তু সেটা আমার প্রাথমিক লক্ষ্য নয়।’

‘ঠিক,’ বলে বাড়িওয়ালি, মুখ বালিশে চেপে ধরে যেন সে ভারি লজ্জার কিছু একটা বলে ফেলেছে ‘আমার নিজের এ ভাব খাটিয়ে আমি যদি আপনার সাক্ষাৎকারের অনুরোধ ক্ল্যামের কাছে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করি কথা দিন যতক্ষণ উত্তর না আসে আপনি নিজে থেকে কোনো কিছু করবেন না।’

‘সেরকম কোনো কথা আমি দিতে পারব না,’ বলল কে ‘আপনার অন্যান্য ইচ্ছে বা খেয়াল যদিও খুশি মনেই মেটাতে রাজি আছি। ব্যাপারটা খুবই জরুরি, বুঝতেই পারছেন, বিশেষ করে গ্রাম প্রধানের সঙ্গে কথাবার্তার ফল যেরকম দূর্ভাগ্যজনক হলো তার পর।’

‘আপনার এক যুক্তি ধোপে টেকে না।’ বলল বাড়িওয়ালি।

‘মোড়ল অতি তুচ্ছ লোক। আপনি নিজে তা বোঝেননি?’

ওর পদে একদিনও টিকতে পারত না ওর বউ না থাকলে। বউই তো সব করে।

‘মিজ্জি?’ জিজ্ঞাসা করে কে। বাড়িওয়ালি মাথা নাড়ে।

‘ও তো সেখানে ছিল।’ ‘ও কোনো মতামত দিয়েছে?’ জিজ্ঞাসা করে বাড়িওয়ালি।

‘না,’ উত্তর দেয় কে, ‘আমার তো মনে হলো না ও কোনো মতামত দিতে পারে।’

‘এই তো,’ বলল বাড়িওয়ালি, ‘দেখলেন এখানকার সবকিছু বিষয়েই আপনার ধারণা কত বিকৃত। যাকগে, আপনার ব্যাপারে মোড়ল কি ব্যবস্থা নেবে তার কোনো মূল্যই নেই। সময় হলে আমি ওর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু আমি আপনাকে কথা দিতে পারি বড়োজোর এক সপ্তাহের মধ্যেই ক্ল্যামের উত্তর এসে পড়বে। এবার তো আপনার কোনো অসুবিধা রইল না আমাকে বাধিত করতে।’

‘এ সব আমাকে প্রভাবিত করা যাবে না।’ বলল কে, ‘আমার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে আর আমি তো পূরণও করব এমনকি যদি কোনো প্রতিকূল উত্তরের মুখোমুখিও আমাকে হতে হয়। আমার উদ্দেশ্য স্থির হয়ে যাওয়ার পর আর আমি আগাম সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করতে পারি না। যে প্রচেষ্টা সাহসী হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে, সহজেই তা নষ্ট হয়ে যাবে যদি আমি সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করি আর তা বে-আইনী বলেই গৃহীত হবে যদি আমি প্রত্যাখ্যাত হই। সত্যি বলতে কি তাতে বিষয়টা অনেক খারাপ হয়ে যাবে।’

‘আরো খারাপ?’ বলে ওঠে বাড়িওয়ালি, ‘যেভাবেই যান সবই বেআইনী হবে, ঠিক আছে, আপনার যা মনে হয় করুন। আমার স্কার্টটা দিন।’

কে-র দিকে কোনো দৃষ্টি না দিয়ে স্কার্টটা পরে নিয়ে সে রান্নাঘরে ঢুকে পাড় দ্রুতপদে। বহুক্ষণ ধরে কে ডাইনিং রুমে হইচই শুনতে পাচ্ছিল। রান্নাঘরের পেছনে কড়া নাড়ার আওয়াজ শোনা গেল। সহকারীরা দরজা খুলে ফেলে চিৎকার করে বলছে তারা ক্ষুধার্ত। দরজার কাছে অন্যান্য মূর্তিও দেখা গেল। চাপা গলায় কয়েকজনের গান শোনা যাচ্ছিল।

নিশ্চিতভাবে বাড়িওয়ালির সঙ্গে কে-র এতক্ষণ বাক্যলাপ চলার ফলে দ্বিপ্রহরের ভোজন প্রস্তুত করার ব্যাপারটাতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। এখনও খাবার প্রস্তুত হয়নি অথচ করিদ্দাররা ক্রমে জড়ো হয়েছিল। অথচ মালিকানির আদেশ অগ্রাহ্য করে ঢোকার হিম্মত কারো নেই। কিন্তু এখন যখন দরজায় আড়িপাতার দল খবর দিল মালিকান আসছে ঝিয়েরা তখনি রান্নাঘরে দৌড় মারে। আর কে যখন খাবার ঘরে ঢুকল বিস্ময়কর সংখ্যার একদল লোক, স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে প্রায় কুড়িজন হবে, সকলেরই পরনে প্রাদেশিক কিন্তু গ্রাম্য বলা যায় না এমন পোষাক, হুড়মুড় করে চৈঁচাতে চৈঁচাতে দরজার আড়াল নিজেদের চেয়ার ঠিক আছে কিনা দেখতে ছোট্টে।

শুধু এক ছোট্টো টেবিল ঘিরে আগেই এক দম্পতি বসে আছে কিনা দেখতে ছোট্টে। শুধু এক ছোট্টো টেবিল ঘিরে আগেই এক দম্পতি বসে ছিল কয়েকটা ছেলেপুলে নিয়ে। লোকটা দেখতে দয়ালু মত, নীল চোখ অবিন্যস্ত চুল দাড়ি। সে বাচ্চাগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ে হাতের ছুরি ঝাঁজিয়ে তাদে সঙ্গে গলা মিলিয়ে তাল দিচ্ছিল সময় কাটাতে, অথচ তাকে চেষ্টা করতে হচ্ছিল ক্রমাগত আওয়াজ নিম্নগামে

রাখতে, বোধহয় গান টান গেয়ে সে তাদের খিদে ভোলাতে চাইছিল। বাড়িওয়ালি ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে মামুলি কয়েকটা শব্দ ছুঁড়ে দেয় খরিদরের উদ্দেশ্যে। কেউ অবশ্য কোনো ভাবে তার ব্যবহারে অসন্তোষ দেখায় না, সে ঘাড় ঘুরিয়ে সরাইমালিককে খোঁজে। সে-অনেক আগেই অবশ্য অবস্থা বেগতিক দেখে সরে পরেছিল। সে এরপর ধীর পায়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। কে-কে আর লক্ষ্যই করে না। কে তখন ব্যস্ত পায়ে ফ্রিডার ঘরের দিকে ফেরে।

৭

ওপরের ঘরে ঢুকেই শিক্ষকের সঙ্গে কে-র দেখা হয়ে গেল। ফ্রিডা এত পরিশ্রম করে ঘরের হাল ফিরিয়েছে যে ঘরটাকে আর চেনাই যায় না। সেখানে এখন হাওয়া বাতাস চলাচল করছে, চুল্লিতে এখন পর্যন্ত জ্বালানি, মেঝেটাকে ঘসে মেঝে একেবারে ঝাঁ চকচকে করা হয়েছে। বিছানা সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখা, ঝিয়েদের জমে থাকা নোংরা জিনিসপত্র, তাদের ছবি, সব একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়েছে। টেবিলটার ওপর এত জঞ্জাল জমে ছিল যে তা দর্শকের চোখকে আক্ষরিক ভাবেই পীড়া দিত। সেই টেবিল পর্যন্ত এখন সুন্দর সূতার কাজ করা একটা সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা।

কে-র পরিত্যক্ত অর্ন্তবাস আগুনের সামনে ঝুলছিল-ফ্রিডা নিশ্চয়ই ওগুলো খুব সকালেই কেচেছে-সেগুলো অবশ্য ঘরের সুস্বাদু বিশেষ আহক করেনি। ফ্রিডা আর শিক্ষক টেবিলের কাছে বসে ছিল। কে-কে দেখে তারা দুজনেই উঠে দাঁড়ায়। ফ্রিডা তাকে স্বাগত জানায় চুমু খেয়ে ও শিক্ষক ঈষৎ নিচু হয়ে অভিবাদন করে। বাড়িওয়ালীর সঙ্গে কথাবার্তার ফলে কে তখনও ক্ষুব্ধ ও কিছুটা অনামনস্ক ছিল। শিক্ষকের সঙ্গে ইতিপূর্বেই সাক্ষাত করতে যায়নি বলে সে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে শুরু করে দিল, যেন তার ধারণা এতদিন সে দেখা না করাতেই অধৈর্য হয়ে শেষ পর্যন্ত শিক্ষককে তার কাছে আসতে হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষকটি যেন বিস্তর ভাবনা চিন্তা করার বিষয়ে কথা হয়ে থাকবে।

‘আপনি নিশ্চয়ই জমির আমিন,’ সে বলল ধীরে, ‘আপনিই তো সেই নবাগতমানুষ যার সঙ্গে চার্চের মাঠে কয়েকদিন আগে দু একটি কথা বলেছিলাম, ‘আজ্ঞে, আমিই সেই অধম,’ বলে কে সংক্ষেপে। নিজেকে তার আশ্রয়হীন বলে মনে হবার সময় যে ধরনের ব্যবহার তাকে সহ্য করতে হয়েছিল তা সে এখন নিজের ঘরে বসে আর সহ্য করতে রাজি নয়। সে ফ্রিডার দিকে ফেরে ও তার সঙ্গে পরামর্শ করে; এখনি তাকে এক জনের সঙ্গে দেখা করতে বেরোতে হবে, এজন্য সবচেয়ে ভালো পোষাকটা তার দরকার।

এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন না করে ফ্রিডা সহকারীদের ডাকে, তারা এতক্ষণ টেবিল ক্রুটা তন্নয়ভাবে দেখছিল, ও আদেশ করে সুট ও জুতো ব্রাশ করতে-ওগুলো কে সবে খুলতে শুরু করেছিল উঠোনে নিয়ে গিয়ে। সে নিজে দড়ি থেকে একটা জামা তুলে নিয়ে রান্নাঘরে ছোটো তা ইন্ট্রি করতে।

এখন ঘরে শুধু কে আর শিক্ষক। শিক্ষক টেবিলের কাছে চুপচাপ বসে ছিল। কে তাকে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষায় রাখে। সে জামা খোলে, কল খুলে হাতমুখ ধোয়। এসব শেষ হবার পরই শুধু সে তার দিকে পেছন ফিরে তার আসার কারণ জিজ্ঞাসা করে।

‘গ্রামপ্রধানের অনুরোধেই আমি এসেছি,’ সে বলে। কে আরো কিছু শোনার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু জলে আওয়াজে কে ঠিক কী বলছে ভালোভাবে শোনা যায় না। তাই শিক্ষক একটু এগিয়ে আসে ও পাশের দেওয়ালে ভর দেয়। কে তার হাত-পা ধোয়া ও তাড়াহুড়োর অজুহাত হিসাবে বলে যে নির্দিষ্ট এক সাক্ষাৎকার রক্ষা করার তাগিদেই তার এরকম ব্যস্ততা। শিক্ষক তার অজুহাতে কোনো কান না দিয়েই বলে, ‘আপনি গ্রামপ্রধানের সঙ্গে অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন। ও রকম বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ মানুষের সঙ্গে আপনার আরো বেশি সম্মানজনক আচরণ করা উচিত ছিল।’ ‘আমার আচরণ সৌজন্যমূলক হয়েছে কি হয়নি বলতে পারি না,’ কে বলে, হাত পা মুছতে মুছতে, “কিন্তু এটা সত্যি যে সেই মুহূর্তে ভদ্র আচরণের চেয়েও বড়ো ব্যাপার নিয়ে আমার ভাবতে হয়েছিল। কারণ আমার অস্তিত্বই বিপন্ন। সেটা আরো বেশি বিপন্ন হয়ে উঠেছে কিছু অপদার্থ সরকারি আমলার জন্য। তাদের চিন্তাপ্রক্রিয়া আপনাকে বোঝানোর প্রয়োজন দেখি না কারণ দেখতেই পাচ্ছি আপনি নিজেই তাদের এক সক্রিয় প্রতিনিধি। গ্রামপ্রধান কি আমার বিষয়ে কোনো অনুযোগ করেছেন আপনার কাছে?’

‘তিনি অনুযোগ করতে পারেন তেমন যোগ্য মানুষ কোথায়,’ শিক্ষক বলল, ‘আর সেরকম কেউ যদি থাকতও আপনি কি মনে করেন, তিনি তা করতেন?’

‘আমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গেই আপনার দুর্বাবহারের ইঙ্গিত পেয়েছি মাত্র, আর তা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি কত দয়ালু প্রকৃতির মানুষ তিনি আর আপনার উত্তরগুলো কী ধরনের ছিল।’ কে তখন চিরুনি খুঁজতে খুঁজতে, সেটা ফ্রিডা সম্ভবত অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছে পরিষ্কার করার সময়, বলল, ‘অভদ্রতার কথা বলছেন, সেটা স্থির করে দেবে এমন একজন যে সাক্ষাৎকারের সময় ছিলই না? তা মন্দ না, এটা কি তাহলে কোনো সরকারি সাক্ষাৎকার ছিল?’

‘না,’ বলল শিক্ষক, ‘ওটাকে আধা সরকারি সাক্ষাৎকার বলা যেতে পারে। আদবেরও দরকার ছিল ততটাই। সাক্ষাৎকারের প্রণালীও স্থির করা হয়েছে শুধুমাত্র এই জন্য যে এখানে সব কিছুই কঠিন অনুশাষণের মধ্যে করাটাই বাধ্যতামূলক। যাই হোক, ব্যাপারটা চুকে গেছে আর আপনার ভাবমূর্তিটা খুব উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি।’ কে শেষপর্যন্ত চিরুনিটা খুঁজে পেল, বিছানার তলায় পৌঁজা ছিল।

সে আরো শান্তভাবে বলে, ‘ঠিক আছে, তাহলে সব চুকে গেছে বলছেন। তা, আপনি কি শুধু এটা জানাতেই এতদূর ছুটে এলেন?’

‘না,’ বলে শিক্ষক, ‘কিন্তু আমি তো একটা যন্ত্রমাত্রও নই, আমার মতামতও আপনাকে জানানো প্রয়োজন বলে মনে করেছিলাম। আমাকে যে সমস্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাও প্রমাণ করে গ্রামপ্রধান কত দয়ালু মানুষ। আমি জোর দিয়েই বলতে চাই এই বিষয়ে তাঁর উদারতা আমার বুদ্ধির অতীত আর আমি যে তাঁর নির্দেশ পালন করছি তা কোনো কর্তব্যপালনের বাধ্যবাধকতা থেকে নয়, তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ থেকেই।’ হাত মুখ ধোয়া হয়ে গেছে, চুল আঁচরানোও শেষ। এবার কে এসে টেবিলে বসে তার জামা ও অন্যান্য পোষাকের অপেক্ষায়, শিক্ষক কোন বার্তা বহন করে এনেছে তা জানতে তার তেমন গা ছিল না।

এছাড়া গ্রামপ্রধান বিষয়ে বাড়িওয়ালীর হীন মন্তব্যও তাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। ‘নিশ্চয়ই এর মধ্যেই বারোটা বেজে গেছে,’ সে বলে, যে দূরত্ব তাকে অতিক্রম করতে হবে তা ভাবতে ভাবতে।

হঠাৎ তার নিজের কথাটা মনে পড়ে যায় ও বলে, ‘আপনি গ্রামপ্রধানের কাছ থেকে কী একটা খবর নিয়ে এসেছেন বললেন না?’

‘হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,’ বলে শিক্ষক এমনভাবে কাঁধ ঝাঁকায় যেন দায়িত্বের সমস্ত বোঝা এবার সেনামাতে যাচ্ছে ‘গ্রামপ্রধান ভয় পাচ্ছেন যে আপনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে যদি অতিরিক্ত সময় লাগে আপনি নিজেই হয়ত হটকারি কোনো কাজ করে বসবেন। আমি অবশ্য বুঝতে পারছি না আপনাকে নিয়ে ওর এত মাথাব্যথা কিসের। আমার মত হরো আপনাকে খুশি করতে দেওয়া হোক। আমরা তো আর আপনার রক্ষাকর্তা দেবদূত নই যে আপনার সমস্ত কাজের পেছনে পেছনে আমাদের দৌড়াতে হবে।

কিন্তু গ্রামপ্রধানের চিন্তাধরা অন্যরকম। তিনি নিজে অবশ্য চরম সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী নন। সেটা কর্তৃপক্ষের হাতে। কিন্তু তাঁর নিজের এলাকার মধ্যেই তিনি উদারভাব আপনার অস্থায়ী সুন্দর একটি বাসস্থানের বন্দোবস্ত করে দিতে চান। এটা অবশ্য নির্ভর করছে আপনি তা গ্রহণ করবেন কিনা তার ওপর। তিনি আপাতত আপনাকে অস্থায়ী স্কুল পরিচারকের কাজ দিতে চান।’ কে এই প্রস্তাবে তেমন গা দেয়নি কিন্তু পরে তার মনে হলো, এই যে তাকে একটা প্রস্তাব করা হয়েছে তা কোনো মতেই তাৎপর্যহীন হতে পারে না। ঘটনাটা বুঝিয়ে দিচ্ছে গ্রামবাসীদের এই ধারণা হয়েছে যে সে এমন একটা জায়গায় রয়েছে যেখানে দাঁড়িয়ে সে নিজের ভার নিজেই বইতে সক্ষম আর সে এমন এক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে বন্ধপরিকর যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই গ্রামীণসভা বিশেষ এক পদক্ষেপ গ্রহণ নেবার জন্য-প্রস্তুত হচ্ছে।

কী গুরুত্বের সঙ্গেই না তারা বিষয়টা নিয়েছে। শিক্ষকটি, যে ইতিমধ্যেই বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছে, তার আগে আদব কায়দা বিষয়ে কথা বলেছে, নিশ্চয়ই এখানে এসেছে গ্রামপ্রধানের আদেশে বাধ্য হয়ে। শিক্ষক যখন দেখল কে-কে শেষ পর্যন্ত সে ভাবিয়ে তুলতে পেরেছে, সে বলতে লাগল ‘আমি আপত্তি করেছিলাম। আমি যুক্তি দেখিয়েছিলাম স্কুলে এতদিন কোনো তত্ত্বাবধায়কেরই দরকার হয়নি। গির্জার দারোয়ানের বউই জায়গাটা মাঝে মধ্যে সাফ করে রাখে আর ফ্রাউলিন গির্জা সব কিছুই তত্ত্বাবধান করেন। অতগুলো শিশুকে নিয়েই আমার ঝঞ্ঝাটের শেষ নেই, তার ওপর নতুন কোনো পরিচারকের ঝামেলা আমি সামলাতে পারব না। তাও প্রধাব বললেন স্কুলবাড়িটা নাকিবড্ড নোংরা হয়ে রয়েছে। আমি তাকে বললাম বাস্তবিকই সেটাকে অত নোংরা বলা চলে না।

এছাড়াও আরো বলেছিলাম, নতুন লোককে কাজে বহাল করলে কি অবস্থার কোনো উন্নতি হবে? নিশ্চিতভাবেই না। উনি তো এ কাজের কিছুই জানেন না, এ কথা বাদ দিলেও, স্কুলে দুটো বড়ো ক্লাশরুম আছে মাত্র, অন্য কোনো ঘরও তো নেই। সেক্ষেত্রে তো পরিচারককে তার পরিবার শুদ্ধ কোনো একটা ক্লাশরুমেই থাকতে, শুতে এমনকী রান্না পর্যন্ত করতে হবে। তাতে পরিচ্ছন্নতা মোটেই বাড়বে না।

কিন্তু প্রধান জোর দিলেন এই যুক্তির ওপর যে এই কাজটা আপনাকে সমস্ত অসুবিধা থেকে দূরে রাখবে আর ফলে আপনি প্রশংসনীয় উদ্যামের সঙ্গে আপনার যাবতীয় কর্তব্যাপালন করবেন। তিনি আরো ইঙ্গিত দিলেন যে আপনার সাথে আমরা আপনার স্ত্রী ও সহকারীদের পরিসেবাও ও পাব উপরি পাওনা হিসাবে। এতে যে শুধু স্কুলবাড়িটাই ঝকঝক করবে তা না। স্কুলের বাগানটাও। আমি খুব সহজেই প্রমাণ করলাম তাঁর যুক্তি ধোপে টেকে না। শেষে আপনার সমর্থনে প্রধান আর কোনো যুক্তিই দেখাতে পারলেন না। শেষে হেসে বললেন আপনি যেহেতু জমির আমিন তখন শাকসজি জমি অন্তত দারুণভাবে প্রস্তুত করতে পারবেন। তা, ঠাট্টার বিরুদ্ধে তো কোনো যুক্তি টেকে না। আমাকে তাই-আপনার কাছে আসতেই হলো তাঁর স্বীকার করার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই।’

‘দারুণ,’ শিক্ষক বলে উঠল, ‘দারুণ; আপনি কিন্তু নিঃশর্তেই কাজটা প্রত্যাখ্যান করলেন।’ এরপর সে টুপিটা তুলে নিয়ে অভিবাদন করে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

এর ঠিক পরেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে উত্তেজিত ভাবে ঘরে ডেকে ফ্রিডা, হাতে ধরা জামটা তখনো তার ইস্ত্রি করা হয়নি। কে-র প্রশ্নের সে কোনো উত্তর দেয় না; তার মন শান্ত করতে কে একটু আগেই শিক্ষকের প্রস্তাবের কথাটা বলে। ভালো করে সব না শুনেই সে সাটটা খাটের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আবার বেরিয়ে যায়। সে আবার ফিরে আগে। কিন্তু শিকফের সঙ্গে নিয়ে। শিক্ষকটিকে খুবই বিরক্ত বলে মনে হলো আর ঘরে সে ঢুকল কোনো অভিবাদন না করেই। ফ্রিডা তাকে অনুনয় করে একটু ধৈর্য্য ধরতে, বোঝাই গেল সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসার সময় এই অনুরোধটি সে তাকে বার বার করেছে। এরপর সে কে-কে একটা দরজা দিয়ে পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠে টেনে নিয়ে যায় ও উত্তেজনায় প্রায় বেদম হয়ে তাকে জানায় ইতিমধ্যে কী কী ঘটে গেছে।

ক্ল্যামের সঙ্গে কে-র সাক্ষাৎকার করিয়ে দেবে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফ্রিডা যেভাবে নিজেকে খাটো করেছে, আরো খারাপ, সে যে তার কাছে আত্মবিসর্জন দিয়েছে ও এসবের বিনিময়ে পেয়েছে চালচুলোহীন, হৃদয়হীন এক মানুষকে-এসবে ক্ষিপ্ত হয়ে বাড়িওয়ালী ঠিক করেছে সরাইয়ে কে-কে আর থাকতে দেবে না। দুর্গের সঙ্গে তার যদি কোনো সংযোগ ঘটে থাকে সে যেন সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার এখনি করে, কারণ তাকে ঘর ছাড়তে হবে আজকেই, এই মুহূর্তে। কর্তৃপক্ষের জরুরি কোনো নির্দেশ পেলেই শুধু সেতার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেবে। কিছু তার ধারণা সেরকম কিছু ঘটবে না। কারণ দুর্গে তারও চেনাশোনা আছে। তাদের কী উপায়ে কাজে লাগানো যায় তাও তার জানা। এছাড়া সে এখানে ঢুকতে পেরেছে একমাত্র সরাইমালিকের অসতর্কতার জন্যই। সে যে আশ্রয়হীন তাও তো নয়, কারণ আজ সকালেই সে গর্ব করে বলেছে ফোকটে রাত কাটাবার মতো জায়গাও নাকি তার আছে। ফ্রিডা অবশ্য এখানেই থাকবে। সে যদি কে-র সঙ্গে চলে যায় বাড়িওয়ালীর দুঃখ হবে খুবই। রসুই ঘরে আগুনের ধারে একটা চেয়ারে বসে সে নাকি কান্নাতে ভেঙেও পড়েছিল শুধু এই সম্ভাবনার কথা ভেবেই, বেচারী, অসুস্থ স্ত্রীলোক।

কিন্তু এছাড়া তার করার কীই বা আছে? বিশেষ করে, তার কল্পনায় অবশ্য, ক্ল্যামের স্মৃতিচিহ্নগুলোর সম্মান রক্ষার সঙ্গে বিষয়টা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই হলো

বাড়িগুলার ব্যাপার। ফ্রিডা অবশ্য বলা বাহুল্য, কে-র সঙ্গেই চলে যাবে, সে যেখানেই যাক না কেন। তবে মানতেই হবে তাদের দুজনের অবস্থাটাই বর্তমানে শোচনীয়। আর শুধু-এই কারণেই সে শিক্ষকের আনা প্রস্তাবটা এত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। পদটা অবশ্যই কে-র যোগ্য নয় কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার সেটা অস্থায়ী মাত্র। এরপর বেশ কিছু সময় পাওয়া যাবে আর অনেক সহজ সুযোগও আসবে, অবশ্য শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা খুব ফলপ্রসূ নাও হতে পারে।

‘যদি অবস্থা বাড়াবাড়ি রকম খারাপ হয়ে পড়ে,’ ফ্রিডা চোঁচিয়ে বলে অবশেষে, কে-র কণ্ঠলগ্ন হয়ে, ‘আমরা চলেই যাব, গ্রামে আর আমাদের পিছুটানটা কিসের?’ আপাতত ডার্লিং আমরা এই প্রস্তাবটা গ্রহণ করে, তাই না? মাস্টারমশাইকে আবার ডেকে এনেছি, তুমি শুধু ওঁকে একবার বল, ‘তাই হবে।’ বাস, এরপরই আমরা স্কুলবাড়িতে গিয়ে উঠব।’

‘যত ঝামেলা,’ বলল কে, আলগাভাবে। কারণ এই মুহূর্তে সে বাসস্থানের বিষয় নিয়ে মোটেই চিন্তিত ছিল না, অন্তর্বাসের ভেতর সে ঠকঠক করে কাঁপছিল, এই কুঠুরিটার দুদিকে কোনো ঘের না থাকায় প্রানান্তরক ঠান্ডা বাতাস তাকে আক্রমণ করছিল।

‘ঘরটা তুমি এত সুন্দরভাবে সাজালে আর তা কিনা এখন ছেড়ে যেতে হবে? পদটা আমি গ্রহণ করলাম অতি, অতি অনিচ্ছায়। মাস্টারের কাছে এর মধ্যেই যা ধমক খেয়েছি তাতেই আমার মন অত্যন্ত তেতো হয়ে আছে। আর এবার তো ও আমার একেবারে ওপরওয়ালাই হয়ে বসল। এখানে যদি আমরা আর কিছুক্ষণ থাকতে পারতাম বিকেলের মধ্যেই হয়ত আমার অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারত। তুমি যদি অন্তত এখানে আরো কিছুক্ষণ থাকতে রাজি হও আমরা একটু দেরি করে শিক্ষককে দায়সারা একটা উত্তর দিয়ে বিদায় করতে পারি। আর আমায় যদি তেমন চূড়ান্ত খারাপ অবস্থাই হয়ে পড়ে, আমি রাতের আশ্রয়টা ঠিকই পেয়ে যাব বার-’ ফ্রিডা তাকে থামিয়ে দেয়, তার মুখে হাত চেপে ধরে।

‘না, ওকথা নয়।’ সে অনুনয় করে, ‘দয়া করে ঐ শব্দটা আর উচ্চারণ কোরো না। এছাড়া তোমার সব কথাই আমি শুনব। তুমি চাইলে আমি এখানে থাকতেও রাজি আছি, তাতে আমার যত কষ্টই হোক না কেন। এমনকী তুমি চাইলে আমার যে প্রস্তাবটা এসেছে সেটাকেও প্রত্যাখ্যান করব। আমার কাছে তা বেঠিক মনে হলেও। কারণ দেখ, তুমি যখন অন্য সম্ভাবনা দেখতেই পাচ্ছ, এই বিকেলের মধ্যেই, তাহলে আর প্রস্তাবিত পদটা ছুঁড়ে ফেলতে বাধা কিসের? তাতে বারন করারও কেউ নেই। আর শিক্ষকের কাছে তোমার অপমানিত হবার ব্যাপারে বলি ভবিষ্যতে যাতে অমন কিছু না ঘটে তা আমি দেখব। ওর সঙ্গে আমি নিজেই কথাবার্তা যা বলার বলব, তুমি সেখানে থাকবে অবশ্য।

কিন্তু তোমাকে একটা কথাও বলতে হবে না। পরেও ঠিক তাই হবে, তুমি না চাইলে ওর সঙ্গে তোমার কোনো কথা বলারই প্রয়োজন হবে না কারণ আমি ওর সব দুর্বলতাই জানি। তাহলে দেখতেই পাচ্ছ কাজটা নিয়ে নিলে আমাদের কিছুই হারাতো

হবে না, কিন্তু অন্যদিকে অনেক ক্ষতি হবে যদি আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করি। সবচেয়ে বড়ো কথা, আজকের মধ্যেই যদি তুমি দুর্গ থেকে কোনো কিছু আদায় করতে না পার তাহল তুমি এমনকী শুধু নিজের জন্যও সারা গ্রামে রাতে মাথা গোঁজার একটা জায়গাও যোগাড় করে উঠতে পারবে না, কোথাও না। তাতে অবশ্য তোমার ভাবী স্ত্রী হিসেবে যে আমি লজ্জিত হবো তা না।

কিন্তু তোমার যদি কোথাও রাতের আশ্রয় না জোটে তাহলে কি মনে কর এখানে আমি উষ্ণ ঘরে শুয়ে আরামে ঘুমতে পারব, যে মুহূর্তে আমার মনে পড়বে তুমি অন্ধকারের মধ্যে ভয়াবহ ঠান্ডায় পথে পথে ঘুরে মরছ?’ এই সময়টা কে ব্যস্ত ছিল কোচোয়ানের মতো বুকে হাত চাপড়ে নিজেকে গরম করে তুলতে। সে বলে, ‘তাহলে কাজটা না নিয়ে আর উপায় কি? এস।’

ঘরে ফিরে কে সোজা এগিয়ে যায় আগুনের কাছে, শিক্ষকের দিকে ফিরেও তাকায় না। শিক্ষক টেবিলের কাছে বসে ঘড়ি বার করে। তারপর বলে, ‘দেরি হয়ে যাচ্ছে।’

‘জানি, আমরা দুজনেই শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ একমত হতে পেরেছি।’ বলে ফ্রিডা ‘আমরা কাজটা গ্রহণ করছি।’

‘ভালো,’ বলে শিক্ষক, ‘চাকরিটা তো দেওয়া হয়েছে আমিনকে, ওকেই নিজের মুখে কথাটা বলতে হবে।’

ফ্রিডা কে-র সাহায্যে এগিয়ে আসে, ‘ও সত্যিই কাজটা স্বীকার করে নিচ্ছে। তাই না কে?’ এর ফলে কে তার ঘোষণাটি সংক্ষেপে শুধু একটি ‘হ্যাঁ’র মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে ও তা বলে শিক্ষককে নয়, ফ্রিডার দিকে তাকিয়ে।

‘সেক্ষেত্রে,’ শিক্ষক বলল, ‘এখন আমার একমাত্র কাজ হচ্ছে আপনাকে আপনার কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা। এর ফলে আমার বরাবরের মতো বুঝেও নিতে পারব আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কটাই বা কি রকম হবে। আপনাকে, আমিনমশাই, দুটো ক্লাসরুমই সাফ করতে হবে, ঘরগুলো গরম রাখতে হবে, বাড়িতে ছোটোখাটো মেরামতের প্রয়োজন হলে তা করবেন, নিজে ক্লাসের আর ব্যায়ামাগারের সরঞ্জাম তদারক করবেন, বাগানের রাস্তাটা তুষারমুক্ত রাখবেন; আমার শিক্ষিকার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করবেন, আর সবচেয়ে বড়ো কাজ গ্রীষ্ম ঋতুতে বাগানের সমস্ত কাজের দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে। এসবের বিনিময়ে আপনার ইচ্ছামতো যে কোনো ঘরে থাকবার সুযোগ আপনি পাবেন, কিন্তু সেটা শুধু তখনই যখন পড়ানোর সময় দুটো ঘরেরই প্রয়োজন পড়বে না; আর আপনি যে ঘরে থাকবেন, প্রয়োজন হলে তা ছেড়ে আপনাকে অন্য ঘরে চলে যেতেই হবে। ঘরে কোনো রান্না-টান্না করতে পারবেন না, তার পরিবর্তে আপনাকে ও আপনার সঙ্গীদের এই সরাইখানা থেকে খাবার সরবরাহ করা হবে গ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে।

আর স্কুলের মর্যাদার সঙ্গে পূর্ণ সংগতি রেখে যে আপনার আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে আর স্কুল চলাকালীন ছাত্রছাত্রীরা যেন আপনাদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ প্রকাশ দেখতে না পায় এটা আমার জানানো বোধ হয় নিঃপ্রয়োজন কারণ একজন শিক্ষিত মানুষ হিসেবে এসব আপনার নিশ্চয়ই জানা। এই প্রসঙ্গে আমার আরো বলার কথা এই যে

ফ্রাউলিন ফ্রিডার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটাকে যত সত্বর একটা আইনি রূপ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে।

এ সমস্ত বিষয় ও আরো নানা ছোটোখাটো শর্ত সম্বলিত একটা চুক্তিপত্র তৈরি হবে। সেটায় আপনাকে সাক্ষর করতে হবে স্কুলে গিয়ে ওঠার পরই, কে-র কাছে এসবের কোনো গুরুত্বই ছিল না। যেন এসবের সঙ্গে তার কোনো যোগই নেই। সে যেন কোনো কিছুই সঙ্গেই যুক্ত নয়।

কিন্তু মাস্টারের মাতব্বরির ভঙ্গিটাও তার পছন্দ হলো না, তাই সে একটু তাকিয়ে দেখিয়েই বলে, ‘জানি, ও সবই তো মামুলি কর্তব্যমাত্র।’ এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া মুখে দিতেই যেন ফ্রিডা বেতন বিষয়ে প্রশ্ন তোলে।

‘কোনো বেতন আদৌ দেওয়া হবে কিনা সেটা স্থির করা হবে আগামী এক মাসের কাজকর্ম দেখার পর।’

‘কিন্তু তাতে তো আমাদের অবস্থাটা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে,’ বলে ফ্রিডা, ‘প্রায় কোনো অবলম্বন ছাড়াই আমাদের বিয়ে করতে হবে। ঘরদোর সাজাবার মতোও হাতে কিছু থাকবে না। আপনি কি আমাদের হয়ে গ্রামসমিতির কাছে গিয়ে বলতে পারেন না গুরুত্বই যাতে উনি বেতনস্বরূপ হাতে কিছু পান? এমন কোনো উপদেশ কি আপনি ওদের দিতে পারেন না?’

‘না,’ উত্তর দেয় শিক্ষক, ‘সে সমস্ত কথাই বলছিল কে-র দিকে চেয়ে, ‘আমি এ বিষয়ে কোনো কথা দিলে তবেই তোমাদের হয়ে গ্রামসমিতিতে প্রতিনিধিত্ব করার প্রশ্ন ওঠে কিন্তু সেরকম কোনো কথা আমি দিতে চাই না। ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের আনুকূল্য দেখাতেই তোমাদের পদটা গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোনো অনুগ্রহকেই বেশি টানাটানি করাটা সঙ্গত নয়, যদি অবশ্য মর্যাদা বিষয়ে কারো কান্ডজ্ঞান থাকে।’

শেষ পর্যন্ত কে-কেই মাঝপথে বাধা দিতে হলো, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রায়, ‘আনুকূল্যের কথা যদি বলতেই হয় মাস্টারমশাই,’ সে বলে, ‘আমার মনে হয় আপনি ভুল করছেন। অনুগ্রহ বোধহয় দেখানো হচ্ছে আমার দিক থেকেই।’

‘না,’ বলে শিক্ষক এখন তার মুখে হাসি, কে-কে সে শেষ পর্যন্ত কথা বলতে বাধ্য করতে পেরেছে, ‘আমি এই বিষয়ে আমার অবস্থান থেকে একচুলও সরতে রাজি নই। স্কুল পরিচালকের প্রয়োজন আমাদের আমিনের প্রয়োজনের মতোই। পরিচালকই বলুন, আর আমিনই বলুন দুটোই আমাদের কাঁধে অতিরিক্ত বোঝা। এখনো আমি ভেবে পাচ্ছি না গ্রামসমিতির কাছে আমি আপনার নিয়োগের যৌক্তিকতা প্রমাণ করব কী ভাবে। সবচেয়ে ভালো হবে প্রস্তাবটা সরাসরি পেশ করা আর তার প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর চেষ্টা আদর্শেই না করা।’

‘আমিও ঠিক তাই বলতে চাই,’ বলে কে, ‘আপনি আমাকে আপনার গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু কেউ যখন ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য কাউকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, তখন সেই অন্যজনই, যে নিজেকে গৃহীত হতে দিচ্ছে আসলে অনুগ্রহ দেখায়।’

‘অদ্ভুত কথা তো।’ বলে শিক্ষক, ‘তা আপনাকে নিতে আমাদের বাধ্যটা করছে কিসে গুনি? আমাদের যা বাধ্য করেছে আসলে তা প্রধানের সহায়তা, বাড়াবাড়ি

রকমের দয়ালু তিনি। আমি বুঝতে পেরেছি আমিনমশাই, এরকম নানা ভুল ধারণা থেকে আপনাকে মুক্ত হতে হবে যদি আপনি নিজেকে স্কুল পরিচালকের কাজে চলনসই প্রমাণ করতে চান। ঘটনাক্রমে, আপনার বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ধরনের কথাবর্তা অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করবে না। এ ছাড়াও আমি আশঙ্কা করছি আপনার চালচলনও ভবিষ্যতে আমাকে বিস্তর ভোগাবে। পুরো সময়টা, আমি তো নিজের চোখেই দেখলাম... যদিও তবুও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে-আপনি আমার সঙ্গে কথা বলে গোপন শুধু জামা আর জাডিয়া পরে।’

‘তাই তো!’ কে চৈচিয়ে ওঠে, হেসে ফেলে ও হাততালি দেয়।

‘বিচ্ছু সহকারীগুলো, ব্যাটারা এতক্ষণ ধরে আছে কোথায়?’ ফ্রিডা ব্যস্ত পায়ে দরজার দিকে এগোয়, আর শিক্ষকটি যখন বুঝতে পারে কে-কে আর কোনো আলোচনাতেই টানা যাবে না তখন ফ্রিডাকে জিজ্ঞাসা করে তারা কখন গিয়ে স্কুলে উঠতে চায়।

‘আজই,’ বলে ফ্রিডা।

‘তাহলে আগামীকালই আমি সব দেখতে টেখতে যাবখন,’ বলে শিক্ষক তাদের বিদায় জানায় ও দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায় কিন্তু ঠিক সেসময় তার ধাক্কা লাগে ঝি-এদের সঙ্গে। তারা এর মধ্যেই তাদের পোটলা পুঁটলি নিয়ে আসতে শুরু করেছিল আবার ঘরের দখল নিতে। শিক্ষকটি কাউকেই রাস্তা ছেড়ে না দিয়ে তাদের মধ্য দিয়ে গলে যায়। ফ্রিডা তাকে অনুসরণ করে।

‘তোমাদের দেখছি বড়োই তাড়া,’ বলে কে, ঝিয়েদের ওপর ভারি প্রসন্ন হয়ে ওঠে সে এখন, ‘আমাদের ধাক্কা দিয়েই ঢুকতে চাও নাকি?’

তারা কোনো উত্তর দেয় না, বিব্রতভাবে পুঁটলিগুলো মোচড়ায়, কে দেখে সেগুলোর ফাঁক দিয়ে নোংরা কাপড় চোপড় উঁকি দিচ্ছে। ‘এখনও তাহলে ওগুলো কেচে উঠতে পারনি?’ বলে কে। কথাগুলো অবশ্য বলা হয় কোনো বেদ্বৈষের সুরে নয়, বরং কিছুটা প্রশ্রয়ের সঙ্গেই। তারা এটা লক্ষ্য করে, একসঙ্গে কঠিন মুখব্যাদান করে, জন্তুসদৃশ সুগঠিত দন্তবিকাশ করে নিঃশব্দে হাসতে থাকে।

‘আমার সঙ্গে এস,’ বলে কে, ‘এখানে জিনিসপত্র রাখো। এখন থেকে এঘর তোমাদেরই।’

তবুও তারা দ্বিধা করছে দেখে-ঘরের পরিবর্তনটা তাদের থাকার পক্ষে বাড়াবাড়ি রকম ভালো মনে করেই সম্ভবত-কে একজনের বাহু ধরে ঘরে ঢোকানোর অভিপ্রায়ে, কিন্তু তখনই সে তা ছেড়ে দেয় যখন দেখে তারা দুজন বিস্মিত স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে আবার তারা কে-র দিকে তাকিয়ে রয়েছে। নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে আবার তারা কে-র দিকে অপলক চেয়ে থাকে। ‘ব্যস, অনেক দেখা হয়েছে আমাকে,’ সে বলে জ্পস্ট, অস্বস্তিকর এক ধরনের অনুভূতি চাপা দিতে। সে জামা কাপড়, বুট পরে নেয়, এগুলো ফ্রিডা তার সহকারীদের সহ্য করে তা সবসময়ই কে-র কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছে আগে। এখনো আবার তাই মনে হয় তার। বহু খোঁজ করার পর সে দেখে নিজের ঘরে বসে ভারি শান্তিতে ভোজনে ব্যাপ্ত রয়েছে তারা।

যে পোষাকটা বেড়ে টেপে পরিস্কার করার কাজে তাদের ব্যস্ত থাকা উচিত ছিল তা তাদের কোলের ওপর দলা পাকিয়ে রয়েছে। সমস্ত কিছু ফ্রিডাকেই পরিস্কার করতে হয় **তবু** সে তাদের তিরস্কার পর্যন্ত করেনি এদের মতো লোককে কিভাবে টিট করতে হয় **তা** তার ভালোভাবে জানা থাকা সত্ত্বেও। বরং তাদের সমানেই সে তাদের কাজে গাফিলতির বিষয়ে এমনভাবে বলে যেন ওগুলো খুবই তুচ্ছ বিষয়, একজনকে তো সে এমনভাবে গালে আলতো চাপড় দিল যেন তাকে আলিঙ্গন করছে। একটু পরেই এই বিষয়টা নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়াটা অত্যন্ত জরুরি।

‘ওরা এখানেই থাকুক, তোমাকে সব সরাতে টরাতে সাহায্য করতে পারবে,’ সে বলল। ব্যবস্থাটি অবশ্য তাদেরও খুব মনোমত হয়। আনন্দিত ও শক্তিতে ভরপুর তাদেরও শরীরচর্চার একটু প্রয়োজন ছিল। ফ্রিডা যখন বলল, ‘নিশ্চয়ই, এই তোমরা এখানেই থাক,’ তারা তা তখনি মেনে নেয়।

‘কোথায় যাচ্ছি জান?’ জিজ্ঞাসা করে কে।

‘হ্যাঁ,’ উত্তর দেয় ফ্রিডা। ‘এবং তুমি আমাকে আটকে রাখতে চাওনা?’ জিজ্ঞাসা করে কে।

‘তোমার ঝামেলার তো এমনিতেই শেষ নেই,’ সে বলল; ‘এক্ষেত্রে আমি কি বললাম না বললাম তার মূল্য কতটুকুই বা?’

সে কে-কে চুমু খেয়ে বিদায় জানায়। দুপুরে তার কোথাও খাওয়া জুটবেনা বলে তার হাতে রুটি সসেজের একটা প্যাকেট ধরিয়ে দেয়। নিচ থেকে সে এসে যেন সরাসরি সে স্কুলে গিয়ে ওঠে ও তার সঙ্গে সঙ্গে সে দরজা পর্যন্ত যার। কে-র ফাঁধে তার হাত।

৮

ঝি ও সহকারীদের ভিড়ে ঠাসা গরম ঘরটা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে কে-র প্রথমে বেশ আনন্দ হয়েছিল। বাইরে ঠাণ্ডা এখন তাপাঙ্কের নিচে, তুষার আরো কঠিন হয়ে উঠেছে বলে হাঁটাও তার কাছে অপেক্ষাকৃত সহজ বলে মনে হলো তার। কিন্তু অন্ধকার ইতিমধ্যেই ভালোরকম ঘনিয়ে আসছিল বলে সে তার পদক্ষেপ দ্রুততর করে।

দুর্গের সীমারেখা এর মধ্যেই মুছে গিয়েছিল ও তা এখন, যেমন সবসময় থাকে, নিঃশব্দ একেবারে। এখন পর্যন্ত কে সেখানে জীবনের সামান্য লক্ষণ পর্যন্ত কখনো দেখতে পায়নি। এমন হতেই পারে যে এই দূরত্ব থেকে ওখানকার কোনো কিছু চিনে ওঠা সম্ভব নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও চোখের দাবী থেকেই যায়। তার এই নিস্তব্ধতা অসহনীয় মনে হয়। এই দুর্গটার দিকে তাকালেই কে-র মনে হয় সে যেন এমন কাউকে পর্যবেক্ষণ করছে যে তার সামনে শান্ত স্থির বসে আছে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে, সব বিস্মৃতি হয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে নয়, বরং পূর্ণ স্বাধীন অচঞ্চল এক সত্তা নিয়ে, যেন সে একক, তাকে লক্ষ্য করার কেউ নেই, অথচ সচেতন যে সে লক্ষিত হচ্ছে কিন্তু এ সত্ত্বেও সামান্য বিচলিত না হয়ে সে তার শান্ত ভাবটি রক্ষা করে যায়।

আর বাস্তবিকপক্ষেই-কারো পক্ষে বলাও সম্ভব না তা কারণ না ফলশ্রুতি-কোনো দর্শকের দৃষ্টিই ওখানে দীর্ঘক্ষণ কেন্দ্রীভূত রাখা সম্ভব হয় না, পিছলে অন্যদিকে সরে যায়। এই অনুভূতি তার এখন আরো প্রগাঢ় হলো ঘনায়মান প্রদোষকালে। যত সে তাকিয়ে থাকে ততই সে কম দেখতে পায় ও সবকিছু অধিকতর গোপালির ধোঁয়াশায় হারিয়ে যেতে থাকে।

হেরেনহফে গিয়ে কে পৌছোনো মাত্রই, তখনো কোনো ঘরে আলো জ্বলেনি, দোতলায় একটা ঘরে জানালা খুলে গেল আর তা থেকেই উনি দিল শজ্ঞাপোক্ত পরিষ্কার করে কামানো এক মুখ, ফারকোট্টে আবৃত, ও জানালা থেকেই চেয়ে রইল। কে-র সম্ভাষণে তার মধ্যে সামান্য ভাবান্তরও লক্ষ্য করা গেল না। হলঘর বা ট্যাপরুমেও কে কাউকে দেখতে পেল না। গতবারের চেয়ে এখন বাসি বিয়ারের কটু গন্ধ আরো উগ্র হয়ে উঠেছে। সেতুর কাছে সে সরাইখানাটা আছে সেখানে পর্যন্ত এমন নোংরামো বরদাস্ত করা হয় না।

কে সরাসরি সেই দরজাটার দিকে এগিয়ে যায় যেটার ফুটো দিয়ে সে ক্ল্যামকে দেখে। এবার সে খুব সন্তর্পণে ছিটকিনি খোলে। কিন্তু দরজাটা বন্ধ রয়েছে। এবার সে আঙুল বুলিয়ে ফুটোটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করে কিন্তু পিন দিয়ে সেটা এমন সুচারুভাবে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সে ফুটোটা খুঁজেই পায় না। অতএব তাকে দেশলাই জ্বালতে হয়। আকস্মিক এক চিৎকারে সে চমকে ওঠে। ঘরে কোণের দিকটাতে, দরজা ও কাউন্টারের মাঝখানে, অগ্নিকুন্ডের ধারে হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে এক তরুণী, দেশলাইয়ের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে দেখা যায় তার দিকে সে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে, চোখে নিদ্রাতুর ভাব। স্পষ্টতই সে ফ্রিডার জায়গায় এসেছে। দ্রুত সংবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে সে ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে দেয়। ভাবটা বিরক্তির, কিন্তু তখনি সে কে-কে চিনতে পারে।

‘ও, আমিন ভাই!’ সে মৃদু হেসে বলে, হাত এগিয়ে দিয়ে নিজেকে পরিচিত করে, ‘আমার নাম পেপি।’ মেয়েটা দেখতে ছোটোখাটো, গাল দুটি লাল, কিঞ্চিৎ গোলগাল ধরনের।

তর বিপুল রক্তিম সোনালী কেশরাশির লম্বা বিনুনি নিচ পর্যন্ত নেমে এসেছে, কিছু চুল অবশ্য অবিন্যস্ত হয়ে মাথায় তালুর কাছে কঁকড়ে রয়েছে। সে পরে রয়েছে ধূসর উজ্জ্বল কাপড়ে বানানো পোষাক, সেটা সোজা নেমে এসেছে অনেক নিচে তার পক্ষে একেবারেই বেমানানভাবে। পায়ের কাছে সেটা গুটিয়ে রাখা হয়েছে জবজব সিন্কেয় ফলি দিয়ে, নিশ্চিতভাবে তার চলাফেরার বাধার সৃষ্টি করে। সে ফ্রিডার কথা জিজ্ঞাসা করে ও জানতে চায় শীঘ্রই তার ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা। প্রশ্নটি ঔদ্ধত্যের সীমা প্রায় অতিক্রম করে গেল।

‘ফ্রিডা চলে যাবার পরই,’ সে এর পরই বলে, ‘আমাকে তাড়াহুড়ো করে ডেকে আনা হয়েছিল কারণ সেই মুহূর্তে অন্য কোনো লোক ওরা খুঁজে পায়নি। এর আগে আমি ছিলাম শোবার ঘরের তদারকিতে।

কিন্তু নতুন এই যে কাজটা পেলাম তা মোটেই আগের কাজটার চেয়ে ভালো না। সারা সন্ধ্যা, রাত জুড়ে প্রচুর কাজ করতে হয় এখানে, ভীষণ ক্লান্তিকর। এসব আমার

বেশিদিন আর পোষাবে বলে মনে হয় না। ফ্রিডা যে একাজ ছেড়ে কেটে পড়েছে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।’

‘ফ্রিডা কিন্তু এখানে সুখেই ছিল,’ বলে কে, তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে যে সে ও ফ্রিডা সমগোত্রীয় নয় এবং সেও যে তুলনাটা পছন্দ করল তা মনে হলো না।’

‘ওর কথা বিশ্বাস করবেন না,’ বলে পেপি, ‘যে কোনো লোকের চেয়ে বেশি মনের কথা ও লুকিয়ে রাখতে পারে, ওর যা স্বীকার করতে আপত্তি তা ও স্বীকার করে না, তাই কেউ বুঝতেই পারে না যে ওর কিছু স্বীকার করার থাকতে পারে। অনেক বছর ধরেই আমি ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা কোনোদিনই তেমনভাবে হয়নি। আর এও নিশ্চিত এর মধ্যে ও আমায় ভুলেও গেছে। বোধ হয় ওর একমাত্র বন্ধু বীজ ইনের বুড়ি মালিকানাটা। আর সেটাও তো মস্ত কেছার ব্যাপার একটা।’

‘ফ্রিডা আমার বন্ধবী,’ বলে কে, একই সময় দরজায় ফুটোটা খুঁজতে খুঁজতে।

‘জানি,’ বলে পেপি, ‘ওই জন্যই তো আপনাকে কথাটা বললাম। তা না হলে এসব আপনি শুনতে যাবেনই বা কেন?’

‘বুঝছি,’ বলল কে, ‘তুমি বলতে চাইছ তাহলে এমন এক চাপা স্বভাবের মেয়ে পেয়ে আমার গর্ব হওয়া উচিত।’ ‘ঠিক তাই,’ বলল সে জয়ের হাসি হেসে, যেন ফ্রিডার বিষয়ে কোনো গোপন আঁতাত এই মুহূর্তে সে করে ফেলল কে-র সঙ্গে।

কিন্তু কে তার ছিদ্রাষেষণে ঢিলে দেয় শুধু তার কথাগুলো শুনে বিচলিত হয়ে উঠেই নয়। সে চঞ্চল হয়ে ওঠে তার আকৃতিতে ও এই মুহূর্তে এখানে তার উপস্থিতিতেও। নিশ্চিতভাবে সে ফ্রিডার চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো, তাকে প্রায় শিশুই বলা যায় তুলনায়, তার পোশাক আসাকও বেশ হাস্যকর। নিশ্চিতভাবে সে বারমেডের কাজটাকে অতিসন্তোষ প্রদায়ক কিছু ভেবে নিয়েই তার সঙ্গে মানানসই এমন অভ্যুত পোশাক পরেছে। আর তার এই দৃষ্টিভঙ্গি তার দিক দিয়ে যথার্থই বলা যায় কারণ তার যোগ্যতার পক্ষে উঁচু এই কাজটি সে পেয়ে গেছে ভাগ্যক্রমে, বিনা পরিশ্রমেই, যদিও অল্প সময়ের জন্য। এমনকি ফ্রিডা সব সময় তার বেল্ট সংলগ্ন যে জালের কাজ করা থলিটা নিয়ে ধুরত বিশ্বাস করে সেটা পর্যন্ত তাকে দেওয়া হয়নি। আর তার পদটি বিষয়ে অসন্তুষ্ট যে কথাগুলো সে বলল তাও নিজের গুরুত্ব বোঝাতেই আসলে।

কিন্তু তবু, তার শিশুসুলভ মানসিকতা সত্ত্বেও কে-র মনে হলো তার সঙ্গে বোধ হয় দুর্গের কোনোরকম সংযোগ রয়ে গেছে। মিথ্যে যদি ও না বলে থাকে তাহলে শোবার ঘর ও আগে দেখাশোনা করত। নিজের সম্পদ বিষয়ে অসচেতন থেকেই ও এতদিন এখানে ঘুমিয়েছে। আর সে যদি এই ছোটোখাটো, গোলগাল, ঈষৎ স্থূল পশ্চাদেশ সম্পন্ন প্রাণীটিকে তার বাহুতে পিষ্ট করে তার সম্পদ আহরণ করতে ব্যর্থও হয় তবু তার সঙ্গে সম্পর্ক তো স্থাপন করতে পারবে ও তাকে আরো কষ্টসাধ্য কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে। সেক্ষেত্রে তার ব্যাপারটাও কি ফ্রিডার মতো হয়ে দাঁড়াবে? না, না, ফ্রিডার ঘটনাটা অন্য রকম ছিল।

শুধু ফ্রিডার দৃষ্টির কথা ভাবলেই যে কেউ তা বুঝতে পারবে পেরিপিকে স্পর্শ করা কে-র পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। সে পেরিপির থেকে চোখ নামিয়ে নেয়, এতক্ষণ সে তার দিকে লোভীর মতো চেয়েছিল।

‘এখানে আলো জ্বালানো নিয়মবিরুদ্ধ,’ বলে পেপি, আলো নিভিয়ে দিয়ে।

আপনি আমাকে অত ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন বলেই আলো জ্বালিয়েছিলাম।
আপনি এখানে সত্যি কী চান বলুন তো? ফ্রিডা কিছু ফেলে গেছে কি?’

‘হ্যাঁ,’ বলে কে, দরজার দিকে দেখিয়ে, ‘একটা টেবিল কভার, পাশের ঘরটাতে।’

‘হ্যাঁ, ওর টেবিল কভার,’ বলে পেপি, ‘আমার মনে পড়ছে, দারুণ বাহারের জিনিস, আমি নিজেও ওকে ওটার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলাম কিন্তু সেটা ঐ ঘরে থাকবে কী করে?’

‘ফ্রিডা তো তাই মনে করেছে। ঐ ঘরে থাকে কে?’

জিজ্ঞাসা করে কে। ‘কেউ না,’ বলল পেপি ‘ওটা ভদ্রলোকদের ঘর। ওঁরা ওখানে খাবার-টাবার খান, পান করেন। মানে ঘরটা ঐ জন্যই ব্যবহার হয় আর কি। কিন্তু আসলে প্রায় সকলেই থাকেন ওপরে, যে যার নিজের ঘরে।’

‘কোনোমতে যদি জানতে পারতাম ঐ ঘরে এই মুহূর্তে কেউ নেই নিশ্চিত হওয়াটাই তো কঠিন; যেমন ধর, ক্ল্যামের অভ্যাস বেশির ভাগ সময় ওখানেই বসে থাকা।’

‘ক্ল্যাম এখন ওখানে কিছুতেই থাকতে পারেন না।’ বলে পেপি, ‘এই মুহূর্তেই উনি যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, উঠানে ওঁর জন্য শ্লেজ অপেক্ষা করছে।’

কোনো বিস্ময়সূচক উক্তি না করেই কে পানশালা ত্যাগ করে সেই মুহূর্তে। হলঘরে পৌঁছেই সে ফেরে, দরজার দিকে নয়, বাড়ির ভিতর দিকটায়। তারপর কয়েকটা সিঁড়ি টপকেই একদম উঠানে নামে। ভারি প্রশান্ত ও মায়াবী জায়গাটা। চারকোণা এক উঠোন, তিন দিকের বাড়ির দেয়াল দিয়ে ঘেরা, রাস্তার দিকটা-এই পার্শ্ববর্তী গলিটা কে-র কাছে অচেনা। উঁচু সাদা দেয়ালের আবেষ্টনী। তার পাশেই রয়েছে বিশাল ভারি একটা গেট, এই মুহূর্তে খোলা। উঠোনটা থেকে বাড়টাকে সম্মুখভাগের চেয়ে অনেক বেশি নিস্তর্র বলে মনে হয়। পুরো দোতলাটাই যেন বাড়িটা থেকে অনেকটা সামনে এগিয়ে এসেছে। অংশটাকে অনেক আকর্ষণীয় বলেও মনে হয় কারণ পুরো অংশটাই ঘেরা কাঠের আবেষ্টনীতে, তার মাঝে শুধু একটা ছোটো ফাঁক, বোধহয় উঁকি দিয়ে দেখার জন্য।

কে-র উল্টোদিকে, একতলায় কোণের দিকে, যেখানে বাড়ির সম্প্রসারিত অংশটি মূল ভবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, একটা উন্মুক্ত পথ দেখা গেল, কোনো দরজা নেই সেখানে। ঠিক এর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে গাঢ় রঙের চারধার ঘেলা একটা শ্লেজ, তাতে দুটো ঘোড়া জোতা! কোচোয়ানকে এই দূরত্ব থেকে প্রদোষের অন্ধকারে দেখার চেয়ে অনুমান করে নিতে হচ্ছিল বেশি। এছাড়া সমস্ত জায়গাটা একেবারেই মনুষ্যহীন।

নিজের চতুর্দিকে সতর্কভাবে তাকাতে তাকাতে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে কে ধীরে ধীরে শ্লেজের কাছে এগিয়ে যায়। কোচোয়ানকে আগের রাতেই সে ট্যাপরুমে চাষিদের মধ্যে দেখেছিল। ফারকোট গায়ে চাপিয়ে জুত করে বসে সে উদাসীন ভাবে কে-কে এগিয়ে আসতে দেখে, যেভাবে মানুষ বেড়ারের গতিবিধি লক্ষ্য করে। এমনকী সে যখন তার নাকের ডগায় এসে দাঁড়াল ও তাকে সম্বোধন করল, যাতে ঘোড়াগুলো পর্যন্ত

চঞ্চল হয়ে উঠল অন্ধকার ফুঁড়ে একটা মানুষের আবির্ভাবে, সে তখনো সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকে।

কে তো ঠিক তাই-ই চায়। সে দেয়ালে হেলান দিয়ে তার খাবার বার করে। তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে খাবার গছিয়ে দেবার জন্য সে এই মুহূর্তে ফ্রিডার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল। সে এইসময় বাড়ির ভিতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। বন্ধিম ভগ্ন সোপানশ্রেণি নেমে গেছে নিচের দিকে, তাকে ছেদ করেছে নিচু কিন্তু আপাদদৃষ্টিতে গভীর এক বারান্দা। সবকিছুই পরিচ্ছন্ন, চুনকাম করা। সমস্ত কিছুর আকৃতি স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে।

যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সময় কে-কে অপেক্ষা করতে হলো। অনেক আগেই তার আহার সমাপ্ত হয়ে গেছে, প্রচণ্ড শীতে তার এখন জমে যাবার অবস্থা, সন্ধ্যার অন্ধকার এখন নিশ্চিন্দ হয়ে এসেছে অথচ এখনো ক্ল্যামের দেখা নেই।

‘আরো, বহু সময় লাগতে পারে,’ হঠাৎ বলে ওঠে এক কর্কশ কণ্ঠ। এত কাছ থেকে আওয়াজটা আসে যে কে আঁতকে ওঠে। বজা আসলে কোচোয়ান। সে এখন জেগে উঠে হাত পা ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙে, সশব্দে হাই তোলে।

‘কিসের পক্ষে অনেক লম্বা সময়?’ কে জিজ্ঞাসা করে। তার শান্তিভঙ্গ করার জন্য সে তো লোকটার ওপর বিরক্তি বোধ করেই না বরং কৃতজ্ঞই হয়, কারণ এই অন্তহীন নৈঃশব্দ ও টান টান উত্তেজনা তার স্নায়ুর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল ইতিমধ্যে।

‘আপনার বিদায় নেবার পক্ষে,’ বলে কোচোয়ান। এতদ্বারা সে যে ঠিক কী বোঝাতে চাইল তা কে-র মগজে ঢুকলো না। কিন্তু সে আর কোনো প্রশ্নও করে না। তার মনে হয় এটিই এই উদ্ভত লোকটাকে কথা বলাবার প্রকৃষ্ট পন্থা। এই নিশ্চিন্দ অন্ধকারে কোনো প্রতিউত্তর না করাটাই একটা চ্যালেঞ্জের মতো।

আর বাস্তবিকই, একটু বিরতির পর কোচোয়ান নিজেই জিজ্ঞাসা করে, ‘আপনি একটু ব্র্যান্ডি পান করবেন?’

‘হ্যাঁ,’ বলে কে, কোনো চিন্তা না করেই শুধু এই প্রস্তাবে লুপ্ত হয়ে, সে জমে যাচ্ছিল ঠান্ডায়।

‘তাহলে শ্লেজের দরজা খুলুন’ বলে কোচোয়ান।

‘দেখবেন পাশের খোপে কয়েকটা বোতল রয়েছে। একটা নিয়ে আপনি পান করুন; তারপর আমার হাতে তুলে দিন। এই ফারকোট গায়ে আমার নিচে নামটা অসুবিধেরই।’

লোকটা তাকে হুকুম করছে দেখে কে একটু গরম হয়ে উঠেছিল কিন্তু এখন কোচোয়ানটাই তার ভরসা এমন মনে হওয়ায় সে তার নির্দেশই পালন করে, শ্লেজের ভিতর ক্ল্যাম বসে থাকতে পারেন সম্ভাব্য এই ঝুঁকি নিয়েও। সে শ্লেজের একটা চওড়া দরজা খোলে। দরজার ভিতর দিকে সাঁটা খোপ থেকে বোতল বার করে আনতে তার কোনো অসুবিধা হবার কথাই না। কিন্তু দরজা খোলা দেখে শ্লেজের ভিতরে ঢোকার তীব্র এক বাসনা তার দূর্দমনীয় হয়ে উঠল। সে ভিতরে সঁধিয়ে যায়। ভিতরটা আরামদায়ক উষ্ণতায় ভরা এ সতেও যে দরজাটা এতক্ষণ খোলা ছিল।

কে সাহস করে দরজাটা বন্ধ করতে পারেনি। এখানে কেউ যদি ঢোকে তো বুঝতেই পারবে না সে কোনো সিটে বসে আছে কিনা কারণ সে আবৃত হয়ে থাকবে কম্বলে। নরম গদিতে ও পশুচর্মে। এখনে যে কোনো দিকেই কেউ হাত পা ছড়াক না কেন সে ঢুকে থাকবে কোমলতা ও অপূর্ব উষ্ণতায়। হাত ছড়িয়ে দিকে চেয়ে থাকে। ক্ল্যাম আসতে এত দেরিই বা করছেন কেন? বরফের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর এই উষ্ণতায় যেন হতবুদ্ধি হয় কে প্রার্থনা করতে লাগল ক্ল্যাম যেন এখনি আসেন। তার বর্তমান অবস্থায় ক্ল্যামের সঙ্গে দেখা হওয়াটা যে বাঞ্ছনীয় নয় একথা কে-র মনে অস্পষ্টভাবে উঁকি দিয়ে গেলেও সেটা তার আরামের বিঘ্ন ঘটাবে এটুকুই তাকে বিব্রত করে প্রকৃতপক্ষে। তার এই বিভ্রমজনিত অবস্থাটি আরো প্রশ্নই পায় কোচোয়ানের ব্যবহারেও। সে ঠিকই জানে যে কে শ্লেজের ভিতরেই বসে আছে কিন্তু তাকে সে সেখানেই থাকতে দেয়, ব্র্যাণ্ডির বোতলটা পর্যন্ত একবারের জন্য দাবি না করে। তার দিক থেকে খুবই সহৃদয় ব্যবহার সন্দেহ নেই ও প্রত্যুত্তরে কে-ও তার উপকার করতে তৎপর হয়।

ধীরে ধীরে সামান্য স্থানচ্যুত না হয়ে সে পাশের খোপে হাত ঢোকায়, খোলা দরজার দিকে নয়, তার পিছন দিকে বন্ধ দরজার পাশে। অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না কারণ সেখানেও বোতলের কোনো কমতি নেই। সে একটা টেনে বার করে। ছিপি খুলে শৌকে ও অচেতন ভাবেই মৃদুহাস্য করে। গন্ধটি অতি মনোরম, যেন অতি প্রিয় কারো উচ্চারিত প্রশংসাবাক্য। মধুর শব্দরাজি। যদিও অবশ্য অজান্তে, সেগুলো বর্ষিত হচ্ছে কি কারণে, জানার বাসনাও থাকে না।

শুধু গভীর সুখ এই চিন্তায় যে তা নির্গত হচ্ছে এক বন্ধুর মুখ থেকে।

‘এ কি সত্যিই ব্র্যাণ্ডি?’

কে নিজেকেই প্রশ্ন করে সন্দিহান হয়ে ও কৌতূহলবশত তার আশ্বাদ নেয়। হ্যাঁ, এ ব্র্যাণ্ডিই বটে, তার অন্তস্থলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, তাকে উত্তপ্ত করে তোলে। যেটাকে গোড়ায় মনে হয়েছিল কোচোয়ানের যোগ্য সস্তা গন্ধভরা মাল তা পান করার পর কি অপূর্ব সুদারসেই না পরিবর্তিত হয়ে গেল।

‘এ কি সত্যি?’ সে নিজেকেই যেন ভৎসনা করে জিজ্ঞাসা করে ও আরেক ঢোক গলায় ঢালে।

এইসময়-কে ঠিক যখন লম্বা একটা চুমুক মারছে-সবকিছু উজ্জ্বল হয়ে উঠল; ইলেকট্রিক আলোয় ঝলসাতে লাগল ভিতরের সিঁড়ি, দরদালান, বৈঠকখানা, দরজার বাইরেটা সিঁড়ি দিয়ে কারো অবতরণের পদধ্বনি শোনা গেল, কে-র হাত থেকে মদের বোতল খসে পড়ল, একটা কম্বলের ওপর মদ চলকে পড়ে ভিজিয়ে দিল। কে লাফিয়ে শ্লেজ থেকে নেমে পড়ল।

কোনো মতে শ্লেজের দরজা বন্ধ করতে পারল, এর ফলে জোর শব্দ হয়। ঠিক এই সময় বাড়ির ভিতর থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। সান্ত্বনা শুধু এই ইনি ক্ল্যাম নন, নাকি এটাকে দুঃখজনকই বলা যাবে? ইনি আসলে সেই ভদ্রলোক যাকে কিছুক্ষণ আগে জানলায় কে দেখেছিল। বয়সে তরুণ, সুদর্শন কিন্তু খুবই গম্ভীর প্রকৃতির।

কে তার দিকে গভীরভাবে তাকায় কিন্তু তার গান্ধীর্যের কারণ একান্তই ব্যক্তিগত। তার উচিত ছিল সহকারীদেরই এখানে পাঠানো কারণ তার তুলনায় কত বেশি বোকামি আর তারা দেখাতে পারত? ভদ্রলোক তখনো তাকে নিঃশব্দে লক্ষ্য করছিলেন এমনভাবে যেন প্রয়োজনীয় কথা বলার মতো দম তাঁর বুকে আর অবশিষ্ট নেই।

‘এরকম তো আগে কখনো শোনা যায়নি,’ অবশেষে বলেন তিনি, টুপিটাকে কপালের একটু পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে, ‘এরপর তাহলে কী?’

শ্লেজের ভিতরে কে-র থাকার কথাটা তো ভদ্রলোকের জানার কথা নয়, অথচ তার মনে হচ্ছে, এমন আগে শোনা যায়নি? তাহলে কি তিনি বোঝাতে চাইছেন কে-র এতদূর উঠোন পর্যন্ত আসার ব্যাপারটাই?

‘এতটা আপনি এলেন কী করে?’ এই হলো ভদ্রলোকের পরের প্রশ্ন, করলেন মরমভাবে, আবার আগের মতো স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে নিতে, যেন যা অবধার্য তা মেনে নিতেই হবে এমন একটা হাল ছাড়া ভাব করে। কি অদ্ভুত প্রশ্ন? এর উত্তরই বা কী দেওয়া যায়? এই লোকটির কাছে তাহলে কে-কে কি খোলাখুলিভাবে স্বীকার করতে হবে নাকি যে অনেক আশা নিয়ে যে প্রচেষ্টার সূত্রপাত সে করেছিল তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে?

কোনো উত্তর না দিয়ে কে শ্লেজের দিকে ফেরে, দরজা খোলে, ভিতর থেকে টুপিটা উদ্ধার করে, সেটা সে সেখান থেকে তুলে আনতে ভুলে গিয়েছিল। সে অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করে গাড়ির পাদানীতে তখনও ব্র্যান্ডি গড়ছে। এবার সে ভদ্রলোকের দিকে ফেরে আবার। সে যে শ্লেজের ভিতর ঢুকেছিল এটা তার কাছে প্রকাশ করতে এখন তার আর তেমন বিবেক দংশন হচ্ছিল না, সেটাই যে সবচেয়ে মন্দ ঘটনা তাতো নয়। তাকে যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলেই শুধু তার জানানোর প্রয়োজন যে কোচোয়ান নিজে তাকে শ্লেজের দরজা খুলতে বলেছিল।

কিন্তু আসল বিপর্যয়টা হলো এই যে সে নিজেকে এই লোকটি দ্বারা বিস্মিত হতে দিয়েছিল, এই যে, এই লোকটি থেকে আত্মগোপন করার মতো যথেষ্ট সময় পায়নি যার ফলে যথেষ্ট সময় ক্ল্যামের জন্য অপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব হতো, কিনা তার এমন উপস্থিত বুদ্ধি মগজে এল না যে সে শ্লেজের ভিতরেই বসে রইল, দরজাটা বন্ধ করে দিল, কক্ষের মধ্যে সঁধিয়ে গিয়ে চুপ করে বসে রইল ক্ল্যামের প্রতীক্ষায়, কিংবা অন্তত সেখানে চেপে বসে রইল যতক্ষণ এই লোকটি এখানে থাকে।

অবশ্য এটাও সত্য যে তার জানবার উপায় ছিল না যে এগিয়ে আসছে সে স্বয়ং ক্ল্যাম ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে কিনা। সেক্ষেত্রে অবশ্য এগিয়ে গিয়ে শ্লেজের বাইরে ক্ল্যামের মুখোমুখি হওয়াটা অনেক সুবিবেচনার কাজ হতো। হ্যাঁ, অনেক কিছুই চিন্তা করার ছিল, কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই। কারণ সব শেষ হয়ে গেছে।

‘আমার সঙ্গে আসুন তো,’ বলে ভদ্রলোকটি, ঠিক হুকুমের সুরে নয়, কথাগুলোর মধ্যে কোনো হুকুম ছিল না, বরং তা প্রকাশ পায় তার অভ্যস্ত নির্লিপ্ত অঙ্গুলিনির্দেশের মধ্যে যা তার উচ্চারিত শব্দের সঙ্গে এগোতে নির্দেশ করে।

‘আমি এখানে একজনের জন্য অপেক্ষা করছি,’ বলে কে, কোনো সাফল্যের আশায় নয়, শুধুমাত্র তার আদর্শবোধ থেকে, ‘আসুন,’ বলে ভদ্রলোকটি প্রায়

অশ্রুতভাবে, যেন সে দেখাতে চায় কে যে কারো জন্য অপেক্ষা করছে এ বিষয়ে তার কোনোই সন্দেহ ছিল না।

‘কিন্তু তাহলে তো যার জন্য অপেক্ষা করছি তার সঙ্গে দেখাই হবে না।’ বলে কে, দ্রুত মাথা নাড়িয়ে। যা কিছু ঘটে গেছে তা সত্ত্বেও তার মনে হচ্ছিল তার বোধ হয় কিছু লাভই হয়েছে। যদিও এটাও তার কল্পনা, তবু সেটাও তার বিসর্জন দেওয়া ঠিক হবে না শুধুমাত্র একটি নম্র অনুরোধের খাতিরে।

‘আপনি ওঁর নাগাল পাবেন না কোনো অবস্থাতেই সে আপনি থাকুন বা চলে যান,’ বলে ভদ্রলোকটি নীরসভাবে, কিন্তু কে-র চিন্তাধারার প্রতি অপ্রত্যাশিত সহানুভূতি দেখিয়ে।

‘তাহলে আমি বরং ওঁর জন্য অপেক্ষাই করি, ওঁর নাগাল পাই বা না পাই,’ বলে কে উদ্বতভাবে। শুধু এই ছোকরার ছঁদো কয়েকটা কথা শুনেই এখান থেকে সরে পড়বে এমন বুদ্ধি সে নয়। এতে মাথাটি পিছনে হেলিয়ে দিয়ে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভদ্রলোকটি দু-এক মুহূর্তে জন্য চোখ বোজেন, যেন কে-র অর্থহীন নির্বুদ্ধিতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে নিজস্ব কঠিন যুক্তিবোধের মধ্যে তিনি ফিরে আসতে চাইছেন, ইষৎ দ্বিধাবিভক্ত ওষ্ঠের ওপর জিব্বালেহন করে ও অবশেষে কোচোয়ানকে বলেন, ‘ঘোড়াগুলো খুলে দাও।’

ভদ্রলোকের প্রতি অনুগতভাবে দেখিয়ে কিন্তু কে-র দিকে ত্রুদ্র ভঙ্গিতে আড়চোখে তাকিয়ে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি এবার নিচে অবতীর্ণ হয় ফারকোট পরা থাকা সত্ত্বেও ও কাজ আরম্ভ করে গভীর অনিচ্ছার সঙ্গে। কে আবিষ্কার করল সে পরিত্যক্ত হয়েছে। শ্লেজটি চলে যাচ্ছে একদিকে আর ভদ্রলোকটি যাচ্ছেন অন্যদিকে, যে পথ ধরে সে নিজে এসেছিল। ভদ্রলোক ও গাড়িটি মিলিয়ে যেন থাকে অতি ধীরে যেন তারা কে-কে বোঝাতে চাইছে এখনো সে ইচ্ছা করলে তাদের ডেকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

এমন শক্তি হয়ত তার রয়েছে কিন্তু তা প্রয়োগের বিনিময়ে তার লাভ কিছুই হবে না। শ্লেজটা ডেকে আনার অর্থ হলো তার নিজেকে এখান থেকে যেতে বাধ্য করা। সুতরাং একা নিধিরামের মতো দাঁড়িয়ে থাকে সে সেখানে কিন্তু এই বিজয় লাভে তার কোনো উল্লাস হয় না। পর্যায়ক্রমে সে একবার ভদ্র লোকটির দিকে আর একবার কোচোয়ানের পশ্চাদভাগের দিকে তাকায়। ভদ্রলোক ইতিমধ্যে সেই দরজাটার কাছে পৌঁছে গেছেন যেটা দিয়ে কে কিছুক্ষণ আগে উঠোনে নেমেছিল। তবুও তিনি একবার কে-র দিকে ফিরে তাকান।

কে-র মনে হলো তিনি যেন একবার মাথাও নাড়ালেন তার গোঁয়াতুর্মিতে অধীর হয়ে। এরপর তিনি স্থির চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপে ফিরে গিয়ে হলঘরে ঢোকেন ও নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যান। কোচোয়ানটি কিছুক্ষণ উঠোনেই থাকে, শ্লেজটা নিয়ে তার এখন অনেক কাজ। তাকে চালাঘরের ভারি দরজা খুলতে হবে, শ্লেজটাকে ভিতরে ঢোকাতে হবে, ঘোড়ায় ওপর থেকে জোয়াল খুলে নেওয়াও দরকার, তাদের আবার আন্তাবলে ঢোকাতে হবে। সে এ সমস্তই করে গভীরভাবে, খুব নিবিষ্টচিত্তে, স্পষ্টতই খুব তাড়াতাড়ি যে রওনা দিতে পারবে এমন কোনো আশা বিসর্জন দিয়েই।

আর সে যে কাজে মগ্ন থেকে একবারের জন্যও কে-র দিকে চোখ ফেরাল না তাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল কে-র প্রতি তার তিরস্কার কত তীব্র, ভদ্রলোকটির চেয়ে বহুগুণ বেশি, এবং এবার চালাঘরের কাজ শেষ করে কোচায়ানটি ধীর গতিতে হেঁটে যায় উঠোনের মধ্য দিয়ে গেটের কাছে, সেটা বন্ধ করে ও আবার ফিরে আসে অতি শ্রুত গতিতে। এই সময়ে আক্ষরিক অর্থেই সে কোনো কিছু দেখে না বরফের ওপর তার নিজের পদচিহ্ন ছাড়া ও অবশেষে চালাঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। এরপর সমস্ত ইলেকট্রিক আলোগুলোও নিভে গেল। সেগুলো আর জ্বলবেই বা কার জন্য?

শুধু দোতলায় কাঠের ঘোরাটোপের মধ্যকার ফাঁকটি উজ্জ্বল হয়ে রইল, এখন সেদিকে কে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কিছুক্ষণের জন্য। কে-র মনে হলো শেষ পর্যন্ত এই লোকগুলো তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ করল ও এখন বাস্তবিকপক্ষে যেন সে আগের চেয়ে অনেক স্বাধীন ও এখানে সে তার ওপর আরোপিত সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে যতক্ষণ ইচ্ছা এখানে কাটাতে পারে ও তার মনে হলো সে এমন এক স্বাধীনতা অর্জন করেছে যা এর আগে কেউ কখনো পারেনি। কেউ আর এই মুহূর্তে তাকে স্পর্শ করতে কিংবা বিভাড়িত করতে, এমনকী তার সঙ্গে কথা বলার সাহস পর্যন্ত পাবে না। কিন্তু ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গতভাবেই মনে হলো এই স্বাধীনতা, ক্রমাগত অপেক্ষা করে থাকা, অনাক্রান্ত থাকা অনাক্রান্ত হবার নিশ্চয়তার চেয়ে অর্থহীন, হতাশাময় আর কিছুই হতে পারে না।

৯

এবং সে নিজেকে সবলে মুক্ত করে বাড়িটাতে ফিরে গেল, বোর দেয়াল ঘেঁষে নয়, সরাসরি তুষারের ওপর দিয়ে এবং হলঘরে সরাইমালিকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎও হয়ে গেল। সে তাকে নিঃশব্দে স্বাগত জানায় ও ট্যাপরুমের দিকে ইঙ্গিত করে। কে তার ইঙ্গিত অনুসরণ করে, কারণ সে ঠকঠক করে কাঁপছিল, মানুষের সান্নিধ্য তার এখন একান্ত কাম্য কিন্তু সে খুবই হতাশ হয় যখন দেখে সেখানে ছোটো একটা টেবিলের সামনে বসে রয়েছে-টেবিলটা নিশ্চয়ই ওখানে বিশেষভাবেই আনা হয়েছিল কারণ সাধারণত খরিদদাররা বসে ওল্টানো পিপের ওপর, -তো, সেখানে বসে রয়েছে সেই তরুণ ভদ্রলোক, আর তাঁর সমনে দাঁড়িয়ে-কে-র খুবই অবাধ লাগল-ব্রিজ ইন-এর গৃহকর্তা।

পেপির গর্বিত মাথা পিছনে হেলানো, মুখে স্থায়ী হাসি, অহংকৃত মর্যাদাবোধ, তার সামান্যতম দেহ সঞ্চালনেই মাথার বিনুনি দোলে। সে ব্যগ্র বাস্তবতার সঙ্গে এদিক ওদিক দৌড়ঝাঁপ করছিল, কখনো আনছিল বিয়ার, কখনো কলম ও কালি, কারণ ইতিমধ্যে ভদ্রলোকটি টেবিলের এদিকে কাগজ বিছিয়ে ফেলে ছিলেন ও লেখালেখি করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। পূর্ণদৈর্ঘ্য থেকে বাড়িওয়ালী নিঃশব্দে ভদ্রলোক ও তার কাগজপত্র সরঞ্জাম দেখে। কোনো এক ভাবনায় তার ঠোঁট অল্প ফাঁক হয়ে গেছে, যেন তার যা কিছু বলার ছিল সবই সে বলে ফেলেছে ও সমস্ত বক্তব্যই গৃহীত হয়েছে।

‘শেষ পর্যন্ত আমিন মশাই তাহলে এলেন,’ প্রবেশ করার আগেই বলে ভদ্রলোকটি অল্প সময়ের জন্য চোখ তুলে। তারপরই আবার কাগজপত্রে ডুবে যায়। বাড়িওয়ালীও

কে-র দিকে তাকায় নির্লিপ্তভাবে ও বিন্দুমাত্র বিস্মিত না হয়ে। মনে হলো একমাত্র পেপিই কে-কে মন দিয়ে দেখছে যখন কে কাউন্টারে গিয়ে ব্র্যান্ডির অর্ডার দেয়।

কে সেখানে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চোখে হাত চাপা দিয়ে, সবকিছু বিস্মৃত হয়ে। এরপর সে ব্র্যান্ডিতে একটা চুমুক দিয়েই ঠেলে সরিয়ে দেয় সেটা একেবারেই অপেয়ে এমন মন্তব্য করে।

‘সমস্ত ভদ্রলোকইতো এটা পান করে থাকেন,’ সংক্ষেপে বলে পেপি কঠিন সুরে। সে বাকি অংশটা ঢেলে ফেলে দিয়ে গ্লাসটা ধুয়ে টুয়ে র্যাকে তুলে রাখে।

‘ভদ্রলোকেরা তো ভালো জিনিসও খান,’ বলে কে। ‘হতে পারে,’ বলে পেপি, ‘কিন্তু আমার তা জোটে না,’ ও এই বক্তব্য শেষ হবার পরই মনে হলো কে-র সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকে গেল ও এবার সে ভদ্রলোকের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে। তাঁর অবশ্য কোনো সেবারই দরকার ছিল না।

পেপি তাঁর পিছনে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে চক্রাকারে, মাঝে মাঝে তাঁর কাঁধের ওপর দিকে সমীহের সঙ্গে তার কাগজের ওপর চোখ বোলাতে চেষ্টা করে। কিন্তু এটি তার অর্থহীন কৌতূহল ও আত্মগরিমার প্রকাশ ছিল মাত্র। বাড়িওয়ালী পর্যন্ত ঙ্গ কুঁচকে তার এই ধরনের আচরণে বিরক্তি প্রকাশ করে।

এরপরই বাড়িওয়ালী হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। সে শূন্যতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন কিছু শুনতে চেষ্টা করছিল। কে-ও পিছনে ফেরে, সে তেমন কিছু শুনতে শেল না, অন্যরাও কিছু শুনতে পাচ্ছে বলে মনে হলো না। কিন্তু বাড়িওলি পা টিপে দৌড়ে যায় দরজা পর্যন্ত, এই দরজাটা দিয়েই উঠোনে নামা যায়, চাবির ফুঁটো দিয়ে উঁকি দেয়, এরপর অন্যদের দিকে বড়ো বড়ো স্থির চোখে মুখ লাল করে আঙুল নেড়ে কাছে আসতে ইঙ্গিত করে, এবার তারাও পালা করে ফুটোতে চোখে রাখে।

বলা বাহুল্য, অধিকাংশ সময়টাই নেয় বাড়িওয়ালী, তারপর পেপি। ভদ্রলোকটি এদের তুলনায় নির্বিকার থাকে অনেক। পেপি ও ভদ্রলোকটি সামান্য পরেই সরে এল কিন্তু বাড়িওয়ালী শঙ্কিতভাবে চেয়েই থাকে। উঁচু হয়ে বসে, প্রায় হাঁটু গেড়ে। কারো মনে হতে পারে সে যেন চাবির ফুটোটাকে অনুন্নয়ন করছে তার ভিতর দিয়ে গলে যেতে দিতে। অনেক সময় কেটে যাবার পর মনে হলো আর বিশেষ কিছু দেখার নেই। অবশেষে সে উঠে দাঁড়ায়। মুখে হাত বোলায়, চুলটুল ঠিক করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর ঘোর অনিচ্ছায় নিজের চোখকে আবার সহিয়ে নিতে চায় এই ঘরটি ও লোকজনের সঙ্গে।

তার সন্দেহ নিরসন করতে নয়, বরং কোনো ঘোষণাকে গোড়াতেই স্তব্ধ করে দিতে কে বলে ওঠে, ‘ক্ল্যাম কি তাহলে এর মধ্যেই বেরিয়ে গেছেন? বাড়িওয়ালী তার পাশ দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে বেরিয়ে যায়, কিন্তু ভদ্রলোকটি তাঁর টেবিল থেকেই বলে ওঠেন, ‘হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, যে মুহূর্তে আপনি নজরদারি বন্ধ করেছেন সেই মুহূর্তেই ক্ল্যামের পক্ষে বেরোনো সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু ওঁর সুস্ব স্ববেদনশীলতা খুবই বিস্ময়ের। লক্ষ্য করেছেন ম্যাডাম, কী অস্বস্তি র সঙ্গে উনি চারধারে তাকাচ্ছিলেন?’ বাড়িওয়ালী তা লক্ষ্য করেছে বলে মনে হলো না

কিন্তু ভদ্রলোক বলে চললেন, ‘অবশ্য, দেখার তেমন কিছু ছিল না, কোচোয়ানদের পায়ের দাগ পর্যন্ত বরফ পড়ে মুছে গেছে।’

‘বাড়িওয়ালী ওসব কিছুই লক্ষ্য করেননি,’ বলে কে, খুব একটা আস্থার সঙ্গে নয়, বরং যেন কিছুটা উসকে উঠেই।

ভদ্রলোকের ভঙ্গি ছিল যেন সবকিছুতেই দাঁড়ি টানার মতো, যেন তার কথার পর আর কারো কিছু বলার থাকতে পারে না।

‘ঠিক তখন আমি বোধহয় চাবির ফুটোর কাছে ছিলাম না।’ বলে বাড়িওয়ালী একটু পরে, ভদ্রলোককে সমর্থন জোগাতে, কিন্তু এর পরেই যেন ক্ল্যামকে প্রাপ্য মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়ে যোগ করে, ‘তা হলেও আমি মনে করি না ক্ল্যাম অতটা স্পর্শকাতর। আমরা সবসময় ওঁর বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্ক থাকি বলে, ওঁকে পাহারা দিয়ে রাখি বলে নিজেরাই ধারণা করে নিচ্ছি উনি অমন ভীষণ ধরনের অনুভূতিপরায়াণ। এমনটাই ভাবা উচিত আর ক্ল্যামেরও নিশ্চয়ই তাই ইচ্ছ। কিন্তু আসল সত্য আমাদের অজানা। অনিচ্ছুক হলে ক্ল্যাম কখনো কারো সঙ্গে কথা বলবেন না, সে তার সঙ্গে কথা বলার জন্য যত কষ্টই করুক না কেন। যত উপদ্রবই করুক না কেন। ক্ল্যাম কোনো অবস্থাতেই তাকে তাঁর কাছে পর্যন্ত আসতে দেবেন না আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি কথা, অবশ্য তিনি যে তাকে সহ্য করতে পারেন না সেটাও প্রমাণ করা অসম্ভব, এ বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান পর্যন্ত করার কোনো উপায় নেই।’

ভদ্রলোকটি প্রবল উৎসাহে মাথা নাড়ান, ‘আমার মূল বক্তব্যও ঠিক তাই, বলাই বাহুল্য,’ তিনি বলেন ‘আমি যদি একটু অন্যরকম ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে থাকি তার একমাত্র কারণ আমিন মশাইকে আমি বিষয়টা আরো প্রাঞ্জলভাবে বোঝাতে চেয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দরজা থেকে বেরিয়ে যাবার পর ক্ল্যাম বেশ কয়েকবার চারদিকে তাকিয়েছিলেন।’

‘উনি হয়ত আমাকেই খুঁজছিলেন,’ বলে কে।

‘সেটা সম্ভব,’ বলেন ভদ্রলোক, ‘তবে আমি অমন কিছু ভাবিনি।’

তারা সকলেই হাসতে থাকে। পেপি হাসে সবার চেয়ে জোরে, কী বলা হলো তা আদপেই না বুঝে। ‘এখানে আপনাদের এত হাসিখুশি দেখে’ ভদ্রলোক বলে চললেন, ‘আমিন মশাই আমি আপনাকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি আমাকে এই মণিপ্রত্নলোর জাক শেষে করতে সাহায্য করুন কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে।’

যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকেই দৃষ্টিপাত করে কে বলে, ‘বিস্তর লেখালেখির ব্যাপার মনে হচ্ছে।’

‘হ্যাঁ, জঘন্য একগেয়ে ব্যাপার,’ বলেন ভদ্রলোক আবার মুখে হাসি এনে, ‘কিন্তু আপনি বোধ হয় এখনো আমার পরিচয় জানেন না। আমার নাম মানুষ, ক্ল্যামের গ্রাম সহায়ক,’ বাক্যটি উচ্চারিত হবার পর ঘরে গভীর নিস্তব্ধতা নেমে আসে। যদিও তিনি বাড়িওয়ালী ও পেপির পূর্বপরিচিত তবু তাঁর নাম ও পদবীটি উচ্চারিত হবার পরই যে ন তারা হতচকতি হয়ে পড়ে।

এবং তিনি যেন নিজেও অনুভব করেন অবিবেচকের মতো তিনি অতিরিক্ত কথা বলে ফেলেছেন এবং তাঁর বক্তব্যের অনভিপ্রেত কোনো ফলশ্রুতি এড়িয়ে যেতেই যেন

কাগজপত্রে ডুব দিয়ে হঠাৎ লিখতে শুরু করেন। এর ফলে সারা ঘরে কলমের খসখস শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যায় না।

‘সেটা কী? গ্রাম সহায়ক?’ কে জিজ্ঞাসা করে একটু বিরতি দিয়ে। মমুসের হয়ে বাড়িওয়ালী তার প্রশ্নের উত্তর দেয়। মমুস নিজের পরিচয় দেবার পর আর এসব কথার ব্যাখ্যা দেবার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না।

‘হের মমুস হচ্ছেন সেই অর্থে ক্ল্যামের সেক্রেটারি যে অর্থে ক্ল্যামের যে কোনো সেক্রেটারিকে বোঝানো হয়। কিন্তু ওঁর সরকারি এলাকা, আর আমি যদি ভুল না করে থাকি, ওঁর সরকারি মর্যাদা,’ লেখায় ব্যস্ত অবস্থাতেই মমুস মাথা নাড়েন ও বাড়িওয়ালী তখন শব্দগুচ্ছ সংশোধন করে নিয়ে বলে, ‘ঠিক কথাটা হলো ওঁর সরকারি এলাকা, পদমর্যাদা নয়, এই গ্রামেই সীমাবদ্ধ। হের মমুস গ্রামের পক্ষে জরুরি চিঠি পত্তর বিলি করেন আবার ক্ল্যামের ডিপুটি হিসাবে গ্রামের থেকে কোনো আর্জি পাঠানো হলে তিনিই গ্রহণ করেন।’

এ সব শোনার পরও প্রভাবিত না হয়ে কে যখন শূন্যদৃষ্টিতে বাড়িওয়ালীর দিকে চেয়ে থাকে তখন সে একটু বিব্রতভাবে যোগ করে, ‘এটাই এখানকার ব্যবস্থা, দুর্গে সমস্ত ভদ্রলোকদেরই সেক্রেটারি রয়েছে।’ কে-র চেয়েও বেশি মনোযোগ দিয়ে সমস্ত কথা শুনছিল মমুস। সে বাড়িওয়ালীর কথার পর যোগ করে আরো তথ্য।

‘সমস্ত গ্রামীণ সেক্রেটারিরাই কাজ করে একজন ভদ্রলোকের হয়ে। কিন্তু আমি কাজ করি দুজনের জন্য ক্ল্যাম ও ভ্যালবেল।’

‘হ্যাঁ,’ বলে চলল বাড়িওয়ালী, যেন এবার তার সব মনে পড়ে গেছে এমনভাবে করে কে-র দিকে ফিরে, ‘হের মমুস দুজন ভদ্রলোকের কাজ করেন, ক্ল্যাম ও ভ্যালবেল আর তাই উনি এক দেহেই দুজন সেক্রেটারি।’

‘বস্তুতপক্ষে এক জোড়া,’ বলে কে, মমুসের দিকে মাথা নেড়ে। সে এখন মুখটা ঈষৎ সামনে এগিয়ে দিয়ে তাঁর দিকে মুখোমুখি চেয়ে ছিল, ঠিক যেভাবে সদ্য প্রশংসিত শিশুর দিকে চেয়ে কেউ মাথা হেলিয়ে উৎসাহ দেয়। তার এই ভঙ্গিতে যদি ঈষৎ সামনে এগিয়ে দিয়ে তাঁর দিকে মুখোমুখি চেয়ে ছিল, ঠিক যেভাবে সদ্য প্রশংসিত শিশুর দিকে চেয়ে কেউ মাথা হেলিয়ে উৎসাহ দেয়। তার এই ভঙ্গিতে যদি ঈষৎ বিদ্রূপ থেকে থাকে তা হয় কেউ তা লক্ষ্য করল না অথবা তা স্বাভাবিক বলেই গ্রহণ করল।

বিশেষ করে কে-কেউ, যাকে চলমান অবস্থাতেও ক্ল্যাম একবার দৃষ্টিপাত মাত্র করতে পারেন এটুকু যোগ্য বলেও বিবেচনা করা হয় না, তাকেই এরা বিস্তারিত ভাবে বোঝাতে চাইছে ক্ল্যামের প্রভাবের মধ্যে রয়েছে এমন একজনের কর্মকান্ডের কথা কোনো লুকাছাপা না করেই গুরুত্বই দেয় না। সে তার সমস্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করে ক্ল্যামকে শুধু একজন মানুষ হিসাবে দেখতে চেষ্টা করেছিল। তার কাছে এই মমুস নামক লোকটির কোনো গুরুত্বই নেই, যে কিনা শুধু ক্ল্যামের ইচ্ছায় টিকে আছে। ক্ল্যামের পরিমন্ডলীকে তার তেমন দরকার নেই, তার চেষ্টাও সেজন্য নয়। সে চায়, তার একমাত্র কাম্য স্বয়ং; ক্ল্যাম আর সেখানেও সে থামতে চায় না, তাকে অতিক্রম করে যেতে হবে আরো অনেক কিছু বহু দূরত্ব, যতক্ষণ না সে দুর্গের অভ্যন্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারে।

এবং সে তার ঘড়ির দিকে তাকায় ও বলে, 'এবার আমায় বাড়ি যেতেই হবে।' সাথে সাথে মমুসের অনুকূলে বিষয়টি মোড় নেয়।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' তিনি উত্তর দেন, 'স্কুলে বহু দরকারি কাজ পড়ে রয়েছে আপনার। কিন্তু আপনি আমার জন্য অমূল্য সময় আর একটু ব্যয় করুন। কয়েকটা ছোটো প্রশ্ন শুধু।'

'ওসবের জন্য আমি ঠিক মেজাজে নেই,' বলে কে ও দরজার দিকে ফেরে। মমুস টেবিলের ওপর একটা মস্ত নখির কাগজ পাতেন ও উঠে দাঁড়ান, 'ক্ল্যামের নামে আমি আপনাকে আদেশ করছি আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে,' 'ক্ল্যামের নামে?'

কে পুনরুচ্চারণ করে, 'তিনি কি তাহলে আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন আজকাল?'

'সে বিষয়ে' মমুস বলেন, 'আমার কাছে কোনো খবর নেই, আপনার কাছে নিশ্চয়ই আরো কম। আমরা বরং সেটা ওঁর ওপরই ছেড়ে দিই নিরাপদে, কি বলেন! তা হলেও আমি ক্ল্যামের দেওয়া ক্ষমতাবলেই আপনাকে আদেশ করছি এখানে থাকতে ও আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে।'

'আমিন মশাই,' এবার নাক গলাল বাড়িওয়ালী, 'আমি আর আপনাকে কোনো পরামর্শ দিতে চাই না। এখন পর্যন্ত আমার সমস্ত পরামর্শই, আপনার মঙ্গলের জন্য এত ভালো আর কেউ আপনাকে দেয়নি, আপনি আমারই ওপর যেভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন তা কেউ কখনো শোনেনি। আর এখন আমি এসেছি-হের মমুস-এর কাছে-আমার লুকোছাপার কিছু নেই-শুধু দণ্ডের একটা ধারণা দিতে আপনার ব্যবহারটা কী রকমের আর জানাতে আপনার আসল উদ্দেশ্যটাই বা কী, আর নিজেকে বরাবরের মতো রক্ষা করতে এমনভাবে যাতে ভবিষ্যতে কখনো আপনি কোনোমতেই আর আমার ঘাড়ে চাপতে না পারেন। এভাবেই আমরা এখানে পরস্পরের পাশে দাঁড়াই আর ভবিষ্যতেই ঠিক তাই করব।

আর আমি যদি এসব মাথায় রেখেই এসব বলে থাকি আমি তা করছি আপনার কোনো সুবিধা করে দিতে নয়, বরং আপনার মতো মানুষের সঙ্গে কাজ করতে হের ক্ল্যামের যে ঝগড়াট হবার কথা তা সামান্য লাঘব করার উদ্দেশ্য নিয়েই। এ সত্ত্বেও শুধু ক্ল্যামার সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে থেকেই-আমি চাইলেও আপনার সঙ্গে অন্য ধরনের আচরণ করতে পারতাম না-আপনি কিছু সুবিধা পেয়ে যেতে পারেন যদি আমার বক্তব্য শুনেন থাকেন, অবশ্য যদি একটু কষ্ট স্বীকার করেন। বর্তমান ক্ষেত্রে আমি আপনার মনোযোগ শুধু আকর্ষণ করতে চাই শুধু এই বিষয়ে যে একমাত্র যে রাস্তা আনাকে ক্ল্যামের দিকে নিয়ে যেতে পারে তা হলো এখানে হের মামুসের সঙ্গে প্রোটোকল বিষয়ে সহযোগিতা করা। কিন্তু আমি বোধ হয় একটু বাড়িয়েই বললাম। হয়ত এই পথও আপনাকে অতদূরে ক্ল্যামের কাছে নিয়ে যাবে না। তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছবার অনেক আগেই হয়ত সেই পথ শেষ হয়ে যাবে, হের মামুসই তার বিচার করবেন। তা সে যাই হোক, ক্ল্যামের কাছে যাবার এই একটি পথই আপনার সামনে পড়ে আছে। আর আপনি এই একটিমাত্র পথও পরিহার করতে চান, আর কোনো কারণে নয়, শুধুমাত্র অহংকারের বশবর্তী হয়ে?'

‘ও ম্যাডাম,’ বলল কে, ‘ক্ল্যামের কাছে নিয়ে যাবে, নাকি যাবে না?’ অবশ্যই তা নিয়ে যেতে পারে,’ বললেন মমুস, ‘গর্বিত ভাবে চোখ নামিয়ে ও কারো দিকে না তাকিয়ে ‘তা না হলে আমি এখানকার সেক্রেটারি থাকব কেন?’

‘এখন দেখতে পেলেন তো ম্যাডাম,’ বলে কে, ‘ক্ল্যাম পর্যন্ত কোনো পথের আমার দরকার নেই, তা সেক্রেটারি পর্যন্ত গেলেই হলো।’

‘আমি আপনার জন্য সেই পথটাই তো খুলে দিতে চেয়েছিলাম,’ বলে বাড়িওয়ালী, ‘আজ সকালেই আমি আপনার অনুরোধ ক্ল্যামের কাছে পাঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করিনি কি?’

তা হয়ত হের মমুসের মাধ্যমে করতে হতো। কিন্তু আপনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন, অথচ দেখুন এখন থেকে এই পথটাই শুধু আপনার সামনে খোলা থাকবে। কিন্তু ক্ল্যামের ব্যক্তিগত জীবনে হানা দেবার চেষ্টা করার পর এতেও আপনার সফল হবার সম্ভাবনা সীমিত হয়ে পড়েছে খুবই। তা হলেও এই শেষ, ধূলপরিমাণ, ক্ষয়মান, প্রায় অদৃশ্য আশাই শুধু আপনার জন্য পড়ে রয়েছে।’

‘এটা কেমন হলো ম্যাডাম,’ বলে কে, ‘গোড়ায় আপনি আগ্রাণ চেষ্টা চালালেন যাতে আমি কিছুতেই ক্ল্যামের সঙ্গে দেখা করতে না পারি, অথচ এখন সেই আপনিই আবার ক্ল্যামের সঙ্গে আমার দেখা করার ইচ্ছেটাকে এত গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। আর মনে করছেন আমার কোনো আশাই নেই প্রধানত এই কারণে যে পরিকল্পনা রূপায়ণে আমি গন্ডগোল বাধিয়ে বসেছি? এক সময় যদি আপনি একেবারে হৃদয় থেকে গভীর সততার সঙ্গে আমায় পরামর্শ দিয়ে থাকেন ক্ল্যামের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টাই না করতে তাহলে এখন আমায় কী করে আবার সেই একই সততায় তার দিকেই ঠেলে দিচ্ছেন এটা আপনার জানা থাকা সত্ত্বেও যে তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছবার অনেক আগেই পথ শেষ হয়ে যাবে?’

‘আমি আপনাকে ঠেলে দিচ্ছি বললেন?’ প্রশ্ন করে বাড়িওয়ালী, ‘আপনি এটাকে ঠেলে দেওয়া বলেন যখন বার বারই আমি বলছি আপনার সব চেষ্টাই অর্থহীন? আমি বলব আপনার স্পর্ধার সীমা নেই যদি আপনি পুরো দায়িত্বটাই আমার ওপর চাপামে চেয়ে থাকেন। সম্ভবত হের মমুস-এর উপস্থিতিই আপনাকে এমন সাহস জুগিয়ে থাকবে। না, আমিন মশাই, আমি আপনাকে কোনো কিছুতেই ঠেলে দিতে চাই না। আমি শুধু একটা ভুল স্বীকার করে নিতে রাজি আছি, আর তা হলো আমি আপনাকে প্রথমে একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছিলাম। ফ্রিডাকে আপনার মুহূর্তের মধ্যে জয় করে ফেলাটা আমাকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। আপনি আরো কত অনর্থ বাধাতে পারেন তা আমি ধারণা করে উঠতে পারছিলাম না। আমি আরো কোনো ক্ষতি রোধ করার চেষ্টা করেছিলাম, আর ভেবেছিলাম তাতে সফল হবার একমাত্র পথ হলো আপনার দৃঢ় মনোভাবকে অনুনয় বিনয় করে বা ভয় দেখিয়ে কিছুটা দুর্বল করে দেওয়া। এরপর থেকেই সবকিছু অনেক শান্তিচিত্তে দেখতে শিখে গেছি। আপনি যা ইচ্ছে করতে পারেন। আপনার সমস্ত উদ্যম ওই উঠানের তুষারের ওপর শুধু গভীর কয়েকটা পায়ের ছাপ ফেলতে পারে, তার বেশি আর কিছুই না।’

‘বৈপরীতটা আমার কাছে এখনো তেমন স্পষ্ট হলো না কিন্তু,’ বলে কে, ‘কিন্তু আপনার দৃষ্টি যে এদিকে আকর্ষণ করতে পেরেছি তাতেই আমি সন্তুষ্ট। কিন্তু আমি আপনাকে অনুরোধ করছি সেক্রেটারি, আমাকে দয়া করে বলুন বাড়িওয়ালীর মতামত যথার্থ কিনা, মানে আমার থেকে যে প্রটোকল আপনি আশা করছেন তার ফল হিসেবে ক্ল্যামের সঙ্গে আমি দেখা করতে পারব কিনা। তা যদি হয় আমি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। ওরকম সম্ভাবনা থাকলে আমি সবকিছু করতেই রাজি।’

‘না,’ উত্তর দিলেন মমুস, ‘তেমন কিছু ঘটবে না, এটা আসলে এই বিকেলে যা কিছু ঘটেছে তার যথাযথ একটা বিবরণ ক্ল্যামের গ্রাম রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রাখা মাত্র। বিবরণটা লেখা মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে, শুধু দু-একটা ফাঁক আপনাকে বাধ্যতামূলক পূরণ করে দিতে হবে রিপোর্টটাকে যথাযথ করতে। এ ছাড়া আর এর অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই, কোনো সুবিধাই এ থেকে পাওয়া যাবে না।’

কে বাড়িওয়ালীর দিকে নিঃশব্দে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ‘আপনি আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন কেন?’

সে জিজ্ঞাসা করে, ‘আমি কি অন্যরকম কিছু বলেছিলাম? উনি তার অন্য অর্থ করবেনই, আর তারপর বলতে থাকবেন ওকে ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। আমি ওকে প্রথম থেকেই বলেছি। আর আবারও আজকে বলছি, ক্ল্যাম ওকে গ্রহণ করবেন তার সামান্যতম আশাও নেই। কোনো দিক দিয়েই যদি আশা না থাকে তাহলে কি শুধু প্রোটোকল মানলেই বদলে যাবে? এর থেকে সোজা-সাপটা জবাব আর কি হতে পারে? আমি ওকে আরো বুঝিয়েছি এই প্রোটোকল লিপিবদ্ধ হবার মধ্য দিয়েই ওর সঙ্গে ক্ল্যামের সম্বন্ধ সরকারিভাবে স্থাপিত হতে পারে। আমার কথাগুলো খুবই স্পষ্ট ও প্রশ্নাতীত।

কিন্তু তবু উনি আমার কথা বিশ্বাস করেন না আর আশা করে আছেন-কিসের ভিত্তিতে তা উনিই জানেন-যে ক্ল্যামের কাছে উনি পৌঁছতে পারবেন। ওঁর এরকম মানসিক অবস্থায় ওকে একমাত্র সাহায্য করতে পারে সরকারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ল্যামের সঙ্গে এরকম সংযোগ স্থাপন অন্যকথায় প্রোটোকল। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকুই ছিল, কেউ যদি তার অন্য ব্যাখ্যা করে থাকে তাহলে সে আমার কথাগুলো বিদ্বেষবশত বিকৃত করেছে মাত্র।’

‘তাই যদি হয়ে থাকে ম্যাডাম,’ বলল কে, ‘আমি ক্ষমা চাইছি, আমি আপনাকে ভুল ভেবেছিলাম।

কারণ আমি মনে করেছিলাম-ভ্রান্তিবশতই, এখনই তা বোঝা গেল-আমি আপনার ঠিক আগের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি যে সামান্য হলেও আমার এখনো আশা আছে।’

‘নিশ্চয়ই,’ বলে বাড়িওয়ালী, ‘আমিও ঠিক তাই তো বোঝাতে চাইছি। আপনি আবার আমার কথাকে বিকৃত করছেন, এবার ঠিক উল্টোভাবে। আমার মতে আপনার এখনো কিছু আশা থাকতে পারে কিন্তু তা নির্ভর করেছে এই প্রোটোকল মেনে চলার উপরই শুধু। কিন্তু সেটা মোটেই এমন ধরনের নয় যে আপনি হের মমুসকে একেবারে

আঁকড়ে ধরে এমন প্রশ্ন করতে পারেন-‘আপনার প্রশ্নের উত্তর দিলে কি আমাকে ক্ল্যামের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে?’

শিশুরাও এমন ধারা প্রশ্ন করলে লোকে হাসে। আর বয়স্ক মানুষ এরকম প্রশ্ন করে যখন তখন সামগ্রিকভাবে কর্তৃপক্ষই অপমানিত হন। হের মমুস অসাধারণ সৌজন্য বোধ দেখিয়ে তা ভদ্রতার আড়ালে গোপন করেছেন। কিন্তু আমি আপনার যে আশার কথা বলেছিলাম তার সারমর্মটা হলো এই যে প্রোটোকলের মাধ্যমেই আপনি শুধুমাত্র ক্ল্যামের সঙ্গে একধরনের সংযোগ স্থাপন করতে পারেন, আর তাই কি আপনার পক্ষে যথেষ্ট নয় আপাতত। কেউ যদি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসাই করে যার বিনিময়ে আপনার পক্ষে সামান্য আশার করার সম্ভাবনার পথটি উন্মুক্ত হয় তা কি আপনি গ্রহণ করবেন না? এই আপনার আশা করার শেষ সুযোগ বলা যেতে পারে। হের মমুস-এর পক্ষেও আপনার জন্য এর বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। কারণ উনি যেমন বললেন, ওঁর সরকারি কর্তব্যের খাতিরেই উনি বিকেলের সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখতে চাইছেন, তা যথাযথভাবে নথিভুক্ত করতে আপনি যদি ওঁকে জিজ্ঞাসাও করেন তবু উনি আমি যা বললাম তা যথার্থ কিনা, সে বিষয়ে উনি কোনো মন্তব্যই করবেন না।’

‘তাহলে ক্ল্যাম কি, মিঃ সেক্রেটারি,’ বলে কে, ‘এই প্রোটোকল নিজেই পাঠ করবেন?’

‘না,’ মমুস বললেন, ‘উনি কেন তা করতে যাবেন? সমস্ত প্রোটোকলই ক্ল্যামের নিজের পক্ষে পড়া সম্ভব না, আসলে উনি একটাও পড়েন না, উনি প্রায়ই বলেন-‘আমাকে তোমাদের ওইসব প্রোটোকল থেকে দূরে রাখ’ ‘আমিন মশাই,’ কাতরে উঠল বাড়িওয়ালী, ‘এ সব প্রশ্ন করে আপনি আমাকে অসম্ভব ক্লান্ত করে তুলছেন। আপনি কি মনে করেন এর আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে? কিংবা একি আদৌ কাম্য যে ক্ল্যাম স্বয়ং এ সমস্ত প্রোটোকল নিজেই করবেন আর আপনার জীবনের যত ছেঁদো বৃত্তান্ত শব্দ ধরে ধরে মুখস্ত করবেন? বরং আপনার কি উচিত নয় বিনীতভাবে প্রার্থনা করা যাতে ক্ল্যামের কাছে আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত গোপন থাকে? এমন প্রার্থনা অবশ্য নিষ্ফলই হবে কারণ ক্ল্যামের কাছে কোনো কিছুই গোপন রাখার সাধ্য কারো নেই, যদিও অবশ্য তিনি তার সহৃদয়তার প্রমাণ অনেক দিয়েছেন বহুবার। আর আপনি যে আশার কথা ভাবছেন তার জন্যও কি তাঁর কোনো প্রয়োজন আছে? আপনি কি নিজেই স্বীকার করেননি যে শুধুমাত্র একবার ক্ল্যামের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলেই আপনি সন্তুষ্ট হবেন, এমনকি ক্ল্যাম যদি আপনার দিকে ফিরেও না তাকান বা আপনার কোনো কথাই না শোনেন, তাহলেও? প্রোটোকলের মধ্য দিয়ে কি সেটুকু আপনি সহজেই লাভ করবেন না, তার বেশি কিছুও আপনি পেয়ে যেতে পারেন হয়ত, কে জানে।’

‘তারও বেশি?’ কে জিজ্ঞাসা করল, ‘কিভাবে?’

‘আপনি যদি সব ব্যাপারে শিশুর মতো অতিরিক্ত কথা বলা বন্ধ করেন, যেন ওগুলো ভারি উপাদেয় খাদ্য’ এমন প্রশ্নের উত্তর পৃথিবীতে কে দিতে পারেন? এই প্রোটোকলের বিষয়বস্তু ক্ল্যামের গ্রামীণ রেজিস্টারে তোলা হবে, এতো একটু আগেই শুনলেন নিজের কানে, এর চেয়ে স্পষ্টভাবে আর কিছুতেই বলা যেতে পারে না। কিন্তু আপনি কি এখনো বুঝতে পেরেছেন সব প্রোটোকলের প্রকৃত তাৎপর্য-হের মমুস,

গ্রামীণ রেজিস্টারের অর্থ? হের মমুসের দ্বারা পরীক্ষিত হবার অর্থ যে কি তা হের মমুস সম্ভবত নিজেও বোঝেন না। উনি চুপচাপ ওখানে বসে ওঁর কর্তব্য করে যান, শুধু নির্দেশ পালন করতেই, ওঁর কথা অনুযায়ী।

কিন্তু একবার ভাবুন ক্ল্যাম ওঁকে নিয়োগ করেছে। উনি ক্ল্যামের নামে কাজ করেন, উনি যা কিছু করেন তা কখনোই ক্ল্যামের কাছে না পৌঁছেলেও যখন ওঁর সব কাজেই ক্ল্যামের অনুমোদন রয়েছে তখন কি তাঁর আত্মার সঙ্গেও কোনো না কোনোভাবে তা সম্পর্কযুক্ত নয়? ভেবে বসবেন না যেন আমি হের মমুসের নির্লজ্জ তোষামোদ করছি। উনি নিজেই তা সহ করতে পারেন না, ওঁকে আমি ব্যক্তিগত দিক থেকেও কিছু বলছি না, ওঁকে আমি এমন একজন মানুষ হিসেবে দেখি যিনি তাঁর অনুমোদন লাভ করেছেন, এক্ষেত্রে উনি ক্ল্যামের হাতের এক যন্ত্র মাত্র আর ওঁর দুঃখের শেষ থাকে না কেউ যদি ওঁর কথা অমান্য করে।’

বাড়িওয়ালীর এই শাসানি কে-কে দমাতে পারেনি ঠিকই কিন্তু সে যে আশা নিয়ে তাকে, তার সমস্ত উদ্যোগকে, নস্যাত্ন করতে চেয়েছে সেটাই তাকে চিন্তিত করে তোলে। ক্ল্যাম বহু দূরের মানুষ। একবার বাড়িওয়ালী তাকে ঈগলের সঙ্গে তুলনা করেছিল। তখন তার কথাটা কের কাছে অবাস্তব ঠেকেছিল।

কিন্তু এখন আর তা আতিশয্য বলে তার বোধ হয় না। তার মনে পড়ল ক্ল্যামের নির্বিকার দূরত্ব, তার অপ্রবেশ্য বাসস্থান, তার নৈঃশব্দ তার আনত নিশ্চল দৃষ্টি-যার অর্থ বোঝা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়-এসব কিছুর সঙ্গেই ঈগলের সাদৃশ্য রয়ে গেছে। কিন্তু এসবের সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই তার সম্পর্কিত প্রোটোকল বিষয়ক কাগজপত্রের কোনো সম্পর্ক নেই, যে কাগজের ওপর রেখে মমুস এখন একটা রোল বানিয়ে ফেলেছে তাতে কিঞ্চিৎ নুনের ছিটে দিয়ে। এরপর তা বিয়া সহযোগে গলাধঃকরণ করে। কাগজগুলোর ওপর লবণ ও মসলার আন্তরন পড়ে থাকে।

‘শুভরাত্রি,’ বলল কে, ‘কোনোর রকম পরীক্ষাতেই আমার আপত্তি নেই,’ এবং সে এগিয়ে যায় দরজায় দিকে। ‘উনি চলে যাচ্ছেন দেখছি এত সবের পরেও,’ বলে মমুস বাড়িওয়ালীকে বেশ শঙ্কিতভাবে।

‘ওর অত বুকের পাটা হবে না,’ বলে বাড়িওয়ালী।

এর বেশি কিছু আর কে শুনতে পেল না, সে এর মধ্যেই হলঘরে ঢুকে পড়েছে। ভিতরটা সাংঘাতিক ঠান্ডা আর প্রবল বাতাসও বইছিল। উন্টোদিকের দরজা দিয়ে সরাইমালিক ঢুকল, মনে হলো পিছন দিকের কোনো একটা ফুটো দিয়ে সে হলঘরটা নজরে রেখেছিল। হাঁটুর কাছে কোটের প্রান্তটি তাকে শক্ত করে ধরে রাখতে হচ্ছিল, হল-এ বহমান বাত্যাপ্রবাহ তাকে এমনই বিপর্যস্ত করে ফেলে।

‘আপনি এর মধ্যেই চললেন বুঝি আমিন মশাই?’ সে জিজ্ঞাসা করে।

‘তুমি তাতে বড্ড অবাক হচ্ছ বুঝি?’ প্রশ্ন করে কে।

‘হচ্ছি,’ জবাব দেয় সরাইমালিক, ‘তাহলে বুঝি আপনাকে পরীক্ষা করা হয়নি?’

‘না,’ বলে কে, ‘আমিই নিজেকে পরীক্ষিত হতে দিইনি।’

‘কেন?’ জিজ্ঞাসা করে সরাইমালিক।

‘জানিনা,’ বলে কে, ‘আমার ওপর পরীক্ষা চালাতে আমি দেবই বা কেন? অন্য কোনো সময় হয়ত এই তামাসাটা বা খেয়ালখুশিটা বরদাস্ত করে নেওয়া যাবে, কিন্তু আজকে নয়।’

‘নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,’ বলে সরাইওয়ালা, কিন্তু সে তার কথা স্বীকার করে নেয় সৌজন্যবোধ থেকেই, কোনো প্রত্যয় থেকে নয়।

‘এবার আমাকে চারকগুলোকে ট্যাপরুমে ডাকতে হবে, ওদের আসার সময় অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। আমি শুধু পরীক্ষার ব্যাপরটায় কোনোরকম ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে চাইনি।’

‘তোমার কি ব্যাপারটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলো?’ প্রশ্ন করে কে।

‘তা তো বটেই,’ বাড়িওয়ালা উত্তর দেয়। ‘আমার ওটা প্রত্যাখ্যান করাটা বোধহয় উচিত কাজ হয় নি।’ বলে কে।

‘না,’ বলে বাড়িওয়ালা, ‘কাজটা আপনার সম্মত হয়নি।’ কে-কে নীরব থাকতে দেখে সে আরো যোগ করে, হয় তাকে সান্ত্বনা দিতে নয়ত তাড়াতাড়ি সরে পড়তে, ‘যাগগে, যাগগে, এর ফলে তো আর আকাশ থেকে গন্ধক বৃষ্টি হবে না।’

‘না,’ উত্তর দেয় কে, ‘আবহাওয়া দেখে তেমনটা তো বোধ হচ্ছে না।’ এবং হাসতে হাসতে তারা বিদায় নেয়।

১০

বাত্যাবিস্কন্ধ পথে পা দিয়ে কে নিশ্চিত অন্ধকারে উঁকি দেয়। প্রকৃতি এখন উদ্দাম, আদিম হয়ে উঠেছে। সে আবার ভাবল কেমন বাবে বাড়িওয়ালী প্রবল চেষ্টা চালাচ্ছিল যাতে সে প্রোটোকল স্বীকার করে নেয় ও সে নিজে কেমনভাবে তার সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে কঠিনভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। বাড়িওয়ালীর চেষ্টা অবশ্য খুব সোজা সরল ছিল না। খুব চতুরভাবে গোপনে সে কে-কে প্রোটোকলের বিরুদ্ধেও ওস্কাতে চেষ্টা করেছে। বাস্তবিকই তার পক্ষে বলা কঠিন সে বিরুদ্ধতা করে এল নাকি প্রকারান্তরে বাড়িওয়ালীর কাছে নতিস্বীকারই করেছে। সমস্তটাই অতি জটিল প্রকৃতির, যেন এই ঝড়ের মতো এক অন্ধ, প্রচণ্ড শক্তিতে সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এক আশ্চর্য অনির্দিষ্ট দূরাগত নির্দেশ দ্বারা যাকে কখনোই অনুমান করে ওঠা যায় না।

মূল সড়কটা ধরে সে সবেমাত্র দু-এক পা এগিয়েছে এমন সময় সে বহুদূরে ইতস্তত বিচরণশীল দুটি আলোকবিন্দু দেখতে পেল। জীবনের এই প্রকাশ তাকে হুট করে তোলে ও সে তার গতি সেদিকে তরাস্থিত করে, আলোকবিন্দুও তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। তার পক্ষে বলা শক্ত সহকারীদের দেখে সে হতাশ বোধ করল কেন। তারা অবশ্য তারই দিকে এগিয়ে আসছিল স্থির গতিতে, নিশ্চয়ই ফ্রিডা তাদের পাঠিয়েছে আর যে লঠনগুলো তাকে চতুর্দিকের গর্জনশীল অন্ধকার থেকে ত্রাণ করল, সেগুলোর মালিকও সে। এ সত্ত্বেও সে হতাশ বোধ করে, সে আশা করেছিল অন্য কিছু, এই পুরনো সঙ্গীদের নয়, এরা আসলে তার কাঁধের ওপর মস্ত বোঝাস্বরূপ।

কিন্তু সহকারীরাই নয়, অন্ধকার, ফুঁড়ে দুজনের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল বারনাবাস। ‘বারনাবাস,’ চিৎকার করে ওঠে কে ও দুহাত ছড়িয়ে দেয়।

‘তুমি আমায় দেখতে এলে?’ তার সঙ্গে আবার এভাবে মিলিত হবার বিস্ময়টি বারনাবাসের প্রতি অতীতে সে যে বিতৃষ্ণাবোধ করেছিল তা ডুবিয়ে দেয়।

‘আপনাকে দেখতেই,’ বলে বারনাবাস আগের মতোই বন্ধুত্বপূর্ণ সুরে, ‘সঙ্গে এনেছি ক্ল্যামের চিঠি।’

‘ক্ল্যামের থেকে চিঠি।’ বলে কে মাথা পিছনে হেলিয়ে দিয়ে।

‘এখানে আলো আনো।’ সে সহকারীদের ডাকে। তারা দুদিকে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে লঠনগুলো তুলে ধরে। কে মস্ত লম্বা পাতাটিকে ভাঁজ করে ছোটো করে নেয় সেটা পড়ার সময় ঝড়ের হাত থেকে বাঁচাতে।

এরপর সে পড়তে থাকে, ‘ব্রীজ ইন-এর কানুনগোর প্রতি। এখন পর্যন্ত জরিপের কাজ আপনি যা করেছেন তা আমার প্রশংসা লাভ করেছে। সহকারীদের কাজও প্রশংসাযোগ্য। ওদের কাজে ব্যবহার করার যোগ্যতা আপনার রয়েছে। আপনার প্রচেষ্টায় ঢিলে দেবেন না। সম্ভ্রষ্টজনক পরিসমাপ্তি না ঘটা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যান। এতে যে কোনো রকম বিচ্যুতি আমার বিরক্তি উৎপাদন করবে মাত্র। অন্যান্য বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার বেতনের বিষয়টা পরে নির্ধারণ করা যাবে। আমি আপনাকে ভালব না।’

কে সবোমাত্র চিঠিটা থেকে মুখ তুলেছে এমন সময় তার সহকারীরা, যারা চিঠিটা পড়ছিল তার চেয়ে অনেক ধীরে, এই সুসংবাদে হর্ষধ্বনি করে ওঠে ও লঠন নাচাতে থাকে।

‘চুপ কর,’ সে বলে ও বারনাবাসের প্রতি, ‘একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে’ ‘কে আবার বলে, বিকেলে যে ক্লাস্তি তাকে অভিজ্ঞত করেছিল তা আবার তাকে গ্রাস করে।

স্কুলের দিকে পথটা তার কাছে মনে হয় অন্তহীনভাবে দীর্ঘ আর বারনাবাসের পিছনে সে তার সমস্ত পরিবারটিকে দেখতে পায় ও তার সহকারীরা তার ঘনিষ্ঠ হয়ে তখনো এমন ধাক্কাধাক্কি করছিল যে সে তাদের কনুই দিয়ে খেদিয়ে দেয়। ফ্রিডা কী করে এই লোকগুলোকে তার কাছে পাঠাল যখন সে নির্দেশ দিয়েছিল তারা যেন তার সঙ্গে থাকে? সে একা একাই পথ খুঁজে ঠিক তার বাড়ি পৌঁছে যেত অনেক ভালোভাবেই বরং এই লোকগুলো সঙ্গে না থাকলে। ব্যাপারটা আরো বিশ্লেষণ করে তুলতেই যেন একজন গলায় একটা স্কার্ফ পেঁচিয়ে এসেছিল। সেটার একটা প্রান্ত ঝড়ে পতপত করে উড়ছিল ও বেশ কয়েকবার কে-র মুখে ঝাপটা মারে।

সত্যি যে অন্য সহকারীটি এই আবরণকে তার লম্বা সদা ক্রিয়াশীল আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল তার মুখ থেকে কিন্তু তাতে কাজ হয় অল্পই। এই যে এতদূর আসা তারপর ফিরে যাওয়া এসব তার সহকারীদের ভারি ফুর্তির ব্যাপার মনে করে এবং এই ঝড়ে রাত্রির ভয়াবহতায় তারা আনন্দে ফেটে পড়ছিল।

‘দূর হও,’ চিৎকার করে বলে কে, ‘আমার সঙ্গে দেখা করতেই যদি বেরিয়েছিল সঙ্গে আমার লাঠিটা আননি কেন? তোমাদের এখন বাড়িতে তাড়িয়ে নিয়ে যাব কী দিয়ে?’

তারা তখন গিয়ে বারনাবাসের পেছনে লুকিয়ে পড়ে কিন্তু তাদের আতঙ্ক এতটা হয়নি যে তাদের রক্ষাকর্তার দু কাঁধে লঠন দুটো স্থাপন করবে না, অবশ্য একটু পরেই

তারা তা সরিয়ে নেয়। 'বারনাবাস' বলে কে, কিন্তু তখনই হৃদয়ে একটা ব্যথাও অনুভব করে যখন দেখে যে বারনাবাস তাকে স্পষ্টতই বুঝতে পারছে না। তার উর্দি সুসময়ে ঝকঝক করলেও, সঙ্কটে তার থেকে কোনো সাহায্যই পাওয়া যাবে না। বিরুদ্ধতা, এক বোবা বিরুদ্ধতা, যার সঙ্গে লড়াই চালানো যায় না। তার সামনে বারনাবাস নিজেও অসহায়। সে শুধু মৃদুহাস্য করতে পারে।

কিন্তু তা থেকে ততটাই সাহায্য পাওয়া যেতে পারে ওপরের আকাশের তারা থেকে এই প্রবল ঝড়ের বিরুদ্ধে যতটা।

'দ্যাক্স ক্ল্যাম কী লিখেছেন,' বলল কে তার মুখের কাছে চিঠিটা তুলে ধরে।

'ওনাকে ভুল খবর দেওয়া হয়েছে। আমি জরিপের কোনো কাজই করিনি। আর তুমি নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছ এই সহকারীদের যোগ্যতার বহরটা। আর এটাও বলা বাহুল্য, যে কাজ আমি শুরুই করিনি তাতে বিঘ্ন ঘটানো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমি যখন ভদ্রলোককে ক্ষুব্ধ করার মতো কিছু করতেই পারলাম না আমি তাঁর প্রশংসাই বা অর্জন করলাম কীভাবে? আর নিশ্চিত্তে থাকার যে কথাটা লিখেছেন তা আমার পক্ষে থাকা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়।'

আমি ব্যাপারটা দেখব।' বলে বারনাবাস। সে পুরো সময়টাই চিঠিটার পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে অন্যদিকে তাকিয়েছিল।

'ও,' বলল কে, 'তুমি আমাকে কথা দিচ্ছ বটে ব্যাপারটা দেখবে, কিন্তু আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি তো?'

আমার খুবই বিশ্বস্ত একজন বার্তাবাহক দরকার। এই মুহূর্তে তো সবচেয়ে বেশি।' কে অধৈর্য্যভাবে ঠোঁট কামড়ায়। 'স্যার,' উত্তর দিল বারনাবাস, বিনীতভাবে, মাথা ঝুঁকিয়ে, যে ভঙ্গিতে বিগলিত হয়ে কে আবার তাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে, 'আমি নিশ্চয়ই বিষয়টা দেখব। আর গতবারে আপনি আমাকে যে চিঠিটা দিয়েছিলেন তারো একটা ব্যবস্থা করব।'

'সে কি?' কে চোঁচিয়ে ওঠে,' 'এখনো তুমি তার ব্যবস্থা করনি? পরদিন তুমি দুর্গে যাওনি বলছ?'

'না,' বলল বারনাবাস, 'বাবা বুড়ো হয়েছেন, তাতো আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন, আর সেই মুহূর্তে হাতে কাজও প্রচুর ছিল, ওঁকেও সাহায্য করতে হলো। তবে খুব তাড়াতাড়ি এবার আমি দুর্গে যাব।'

'তুমি ভেবেছটা কী হে নির্বোধ?' বলে কে তার জর কাছে একটা ঘুঁষি মেরে বলে, 'ক্ল্যামের কাজটাই কি সবকিছুর উর্দ্ধে নয় তাহলে? তুমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে নিযুক্ত আছ, তুমি বার্তাবাহক, আর তুমি কিনা আমাকে ডোবালে এমন জঘন্যভাবে? তোমার বাবার কাজের গুরুত্ব কতটুকু? ক্ল্যাম খবরের, আশায় বসে আছেন, তুমি ক্লোথায় আমার আবেদন নিয়ে পড়িমরি করে তার কাছে ছুটবে, তা না ব্যস্ত হয়ে পড়লে আস্তাবল পরিষ্কার করতে।'

'আমার বাবা মুচি' ব্যস্তভাবে উত্তর দেয় বারনাবাস, 'উনি ক্রনসউইকের কাছ থেকে অর্ডার পেয়েছিলেন। আর আমি তাঁর সহকারী।'

অর্ডার 'মুচি, ক্রসসউইক,' চিৎকার করে বলে কে, কাটা কাটা উচ্চারণ করে, যেন তার ইচ্ছা শব্দগুলি নিশ্চিহ্ন করে দেবার।

'তা এই জনবিরল রাস্তায় বুটের দরকারটা হয় কার? আর এই মুচি টুচির গল্প শুনেই বা আমি কী করব? আমি তোমাকে একটা চিঠির দায়িত্ব দিয়েছিলাম, সেটা এখানে সেখানে ফেলে রাখার জন্য নয়, বেঞ্চে ওপর দলা করে ফেলে রাখার জন্য নয়, ক্ল্যামের কাছে পৌঁছে দিতে।'

এই সময় কে কিছুটা সংযত হয় যেহেতু তার মনে পড়ে যায় ইতিমধ্যে অধিকাংশ সময়টাই ক্ল্যাম দুর্গে না থেকে হেরেনহফে কাটিয়েছেন। কিন্তু সে আবার উষ্ণ হয়ে ওঠে যখন বারনাবাস তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে সে চিঠির কথা ভোলেনি ও সে চিঠিটার বক্তব্য আবৃত্তি করতে শুরু করে। 'যথেষ্ট হয়েছে, আমি আর শুনতে চাই না।' সে বলে।

'আমার ওপর রাগ করবেন না স্যার,' বলল বারনাবাস, এরপর যেন অচেতনভাবেই কে-র ব্যবহারে ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করতেই তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে চোখ আনত করে, কিন্তু সম্ভবত সে কে-র ক্রোধের বহিঃপ্রকাশেই কিছুটা দমে গিয়েছিল।

'আমি তোমার ওপর রাগ করিনি' বলল কে, এবং এবার তার স্ফোভটা তার নিজের বিরুদ্ধেই মোড় নেয়।

'আমার রাগ তোমার ওপর নয়, আমার নিজেরই এমন আহাম্মকির জন্য যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা কাজের জন্য তোমার মতো একটা বার্তাবাহককে বেছে নিয়েছিলাম।'

দেখুন,' বলে বারনাবাস ও যেন বার্তাবাহক হিসাবে নিজের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করতেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভাবে বলতে থাকে, 'ক্ল্যাম ঠিক আপনার চিঠির জন্য অপেক্ষা করে বসে নেই। তাঁকে বরং বিরক্তই হতে দেখি যখন তাঁর কাছে যাই-আরো একটা নতুন খবর।'

একবার এমনকী বলেও ওঠেন, আর আমাকে দূর থেকে আসতে দেখলেই উঠে পাশের ঘরে চলে যান ও আমাকে আর দেখা দেব না। এছাড়া এমন কোনো নিয়মও নেই যে কোনো বার্তা পাওয়া মাত্রই আমাকে তা নিয়ে তখনি ছুটতে হবে। তেমন কোনো নিয়ম থাকলে আমি তখনি ছুটে যেতাম নিঃসন্দেহে। কিন্তু এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, আর সেই কারণে আমি যদি একেবারেই না যেতাম তাহলেও আমাকে কিছুই বলা চলত না। আমি কখন খবর নিয়ে যাব, না যাব তা আমার নিজস্ব মজির ওপর নির্ভর করে।'

'তা বেশ, ভালোই তো,' বলে কে, বারনাবাসের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে। সহকারীরা পিছন থেকে পর্যায়ক্রমে সাবধানে মাথা বার করছিল যেন গুপ্ত কোনো কুঠুরি থেকে উঁকি দিচ্ছে, ও দ্রুত অদৃশ্য হচ্ছিল নরম শিশ দিয়ে বাতাসের তীক্ষ্ণ শিশধ্বনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে, যেন কে তাদের কাছে আতঙ্কের পাত্র। বহুক্ষণ তারা নিজেদের অবস্থাটা এভাবেই উপভোগ করে।

'ক্ল্যাম কী ধরনের মানুষ জানি না কিন্তু আমার গভীর সন্দেহ আছে তুমি আদৌ ওখানকার ব্যাপার স্যাপার ঠিকমতো বোঝা কিনা সে বিষয়ে, আর মনে হয় তুমি যদি

তা বুঝেও থাক এখনকার পরিস্থিতির কোনো রকম উন্নতি করা তোমার সাধ্যের অতীত। কিন্তু তুমি অন্তত একটা চিঠি তো পৌঁছে দিতে পার, আর আমি তোমাকে সেটুকুই করতে বলাছি। খুব ছোটো একটা খবর। আমার হয়ে কালকে সেটা পৌঁছে দিয়ে কালকেই উত্তরটা নিয়ে আসতে পারবে কি? অন্তত আমাকে জানাতে পারবে কি তোমাকে কীভাবে গ্রহণ করা হলো। এটা তুমি করতে পারবে কি, ও করবে কি? তাহলে আমার মন্ত একটা উপকার করা হবে। সেক্ষেত্রে তোমাকে যথাযথভাবে পুরস্কৃত করার আমিও একটা সুযোগ পাব। নাকি তোমার এমন কোনো ইচ্ছা আছে যেটা আমি এখনই পূরণ করতে পারি?’

‘আমি নিশ্চয়ই আপনার আদেশ পালন করব,’ বলে বারনাবাস।

‘আর তুমি তোমার যথাসাধ্য করবে সেটা ঠিকমতো পৌঁছে দিতে ক্ল্যামেরকাছে। স্বয়ং ক্ল্যামের কাছ থেকে উত্তর নিয়ে আসবে, যত সত্বর সম্ভব, সব কিছুই অত্যন্ত দ্রুত, আগামীকাল সকালেই করবে এসব?’

‘আমি যথাসাধ্য করব।’ উত্তর দেয় বারনাবাস। ‘কিন্তু আমি সবসময় তাই-ই তো করে থাকি।’

‘এ বিষয়ে আমরা আর কোনো তর্ক-বিতর্কে যাব না,’ বলে কে, ‘এই হচ্ছে চিঠি: কানুনগো শ্রদ্ধেয় পরিচালক মহাশয়কে বিনীতভাবে অনুরোধ করছেন তাকে একটা একান্ত সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিতে, এই অনুমোদনের জন্য যে কোনো শর্তই পত্রলেখক মেনে নিতে রাজি আছেন। তিনি এই অনুরোধ করতে বাধ্য হচ্ছেন কারণ ইতিপূর্বে সমস্ত প্রকার মধ্যস্থতাই সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি এই তথ্য জানাতে চান যে এখন পর্যন্ত জরিপের কোনো কাজই পত্রলেখক করেননি ও গ্রামবাসীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী ভবিষ্যতেও কখনো এ ধরনের কাজ করতে পারবেন না। এই কারণেই তিনি পরিচালকের শেষ চিঠিটি পাঠ করেছেন গভীর লজ্জা ও হতাশার সঙ্গে; শুধুমাত্র পরিচালকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই এক্ষেত্রে উপকার হতে পারে।

কানুনগো অবগত আছেন তার অনুরোধটি কত অসমীচীন। কিন্তু তিনি নিজেকে এত নগণ্যভাবে তাঁর সামনে উপস্থিত করবেন যে পরিচালক তার উপস্থিতিতে সামান্য বিরক্ত বোধ করার কোনো কারণই খুঁজে পাবেন না। তাকে যদি অতি সামান্য সময়ও বরাদ্দ করা হয় পত্রলেখক তাও অতি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মেনে নেবেন এমনকি সাক্ষাৎকারের সময় শব্দসংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিলেও আপত্তি নেই, এমনকি তাকে দশটি শব্দ বরাদ্দ করা হলেও তিনি মনে করেন কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন। প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও গভীর উদ্বেগের মধ্যে পত্রলেখক পরিচালকের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রইলেন।’

কথা বলার সময় কে আত্মাবিস্মৃত হয়ে পড়েছিল, যেন সে এই সময়টা ক্ল্যামের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিল।

‘যতটা ভেবেছিলাম চিঠিটা তার চেয়ে বড়োই হয়ে গেল হে,’ সে বলল, ‘কিন্তু তুমি এটা একেবারে মুখস্থ করে নাও, বুঝলে, আমি এটা কাগজে লিখতে চাই না, অন্যান্য কাগজপত্রের হতো এটাও তাহলে অন্তর্হীন রাস্তায় ঘুরে মরবে,’ তাই বারনাবাসের

সুবিধার জন্য কে এক সহকারীর পিঠের ওপর একটুকরো কাগজ রেখে তাতে এসব লিখে দেয়। অন্য সহকারী লঠনটা উঁচু করে ধরে থাকে।

কিন্তু ইতিমধ্যেই কে বারনাবাসের মুখ থেকে চিঠিটির হুবহু শব্দগুলি শুনতে পায়, একটি শব্দও বাদ না দিয়ে বারনাবাস তা আবৃত্তি করে, সহকারীদের নানা রকম উপদ্রব অগ্রাহ্য করে।

‘তোমার স্মরণশক্তি তো অসাধারণ হে,’ কে বলে, তার হাতে কাগজটা দিয়ে, ‘কিন্তু অন্যান্য কাজেও এমন অসাধারণত্ব প্রমাণ কর দেখি। তোমার কোনো অনুরোধ আছে? নেই? চিঠির ব্যাপারে আমি অবশ্য আরো একটু নিশ্চিত হতে পারতাম যদি তোমার কোনো চাহিদা থাকত।’ প্রথমে বারনাবাস চুপ করে থাকে।

তারপর বলে, ‘আমার বোনেরা আপনাকে, শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে’ ‘তোমার বোনেরা,’ বলে কে, ‘ও হ্যাঁ, বেশ বড়োসড়ো স্বাস্থ্যবতী মেয়েরা।’

দুজনেই আপনাকে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে, কিন্তু অ্যামেলিয়া বিশেষ করে।’ বলে বারনাবাস, ‘এছাড়া সেই-ই দূর্গ থেকে এই চিঠি আজ আমায় এনে দিয়েছে।’ নতুন এই তথ্যটিতে আবার একটু ধাক্কা খেয়ে কে জিজ্ঞাসা করে, ‘আমার চিঠিটাও কি তাহলে সে দূর্গে পৌঁছে দিতে পারে না? কিংবা তোমরা দুজনেই সেখানে গিয়ে প্রত্যেকে আলাদাভাবে চেষ্টা করতে পারনা কি?’

‘অ্যামেলিয়াকে দপ্তরে যেতে দেওয়া হয় না,’ বলে বারনাবাস, ‘তা না হলে সে নিজে কাজটা করতে পারলে খুব খুশি হতো।’

‘হয়ত কালই গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আসবো।’ বলে কে, ‘তুমি শুধু প্রথমে উত্তরটা নিয়ে এসো। আমি স্কুলঘরে তোমার প্রতীক্ষায় থাকব। তোমার বোনদেরও আমার শুভেচ্ছা জানিও।’

কে-র প্রতিশ্রুতিটিতে মনে হলো বারনাবাস খুবই হুট হয়েছিল এবং উভয়ের হস্ত মর্দনের পালা শেষ হলে সে কে-র কাঁধেও হালকাভাবে হাত না ছুঁইয়ে পারে না, যেন সবকিছুই ঠিক আগের মতো আছে, সেই যখন বারনাবাস প্রথম গভীর মর্যাদাবোধের সঙ্গে কৃষককূলে পরিপূর্ণ সরাইটিতে পদার্পণ করেছিল তেমনই যেন সে এখনো। তার কাঁধের ওপর বারনাবাসের স্পর্শ কে-কে তার সেই বিশিষ্টতা স্মরণ করিয়ে দিল ও সে স্মিতহাস্য করে। এখন তার মেজাজটি দিব্যি ফুরফুরে হয়ে উঠেছে বলে ফেরার পথে সহকারীদের নানা রকম বাঁদরামো লক্ষ্য করেও সে কোনো আপত্তি করে না, সে তাদের যথেষ্টাচার সহ্য করে।

১১

সে যখন স্কুলবাড়িটায় গিয়ে পৌঁছল তখন সে হাড়মজ্জায় জমে গিয়েছে। একেবারে ঘুরঘুটি অন্ধকার। লঠনের ভিতর মোমগুলোও জ্বলে শেষ হয়ে গিয়েছে। সহকারীদের সাহায্যেই শুধু, তারা ইতিমধ্যেই এখানকার গালিঘুঁজি চিনে ফেলেছে, কে স্কুলের একটা ঘরে ঢোকার পথের হদিস পায়। ‘এই প্রথম তোমাদের একটা প্রশংসনীয় কাজ করতে দেখা গেল,’ সে বলে, ক্র্যামের চিঠির কথাটা স্মরণ করে। অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় কোণের একটা দিক থেকে ফ্রিডা চোঁচিয়ে বলে ওঠে, ‘কে-কে ঘুমতে দিও, ওকে বিরক্ত করো না।’

কে-র চিন্তা সর্বক্ষণ তাকে এমনভাবেই আচ্ছন্ন করে রাখে, যদিও অবশ্য সে ঘুমে এমন কাতর হয়ে পড়েছিল যে তার জন্য অপেক্ষা করা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এবার একটু আলোর বন্দোবস্ত করা গেল কিন্তু লণ্ঠনের আলো বেশি ওসকানো সম্ভব হয়না, প্যারAFFIN পড়ে আছে অতি অন্ধই। নতুন সংসারটিতে অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুই অভাব রয়ে গেছে।

এটা ঠিকই যে ঘরটা একবার গরম করা হয়েছিল কিন্তু ঘরটা বেশ বড়োসড়ো-কখনো সখনো ঘরটা ব্যায়ামাগার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে, ব্যায়ামের সরঞ্জাম কিছু দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, কিছু বাদ থেকে ঝুলছে-আর ঘরগরম রাখতে সমস্ত কাঠই ইতিমধ্যে জ্বালানো হয়ে গেছে। তাই প্রথমদিকে ঘরটা আরামদায়ক গরম থাকলেও কে-র দুর্ভাগ্য, ঘরটা আবার ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। প্রচুর পরিমাণ কাঠ অবশ্য একটা চালাঘরের মধ্যে মজুত রাখা আছে কিন্তু ঘরটা তালা মারা আর তার চাবি শিক্ষকের জিন্মায়। সে শুধু ক্ল্যাশ চলাকালীনই কাঠ জ্বালানোর অনুমতি দেয় স্কুল ঘর উত্তপ্ত রাখতে। এই ঘরটাও সহনীয় হয়ে উঠত অন্তত যদি একটা বিছানাও পাতা থাকত দেহটা লম্বা করতে।

কিন্তু সেদিক দিয়েও দেখা গেল কপাল খারাপ। পড়ে রয়েছে শুধু খড়পোরা একটা বস্তা, সেটার ওপর অবশ্য ফ্রিডা সুন্দরভাবে তার উলের চাদরটা বিছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু পালকের বিছানার পরিবর্তে শুধু দুটো কর্কশ, শক্ত কম্বলের সাহায্যে কেউ নিজেকে গরম রাখতে পারে না। তার সহকারীরা কিন্তু এই জঘন্য খড়ভরা বস্তাটার দিকেই লুপ্তদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, অবশ্য এমন কোনো আশা ছাড়াই যে তারা তার ওপর শোবার অনুমোদন পাবে। ফ্রিডা কে-র দিকে চেয়েছিল শঙ্কিত দৃষ্টিতে। ঘর কীভাবে সাজাতে হয় তার তা জানা। এমনকি সবচেয়ে জঘন্য ঘরকেও কী করে বাসযোগ্য করে তুলতে হয় সে বিদ্যাও তার আয়ত্ব, ব্রীজ ইন-এ তার পরিচয়ও সে দিয়েছে।

কিন্তু এখানে সে তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেনি জিনিসপত্রের অভাবেই সম্ভবত।

‘এখানে আমাদের একমাত্র তৈজসপত্র হচ্ছে ব্যায়ামের সরঞ্জামগুলো,’ চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে বলে ঈষৎ হাসির চেষ্টা করে।

কিন্তু মূল যে অভাবগুলো রয়েছে-যেমন শোবার অবস্থা আর জ্বালানির-এগুলোর বিষয়ে সে পরের দিনই সাহায্য নেবে ও সে কে-কে অনুনয় করে সে যেন ততক্ষণ একটু ধৈর্য ধরে। তার কোনো কথা, কোনো ইঙ্গিত বা ভঙ্গি থেকে কারো মনেই হবে না কে-র বিরুদ্ধে তার অণুমাত্র কোনো তিক্ততা রয়েছে, যদিও কে-কে স্বীকার করতেই হলো সে-ই তাকে প্রথমে হেরেনহফ, তারপর ব্রীজ ইন থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এসেছে। তাই বিনিময়ে সে সমস্ত কিছুই সহনীয় ভেবে নেবার চেষ্টা করে, যেটা অবশ্য তার তেমন কঠিন বলেও মনে হয় না কারণ মনের গভীরে সে তখনো বারনাবাসের কাছে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করতে করতে তার বার্তাটি পাঠ করে যাচ্ছিল। বারনাবাসকে আসলে যেভাবে বলে এসেছে ঠিক সেভাবে নয়, বরং ক্ল্যামের কাছে সেটা কেমন শোনাবে তেমনভাবে।

যাই হোক, সে খুব আনন্দিতই হয়ে ওঠে যখন ফ্রিডা তাকে স্পিরিট স্টোভে ফুটিয়ে একপাত্র কফি এগিয়ে দেয়, তারপর প্রায় ঠান্ডা চুল্লির দিকে ঝুঁকে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে শিক্ষকের টেবিলের ওপর বিছিয়ে দেয় তার অপরিহার্য সাদা রঙের টেবিল কভারটি, বার করে আনে ফুলের নকশা করা কাপ, তারপর রুটি, সসেজ আর সসেজ আর সত্যি সত্যিই একটিন সার্ডিন মাছ। এবার সবকিছু প্রস্তুত। ফ্রিডা নিজেও এতক্ষণ না খেয়ে কে-র জন্য অপেক্ষা করেছে। দুটো চেয়ারই পাওয়া গেল, তাতে ওপর ফ্রিডা ও কে বসে পড়ে টেবিলটা সামনে টেনে নিয়ে, সহকারীরা দাঁড়িয়ে থাকে উঁচু জায়গায়, কিন্তু তারা একমুহূর্তও স্থির থাকে না, খাবার সময় এমনকি নানা বিঘ্নও ঘটতে থাকে। যথেষ্ট পরিমাণ খাবারের ভাগ পাওয়া সত্ত্বেও তারা সেগুলো শেষ না করেই উঠে আসে মাঝে মাঝে নিশ্চিত হতে টেবিলে আরো খাবার রয়েছে কিনা যা থেকে আরো কিছু হাতানোর আশা তারা করতে পারে।

কে তাদের একেবারেই অগ্রাহ্য করে কিনতু তাদের লক্ষ্য করতে বাধ্য হয় শুধু যখন ফ্রিডা তাদের ভাঁড়ামি দেখে হাসিতে ভেঙে পড়ে। সে নরমভাবে তার মাথায় হাত রাখে ও মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করে সে তাদের এভাবে আসকরা দিচ্ছে কেন, তাদের বজ্জাতিকে এতটা প্রশ্রয়ের চোখে দেখছে কেন। এভাবে চললে তো ওদের হাত থেকে কখনোই নিস্তার পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে ওদের কঠোরভাবে শাসন করলে হয় তো ওদের কিছুটা শায়েস্তা করা যাবে। কিংবা আরো সম্ভব ও কাম্য, ওদের অবস্থাটা এমন শোচনীয় করে তোলা যাবে যে শেষ পর্যন্ত মানে মানে তারা সরে পরতে বাধ্য হয়।

দীর্ঘ সময় ধরে বাস করার পক্ষে এই স্কুলটা মোটেই আরামের জায়গা নয়, অবশ্য বেশিদিন এখানে থাকতেও হবে না, যেদিক দিয়েই দেখা যাক না কেন। কিন্তু এ জায়গাটার দোষত্রুটি তেমন প্রকট হয়ে উঠবে না এই সহকারীরা যদি বিদায় নেয় ও নির্জন বাড়িটা শুধু তাদের দুজনের হয়ে ওঠে। এছাড়াও সে কি লক্ষ্য করেনি দিন দিন এই বান্দরগুলোর বাড়ি কেমন বেড়েই চলেছে, যেন ফ্রিডার উপস্থিতিতেই তাদের সাহস এত বেড়ে গেছে যে তারা ধরেই নিয়েছে কে আর তাদের সেরকম দৃঢ়তার সঙ্গে শাসন করতে পারবে না অন্য পরিস্থিতিতে সে যেমনটা পারত। এছাড়া এখনি তাদের হাত থেকে নিস্তার পাবার অন্য সহজ পথও রয়েছে, তেমন কোনো উপলক্ষ্য ছাড়াই, সম্ভবত ফ্রিডাও সেটা ভালোমতোই জানে, এসব পরিস্থিতি সামলানোর অভিজ্ঞতাও তার রয়েছে।

এছাড়া কোনো ছুতোয় এই লোকগুলোকে খেদিয়ে দিলে আসলে তাদেরই উপকার করা হবে। এখানে তাদের যে বিশেষ সুবিধা হচ্ছে তাতো নয়। আর তাছাড়া যেরকম আলস্যের মধ্যে মহা আনন্দে তারা দিন কাটিয়ে চলেছে সেটাও আশু বন্ধ হওয়া দরকার, অন্তত কিছু পরিমাণে, কারণ ওদের তো আবার কাজ করতেই হবে যখন ফ্রিডার এই কয়েকটা দিনের সম্মিাদনা কমে এলে তাকে বিশ্রাম নিতে হবে আর তাকে, কে-কে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার একটা উপায় খুঁজে বার করতে।

সে যাই হোক, এই সহকারীরা যদি বিদায় হয় সে এতটাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে সে স্কুলের সমস্ত কাজই শুধু যে সে একা করে উঠতে পারবে তাই নয়, তার সঙ্গে অন্যান্য কর্তব্য পালন করাও তার কাছে কঠিন বোধ হবে না।

তার কথা মন দিয়ে শুনতে শুনতে ফ্রিডা তার হাতে মৃদু চাপড় দিতে থাকে ও বলে তারও মতামতও একইরকম, তবে কে বোধ হয় তাদের দুইটামিকে একটু বেশি গুরুত্ব দিয়েই দেখেছে। আসলে তারা বয়সের দিক থেকে বালকমাত্র, শক্তিতে ভরপুর, আর একটু চপলও বোধ হয় হয়ে পড়েছে জীবনের প্রথম নতুন ধরনের একটা কাজ পেয়ে। এসব কারণেই তারা কিছুটা লাগামছাড়া উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। এমন অবস্থায় পড়ে তারা এমন বাঁদরামো শুরু করেছে যাতে বিরক্ত বোধ করা খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হবে তাদের চলাচলনকে ঠাট্টার চোখে দেখা। সে নিজে তো তাদের দেখে না হেসেই পারে না। অবশ্য সেও কে-র সঙ্গে একমত যে সবচেয়ে ভালো হয় যদি তারা দুজন একান্তে থাকতে পারে, তারা দুজন শুধু। সে কে-র কাছে ঘন হয়ে আসে ও কে-র কাঁধে মুখ ঝুঁজে দেয়। সেখানে সে ফিসফিস করে এত নিচু স্বরে কিছু বলে যে কে-কে তা শুনতে মাথা পিছনে হেলাতে হয়। সে যা বলে তার সারাংশ হলো-সহকারীদের সামলানোর কোনো উপায় তার জানা নেই, আর তার আশঙ্কা হচ্ছে কে-ও যে সব উপায়ের কথা বলল তাতে কোনো কাজ হবে না।

তার যতদূর জানা কে নিজেই তাদের চেয়েছে, এবং পেয়েছে এবং তাদের রাখতে সে বাধ্য। তাদের একটা মস্ত রসিকতা হিসেবে দেখাটাই সবচেয়ে ভালো কারণ তারা আসলে তাই-ই, তাদের সহ্য করে নেওয়াটাই একমাত্র পথ।

তার এই উত্তরে কে বিরক্ত হয়; কিছুটা ঠাট্টার সঙ্গে, কিছুটা রাশভারিভাবে নিয়ে সে বলে যে ফ্রিডার কথা শুনে মনে হয় তাদের সঙ্গে তার একটা গোপন আঁতাত রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। অন্তত তাদের ওপর তার একধরনের টান তো দেখাই যাচ্ছে; অবশ্য এটা ঠিক ছোঁড়াদুটোকে দেখতে বেশ সুদর্শন। কিছু মনে কেউ নেই যার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যেতে পারে না মনের জোর থাকলে। সে সেটাই করে দেখাবে তার নিজের সহকারীদের ক্ষেত্রে।

ফ্রিডা বলল সে যদি তা করতে পারে তার প্রতি সে গভীর কৃতজ্ঞ থাকবে। এখন থেকে সে আর তাদের নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করবে না, তাদের সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও বলবে না। অবশ্য এখন সে তাদের মধ্যে হাস্যকর কিছু দেখতেও পাচ্ছে না। সব সময় দুটো লোক গোয়েন্দাগিরি করে চলেছে এ তো সত্যিই কোনো মজার বিষয় হতে পারে না।

সে কে-র চোখ দিয়ে তাদের দেখতে শিখে নিয়েছে। এবং বাস্তবিকই সে এখন কিছুটা সংকুচিত হয়ে ওঠে যখন সহকারীরা উঠে এগিয়ে আসে, কিছুটা খাবার দাবার পড়ে আছে কিনা দেখতে, আর কিছুটা ক্রমাগত ফিসফিসানির রহস্য ভেদ করতে। এই ঘটনাটিকে কে কাজে লাগায় সহকারীদের বিরুদ্ধে ফ্রিডার বিতৃষ্ণা বাড়াতো, তাকে নিজের কাছে টেনে আনে ও গায়ে গা ঠেকিয়ে তারা নৈশাহার সারে। এবার বিছানায় যাবার সময় হলো, তারা সকলেই এখন খুবই নিদ্রাকাতর। একজন সহকারী তো খেতে খেতেই ঘুমিয়ে পড়েছে, এতে অন্যজনের ভারি আমোদ বোধ হয় ও তার সঙ্গীর হাবার মতো মুখের দিকে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতে থাকে যদিও তার সে চেষ্টা বিফলেই যায়।

কে ও ফ্রিডা বসে থাকে স্থানুর মতো কোনোদিকে মনোযোগ না দিয়ে। ঠাণ্ডা এত মারাত্মক হয়ে উঠছিল যে তারা বিছানায় যাবারই চেষ্টা করল না, অবশেষে কে ঘোষণা করল ঘর গরম করতেই হবে, না হলে ঘুমনো অসম্ভব। সে চারধারে তাকায় একটা কুড়োল বা ওই ধরনের কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখতে। তার সহকারীরা কোথা থেকে একটা কুড়োল সংগ্রহ করে আনে। এরপর তারা যাত্রা করে কাঠ রাখার চালাঘরটির উদ্দেশ্যে।

কয়েক মুহূর্তেই পলকা দরজাটি চূর্ণ হলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘরে কাঠের স্তূপ জমে গেল, চুল্লিটা আবার উসকে দেওয়া হলো, সকলে সেটাকে ঘিরে শুয়ে পড়ল, সহকারীদেরও একটা কম্বল দেওয়া হলো নিজেদের আবৃত করতে, তাদের পক্ষে যথেষ্ট বড়ো কম্বল, কারণ স্থির করা হলো তাদের মধ্যে একজন জেগে থাকবে আশুন জ্বালিয়ে রাখতে-এরপরই চুল্লির চারধার এমন গরম হয়ে উঠল যে কম্বলের কোনো প্রয়োজনই আর রইল না, লণ্ঠনগুলো নিভিয়ে দেওয়া হলো এবং কে ফ্রিডা উত্তপ্ত নৈঃশব্দের মধ্যে অতিসুখে ঘুমের হাতে নিজেদের ছেড়ে দেয়।

কোনো একটা আওয়াজে কে গভীর রাতে জেগে উঠে এবং অস্পষ্ট নিদ্রাকাতর অবস্থান সে ফ্রিডাকে হাত দিয়ে অনুভব করতে চায়। সে দেখে ফ্রিডার পরিবর্তে এক সহকারী তার পাশে শুয়ে রয়েছে। সম্ভবত এক ভীষণ বিরক্তি থেকেই, হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠতে হলে যেমনটা ঘট খুবই স্বাভাবিক, সে সাংঘাতিক আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, এই গ্রামে পা রাখার পর তার এই প্রথম এমন ঘটল। একটা চিৎকার করে সে উঠে বসে ও সে কী করছে বোঝার আগেই সহকারীটিকে সজোরে এমন একটা ঘুমি মারে যে সে কাঁদতে শুরু করে। আসল ব্যাপারটা অবশ্য নিমেষেই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ফ্রিডা জেগে উঠেছিল-অন্তত তাই তার ধারণা-বড়ো একটা জানোয়ারের স্পর্শে, কোনো বেড়াল টেড়ালই সম্ভবত। সেটা তার বুকের ওপর চড়ে বসেছিল, তারপর লাফিয়ে অন্তর্হিত হয়। সেউঠে পড়ে, একটা মোম নিয়ে সারা ঘরে জঙ্ঘটাতে খুঁজে বেড়ায়। এই অবসরে একটা সহকারী অন্তত অল্পক্ষণের জন্য হলেও বস্তার ওপর শোবার সুযোগটা নেবার চেষ্টা করেছিল, যে জন্য তাকে এখন অনুতাপ করতে হচ্ছিল।

ফ্রিডা কিছুই খুঁজে পায়নি, বোধ হয় সবই তার কল্পনা। সে আবার কে-র কাছে ফিরে আসছিল ও ফেরার পথে সে হাঁটু মুড়ে ক্রন্দনরত সহকারীটির মাথার চুলে হাত বুলিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করে, যেন একটু আগের সমস্ত কথোপকথনই সে বিস্মৃত হয়েছে। কে এ বিষয়ে কিছু বলে না কিন্তু সহকারীদের নির্দেশ দেয় চুল্লিতে কাঠ আর না দিতে কারণ প্রায় সমস্ত কাঠের স্তূপটাই ভস্মীভূত হয়ে যাবার ফলে ঘর ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত গরম হয়ে উঠেছে।

১২

পরের দিন কারোরই ঘুম ভাঙল না যতক্ষণ না স্কুলের বাচ্চাগুলো সেখানে এসে হাজির হলো। নিদ্রিতদের বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে তারা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। ব্যাপারটা খুবই অশস্তিকর কারণ প্রচণ্ড গরমের জন্য, ভোরবেলা অবশ্য ঠাণ্ডা হতে শুরু হয়েছিল শীতও করছিল, তারা জামা ছাড়া আর সবই খুলে ফেলেছিল আর তারা যখন পোশাক পরতে

শুরু করেছে মাত্র,-মহিলা শিক্ষিকাটি, নাম গিসা, এসে হাজির হলো দরজার কাছে। উজ্জ্বল গায়ের রঙ, লম্বা সুন্দর দেখতে হলেও অভুত দরনের এক তরুণী।

স্পষ্টতই সে নতুন স্কুল পরিচালকের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল, মনে হলো তাকে এ বিষয়ে শিক্ষকবই ইতিমধ্যেই কিছু নির্দেশও দিয়ে রেখেছে কারণ দরজার কাছে এসে দাঁড়ানোমাত্রই সে বলতে শুরু করে, 'এসব আমার পক্ষে বরদাস্ত করা অসম্ভব। ভারি চমৎকার অবস্থা দেখতে পাচ্ছি এখানে। ক্লাশ ঘরে আপনাদের ঘুমনোর অনুমতি আছে, বাস এটুকুই। আপনার শোবার ঘরে পড়াতে আমি বাধ্য নই। একটা দারোয়ানের পরিবার ভর দুপুর পর্যন্ত বিছানায় গড়াচ্ছে। জঘন্য।'

ঠিক আছে, কিন্তু তারও এই প্রসঙ্গে কিছু বলার ছিল; বিশেষ করে পরিবার বা বিছানা সম্পর্কে, ভাবল কে। এই সময়ে ফ্রিডার সাহায্যে-সহকারীদের কাছ থেকে কোনো সাহায্যই পাওয়া গেল না কারণ মেঝেতে তখনও শুয়ে তারা অবাকচোখে মহিলা শিক্ষক ও শিশুদের দেখছিল-সে প্যারালাল বার আর ভলটিং হর্স টেনে সরিয়ে এনে তাদের ওপর কন্সল বুলিয়ে দেয় ও এভাবে খাটো একটা আড়াল তৈরি করতে সমর্থ হয়, যার পিছনে দাঁড়িয়ে অন্তত শিশুদের দৃষ্টির অগোচরে পোশাক পরে নেওয়া যেতে পারে। তাকে অবশ্য এক মিনিটের জন্যও শান্তিতে থাকতে দেওয়া হয় না কারণ শিক্ষিকাটি তাকে ধমকাতে শুরু করেছিল ধোয়াধুয়ি করা গামলাটায় টাটকা জল ছিল না বলে-একটু আগেই কে ভাবছিল গামলাটা সরিয়ে আনবে কিনা তার ও ফ্রিডার হাত মুখ ধোবার জন্য, কিন্তু আপাতত সে এই চিন্তা বিসর্জন দেয়।

দিদিমণিকে আরো চটিয়ে দেবার ইচ্ছা তার ছিল না। কিন্তু তার এতমুখ শুভেচ্ছা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না কারণ সামান্য পরেই বিপুল শব্দে ঘরটি পূর্ণ হয়ে ওঠে। দুর্ভাগ্যবশত তারা বোধহয় নৈশভোজের ভুক্তাবশিষ্ট পরিষ্কার করতে ভুয়ে গিয়েছিল। শিক্ষিকাটি হাতের রুল দিয়ে সেগুলো শূন্যে নিক্ষেপ করে ও সেগুলো সশব্দে মেঝেতে গিয়ে পড়ে। এবার দিদিমণিটি নির্লিপ্ত ভাবে চেয়ে থাকে সার্ভিসের তেল, অবশিষ্ট চলকে পড়া কফি, চূর্ণ কফিপটের দিকে, পরিচালকই ওগুলো পরিষ্কার করুক।

আবার জামা কাপড় পরা হয়ে গেলে প্যারালাল বারের আড়াল থেকে মাথা বাড়িয়ে ফ্রিডা দেখে তাদের সম্পত্তিগুলো কীভাবে ধ্বংস করা হলো। সহকারীদের মাথায় তখনো জামা কাপড় পরে নেবার চিন্তাটা আসেনি। মেঝেতে শুয়ে কন্সলের ভাঁজ থেকে তারা মুগ্ধ বার করে, উপস্থিত শিশুদের প্রচুর আমোদের কারণ ঘটিয়ে। ফ্রিডার সবচেয়ে কষ্ট হয় কফি পটটার কথা ভেবে।

শুধু যখন কে তাকে আশ্বাস দিল সে গ্রামপ্রধানের কাছে গিয়ে এর ক্ষতিপূরণ দাবি করবে ও তাকে সেই দাবিপূরণে বাধ্য করবে সে ঘেরাটোপ থেকে সেমিজ ও স্কাট পরে বেরিয়ে আসে ও টেবিল কভারটা তুলে নেয় আরো নোংরা হয়ে যাবার আগে। কোনোমতে সে কাজটা সারতে পারে যদিও শিক্ষিকা তাকে ভয় দেখাতে রুলারটি দিয়ে টেবিলের ওপর ক্রমাগত আঘাত করছিল ভীতিকর ভাবে।

কে ও ফ্রিডা ঠিকঠাক পোশাক পরে নেবার পর হতচকিত সহকারীদেরও পোশাক পরে নিতে বাধ্য হয়। এবার তারা সবাই প্রস্তুত হবার পর কে তাদের মধ্যে অবশিষ্ট

কাজ ভাগ করে দেয়। সহকারীদের কাঠ নিয়ে এসে আগুন জ্বালাতে হবে, আগে প্রথম ক্লাশঘরটিতে, যেখানে আরো একটা বড়ো ধরনের বিপদের সম্ভাবনা রয়ে গেছে, শিক্ষক বোধহয় ইতিমধ্যে সেখানে এসে পৌঁছে গিয়েছে।

ফ্রিডা মেঝেটা পরিষ্কার করবে ঘষে ঘষে আর কে নিজে টাটকা জল টেনে নিয়ে আসবে ও অন্যান্য কিছু ঠিকঠাক করে ফেলবে এমনটাই স্থির হয়। এখন প্রাতরাশের কথা ভাবার সময় নেই। কিন্তু শিক্ষিকার যথার্থ মনের ভাব বুঝতে কে স্থির করে সে আগে ঘর থেকে বেরোবে, বাকিরা তাকে অনুসরণ করবে শুধুমাত্র সে তাদের ডাকলে, সে এরকম স্থির করে কারণ তার সহকারীদের কোনো নির্বুদ্ধিতার কারণ পরিস্থিতি আরো ঘোরালো হয়ে উঠুক এটা তার অনভিপ্রেত ছিল। এছাড়াও তার ইচ্ছে ফ্রিডাকে যথাসম্ভব নিষ্কৃতি দেওয়া, কারণ ফ্রিডার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তার নেই; ফ্রিডা অভিমাত্রী, সে নয়; ফ্রিডা তাৎক্ষণিক তুচ্ছ অসচ্ছন্দ বিষয়ে চিন্তিত হয়ে আছে; সে ভাবছে বারনাবাস ও ভবিষ্যতের কথা।

ফ্রিডা তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছিল, তার থেকে এক মুহূর্তের জন্য নজর প্রায় না সরিয়ে। সে আবার উপস্থিত হতে না হতেই শিক্ষিকা জিজ্ঞাসা করে, শিশুদের হাস্যধ্বনির মধ্যে, ‘ঘুম ভালো হয়েছিল?’

ও কে যেহেতু কোনো পাত্তাই দেয় না বুঝতে পেরে যে এটা আসল প্রশ্ন নয় ও ওয়াশস্ট্যান্ড পরিষ্কার করতে থাকে, সে আবার জিজ্ঞাসা করে, ‘আমার বেড়ালটাকে কী করেছিলেন?’

একটা মস্ত দেখতে মোটাসোটা বিড়াল অলসভাবে চিত্তিয়ে শুয়ে ছিল টেবিলের ওপর আর শিক্ষিকাটি তার একটি থাবা পরীক্ষা করছিল, স্পষ্টতই সেটা অল্প একটু চোট পেয়েছে। তাহলে ফ্রিডা ঠিক কথাই বলেছিল, অবশ্য বেড়ালটা তার ওপর লাফিয়ে ওঠেনি, লাফাবার ক্ষমতা তার চলে গেছে। সে গুঁড়ি মেরেই ফ্রিডার ওপর উঠে থাকবে, ফাঁকা ঘরে হঠাৎ লোকজন দেখেই ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়েছিল ও অনভ্যস্তভাবে দ্রুত পালাতে গিয়েই ব্যথা পেয়েছে। মহিলাকে কে এসব শান্তভাবে বোঝাতে চেষ্টা করে কিন্তু সে আঘাতটা ছাড়া আর কিছুই বুঝতে রাজি নয় ও বলে, ‘তাতে কী, আপনারা এলেন বলেই তো এমন ঘটল।’

একবার শুধু দেখুন এসে কী করেছেন আপনারা।’ এবং সে কে-কে টেবিলের কাছে ডাকে, বেড়ালের থাবাটা দেখায় ও সে তা ভালোভাবে দেখে ওঠার আগেই তার হাতের পিছনে রুলারটা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানে। বেড়ালের শোকে তার আঘাতটি এতই সাংঘাতিক হয় যে কে-র হাতের চামড়া ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে থাকে।

‘এবার নিজের কাজে যান,’ সে বলে অধৈর্যভাবে, বেড়ালের ওপর আবার জুঁকে পড়ে। প্যারালাল বারে পিছন থেকে সহকারীদের সঙ্গে ফ্রিডাও সব দেখছিল, রক্ত দেখে সে চিৎকার করে ওঠে।

কে শিশুদের কাছে গিয়ে হাত তুলে ধরে বলে ‘দেখ তোমরা, ঐ বজ্জাত, ধূর্ত বেড়ালটা আমার কী হাল করেছে।’

সে অবশ্য শিশুদের ঠিক কথাগুলো বলে না, তাদের চিৎকার ও কলহাস্য চলছিল অবিরাম, তাতে নতুন কোনো ইন্ধনের প্রয়োজনও ছিল না, আর তাছাড়া তার কোনো কথাই তাদের প্রভাবিত করতে পারে এমন সম্ভাবনাও ছিল অতাল্প।

কিন্তু কে যখন দেখল দিদিমণিটিও একটি পার্শ্ব কটাক্ষ হানে মাত্র যেন অপমানটি স্বীকার করে নিতেই ও তারপর বেড়ালটা নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে, রক্তপাত ঘটিয়ে তার ক্রোধের মোটামুটি প্রশমন হয়েছে, তখন সে ফ্রিডা ও সহকারীদের ডাক দেয় ও তাদের সেদিনের কর্তব্য শুরু হয়।

কে যখন বালতি করে নোংরা জল বাইরে ফেলে দিয়ে টাটকা জল নিয়ে আসছিল এই সময়, ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যাবার সময়, প্রায় বারো বছরের একটি বালক ডেস্ক থেকে উঠে এসে কে-র হাত স্পর্শ করে কিছু একটা বলল যেটা ক্লাশের তীব্র কোলাহলের মধ্যে শোনা গেল না। এরপর হঠাৎ সমস্ত শব্দ থেমে যায় ও কে ফিরে তাকায়।

সারা সকাল ধরে সে ভয়টা সে করছিল তাই ঘটল অবশেষে। দরজার কাছে শিক্ষকটি দাঁড়িয়ে। বেঁটেখাটো লোকটি দুহাতে তার দুই সহকারীর গলার স্কার্ফ পেচিয়ে টেনে রেখেছে। সে তাদের ধরেছে, মনে হলো, যখন তারা কাঠ আনতে যাচ্ছিল কারণ সে প্রবল কণ্ঠে চিৎকার করতে শুরু করল, 'কাঠের চালাঘর ভেঙে ভিতরে ঢোকার সাহসটা কার? সেই শয়তানটা কোথায় গেল? আমি তাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেব।'

এইসময় ফ্রিডা মেঝে থেকে উঠে দাঁড়ায়, দিদিমণির পায়ের কাছে জায়গাটা সে পরিষ্কার করার চেষ্টা করছিল, কে-র দিকে তাকায় যেন সে তার থেকে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে ও তারপর পলে, 'আমিই তা করেছি মাস্টারমশাই। অন্য কোনো পথ খুঁজেই পেলাম না। সময়মতো ক্লাশঘর গরম রাখতে গেলে কাঠ রাখার চালাঘরটা তো খুলতেই হবে, মাঝরাতে গিয়ে আপনার কাছে চাবি চাইবার ভরসা পাইনি, আমার প্রেমিক তখন হেরেনহফে ছিলেন, ওখানেই ওঁর সারারাত কাটাবার সম্ভাবনা ছিল, তাই আমাকেই কর্তব্য ঠিক করে নিতে হয়েছিল। আমি যদি ভুল করে থাকি আমার অনভিজ্ঞতাকে মার্জনা করবেন। আমার প্রেমিকও আমায় খুব বকাবকি করেছে, আমি কী করেছি তা দেখার পর। হ্যাঁ, ও এমনকী আমায় আগে থেকেই আগুন জ্বালাতে নিষেধ করেছিল কারণ ও মনে করেছে ঘরটায় তালা লাগিয়ে দিয়ে আপনি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে আপনি নিজে আসার আগে কাঠ জ্বালানোর কোনো প্রয়োজনই নেই। তাই এখনো যে আগুন জ্বালানো হয়নি সেটা ওর দোষেই, আর চালাঘর ভেঙে ভিতের ঢোকার দোষটা আমার।'

'দরজা কে ভেঙেছে?' জিজ্ঞাসা করে শিক্ষক সহকারীদের দিকে ফিরে। তারা শুখনো তার হাত থেকে নিস্তার পেতে নিষ্ফল লড়াই করছিল।

'ঐ ভদ্রলোক,' তারা দুজনেই উত্তর দেয় আর যাতে কোনো সন্দেহেরই অবকাশ না থাকে সেজন্য কে-র দিকে আঙুল তুলে দেখায়। ফ্রিডা সশব্দে হেসে ওঠে ও তার এই হাসি তার কথার চেয়েও অনেক বেশি চূড়ান্ত বলে মনে হয়। এরপর যে ন্যাকড়াটা

দিয়ে সে ঘর মুছ ছিল তা বালতির ভিতর নিংড়োতে থাকে এমনভাবে যেন তার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে ও সহকারীদের সাক্ষ্য বিলম্বিত একটা রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়।’

আবার হাঁটু মুড়ে কাজ আরম্ভ করার সময় সে যোগ করে, ‘বয়সে বড়ো দেখালেও আমাদের এই সহকারী দুটো আসলে শিশু, উচিত ছিল ওদের স্কুলের ডেস্কে বসিয়ে রাখা। গত সন্ধ্যায় সত্যিই আমি নিজে কুড়ুল দিয়ে চালাঘরের দরজা ভাঙি। কাজটা এতই সহজ সে সহকারীদের সাহায্যের আমার কোনো দরকারই হয়নি, ওরা শুধু ঝামেলাই বাড়াত। অনেক রাতে আমার প্রেমিক ফিরে এসে নিজের চোখেই ক্ষয়ক্ষতি দেখতে বেরিয়ে গিয়েছিল। সম্ভব হলে ভাঙা জিনিসগুলো নিজেই মেরামত করে দিতে, সহকারীরাও ওর পিছন পিছন দৌড়ে ছিল; সম্ভবত একা থাকতে ভয় পেয়েই। ওখানে গিয়ে তারা আমার প্রেমিককে তার ভাঙা দরজাটা নিয়ে কাজ করতে দেখে। ওই কারণেই ওরা এখন বলছে-কিন্তু আসলে তো ওরা দুজন শিশুই।’

এটা ঠিক ফ্রিডার কাহিনির সময় তারা মাথা দোলায় কিন্তু তখনি আবার কে-র দিকে আঙুল তোলে ও নানা মূক দেহভঙ্গি করে ফ্রিডাকে তার গল্প থেকে বিরত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু এতে সফল না হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা নতি স্বীকার করে। ফ্রিডার বক্তব্যকেই একধরনের নির্দেশ বলে মেনে নেয় ও তাদের যখন শিক্ষক একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তার নীরব থাকে।

‘তাহলে,’ শিক্ষকটি বলে, ‘তোমরা মিথ্যে বলছিলে? অকারণে স্কুলের পরিচারককে দোষারোপ করেছ?’

তখনো তারা নিশ্চুপ থেকে যায়। কিন্তু তাদের অস্থির শক্তিত চাউনি যেন তাদের দোষের প্রতি ইঙ্গিত করছিল।

‘সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের আগাপাশতলা বেত মেরে ঠিক করে দিচ্ছি,’ সে বলে। একটি বাচ্চাকে পাশের ঘর থেকে তার বেতটি নিয়ে আসতে পাঠায়। এরপর যখন সে বেত তোলে ফ্রিডা চোঁচিয়ে বলে, ‘সহকারীরা সত্যি কথাই বলেছে,’ ও হতাশায় ঘর মোছা ন্যাকড়াটি বালতির মধ্য ছুঁড়ে দেয়, যার ফলে চতুর্দিকে জল ছিটকে পড়ে, ও প্যারালাল বারের পিছনে দৌড়ে যায়, সেখানেই আত্মগোপন করে থাকে।

‘মিথ্যের জাহাজ একটা,’ মন্তব্য করে দিদিমণি; ইতিমধ্যে তার বিড়ালের থাবা বেঁধে দেবার কাজটি সম্পন্ন হয়েছে, এবার সে বিড়ালটাকে কোলে নেয়, অবশ্য জানোয়ারটা তার কোলের চেয়ে বেশ বড়োই।

‘তাহলে স্কুল পরিচারকই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি,’ বলে শিক্ষক, সহকারীদের সরিয়ে দিয়ে ও কে-র দিকে ফিরে, সে পুরো সময়টাই ঝাঁটার লম্বা হাতলে ভর দিয়ে সব শুনছিল।

‘এই স্কুল পরিচারকটি এতটাই কাপুরুষ যে নিজে বজ্জাতি করে অন্যদের ঘাড়ে অন্যায়ভাবে দোষ চাপাতে দ্বিধাবোধ করে না।’

‘বেশ তো,’ বলে কে, সে লক্ষ্য না করে পারে না যে ফ্রিডার মাথা গলানোর ফলে শিক্ষকটির দুর্দমনীয় ক্রোধ অনেকটা প্রশমিত হয়ে এসেছে।

‘সহকারীরা যদি লাঠির একটু আশ্বাদ পেত আমার দুঃখ হতো না। তারা যদি দশবার শাস্তি এড়িয়ে গিয়ে থাকে তাহলে অন্যভাবে হলেও একেবারেই পুরোটা উসুল হয়ে গেলে তাদের তা সহ্য করা উচিত। কিন্তু এছাড়াও মাস্টারমশাই আপনার সঙ্গে আমার সরাসরি ঝগড়া এড়ানো সম্ভব হলে তা আমার কাছে খুবই কাম্য বলে মনে হতো, আপনি নিজেও তা হয়ত খুবই কাম্য বলে মনে করতেন। কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে ফ্রিডা সহকারীদের চেয়ে আমাকেই বলি দেওয়াটা।

বেশি পছন্দ করছে,-‘এখানে কে থাকে ও এইসময় পর্দার আড়াল থেকে ফ্রিডার ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনা যায়, ‘সেক্ষেত্রে গোড়া থেকেই পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া জরুরি।’

‘কুৎসিত,’ বলে ওঠে দিদিমণি।

‘আমিও আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ফ্রাউলিন গিজা, বলে শিক্ষকটি, ‘আপনি স্কুল পরিচারক, এমন কলঙ্কজনক কাজের জন্য এই মুহূর্তেই পদচ্যুত হলেন। আপনার আরো শাস্তি আমি ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখছি। কিন্তু আপনি এফুনি মালপত্তর নিয়ে এই বাড়ি থেকে দূর হয়ে যান। আমাদের কাছে সেটা মন্ত স্বস্তির কারণ হবে আর আমরা শেষ পর্যন্ত ক্লাশও শুরু করতে পারব।’

‘আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ব না,’ বলল কে, ‘আপনি আমার উর্দ্ধতন ঠিকই কিন্তু আমাকে আপনি এই পদে বহাল করেননি, সেটা করেছেন গ্রামপ্রধান আর আমাকে বরখাস্ত করার অধিকার একমাত্র তাঁরই রয়েছে। আর তিনি নিশ্চয়ই আমাকে এই পদটি দেননি যাতে আমি ও অন্যান্যরা এখানে ঠাণ্ডায় জমে মরা যাই বরং-আপনি নিজেই যেমন বললেন-প্রয়োজন পড়লে বাঁচার তাগিদে যেমন খুশি করতে পারি।

তাই হঠাৎ আমাকে বরখাস্ত করে দেওয়াটা তাঁর ইচ্ছেই হতে পারে না। তাঁর মুখ থেকে যতক্ষণ না বরখাস্তের কথা নিজের কানে শুনছি ততক্ষণ এটা কিছুতেই বিশ্বাস করব না। এছাড়া আমি যদি আপনার এই তড়িঘড়ি বরখাস্তের নোটিশটা অগ্রাহ্য করি সেটা সম্ভবত আপনার নিজের পক্ষেও খুবই সুবিধাজনক হবে।’

‘তাহলে নোটিশটা আপনি গ্রহণ করছেন না?’ জিজ্ঞাসা করল শিক্ষক। কে মাথা নাড়ায়।

‘ভালো করে বিষয়টা ভেবে দেখুন,’ বলে শিক্ষক, ‘আপনার সিদ্ধান্তই যে সবসময় সেরা হবে তার কোনো মানে নেই। আপনার ভেবে দেখা উচিত, উদাহরণস্বরূপ, কাল বিকেলের ঘটনাটা, আপনি তখন পরীক্ষা দিতে রাজি হননি।’

‘সেই কথা এখন তুললেন কেন?’ কে জিজ্ঞাসা করে।

‘কারণ সেটাই আমার ইচ্ছে,’ বলে শিক্ষক, ‘এবার শেষ বারের মতো বলছি বেরিয়ে যান।’

কিন্তু তাতে কোনোও কাজ হলো না দেখে শিক্ষকটি টেবিলের কাছে গিয়ে ফ্রাউলিন গিজার কানে কী সব যেন ফিসফিস করে বলে; মহিলাটি পুলিশ বিষয়ে কিছু একটা বলল, কিন্তু শিক্ষক তা অগ্রাহ্য করে, শেষ পর্যন্ত তাদের মতৈক্য হয়। শিক্ষকটি শিশুদের তার ক্লাশঘরে গিয়ে ঢুকতে নির্দেশ দেয়। সেখানেই সে অন্য শিশুদের সঙ্গে

ঢাদের পড়াবে। এই পরিবর্তনটা তাদের বেশ মনমতো হয়, নিমেষের মধ্যে চিৎকার, হাস্যধ্বনির মধ্যে ঘর খালি হয়ে যায়। তাদের পিছনে শিক্ষক ও ফ্রাউলিন গিজাও অন্তর্হিত হয়, শেষোক্তের হাতে ক্লাশ রেজিষ্টার ও বিপুলাকায় বিড়ালটি, অসীম নিরাসক্তি নিয়ে যে চেয়ে ছিল। বিড়ালটি এই ঘরেই রেখে যেতে পারলে শিক্ষকটি খুশি হতো কিন্তু তার এই প্রস্তাবটি ফ্রাউলিন গিজা খারিজ করে দেয় হেলায়; কে-র অমানবিকতার উদাহরণ দিয়ে।

সুতরাং তার আগের সমস্ত অনুযোগ ছাড়াও শিক্ষক কে-কে বিড়ালের জন্যও দায়ী করে। আর তার ফলেই দরজার কাছে পৌঁছবামাত্র কে-র উদ্দেশ্যে তার শেষ কথাগুলো ছিল, ‘শিশুদের সঙ্গে এক মহিলাকেও ঘর থেকে বের করে দিলেন আপনি গায়ের জোরে আর বিদ্রোহ করেই আপনি আমার নোটিশটাও গ্রহণ করলেন না-আর ওনার মতো তরুণীকে তো আর আপনাদের নোংরা ঘরোয়া ব্যাপারের মধ্যে ক্লাশ নিতে বলা যায় না। সুতরাং এবার আপনি একাই রইলেন, যত খুশি জায়গা নিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে থাকুন, সম্মানীয় মানুষদের অগ্রাহ্য করে। কিন্তু এর আয়ু খুব বেশিদিন আর নয়, আপনার কাছে আমার এই প্রতিশ্রুতি রইল।’ এই বলে সে দরজা সশব্দে বন্ধ করে দেয়।

১৩

তারা সবাই বিদায় নিতে না নিতেই কে তার সহকারীদের বলল, ‘বেরিয়ে যাও।’ হঠাৎ এমন আদেশে ঘাবড়ে গিয়ে তারা নির্দেশ পালন করে, কিন্তু তারা বেরোনো মাত্রই কে যখন দরজা বন্ধ করে দিল তারা আবার ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে, বাইরে দাঁড়িয়ে অনুনয় করতে থাকে, দরজায় টোকা দেয়।

‘তোমাদের বরখাস্ত করা হলো,’ কে চিৎকার করে বলে, ‘তোমাদের আর কখনো কাজে ফিরিয়ে নেব না।’

কিন্তু বলা বাহুল্য সেটা তাদের কাছে মোটেই কাম্য মনে না হওয়ায় তারা হাত-পা দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে, ‘আপনার কাছে ফিরে যেতে দিন স্যার,’ তারা চিৎকার করে বলল এমনভাবে যেন প্রবল বন্যা তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর তাদের সামনে কে-ই একমাত্র শুকনো জমি।

কে-র মন গলে না ও সে অর্ধৈর্ষ্যভাবে অপেক্ষা করতে থাকে কখন এই অসহনীয় হট্টগোল বিরক্ত হয়ে শিক্ষক এসে মাথা গলায়। আর তা ঘটলও খুব তাড়াতাড়ি।

‘আপনার এই হতভাগা সহকারীদের ভিতরে ঢুকতে দিন,’ সে উচ্চকণ্ঠে বলে।

‘আমি ওদের বরখাস্ত করেছি,’ কে-ও চিৎকার করে জবাব দেয়। চোখের সামনেই শিক্ষকটি দেখতে পাচ্ছিল যথার্থ শক্তিমান পুরুষ কাকে বলে, শুধু নোটিশ দেওয়াতেই নয়, তাকে কার্যকর করে তোলার ক্ষমতাতেও। এবার শিক্ষকটি সহকারীদের শাস্ত করার চেষ্টা করে এই সদয় আশ্বাস দিয়ে যে তারা যদি চুপচাপ অপেক্ষা করে কে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ঘরে ঢুকতে দিতে বাধ্য হবে। এরপর সে বিদায় নেয়।

এবং এবার হয়ত ব্যাপারটা থিতুয়েই আসত যদি কে চিৎকার করে আবার না বলত যে তাদের চূড়ান্তভাবেই বরখাস্ত করা হয়েছে, তাদের আবার ফিরিয়ে নেবার

ক্ষীণতম সম্ভাবনাও নেই। এর ফলে আবার তারা হট্টগোল শুরু করে দেয়। আবার শিক্ষক এসে উপস্থিত হয়। তবে এবার সে তাদের বোঝাবার চেষ্টা না করে তার হস্ত দৃত ভীতিকর লাঠিটির সাহায্যে বাড়ি থেকে খেদিয়ে দেয়।

তারা সঙ্গে সঙ্গেই এসে হাজির হয় ব্যায়ামগারে জানলার সামনে, কাঁচে আঘাত করে, চিৎকার করে কী যেন বলে, কিন্তু তাদের কথা কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু সেখানেও তারা বেশিক্ষণ টিকতে পারে না। গভীর তুষারের মধ্যে তাদের উন্মত্ততার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেই মতো লার্করাপ করে উঠতে পারছিল না। তাই তারা দৌড়ে যায় স্কুলের বাগানের সামনে রেলিং-এর দিকে, সেটা উপক্কে পাথর বিছানো ত্রিকোণাকৃতি একটি স্থানে নামে। এখান থেকে দূরে হলেও ঘরের দৃশ্য ভালোভাবে দেখা যায়। এখানে তারা এধার থেকে ওধার রেলিং ধরে দৌড়োদৌড়ি করে।

তারপর এক জায়গাতে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে করুণভাবে কে-র প্রতি আবেদন করতে থাকে। বহুক্ষণ ধরেই তারা এমনটা করে, তাদের এই প্রচেষ্টার অর্থহীনতা অনুধাবন না করেই, তারা এই চেষ্টায় এমনই মগ্ন হয়ে পড়ে যে তারা তাদের অনুনয় বিনয় থামায় না এমনকী যখন কে জানলার পর্দা টেনে দেয় তাদের যাতে দেখতে না হয়। অন্ধকার হয়ে আসা ঘরে কে এবার প্যারালাল বারের কাছে যায় ফ্রিডার খোঁজে। তার দৃষ্টি অনুভব করে ফ্রিডা উঠে দাঁড়ায়, চুল সংবৃত করে, চোখের জল মোছে, ও নিঃশব্দে কফি প্রস্তুত করতে শুরু দেয়। যদিও তার সবই জানা তবু কে যেন বিধিসম্মতভাবে তাকে জানাতে চায় যে সে সহকারীদের বরখাস্ত করে দিয়েছে। সে শুধু মাথা নাড়ে। একটা ডেস্কের ওপর বসে পড়ে কে তার ক্লান্ত অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করে। ছেদহীন নিটোল প্রাণপূর্ণতা ও স্থির বুদ্ধি তার অতি সাধারণ দেহটিকে সুসমামন্তিত করে তুলেছিল।

কে-র সঙ্গে মাত্র কয়েকদিন ঘর করার পর থেকেই তার সেই সৌন্দর্য অস্তর্হিত হতে শুরু করেছে। ট্যাপরুমে তাকে যে পরিমাণ কাজ করতে হতো তা খুব সামান্য ছিল না কিন্তু তার কাছে বোধ হয় সেই কাজ বেশ পছন্দসই ছিল। তাহলে কি ক্ল্যামের সঙ্গচ্যুতিই তার এই অবক্ষয়ের কারণ? ক্ল্যামের ঘনিষ্ঠ হবার কারণেই সম্ভবত সে এমন অপ্রতিরোধ্যভাবে মোহিনী শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পেরেছিল, তার এই শক্তিই কে-কে তার কাছে টেনে এনেছিল, আর এখন সে তার বাহুবন্ধনের মধ্যেই শুকিয়ে যাচ্ছে।

‘ফ্রিডা,’ বলল কে। কফির সরঞ্জাম সব সরিয়ে রেখে সে তখনি কে-র ডেস্কের সামনে যায়।

‘তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?’ সে জিজ্ঞাসা করে।

‘না,’ বলে কে, ‘আমার মনে হচ্ছে তুমি এখানে সামলে উঠতে পারছ না। হেরেনহফ-এ তুমি কত সুখী ছিলে। আমার উচিত ছিল মোতাসে ওখানেই থাকতে দেওয়া।’

‘হ্যাঁ,’ বলে ফ্রিডা, বিষণ্ণভাবে সামনে তাকিয়ে, ‘তোমার উচিত ছিল আমাকে ওখানে থাকতে দেওয়া। তোমার সঙ্গে থাকার আমি যোগ্য নই। আমার হাত থেকে মুক্তি পেলে তুমি হয়ত বহু কিছুই পেতে পারতে। শুধু আমার জন্যই তোমাকে শিক্ষকের অত্যাচার মেনে নিতে হচ্ছে, এই জঘন্য পদটা তোমাকে আমার জন্যই

স্বীকার করতে হলো আর এখন তোমাকে আশ্রয় চেষ্টা করতে হচ্ছে ক্ল্যামের সাক্ষাৎ পেতে। সবই আমার জন্য, অথচ এসবের বিনিময়ে আমি তোমাকে বেশি কিছু দিতে পারিনি।’

‘না, না,’ বলে কে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে তাকে বাহবেষ্টন করে, ‘এ সব খুবই তুচ্ছ, আমার গায়েই লাগেনি আর শুধু তোমার জন্যই তো আমি ক্ল্যামের কাছে পৌঁছতে চাইছি। তাছাড়া তুমি আমার জন্য কত কী করেছ একবার ভাব তো। তোমাকে চেনবার আগে আমি একটা অন্ধ গলিতে ঘরে মরছিলাম, কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকায়নি তখন। আর কারো কাছ থেকে আতিথ্যলাভের সুযোগ যদি পেয়েও থাকি তা এসেছে এমন লোকের কাছ থেকে যার থেকে আমি শুধু পালাতে চেয়েছি, যেমন বারনাবাসের পরিবার।’

প্রবল ঔৎসুক্য নিয়ে চিৎকার করে ওঠে ফ্রিডা, ‘তুমি ওদের থেকে পালাতে চেয়েছিলে? সত্যিই? ডালিং?’

ও একটু পরে কে-র দ্বিধাপূর্ণ ‘হ্যাঁ, শুনে আবার ঔদাস্যে ডুবে যায়।

কিন্তু কে-র আর ইচ্ছা হলো না ফ্রিডাকে আরো ব্যাখ্যা করে বোঝায় তার সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপনের ফলে তার নিজের জীবনে কী শুভ পরিবর্তন এসেছে। সে ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নেয় ও তারা অল্পক্ষণ নিঃশব্দে বসে থাকে ও শেষে-যেন তার বাহুই এতক্ষণ তাকে উত্তাপ ও সান্ত্বনা জোগাচ্ছিল ও এখন থেকে বঞ্চিত হয়ে সে অসহায় বোধ করছে-ফ্রিডা বলে ওঠে, ‘এখানকার এই জীবন আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তুমি যদি আমাকে সঙ্গে রাখতে চাও তোমাকে অন্য কোথাও যেতেই হবে, ফ্রান্সের দক্ষিণ দিকে, কিংবা ধর স্পেনে।’

‘আমি তো চলে যেতে পারি না,’ কে জবাব দেয়, ‘আমি এখানে থাকতে এসেছি, আমি এখানেই থাকব,’ এবং স্ববিরোধটি উচ্চারণ করে, যা সে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করে না, যেন সে নিজের উদ্দেশ্যই আরো বলে, ‘এখানে থাকার ইচ্ছা না থাকলে আমি এই জনহীন দেশে আসব কেন?’

এরপর সে আরো বলতে থাকে, ‘কিন্তু তুমিও তো এখানেই থাকতে চাও, তাই না? যতই হোক এ তোমার নিজের দেশ। আসলে ক্ল্যামকে হারিয়ে তোমার দুঃখ হচ্ছে আর হতাশায় মরিয়া হয়েই তুমি এরকম ভাবছ।’

‘ক্ল্যামকে হারিয়ে আমার দুঃখ?’ বলল ফ্রিডা, ‘এখনো আমি ইচ্ছে করলেই ক্ল্যামকে পেতে পারি, একটু বেশি পরিমাণেই বোধ হয়, ওঁর থেকে নিস্তার পেতেই তো আমি এখান থেকে চলে যেতে চাইছি। আমার বিরহের আশঙ্কা ক্ল্যামের জন্য নয়, তোমার জন্য। তোমার জন্যই আমি এ জায়গাটা ছাড়তে চাইছি। কারণ এখানকার সবকিছু তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আমি তোমাকে কিছুতেই নিজের করে পাচ্ছি না। আমি খুশি মনেই মেনে নেব যদি আমার সুন্দর দৃষ্টি খারাপ হয়ে যায়, আমি যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে রোগ ভোগও করি, শুধু যদি আমাকে তোমার সঙ্গে শান্তিতে থাকতে দেওয়া হয়।’

কে তার একটি কথাতেই উৎসুক হয়ে ওঠে, 'তাহলে এখনো ক্ল্যামের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ রয়েছে বলছ?' উদগ্রীবভাবে সে প্রশ্ন করে, 'উনি তোমাকে তাহলে ডেকেও পাঠান?'

'আমি ক্ল্যামের বিষয়ে কিছুই জানি না,' ফ্রিডা উত্তর দেয়, 'ঠিক এই মুহূর্তে আমি অন্যদের কথা বলছিলাম, মানে সহকারীদের কথা আর কী।'

'ও সহকারীরা' কে বলে হতাশার সুরে, 'ওরা কি তোমাকে কোনোভাবে বিরক্ত করেছে নাকি?' 'সেকি, তুমি কখনো লক্ষ্য করনি?' ফ্রিডা জিজ্ঞাসা করে।

'না তো,' কে উত্তরে বলে, 'বৃথাই কিছু মনে করার চেষ্টা করে, 'ব্যাটারা একটু নাছোড়বান্দা আর কামুক প্রকৃতির ঠিকই কিন্তু তোমার দিকে চোখ তুলে তাকাবার মতো সাহস ওদের হয়েছে এমনটা তো আমার চোখে পড়েনি।'

'পড়েনি?' বলল ফ্রিডা, 'তুমি একবারও লক্ষ্য করনি ব্রীজ ইন-এ আমাদের সঙ্গ থেকে কিছুতেই তাড়ানো গেল না, দেখনি কীরকম হিংসুটের মতে আমাদের চাল চলন তারা লক্ষ্য করছিল, দেখনি কি ওদের একজন কেমনভাবে খড়ের বস্তাটার ওপর তাড়াহুড়ো করে আমার জায়গায় গুয়ে পড়েছিল, আর কয়েক মিনিট আগেই তো দেখতে পেলে কেমনভাবে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল যাতে তোমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে তোমার সর্বনাশ করতে পারে আর আমাকে একা পেয়ে গ্রাস করার সুযোগ পায়।'

কে কোনো উত্তর না দিয়ে ফ্রিডার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সহকারীদের বিরুদ্ধে তার অভিযোগগুলো অবশ্য সত্যি কিন্তু সেগুলো অনেক সোজাসাপটা ভাবে এভাবেও তো ব্যাখ্যা করা যেতে পারে-যে এই দুজনের ব্যবহার আসলে মাত্রাতিরিক্ত ছেলেমানুষি, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা চপলমতিত্বের ফলশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাছাড়া এটাই কি তাদের দোষী মনে করার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় না যে সদাসর্বদা তারা কে-র সঙ্গেই সমস্ত জায়গায় যাবার আশ্রয় চেষ্টা করেছে ফ্রিডার কাছে পড়ে থাকার পরিবর্তে? কে মোটামুটি এমনই একটা ইঙ্গিত দেয়। 'এটাও ওদের একটা চালাকি,' ফ্রিডা বলে, 'তুমি ধরতে পারনি বুঝি? আচ্ছা, তা না হলে তুমি ওদের তাড়ালেই বা কেন? এ জন্যই যদি না হয়ে থাকে?'

এবং সে জানলার কাছে যায়। পদটি সামান্য সরায়, তাকিয়ে থাকে ও কে-কে কাছে ডাকে। সহকারীদ্বয় তখনো রেলিং আঁকড়ে দাঁড়িয়েছিল, যদিও এখন ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তবু তারা সমস্ত শক্তি একত্রিত করে মাঝে হাতদুটি জোড় করে সামনে এগিয়ে দিচ্ছিল অনুন্য়ের ভঙ্গিতে স্কুল বাড়িটার দিকে। যাতে সবসময় ধরে রাখতে না হয় সেজন্য তাদের একজন রেলিং এর সঙ্গে কোটের পিছনটা কোনোমতে আটকে নিয়েছিল।

'বেচার! বেচার!'' বলে ফ্রিডা।

'তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে আমি কেন ওদের তাড়িয়ে দিয়েছি। বলে কে, 'তুমিই তার একমাত্র কারণ।'

'আমি?' জিজ্ঞাসা করে ফ্রিডা, সহকারীদের থেকে চোখ না সরিয়ে।

‘তোমার তো বাড়াবাড়ি রকম সহানুভূতি ওদের উপর,’ বলল কে, ‘তুমি ওদের সব দোষই মাপ করে দাও, ওদের সঙ্গে হাসাহাসি কর, মাথায় হাত বুলিয়ে দাও, ওদের উপর তোমার অন্তহীন মায়ামমতা, ‘আহা বেচারা,’ ‘আহা বেচারা,’ একটু আগেই তো বলছিলে আর সবশেষে যেটা ঘটল, ওদের পিটুনি খাওয়া থেকে বাঁচাতে এমনকী আমাকে বলি দিতেও তোমার বিবেকে এতটুকু বাধেনি।’

‘হ্যাঁ,’ ঠিক তাই, আমি তোমাকে তো ঠিক ওই কথাটাই বলার চেষ্টা করছিলাম, ও সমস্তই তো আমাকে এত অসুখি করে তুলেছে, তোমাকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে যদিও তোমার সঙ্গে সব সময় থাকার চেয়ে বড়ো সুখ আমি কল্পনাই করতে পারি না, তোমার সঙ্গে বাধাহীন অনন্তকাল ধরে তোমার সঙ্গে থাকার সুখ। কিন্তু আমাদের প্রেমের জন্য এমন কোনো নির্বিঘ্ন জায়গান এই গ্রামে কিংবা অন্য কোথাও নেই; আমি স্বপ্ন দেখি এক কবরের, গভীর কিন্তু সংকীর্ণ, সেখানে আমরা পরস্পরকে লোহার মতো শক্ত করে জড়িয়ে শুয়ে আছি, আমি মুখ গুঁজেছি তোমার মধ্যে আর তুমি আমার মধ্যে, কেউ আমাদের আর দেখতে পাবে না।

কিন্তু এখানে-দেখ, দেখ ঐ যে সহকারীগুলো। ওরা হাত জোড় করছে কিন্তু তোমার উদ্দেশ্যে না, আমাকেই।’

‘আর ওদের দিকে এখন তাকিয়েও আছ কিন্তু তুমিই, আমি না,’ বলে কে।

‘নিশ্চয়ই আমি,’ বলল ফ্রিডা রাগের গলায়, ‘আমি তো প্রথম থেকেই সেই কথা বলছি, তা না হলেও ওরা আমার পায়ে পায়ে ঘোরে কেন, ক্র্যামের বার্তাবাহক হওয়া সত্বেও?’

‘ক্র্যামের বার্তাবাহক?’ আওড়ায় কে, তাদের এই পদের কথাগুলো সে বিস্ময়ে ভেঙে পড়ে। যদিও তার কাছে সেটা খুবই সম্ভব বলে বোধ হয়।

‘নিশ্চয়ই, ক্র্যামের বার্তাবাহক,’ বলল ফ্রিডা।

‘তা হলেও বলব ওরা অসম্ভব বোকা, ধাক্কা না খেলে ওদের বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না। শয়তান দুটো কি কেলে কুৎসিত দেখেছ? আর দুজনের মুখের ফারকাও কি জঘন্য। ঠিক যেন বুড়োদের মতো বা ছাত্রদের মতো মুখ আর ন্যাকা বোকা ব্যবহার? তুমি কি ভাব আমি এসব দেখিনি? ওদের দেখে আমারই লজ্জা হয়। হ্যাঁ ব্যাপারটা ঠিক তাই, আমাকে ওরা ঠিক বিকর্ষণ না করলেও ওদের নিয়ে আমার লজ্জার শেষ নেই, আবার ওদের দিকে না তাকিয়েও পারি না। ওদের ওপর যখন বিরক্ত হওয়া উচিত তখন আমি ওদের নিয়ে তামাশা করি। লোকে যখন ওদের প্রহার করতে চায় আমি ওদের চুলে হাত বুলিয়ে দিই। তোমার পাশে শুয়েও আমি রাতে ঘুমতে পারিনি, শুধু তোমার ওপর ভর দিয়ে ছিলাম ওদের ওপর নজর রাখব বলে, ওদের একজন কন্মলে মুড়ি দিয়ে ঘুমছিল, আর অন্যজন চুল্লির সামনে হাঁটু মুড়ে বসেছিল তাতে কাঠ গুঁজতে আর আমাকে এতই সামনে ঝুঁকতে হয়েছিল যে তোমার ঘুম প্রায় ভাঙ্গিয়ে দিছিলাম আর তুমি ঘুম থেকে উঠলে আমাকে ভয় পাওয়ায়নি, আমি তখন নিজের ভয়েই মরি। সামান্য শব্দেই চমকে উঠি এই মুহূর্তে হয়তো আমার ভয় হলো তোমার ঘুম ভেঙে যাবে আর তুমি জেগে উঠলে সব লভভন্ড করে দেবে, আবার পরের মুহূর্তেই আমি লাফিয়ে উঠে মোম জ্বালি যাতে তুমি তক্ষুনি জাগতে বাধ্য হও আর আমাকে রক্ষা কর।’

‘আমি তো এ সমস্ত কিছুই জানতাম না,’ কে বলে, ‘এমনই অস্পষ্ট সন্দেহ আমার হয়েছিল বলেই তো ওদের তাড়লাম; যাই হোক, এখন তো ওরা বিদায় হয়েছে, সবই এবার ঠিকঠাক হয়ে যাবে।’

‘হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওরা বিদায় হয়েছে,’ ফ্রিডা বলল, কিন্তু তার মুখ এখন চিত্তাকাতর, সুখি নয়, ‘শুধু আমরা জানি না ওরা আসলে কে। আমি হয়ত অনুমান থেকে বলে থাকব ওরা ক্ল্যামের বার্তাবাহক, খুব একটা ভেবে বলিনি অবশ্য, কিন্তু ওরা আসলে তা হতেও তো পারে? ওদের চোখগুলো, অকপট আর উজ্জ্বল, আমাকে ক্ল্যামের কথা মনে পড়িয়ে দিত। হ্যাঁ, একদম ঠিক ভেবেছি, কখনো কখনো ক্ল্যামের দৃষ্টি ওদের চাউনির মধ্য দিয়ে আমার মধ্যে চারিয়ে গেছে, আর তাই, এই যে আমি বললাম ওদের জন্য আমার লজ্জা হয় সেটা ঠিক বলিনি।’

আহা তা যদি সত্যিই হতো! আমি ভালোই জানি অন্য যে কোনো জায়গায় যে কোনো লোকের কাছে ওদের ব্যবহার অত্যন্ত নির্বোধ ও আপত্তিজনক বলে বোধ হবে, কিন্তু আসলে ওরা অমন নয়। ওদের নির্বোধ চাতুরি আমি লক্ষ্য করেছি প্রশংসা ও সম্মানের সঙ্গে। কিন্তু ওরা যদি ক্ল্যামের বার্তাবাহক হয় তাহলে ওদের হাত থেকে আমাদের বাঁচাবেই বা কে? কিংবা ওদের হাত থেকে বাঁচাটা কি আদপেই ভালো ব্যাপার হবে? এমন অবস্থায় তোমার কি উচিত নয় এখনি গিয়ে ওদের ফিরিয়ে আনা আর মানসিক শান্তি লাভ করা, যদি অবশ্য ওরা ফিরে আসতে রাজি থাকে?’

‘তুমি তাহলে চাইছ আমি গিয়ে আবার ওদের ফিরিয়ে আনি?’ জিজ্ঞাসা করে কে।

‘না, না,’ বলল ফ্রিডা, ‘আমি মোটেই তা চাইনা, ওদের চেহারা যদি আবার আমাকে দেখতে হয়। যদি ওরা এখানে দৌড়ে ঢোকে, আমাকে দেখে যদি আবার ফুর্তিতে লাফালাফি শুরু করে, শিশুদের মধ্যে ঘরে দাপায় আর পুরুষ মানুষের মতো আমার দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে-না, আমার তো মনে হয় না আমি ওসব বরদাস্ত করতে পারব।’

কিন্তু তা হলেও আমার মনে হচ্ছে তুমি যদি ওদের বিরুদ্ধে মন কঠোর করে রাখ তাহলে হয়ত সেটাই তোমার পক্ষে ক্ল্যামের কাছে গিয়ে পৌঁছবার চিরদিনের জন্য একটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আমি তোমাকে যে কোনো উপায়ে এমন কোনো ভবিতব্য থেকে বাঁচাতে চাই। এক্ষেত্রে তোমার কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা ওদের এই মুহূর্তে ঘরে ঢুকতে দাও। আমাকে নিয়ে ভেব না, আমার মূল্যই বা কতটুকু? যতক্ষণ পারব আমি নিজেকে রক্ষা করে যাব আর আত্মসমর্পণ যদি করতেই হয় তাও করব এই বিশ্বাস নিয়ে যে সেটাও তোমার জন্যই করেছে।’

‘সহকারীদের বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত তুমি আরো পাকা করে দিচ্ছ,’ বলল কে, ‘আমার ইচ্ছায় ওরা কখনই এ ঘরে ঢুকতে পারবে না। এই যে ঘটনাটা ঘটল যে শেষ পর্যন্ত আমি ওদের তাড়িয়ে দিতে পারলাম তাতেই তো প্রমাণ হয়ে গেল কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করা যেতেই পারে আর এছাড়া আরো বড়ো কথা যে ক্ল্যামের সঙ্গে ওদের কোনো সত্যিকারের সম্পর্ক নেই। এই তো গত রাতেই ক্ল্যামের চিঠি পেলাম যা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল ওদের বিষয় ক্ল্যাম একেবারে ভুল খবর পেয়েছেন, যেটা

থেকে আবার এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে উনি ওদের সম্পর্কে একেবারেই নিস্পৃহ, তা না হলে উনি তো ওদের পুজ্ঞানাপুজ্ঞ খবরই রাখতেন। আর এই যে তুমি বললে যে ওদের মধ্যে তুমি ক্র্যামকে দেখতে পাও তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না কারণ তুমি এখনো, দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাড়িওয়ালীর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারনি।

সব জায়গাতেই ক্র্যামকে দেখতে পাচ্ছ। এখনো তুমি ক্র্যামের প্রেমিকাই রয়ে গেছ, আমার যথার্থ স্ত্রী হয়ে উঠতে পারনি দূরতম অর্থেও। মাঝে মাঝে এর ফলে আমি খুবই মুষড়ে পড়ি, মনে হয় আমার সবকিছু খোয়া গেছে। মনে হয় আমি এইমাত্র গ্রামে ঢুকলাম, কিন্তু বুকভরা আশা নিয়ে নয়, যেভাবে বাস্তবিকই আমি এসেছিলাম, বরং এই জ্ঞান নিয়ে যে আমার জন্য অন্তহীন হতাশাই শুধু অপেক্ষা করে আছে আর আমাকে এক এক করে সমস্ত হতাশাই সহ্য করতে হবে শেষ পর্যন্ত। তবে এমন মনে হয় মাঝে মাঝেই।’

কে যোগ করে স্মিতহাস্যের সঙ্গে যখন সে লক্ষ্য করে তার কথা শুনে ফ্রিডা ঝিমিয়ে পড়ছে, ‘আর সবকিছুর গভীরে শুধু এ কথাই প্রমাণিত হয় যে তুমি আমার কাছে কতখানি। আর তুমি যদি আমাকে এখন একবার হুকুম দাও তুমি কিংবা সহকারীদের মধ্যে কাউকে বেছে নিতে, তাতে। সহকারীদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। ভাবা যায়? বাছতে হবে কাকে? না তোমাকে, নয়ত সহকারীদের।’

কিন্তু আমি এবার চূড়ান্তভাবেই ওদের হাত থেকে মুক্তি চাই, শুধু ওদের বিষয়ে আলোচনা থেকেই নয় ওদের বিষয়ে চিন্তা থেকেও। এছাড়া কে বলতে পারে এই যে আমাদের দুজনের মধ্যে দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে তার কারণ এই নয় যে আমরা এখনো প্রাতরাশ খেয়ে উঠতে পারিনি?’

‘তা হতে পারে,’ বলে ফ্রিডা ক্লান্তভাবে হেসে ও কাজে ফিরে গিয়ে, কে আবার ঝাঁটা তুলে নেয় হাতে।

একটু পরে দরজায় আলতো টোকা। ‘বারনাবাস’ চিৎকার করে ওঠে কে, হাতের ঝাঁটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, এবার কয়েক পদক্ষেপেই দরজার কাছে পৌঁছে যায়। ফ্রিডা তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। নামটি শোনামাত্রই সে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। কাঁপা হাতে কে পুরনো তালটা সঙ্গে সঙ্গেই খুলতে পারে না। সে শুধু বার বার বলতে থাকেম ‘এইতো খুললাম বলে,’ একবারও জিজ্ঞাসা না করে বাস্তবিকই কে আসতে চাইছে।

এবং এবার তাকে এই বাস্তবের মুখোমুখি হতে হরো যে উন্মুক্ত দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকা ব্যক্তিটি বারনাবাস নয়, সে হচ্ছে সেই ছোটো ছেলেটি যে আগে তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু সেকথা স্মরণ করার কোনো ইচ্ছে কে-র ছিল না।

‘তুমি এখানে কী চাও?’

সে প্রশ্ন করে, ‘ক্লাশ তো নেওয়া হচ্ছে পাশের ঘরে।’

‘আমি ওখান থেকেই আসছি,’ বালকটি উত্তর দেয়, বিশাল দুটি চোখ কে-র ওপর ন্যস্ত করে, হাত দুটি দুপাশে ঝুলিয়ে সিঁধে দাঁড়িয়ে আছে সে এখন। ‘তা তুমি চাওটা কী? চটপট বলে ফেল,’ বলল কে, একটু ঝুঁকে কারণ ছেলেটি কথা বলছি নিচুস্বরে।

‘আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি?’ জিজ্ঞাসা করে সে।

‘এ আমাদের সাহায্য করতে চায়,’ বলে কে ফ্রিডার উদ্দেশ্যে তারপর ছেলেটিকে বলে, ‘তোমার নাম বল।’

‘হ্যানস ব্রুনসউইক,’ সে উত্তর দিল, ‘চতুর্থ শ্রেণি, ম্যাডেলিন গ্রাসের প্রধান মুচি অটো ব্রুনসউইক এর ছেলে।’

‘বেশ, তোমার নাম তাহলে ব্রুনসউইক,’ বলল কে, এবার অনেক নরম গলায়।

কথায় বোঝা গেল হ্যানস যখন কে-র হাতে শিক্ষিকার লাঠির আঘাতের ফলে রক্তাক্ত কাটা দাগটি দেখে তখনই সে অসম্ভব ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে স্থির করে ফেলেছিল সে কে-র পাশে দাঁড়াবে। এইমাত্র সে পাশের ক্লাশরুম থেকে কঠিন শাস্তির ভয় অগ্রাহ্য করে সদর্পে বেরিয়ে এসেছে, অনেকটা যেভাবে দলত্যাগী কোনো মানুষ শত্রুপক্ষের কাছে যায় সেভাবে। বালকোচিত কল্পনাপ্রবণ মনই তাকে সম্ভবত তাকে এমন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। সবকিছু সে যেভাবে গুরুত্বের সঙ্গে বলছিল তাতে এই কথাই প্রমাণিত হয়।

প্রথমদিকে সঙ্কোচে সে একটু জড়সড় ছিল বটে কিন্তু দ্রুতই সে কে ও ফ্রিডার কাছে অসঙ্কোচ হয়ে উঠল আর যখন তার হাতে এককাপ কফি ধরিয়ে দেওয়া হলো সে একেবারে চনমনে বিশ্বস্ত হয়ে উঠে প্রবল আগ্রহে অদম্যভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকল যেন যতো দ্রুত সম্ভব সমস্ত ঘটনার সারাংশের আত্মস্থ করে নিয়ে তাদের বর্তমানে কর্তব্য কী সে বিষয়ে সে তার সিদ্ধান্ত জানাতে সক্ষম হয়। তার চরিত্রে একধরনের কর্তৃত্বপরায়ণতা ছিল কিন্তু তাতে মিশে ছিল শিশুসুলভ সারল্য আর তারাও প্রতিরোধহীনভাবে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে, কিছুটা ঠাট্টার ভাব নিয়ে, কিছুটা গুরুত্বের সঙ্গে। তা যা হোক, সে-ই তাদের সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে নিয়েছিল। কাজকর্ম সব স্তব্ধ হয়ে গেল প্রায়, প্রাতরাশ প্রলম্বিত হতে লাগল।

যদিও হ্যানস ছাত্রদের একটা ডেস্কের সামনে বসেছিল ও কে ফ্রিডাকে পাশে নিয়ে ডায়াসের ওপর চেয়ারে বসেছিল, আসলে কিন্তু মনে হচ্ছিল হ্যানসই শিক্ষক, সে তাদের পরীক্ষা নিচ্ছে ও তাদের উত্তরের গুণাগুণ বিষয়ে তার বিচার জানাচ্ছে। তার নরম ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি যেন বুঝিয়ে দিচ্ছিল সে ভালোই জানে এসমস্তই আসলে একটা খেলা মাত্র কিন্তু সেই কারণেই অতি গুরুত্বের সঙ্গে তাকে খেলাটা পরিচালনা করতে হচ্ছে, কিংবা হয়ত সে ঠিক হাসছিল না, তার ঠোঁটে খেলা করছিল শিশুমনের আনন্দের অভিব্যক্তি। আশ্চর্যের ব্যাপার অনেক কথাবার্তার শেষে সে প্রকাশ করল যে সে কে-কে চিনত তার ল্যাসম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় থেকেই।

কে খুশি হলো। ‘তুমি সেই মহিলার পায়ের কাছে বসে ছিলে না?’ কে জিজ্ঞাসা করল।

‘হ্যাঁ,’ হ্যানস উত্তর দিল, ‘উনি আমার মা,’ এবার তাকে মা বিষয়ে সব বলতে হয়, কিন্তু সে তা বলে ভারি দ্বিধার সঙ্গে এবং তা-ও বহুব্যবহৃত জিজ্ঞাসিত হবার পর।

এটা স্পষ্ট বোঝা গেল সে আসলে একটি শিশুমাত্র, যদিও অবশ্য তার মুখ থেকে, বিশেষ করে তার প্রশ্নগুলোর মধ্য দিয়ে যেন কথা বলছিল কোনো শক্তিশালী,

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ, কিন্তু আবার তখনই, মুহূর্তের বিরতি না দিয়ে সে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল একটি স্কুলবালকে যে বহু প্রশ্নের অর্থই বোঝে না, অন্যগুলো গুলিয়ে ফেলে আর শিশুসুলভ অবিবেচনার কারণে কথা বলে অতিরিক্ত নিচুস্বরে, যদিও তার এই ক্রটির দিকে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

অথচ গোয়ারের মতো চুপ করে থেকে অনেক প্রশ্নের সে উত্তরই দেয় না, কোনোভাবেই সেজন্য বিব্রত বোধ না করে, কোনো বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে যেমনটা অসম্ভব। মনে হলো, তার ধারণা প্রশ্ন করার অধিকার একমাত্র তারই রয়েছে এবং কে ও ফ্রিডার প্রশ্ন করার ফলে অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে মাত্র। এর ফলে সে নিশ্চুপ বসে থাকে, তার দেহকান্ডটি সোজা, মাথা অবনত, নিচের চোঁটটি ঈষৎ ঝুলে পড়া। তার এইসব ভাব ভঙ্গিতে ফ্রিডা এতটাই মোহিত হয়ে পড়ে যে তাকে খোঁচাতে আরো প্রশ্ন করতে থাকে যাতে সে এমন ভাবসার আরো করে। এবং সে এতে সফলও হয় যদিও কে-র বিরক্তি বোধ হয় এতে। তারা দুজনে যা জানতে পারল তা তেমন কিছু না।

হ্যানস এর মা অসুস্থ কিন্তু অসুখটা যে আসলে কী তা অনিহিতই রয়ে গেছে। তার কোলে যে শিশুটি ছিল সে হ্যানস এর বোন, নাম ফ্রিডা, (হ্যানস অবশ্য জেনে খুশি হলো না তার প্রশ্নকর্ত্রীর নামও ঠিক তাই।) তার পরিবারটি গ্রামেই বাস করে, কিন্তু ল্যাসম্যানের সঙ্গে নয়, তারা শুধু ল্যাসম্যানের সঙ্গে দেখা করতে ও সেখানে স্নান করতে গিয়েছিল। এবার তার বাবার বিষয়ে হ্যানস কখনো অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে, কখনো অতি ভয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। তার মায়ের তুলনায় বাবা অবশ্য খুবই অকিঞ্চিৎকর।

কিন্তু ব্রুনসউইকদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও বিশেষ কিছুই জানা গেল না। কে শুধু জানতে পারে তার বাবা সমগ্র অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো জুতো ব্যবসায়ী, তার সঙ্গে টেক্সা দেবার সাধ্য কারো নেই, সম্পূর্ণ অন্য প্রশ্ন করা হলেও সে একই বক্তব্যে বার বার ফিরে আসছিল; এছাড়া সে অন্যান্য মুচিদেরও কাজ দেয়, যেমন ধরা যাক বারনাবাসের বাবাকে। এটা সে করেছে তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাতেই, অন্তত হ্যানস-এর অহংকারী মাথার আন্দোলন তেমন কিছুরই ইঙ্গিত দিচ্ছিল-তার এই ভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়ে ফ্রিডা দৌড়ে গিয়ে তাকে একটা চুমুই খেয়ে ফেলল। সে কখনো দুর্গে গিয়েছে কিনা এই প্রশ্নটি একাধিকবার তাকে করার পরই শুধু সে কখনো দুর্গে গিয়েছে কিনা এই প্রশ্নটি একাধিকবার তাকে করার পরই শুধু সে একটি নিটোল উত্তর দেয়, 'না,' তার মা বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সে উত্তরই দেয় না।

অবশেষে কে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তার কাছেও মনে হলো এইসব প্রশ্নমালা সম্পূর্ণ নিরর্থক; তাকে স্বীকার করতে হলো এ বিষয়ে বালকটির ধারণা যথার্থই। এছাড়া একটি শিশুর অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তার পরিবারের গোপন ব্যাপার স্যাপার জেনে নেবার চেষ্টার মধ্যে এক ধরনের অপমান থেকে যায়। দ্বিগুণ অপমানজনক হলো এই যে এত চেষ্টার পরও কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সে কিছুই জানতে পারেনি। এবার সব চুকিয়ে ফেলতে কে যখন বালকটিকে জিজ্ঞাসা করল সে কীভাবে তাদের সাহায্য করতে চায় তখন তাকে সামান্য অবাক না করেই ছেলেটি জানাল সে তাদের শুধু ইস্কুলের কাজ কর্মে

সাহায্য করতে চেয়েছিল যাতে শিক্ষকমশাই ও তাঁর সহকারীগণ তাকে অত বকাবকি না করেন ।

কে তখন হ্যানসকে বোঝাতে লাগল যে তার ঐ ধরনের সাহায্যের কোনোই প্রয়োজন নেই, লোককে ধমকানোই শিক্ষকের স্বভাব, যত দক্ষভাবেই কেউ কাজ করুক না কেন সে তাকে ধমকাবেই, তবে তার কাজকর্ম তেমন কঠিন কিছু নয়, বিশেষ কারণবশতই আজ তার কাজ সারতে অত দেরি হয়ে গিয়েছিল । শিক্ষকের ধমককে ছাত্ররা ভয় করতে পারে কিন্তু সে নিজে তাকে মোটেই কোনো আমল দিতে রাজি নয়, সে ওসব ঝেড়ে ফেলে দেয় সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবেই, এছাড়া তার আশা খুব তাড়াতাড়িই সে এই শিক্ষকের আওতার বাইরে চলে যেতে পারবে ।

হ্যানস যদিও তাকে শিক্ষকের ব্যাপারেই সাহায্য করতে চেয়েছিল তবু সে তাকে অন্তর থেকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছে । কিন্তু এবার তার ক্লাশে ফিরে যাওয়া উচিত আর এই মুহূর্তে ক্লাশে ঢুকলে সে হয়ত শাস্তিও এড়িয়ে যেতে পারবে যদি তার কপাল ভালো থাকে । যদিও দোর দিয়ে নয়, শুধু ইস্তিতেই কে জানিয়েছিল শিক্ষকের ব্যাপারে তার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন না থাকলেও অন্য ধরনের সাহায্যের তার প্রয়োজন হতে পারে, হ্যানস স্পষ্টতই ইস্তিটি ধরে ফেলে ও কে-কে প্রশ্ন করে সেক্ষেত্রেও সাহায্য করার চেষ্টা করবে আর তার নিজের পক্ষে যদি সাহায্য করা সম্ভব না হয় সে তার মা-র সাহায্য নেবে, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে । তার বাবার কোনো করেছেন, তিনি নিজে ঘর ছেড়ে বেরোনই না, সেদিন যে তিনি ল্যাসম্যানের বাড়ি গিয়েছিলেন সেটাকে একটা ব্যতিক্রমই বলা যায় ।

কিন্তু সে, হ্যানস সেখানে প্রায়ই যায় ল্যাসম্যানের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করতে । তার মা তাকে একবার জিজ্ঞাসাও করেছেন কে-কে সেখানে আর যেতে হয়েছে কিনা । তার মা খুবই দুর্বল ও অসুস্থ হওয়ায় বেশি কথা বলা তার পক্ষে নিষিদ্ধ । তাই সে শুধু তাঁকে জানিয়েছে যে আমিন মশাইকে সেখানে আর দেখতে পায়নি, এর পর এ বিষয়ে আর কোনো কথা হয়নি । কিন্তু সে যখন কে কে দেখল, এই স্কুলে, সে তার সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে এসেছিল যাতে সে মাকে গিয়ে এই খবরটা দিতে পারে । কারণ তার মা খুব খুশি হয়ে ওঠে যখন কেউ তার আদেশ ছাড়াই তার সবচেয়ে প্রিয় কাজটি করে । এরপর অল্প একটু চিন্তা করে কে বলল তার কোনোরকম সাহায্যেরই দরকার নেই । তার প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই রয়েছে, কিন্তু হ্যানস যে তাকে সাহায্য করতে সাহায্য করতে চেয়েছে তাই যথেষ্ট । সে তার শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে ।

ভবিষ্যতে তার কোনো কিছুর প্রয়োজন তো হতেই পারে, তখন সে নিশ্চয়ই হ্যানসের কাছে যাবে, তার কাছে হ্যানসের ঠিকানাও রয়েছে । বিনিময়ে কে-ও হয়ত তাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারবে । সে শুনে ভারি দুঃখ পেয়েছে যে হ্যানসের মা অসুস্থ আর গ্রামের কোনো মানুষ তাঁর রোগ নির্ণয় করতে পারছে না । এভাবে চলতে দিলে তুচ্ছ রোগও অতি গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে এখন, কে-র চিকিৎসাবিদ্যা কিছুটা জানা, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ অসুস্থ লোকদের চিকিৎসা করার অভিজ্ঞতাও তার কিছু রয়েছে । অনেক রুগীকেও সে নিরাশয় করে দিতে সক্ষম হয়েছে যাদের ব্যাপারে

ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিয়েছিল। তার নিজের জায়গার লোকেরা তো তার নামকরণই করে ফেলেছিল 'তেতো করিবাজ' তার নিরাময় করার ক্ষমতার কারণেই।

সে যাই হোক, সে তার মাকে একবার দেখতে পেলে ও তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পেলে খুশি হতো। সে হয়ত তাকে কিছু সদুপদেশও দিতে পারবে, অবশ্য সে এ সমস্তই করতে চায় হ্যানস-এর খাতিরে আর তার কোনো উপকার করতে পারলে সে আনন্দিতই হবে। কে-র প্রস্তাবে প্রথমে হ্যানস-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যা কে-র মনে একধরনের উত্তেজিত তৎপরতার সৃষ্টি করে কিন্তু পরবর্তী ফলটি হলো হতাশাব্যাঞ্জক কারণ অনেক প্রশ্ন করার পর হ্যানস উত্তর দিল, তাতে ক্ষোভের চিহ্নমাত্র ছিল না, যে কোনো অচেনা লোককেই তার মা-র সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না, তাকে খুব সাবধানে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতে হয়।

সেদিন কে তার সঙ্গে অতি সামান্য কথাই বলেছিল কিন্তু সেজন্যই তাকে বেশ কয়েকদিন রেগে গিয়েছিলেন, তিনি কিছুতেই তাকে বাড়ি ঢুকতে দেবেন না, তিনি এমনকী কে-র অবিম্শ্যকারীতার জন্য শাস্তি দিতে তাকে খুঁজে বার করতেও যাচ্ছিলেন শুধু হ্যানসের মা-ই তাঁকে আটকান। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মা কারো সঙ্গে কথা বলতে চান না আর কে-র ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। বরং কে-র নাম উচ্চারিত হতে শুনে তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করাই তো মা-র পক্ষে স্বাভাবিক হতো, কিন্তু তিনি তা করেননি আর এতেই তাঁর মনোভাবটা কী তা স্পষ্টই তো বোঝা যাচ্ছে। তিনি শুধু কে-র বিষয়ে গুনতেই চান, তার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে নয়।

এছাড়া তিনি যে রোগে ভুগছেন তাকে ঠিক অসুখও বলা যায় না। তাঁর রোগের প্রকৃতি তিনি নিজেও ভালোভাবে জানেন ও সে বিষয়ে তিনি ইঙ্গিতও দিয়েছেন; আসলে বোধহয় এখানকার জলবায়ু তার ঠিক সহ্য হচ্ছে না, অথচ এ জায়গাটা তার পক্ষে ছেড়ে যাওয়াটাও সম্ভবপর নয় তার স্বামী, সন্তানের জন্য, তাছাড়া এখন তিনি আগের চেয়ে ভালোই আছেন। এখানে কে লক্ষ্য করল উত্তরোত্তর হ্যানস-এর চিন্তাশক্তি কেমন লক্ষ্যণীয়ভাবে পল্লবিত হয়ে উঠেছে শুধুমাত্র তার মা-কে কে-র হাত থেকে আড়াল করার চেষ্টায়,-কে-র থেকে, যাকে সে সাড়ম্বরে সাহায্য করতে এসেছিল। হ্যাঁ, মা-কে তার হাত থেকে বাঁচবার শুভ চেষ্টায়। সে এমনকী একটু আগে যা যা বলেছিল তার কয়েকটার উল্টো কথাও এখন বলতে থাকে।

বিশেষ করে তার মায়ের অসুস্থতা বিষয়ে। এসব সত্ত্বেও, কে ভাবল তার ওপর হ্যানসের এক ধরনের টান দেখা যাচ্ছে, শুধু মায়ের কথা উঠলেই সে সবকিছু বিস্মৃত হয়, তার মা-র সঙ্গে কেউ যুক্ত হতে চাইলেই তার বিরুদ্ধতা লাভ করবে, এই মুহূর্তে এটা ঘটেছে হয়ত কে-র ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা তার বাপের ক্ষেত্রেও হতে পারত, উদাহরণ স্বরূপ।

কে তার এই অনুমান পরীক্ষা করে দেখতে চাইল ও বলল যে তার বাবা খুবই সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন সবার থেকে মাকে আড়াল করে রেখে ও কে-র যদি সেদিন সমস্ত ঘটনাটা জানা থাকত সে তার মা-র সঙ্গে কথা বলতে কোনো অবস্থাতেই

এগিয়ে যেত না ও সে হ্যানসকে অনুরোধ করে সে যেন মা-কে জানায় সে ক্ষমপ্রার্থনা করেছে।

অন্যদিকে সে অবশ্য বুঝতে পারছে না হ্যানসের বাবা কেন তাঁকে অন্য কোথাও যেতে দিচ্ছেন না যখন তিনি অসুখের কারণ হ্যানসের কথা অনুযায়ী ভালো মতোই জানেন। যে কেউ মনে করবে তিনি হ্যানসের মাকে আটকে রেখেছেন না, কিন্তু সন্তানদের নিয়ে কোথাও যেতে তাঁর বাধাটা কোথায়, তাঁর তো বহুদিনের জন্য বা অনেক দূরে কোথাও যাবার দরকার নেই, এমনকী কাছেই দুর্গের পাহাড় রয়েছে।

সেখানে আবহাওয়াও সম্পূর্ণ অন্যরকম। টাকাকড়ি খরচের ব্যাপারেও তো হ্যানসের বাবার চিন্তিত হবার কারণ নেই যেহেতু তিনি এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো জুতো ব্যবসায়ী, আর এটাও নিশ্চিত তার মা বা বাবার কোনো চেনাশোনা আত্মীয়-টাত্মীয় কিংবা চেনাশোনা কেউ না কেউ দুর্গে রয়েছেই যারা তাঁকে সানন্দেই গ্রহণ করবে। তাহলে তিনি তাকে যেতে দিচ্ছেন না কেন? এভাবে অসুখটাকে লঘু করে দেখাটা তাঁর একেবারেই উচিত হচ্ছে না, কে তার মা-কে সামান্য মিনিটখানেকের মতো দেখেছিল মাত্র কিন্তু অত অল্প সময়ের মধ্যেই তার বিবর্ণতা' অসুস্থতা তাকে এতটাই অস্থির করে তোলে যে সে তাঁর সঙ্গে কথা না বলে পারেনি।

এমনকী সেই সময়েও সে অবাক হয়েছিল এই ভেবে যে কী করে তাঁর স্বামী তাকে বসে থাকতে দিলেন, অমন অসুস্থ স্ত্রীকে ওরকম একটা অস্বাস্থ্যকর বাষ্পপূর্ণ ঘরে, যেখানে মানুষজন স্নান করছে, যেখানে কাপড় কাচা চলেছে? এছাড়া উনি ওঁকে অন্যদের সঙ্গে অমনভাবে চোঁচিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রেও কোনো বাধা আরোপ করেননি। বাস্তবিকই হ্যানসের বাবা কোনো খবর রাখেন না।

শেষ কয়েক সপ্তাহে এমনকী অসুস্থতা যদি হ্রাস পেয়েও থাকে একথা মনে রাখা দরকার এ ধরনের অসুখের প্রবণতাই হলো ক্রমাগত হ্রাস বৃদ্ধি আর শেষ পর্যন্ত, যদি ঠিকমতো লড়াই না করা যায়, অসুখ ফিরে আসে দ্বিগুণ তেজে তখন রুগী সমস্ত রকমের সাহায্যেরই বাইরে চলে যায়। তার মা-র সঙ্গে যদি কে-র কথা বলা সম্ভবও না হয় তার বাবার সঙ্গে কথা বলাটা ও তাকে এসব জানানো খুবই জরুরি।

হ্যানস সবকিছুই গুনল গভীর মনোযোগের সঙ্গে, অধিকাংশ কথা বুঝতেও পারল আর কে-র বিষণ্ণ উপদেশের মধ্যে যে সাংঘাতিক সতর্কবার্তা প্রচ্ছন্ন ছিল তাতে সে গভীরভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে। এ সত্ত্বেও সে কে-কে জানাল তার বাবার সঙ্গে সে কথা বলতে পারবে না কারণ তিনি কে-কে অত্যন্ত অপছন্দ করেন আর এসব গুনলে তিনি তার সঙ্গে ব্যবহার করবেন ঠিক শিক্ষকের মতোই। সে যখন কে বিষয়ে কথা বলছিল তার অধরে ভাসছিল একটু লাজুক হাসি কিন্তু তার পিতার বিষয়ে বলার সময় তার কণ্ঠস্বর হয়ে উঠল বিষণ্ণ ও তিক্ত।

কিন্তু সে যোগ করল কে-র পক্ষে হয়ত তার মা-র সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হতে পারে শুধু যদি বাবা না জানতে পারেন। এরপর গভীর চিন্তায় ঢুকে গিয়ে হ্যানস অলক্ষণ সামনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে-ঠিক কোনো স্ত্রীলোকের মতো যে নিষিদ্ধ কিছু করতে চায় কিন্তু উপায় খোঁজে কীভাবে তা করা যেতে পারে কোনো শাস্তি এড়িয়ে

গিয়ে-এবং জানায় যে এটা করা যেতে পারে আগামী পরশু, সেদিন তার বাবা হেরেনহফে যাবেন, সেখানে তার একটা সম্মেলনে যোগ দেবার কথা। তখন সে, হ্যানস এসে কে-কে মার কাছে নিয়ে যাবে, অবশ্য মা যদি রাজি থাকে, তার সম্ভাবনাও বেশ কমই। মা কখনো বাবার ইচ্ছাবিরুদ্ধ কোনো কাজ করে না, সব ব্যাপারেই মা বাবার সমস্ত ইচ্ছেকেই মেনে নেয়, এমনকী এমন ব্যাপারেও যার যুক্তিহীনতা হ্যানস পর্যন্ত স্পষ্টই বুঝতে পারে।

এসব কথাবার্তা আগেই কে হ্যানসকে ডায়াসের ওপর নিজের হাঁটুর মধ্যে টেনে নিয়েছিল ও তাকে সান্ত্বনা দিতে আদর করছিল। এই নৈকট্যের ফলে ঘনিষ্ঠতা বাড়ল, পরস্পরের মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়া গড়ে উঠল, মাঝে মধ্যে হ্যানসের বিরূপতা সত্ত্বেও। তারা অবশেষে রাজি হয় এই বিষয়েঃ-হ্যানস তার মাকে সমস্ত সত্য জানাবে, কিন্তু যাতে চট করে মা রাজি হয় সেজন্য মাকে জানাবে যে কে নিজেই ব্রুনসউইকের সঙ্গে কথা বলে নেবে, মা-র বিষয়ে নয়, তার নিজের বিষয়ে।

কথাটাও মিথ্যে নয়, কথোপকথনকালে কে-র মনে পড়ে গেল ব্রুনসউইক, সে যদি বদ ও বিপদজনক প্রকৃতির লোক হয়েও থাকে, এখন তার শত্রু হতেই পারে না, তা যদি সে হতো, গ্রামপ্রধানের দেওয়া খবর অনুযায়ী, তাহলে প্রতিনিধিত্ব করত না এমন সমস্ত লোকের হয়ে যারা গ্রামে আমিন নিযুক্ত করার পক্ষে, সেটা যদি শুধু রাজনৈতিক কারণেও হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে কে-র এই গ্রামে আসাটা নিশ্চয়ই ব্রুনসউইকের অনভিপ্রেত ছিল না।

কিন্তু সেক্ষেত্রে আবার তার প্রথম দিনের রুঢ় অভ্যর্থনা ও তার প্রতি হ্যানস কথিত অপছন্দের মনোভাবের কারণটা দূর্বোধ্যই ঠেকছে-হতে পারে সে যে এখানে এসে প্রথমেই তার সাহায্য নিতে যায়নি সেটা ব্রুনসউইকের সম্মানে আঘাত করেছিল, কিংবা অন্য কোনো কারণে সে তাকে ভুল বুঝেছে, তবে সেটা তো সামান্য দু-একটা কথা বলেই দূর করে দেওয়া যেতে পারে। আর তা যদি করা যায় তাহলে কে শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্রুনসউইকের মতো জবরদস্ত একজন সমর্থক পেয়ে যাবে, হ্যাঁ, আর গ্রামপ্রধানের বিরুদ্ধেও। সমস্ত সরকারি ষড়যন্ত্রই-সমস্ত ব্যাপারটাকে এ ছাড়া আর কী বলা যায়-যার সাহায্যে শিক্ষক ও মোড়লমশাই তাকে দুর্গ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে ও তাকে স্কুল পরিচারকের কাজ নিতে বাধ্য করেছে ফাঁস হয়ে যাবে এর ফলে।

কে-কে কেন্দ্র করে যদি নতুন করে ব্রুনসউইক আর গ্রামপ্রধানের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায় ব্রুনসউইক কে-কে তার পাশে পেতে চাইবে; কে ব্রুনসউইকের বাড়ির অতিথি হয়ে উঠবে, ব্রুনসউইকের সমস্ত যুদ্ধের উপকরণ তার হাতেই মজুত থাকবে। গ্রামপ্রধানের সমস্ত বাধা সত্ত্বেও, এ সমস্তের বিনিময়ে সে যে কত কী পেতে পারে তা কে বলবে? আর সারা সময়টাই সে মহিলার প্রচুর সান্নিধ্য, তো লাভ করবে-এইভাবে সে তার স্বপ্নের সঙ্গে খেলা করতে থাকে, স্বপ্নরা তার সাথে। এইসময় হ্যানস তার মার চিন্তায় মগ্ন হয়ে বিষণ্ণভাবে কে-র নীরবতা লক্ষ্য করে, যেভাবে কেউ চিকিৎসকের দিকে তাকিয়ে থাকে যখন তিনি রুগীর সুকঠিন অস্থির যথার্থ গুণগুলি নির্ধারণ করতে ডুবে ঘাম গভীর ভাবনায়

কে যখন প্রস্তাব করল সে ক্রনসউইকের সঙ্গে তার আমিন পদটির বিষয়ে কথা বলবে তখন হ্যানস তাতে সায় দিল কিন্তু শুধুমাত্র এই কারণে যে এর ফলে তার মা বাবার থেকে একটা আড়াল পাবে, সে শুধু কে-কে জিজ্ঞাসা করে এত দেরি করে তার বাবার কাছে যাবার কৈফিয়ত কী দেবে ও মোটামুটি সন্তুষ্ট হলো, যদিও তার মুখটি একটু গোমড়া হয়েই রইল, যখন কে এই মন্তব্য করল যে কারণ হিসেবে সে তার বাবাকে জানাবে যে স্কুলে অসহনীয় অবস্থা আর শিক্ষকের অপমানে সে এত হতাশাগ্রস্ত ছিল যে সমস্ত রকম সমর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে ভুলে গিয়েছিল।

এরপর সবারই মোটামুটি একটা ব্যবস্থা হবার পর ও সাফল্যের সম্ভাবনা বিষয়ে মোটামুটি ঐকমত্য হবার ফলে হ্যানসের মুখ চিন্তাভারমুক্ত হয়ে আনন্দিত হয়ে উঠল ও সে কে-র সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে বকবক করতে থাকল, একটু পরে ফ্রিডার সঙ্গেও। সে বহুক্ষণ কীসব চিন্তায় ডুবে ছিল, এবার সে আলোচনায় অংশ নিতে থাকে আবার।

অন্যান্য প্রসঙ্গের পর সে তাকে জিজ্ঞাসা করে সে কী হতে চায়, হ্যানস বেশি চিন্তা না করেই উত্তর দেয় সে চায় কে-র মতো একজন পুরুষ মানুষ হয়ে উঠতে। এরপর যখন তাকে প্রশ্ন করা হলো তার এমন চিন্তায় কারণ কী সে ঠিক জবাব দিতে পারল না এবং এর পরের প্রশ্ন সে স্কুলের পরিচারক হতে প্রস্তুত কিনা শুনে সে দৃঢ়কণ্ঠে নেতিবাচক উত্তর দিল। তাকে বহু প্রশ্ন করার পরই তারা বুঝতে পারল কত ঘুরপথে সে তার এই ইচ্ছেটিতে পৌঁছিয়েছে।

কে-র বর্তমান অবস্থাকে মোটেই ঈর্ষাজনক বলা চলে না, বরং বলা যায় ভাঙা চোরা, বেশ অপমানজনকই। কাউকে জিজ্ঞাসা না করে, নিজের বুদ্ধিতেই হ্যানস তা বুঝতে পেরেছিল। সে স্বইচ্ছায় কে-র কাছে এসেছে, তাকে সাহায্য করতে দিতে অনুনয় করেছে আর কে যখন তাতে সম্মতি জানিয়েছে সে খুশি হয়েছে। তার কল্পনায় অন্য লোকদের মনোভাবও তারই মতো। আর তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তার মা নিজে কে-র নাম উল্লেখ করেছে। এই সমস্ত বৈপরীত্য তার মনে এমন বিশ্বাসে রজন্য দিয়েছে যে এই মুহূর্তে কে-র অবস্থা ভয়ানক হতে পারে, মানুষজন তাকে ছোটো চোখে দেখতে পারে কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতের অবাস্তব চিত্রটি ও তার থেকে যে সুমহান ঘটনাক্রমের উন্মেষ ঘটতে পারে তার সম্ভাবনাই হ্যানসকে আকর্ষণ করেছে।

এই কারণে সে কে-কে তার বর্তমান দূর্দশাগ্রস্ত অবস্থাতেও গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়েছে। এই ইচ্ছের মধ্যে যে সূক্ষ্ম শিশুমনের বড়ো হবার প্রবণতা রয়ে গেছে তার মূলে ছিল এই কারণ যে হ্যানস কে-কে দেখেছিল নিজের ছোটো ভাই হিসেবে, যে ভাই বড়ো হয়ে উঠে তাকে একদিন অতিক্রম করে যাবে, খুব ক্ষুদ্র শিশুর ভবিষ্যতের বৃহত্ত্ব। ফ্রিডার প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার হয়ে বড়োদের মতো বিব্রত ভাব দেখিয়ে হ্যানস এসব প্রকাশ করে। কে আবার তাকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে বলল যে সে জানে তার কোন জিনিসটাকে হ্যানস সবচেয়ে হিংসে করে-তার দারুণ সুন্দর দেখতে বেড়াবার ছড়িটা, সেটা শোয়ানো ছির টেবিলের ওপর।

কথা বলবার সময় হ্যানস অন্যমনস্কভাবে সেটা নিয়ে খেলা করছিল। এখন কে জানে অমন ছড়ি কীভাবে বানাতে হয়, আর তাদের পরিকল্পনা যদি সফল হয় সে

হ্যানসকে এর চাইতে অনেক সুন্দর একটা ছড়ি বানিয়ে দেবে। হ্যানস সে খুব খুশি হয়ে উঠল তার একমাত্র কারণ এই ছড়ি পাবার প্রতিশ্রুতি কিনা তা বোঝা গেল না। সে আনন্দে উদ্ভাসিত মুখে বিদায় জানায় কে-র হাত আবেগে চেপে ধরে ও শেষে বলে, 'তাহলে, আগামী পরশু।'

হ্যানস বিদায় নিল একেবারে মোক্ষম সময়ে কারণ সামান্য পরে সশব্দে দরজা খুলেই যখন শিক্ষকটি দেখল কে ও ফ্রিডা অলসভাবে টেবিলে বসে রয়েছে সে চিৎকার করে উঠল, 'আমার অনধিকার প্রবেশ মার্জনা করবেন। কিন্তু দয়া করে আমাকে একবার জানাবেন কি এই ঘরটা ঠিক কখন পরিষ্কার হবে? আমরা পাশের ঘরে গাদাগাড়ি করে বসে আছি। পড়ানোই অসম্ভব আর আপনারা এই মন্ত ব্যায়ামগারটায় কেমন গুয়ে টুয়ে সময় কাটাচ্ছেন, সহকারী দুটোকেও বিদায় করে দিয়েছেন নিজেরা যাতে আরো জায়গা বাগাতে পারেন। এবার দয়া করে একটু গাত্রোখান করুন, একটু নড়াচড়া করা হোক।'

এরপর কে-র উদ্দেশ্যে, 'এখনি ব্রীজ ইন-এ গিয়ে আমার জন্য লাঞ্চ নিয়ে আসুন।' এ সমস্তই ক্রুদ্ধ চিৎকারের সঙ্গে কথিত হচ্ছিল যদিও অবশ্য আগের তুলনায় কম অপমানজনক ভাবে।

আদেশ পালন করতে কে প্রস্তুততাই ছিল কিন্তু শিক্ষককে একটু খোঁচাতে সে বলে, 'কিন্তু আমাকে তো বরখাস্তই করা হয়েছে।' 'বরখাস্ত করা হোক বা না হোক আমার লাঞ্চ নিয়ে আসুন,' বলে শিক্ষক, 'বরখাস্ত করা হয়েছে কি হয়নি সেটা আমি আগে জানতে চাই,' বলে কে।

'এসব বাজে কথার মানে কী?' শিক্ষক বলে, 'আপনি তো আমার জবাব মেনেই নেননি!'

'তাহলে বলছেন বরখাস্তের আদেশ খারিজ হয়ে গেছে?' জিজ্ঞাসা করে কে।

'আমার কাছে নয়,' বলে শিক্ষক, 'আমার এ কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু গ্রামপ্রধানের কাছে বোধ হয় নয় যদিও কারণটা আমার জানা নেই। কিন্তু এবার গা তুলুন। নয়তো সত্যি বলছি ঘর থেকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেব।'

কে এতেই সন্তুষ্ট হলো যে শিক্ষকটি তাহলে প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছে, কিংবা হয়ত আদপেই কথা বলেনি, শুধু প্রধান কীভাবে বিষয়টা নিতে পারে তা নিয়ে মনে বিচার বিশ্লেষণ করেছে ও সিদ্ধান্তটি কে-র পক্ষেই গেছে। এখন কে তাড়াহুড়ো করে লাঞ্চ আনার জন্য বেরোতে যাচ্ছিল আর ঠিক তখনই তাকে দরজা থেকে ফিরিয়ে আনে শিক্ষক, হয় সে এমন উল্টো ধরনের আদেশ দিয়ে কে-র আনুগত্য পরীক্ষা করতে চেয়েছিল যাতে সে বুঝে নিতে পারে ভবিষ্যতে সে আরো কতদূর এগোতে পারে। কিংবা একধরনের অহংবোধে সে আক্রান্ত হয়েছিল যার ফলে সামান্য এক ওয়েটারের মতো কে তার আদেশে এদিক ওদিক ছোট্টাছুটি করছে। দেখে তার ভারি আরাম বোধ হয়।

তার নিজের দিক থেকে কে জানত খুব বেশি আনুগত্য দেখালে সে একেবারে শিক্ষকের ক্রীতদাস ও বলির পাঠা হয়ে পড়বে কিন্তু সে স্থির করল কিছুদূর পর্যন্ত

আপাতত সে এই লোকটার খেয়ালখুশিই বরদাস্ত করে নেবে। কারণ যদিও দেখা যাচ্ছে এর তাকে তাড়াবার কোনো ক্ষমতাই নেই তবু সে নিশ্চিতভাবে ইচ্ছে করলে তার কাজটাকে এত সাংঘাতিক করে তুলতে পারে যে তার পক্ষে এখানে থাকাটাই অসম্ভব হয়ে উঠবে। আর এই মুহূর্তে তার পদটি তার কাছে আগের চেয়ে বহুগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলো।

হ্যানসের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর তার মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে, হয়ত সবই অসম্ভব, সবই ভিত্তিহীন, তবু সে সেই আশা মন থেকে বিসর্জন দিতে পারছিল না, সেগুলো বারনাবাসকেও ছাড়িয়ে গেল। সে যদি সেই আশাগুলোর কাছে আত্মসমর্পণ করে, না করে উপায়ও নেই, তাহলে তার সমস্ত শক্তিকে সংহত করতে হবে, কোনো কিছুতেই বিচলিত হয়ে চলবে না, খাদ্য আশ্রয়, গ্রাম কর্তৃপক্ষ, না, এমনকী ফ্রিডার বিষয়েও নয়—প্রস্তুত কিছু তো ফ্রিডাকে কেন্দ্র করেই, তার এত কিছু বিষয়ে চিন্তা, উদ্বেগ।

এই কারণে তাকে কাজটা রক্ষা করে যেতে হবেই, ফ্রিডাকে অন্তত কিছুটা নিশ্চয়তা দিতে আর এজন্য যদি শিক্ষকের কাছ থেকে বহুগুণ বেশি অত্যাচারও নেমে আসে সে সহ্য করে নেবে, যেটা সাধারণ পরিস্থিতিতে সে কিছুতেই করত না। কোনো কিছুই তার কাছে সাধ্যের অতিরিক্ত নয়, জীবনের অন্তহীন ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে অতি তুচ্ছ অপ্রিয় বিষয়মাত্র এগুলো, যা সে পেতে চাইছে তার তুলনায় অতি তাৎপর্যহীন, সে তো আর এখানে শুধুমাত্র সম্মানজনক আরামদায়ক জীবন কাটাতে আসেনি।

এবং এই কারণে সে যখন সরাইখানায় দৌড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সে দ্বিতীয় আদেশটিও মেনে নিতে প্রস্তুত হয় ও প্রথমই ঘরটি এমনভাবে গুছিয়ে ফেলে যে দিদিমণির আর বাচ্চাদের নিয়ে এ ঘরে আসার পক্ষে কোনো বাধা থাকে না। কিন্তু তাকে তা করতে হয় অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কারণ তাকে এরপরই লাঞ্ছনা আনতে দৌড়তে হবে; ইতিমধ্যেই শিক্ষকের ক্ষিদে প্রবল হয়ে উঠেছে। কে তাকে নিশ্চিত করে যে সবকিছুই তার ইচ্ছে অনুসারে হবে। শিক্ষক কিছু সময় চেয়ে থাকে ও কে এই অবসরে খড়ের বস্তাটি সরায়, ব্যায়ামের সরঞ্জামগুলো যথাস্থানে গুছিয়ে রাখে ও ঘর ঝাঁট দিতে শুরু করে।

এই অবসরে ফ্রিডা মঞ্চটা ধুয়ে ফেলে। তাদের এই তৎপরতা দেখে মনে হলো শিক্ষক খুশি হয়েছে, সে শুধু তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আগুন জ্বালানোর জন্য রাখা দরজার বাইরে এক স্তূপ কাঠের দিকে—সে অবশ্যই বলা বাহুল্য কে-কে কখনোই আর কাঠের চালার কাছে যাবার অনুমতি দেবে না—এবং এরপর সে ক্লাশে ফিরে যায় এই ভয় দেখিয়ে যে একটু পরেই সে আবার ফিরে এসে সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে যাবে।

কয়েক মিনিট চুপচাপ কাজ করার পর ফ্রিডা কে-কে জিজ্ঞাসা করল একটু আগে সে অমন নিচের মতো শিক্ষকের কাছে আত্মসমর্পণ করল কেন। প্রশ্নটি অবশ্য করা হলো গভীর সহানুভূতি ও আশঙ্কার সঙ্গে কিন্তু কে তখন ভাবছিল ফ্রিডা যে তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল শিক্ষকের সমস্ত আদেশ, অপমান থেকে তাকে আড়াল করে রাখবে তার কতটুকু সে পালন করতে পেরেছে। সে শুধু সংক্ষেপে উত্তর দেয় যেহেতু সে স্কুলের পরিচারকের কাজ নিয়েছে কর্তব্য পালন করতেই হবে। এরপর আবার নৈঃশব্দ

নেমে আসে ও এই সংক্ষিপ্ত বাক্য বিনিময়ের ফলে কে-র মনে পড়ে যায় ফ্রিডা যেন বহুক্ষণ কী একটা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ডুবে ছিল-বিশেষ করে হ্যানসের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময়টাতেই-এবং সে যখন কার্ঠ-টাট সরাচ্ছিল সে তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে সে এত চিন্তিত কেন। আস্তে তার দিকে চোখ ফিরিয়ে ফ্রিডা উত্তর দিল সে তেমন কিছু ভাবছে না, তবে তার বাড়িওয়ালীর কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে আর তার মনে হচ্ছে সে যা বলেছিল তার মধ্যে অনেক সত্য রয়েছে।

কে যখন চাপ দিতে লাগল আরো স্পষ্ট করে বলতে শুধুমাত্র তখনই বিস্তারিত বিবরণের পর সে উত্তর দিল অনেক স্পষ্টভাবে কিন্তু কাজ থেকে চোখ না সরিয়ে-এ বিষয়ে সে চিন্তাক্রান্ত ছিল বলে নয়, তাতে বিশেষ অগ্রগতি হচ্ছিল না, বরং যাতে কে-র চোখে চোখ রাখতে সে বাধ্য না হয়। এবং এবার সে কে-কে বলতে লাগল হ্যানস-এর সঙ্গে তার কথোপকথন সে প্রথমে চুপচাপ শুনে গেছে তারপর তার কয়েকটা কথা শুনে সে চমকে উঠেছে, তারপর আরো স্পষ্টভাবে কথাগুলোর আসল অর্থ ধরতে পেরেছে আর সেই থেকে সে কথাগুলোর প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি কারণ বাড়িওয়ালী তাকে ঠিক যা যা বলেছিল ওই কথাগুলো তাদের প্রত্যেকটিকে সমর্থন করছিল, যদিও গোড়ায় সে বাড়িওয়ালীর একটা কথাও বিশ্বাস করেনি।

এই সমস্ত ঘোরপ্যাচে বিরক্ত হয়ে ও ফ্রিডার অশ্রুপূর্ণ অনুযোগে আরো বেশি উতাক্ত হয়ে, বিশেষ করে তাদের নিজেদের ব্যাপারে আবার বাড়িওয়ালী প্রসঙ্গ ওঠায় কে হাতে করে যে কার্ঠের বোঝা নিয়ে আসছিল তা মেঝেতেই ছুঁড়ে ফেলে, তার ওপরই বসে পড়ে ও গভীর গলায় ফ্রিডার কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা জানতে চায়।

‘একাধিকবার,’ ফ্রিডা আরম্ভ করল, ‘হ্যাঁ, প্রথম থেকেই বাড়িওয়ালী চেষ্টা করেছে আমার মধ্যে তোমার বিরুদ্ধে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে, সে একথা বলেনি যে তুমি মিথ্যে বলছ, বরং উল্টোভাবেই বলেছে তুমি শিশুদের মতো খোলামেরা, কিন্তু তোমার চরিত্র আমাদের থেকে এত ভিন্ন, সে বলেছি, তুমি যখন সোজাসুজি কথাও বল তা আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে ওঠে। আর তুমি যদি কোনো সদুপদেশ না নাও তাহলে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতায় মধ্য দিয়ে তোমাকে বিশ্বাস করার মাশুল আমাদের গুনতে হবে। এমনকী মানুষ সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও সে নিজে পর্যন্ত তোমার বিষয়ে ঠকে গিয়েছিল।

কিন্তু ব্রীজ ইন-এ তোমার সঙ্গে শেষ কথাবার্তা বলার পর-আমি শুধু তার কথাগুলোর পুনরুক্তি করছি মাত্র-সে তোমার চালাকি ধরে ফেলে, তার কথা অনুযায়ী, এরপর আর তুমি তাকে ঠকাতে পারনি যত সুচতুরভাবেই তুমি তোমার আসল উদ্দেশ্য গোপন করার চেষ্টা কর না কেন, তুমি কিন্তু কিছুই গোপন করনি, ও বার বার এটাই বলেছে, তারপর বলেছে, ‘খুব সাবধানে ওর কথা শুনবি; অনুকূল মনগড়া ভাব থেকে নয়, কিন্তু সাবধানে, খুব সতর্কভাবে।’

সে নিজেও ঠিক তাই করেছে তার কাছে আমার বিষয়ে তোমার কথাগুলো ছিল এইরকম-তুমি যে আমাকে পটিয়েছ-সে ঠিক এই শব্দগুলোই ব্যবহার করেছিল-তার একমাত্র কারণ ঘটনাক্রমে আমি তোমার সামনে গিয়ে পড়েছিলাম আর আমাকে

তোমার অপছন্দের বলেও মনে হয়নি আর ভুল করে ভেবে নিয়েছিলে বারের মেয়ে যখন যে খন্দের ডাকবে তার কোলে গিয়েই বসে পড়বে। এ ছাড়াও, বাড়িওয়ালী এটা হেরেনহফ-এ গিয়ে জানতে পারে, যে কোনো কারণেই হোক, তুমি রাতটা হেরেনহফ-এ কাটাতে চেয়েছিলে আর আমাকে ছাড়া কোনোমতেই তোমার পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না। এ সব কারণেই তুমি আমার এক রাতের প্রেমিক হয়ে উঠেছিলে।

কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী প্রেমকে আরো গভীর করে তুলতে আরো অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজন ছিল। এই অতিরিক্ত কিছুটা ছিলেন ক্ল্যাম। তুমি ক্ল্যামের কাছে কী চাও তা জানে বলে অবশ্য বাড়িওয়ালী দাবি করেনি; সে শুধু এটুকুই জানত যে আমাকে চেনার আগে তুমি সেই আগ্রহ নিয়েই পৌছতে চেষ্টা করেছিলে যেমনটা তুমি এখনো করে যাচ্ছ। তফাৎটা শুধু এই যে আমাকে চেনার আগে তোমার চেষ্টা ছিল আশাহীন কিন্তু এখন তুমি ভেবে নিচ্ছ আমাকে পেয়ে যাওয়ায় ক্ল্যামের কাছে যাবার পথটা শুধু অনেক বেশি মসৃণ, সুনিশ্চিতই হয়ে যায়নি, তোমার নিজের পক্ষে অনেক বেশি সুবিধাজনকও হয়ে উঠেছে। আমি ভীষণভাবে চমকে উঠেছিলাম— অবশ্য সেটাকে অকারণ অমূলক ভয়ই বলা চলে-যখন তুমি একটু আগে বললে যে আমাকে চেনার আগে এখানে তুমি একটা অঙ্ক গলিতে ঘুরে মরছিলে।

কথাগুলো যেন ঠিক বাড়িওয়ালীর মুখেই শুনেছিলাম, সেও বলেছিল আমার সঙ্গে পরিচয়ের পরই তুমি তোমার লক্ষ্য বিষয়ে সচেতন হয়েছে। তার কারণ তোমার বিশ্বাস আমাকে পেয়ে তুমি ক্ল্যামের প্রেমিকাকে কজা করতে পেরেছে, আর তাই তোমার কারাগারে বন্দি আছে তার স্ত্রীলোক যাকে সে একমাত্র প্রচুর মুক্তিপণের বিনিময়েই ফিরে পেকে পারে। যেহেতু তোমার চোখে আমার আমি কিছুই না, আমার দামটাই সব, আমায় তুমি সমস্ত সুবিধাই দিতে প্রস্তুত আছ কিন্তু মুক্তিপণের বিষয়ে তুমি কঠোর। তাই হেরেনহফে আমার কাজটা যে গেল আর ব্রীজ ইনও ছেড়ে চলে আসতে বাধ হলাম, এসবে তুমি একেবারেই নির্বিকার রইলে আর এখানে, এই স্কুলটাতে আমাকে যে হাড়ভাঙা খাটনি খাটতে হচ্ছে তাতেও তোমার কোনো গা নেই।

আমার সঙ্গে দু-দন্ড কথা বলারও সময় নেই তোমার, আমায় তুমি ছেড়ে দিয়েছিলে সহকারীদের হাতে, তাদের হিংসে পর্যন্ত করার কথা তোমার মগজে আসে না, আমার মূল্য তোমার কাছে শুধুমাত্র এইটুকু যে একসময় ক্ল্যাম আমার নাগর ছিলেন, অঙ্কনেই তুমি এমন আচরণ কর যাতে আমি ক্ল্যামকে ভুলে না যাই, যাতে ঠিক চূড়ান্ত মুহূর্তে আবার ক্ল্যামের কাছে ফিরে যাই সুরসুর করে, অথচ একই সময় তুমি বাড়িওয়ালীর সঙ্গেও ঝগড়া চালিয়ে যাচ্ছ, একমাত্র সেই মহিলা যে তুমি মনে কর, আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারে, আর সেইজন্যই তুমি ঝগড়াটাকে এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে টেনে এনেছিলে যাতে আমাকে নিয়ে তুমি ব্রীজ ইন থেকে সরে পড়তে পার।

আর যাই ঘটুক না কেন আমি যে তোমারই থাকব এ বিষয়েও তোমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ক্ল্যামের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটাকেও তুমি দেখছ শুধু একটা ব্যবসায়িক বোঝাপড়ার দিক থেকেই, যেন একেবারে নগদ টাকার লেনদেন। সমস্ত রকম সম্ভাবনার কথাই তোমার ঠান্ডা হিসেবের মধ্যে রয়ে গেছে,

লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তুমি সবকিছু করতেই প্রস্তুত আছ; যদি ক্ল্যাম আমাকে চান তুমি অকাতরে আমাকে দিয়ে দেবে, তিনি যদি চান তুমি আমার সঙ্গে লেপ্টে থাক; তুমি লেপ্টে থাকবে, তিনি যদি চান তুমি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দাও, তুমি ছুঁড়ে ফেলে দেব-কিন্তু এখানে তোমার নিজেরও একটা ভূমিকা থাকবে, যদি তোমার পক্ষে সুবিধাজনক হয় তুমি সকলকে দেখাবে আমাকে কত ভালোই না বাস, তাঁর নির্লিপ্ততাকে তুমি আঘাত করতে চাইবে নিজের ক্ষুদ্রতাকে মাত্রাতিরিক্তভাবে প্রকাশ করে আর এরপর তাকে গভীর লজ্জায় ছুঁড়ে দিয়ে দাবি করবে তুমিই তাঁর উত্তরাধিকারী, তার পরিবর্তে তুমিই তার প্রেমের জটিলতা বহন করবে, তারপর অবশ্য আমাকে ফিরিয়ে নিতে অনুনয় করবে, অবশ্যই তোমার নিজের শর্তে।

কিন্তু বাড়িওয়ালী আমাকে শেষে বলেছিল, তুমি যখন বুঝতে পারবে তুমি নিজেকে ঠকিয়েছ সমস্ত ব্যাপারেই, তোমার অনুমানে, তোমার আশায়, ক্ল্যাম বিষয়ে তোমার ধারণায়, তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বিষয়ে ধারণায়, তখনই শুধু আমার পাপস্খালন শুরু হবে, কারণ-এই প্রথম বাস্তবে আমি তোমার একমাত্র নির্ভরস্থল হয়ে দাঁড়াব, কিন্তু একই সময়ে আমি তোমার এমন এক বিত্ত হয়ে উঠব যা একেবারেই মূল্যহীন বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে, আর তখন তুমি আমার সঙ্গে তেমন আচরণই করতে থাকবে। দেখা যাবে আমার ওপর তোমার কোনো দরদই নেই, পড়ে আছে শুধু অধিকারবোধ।

ঠোট কঠিনভাবে চেপে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কে তার কথা শুনছিল। যে কাঠগলোর ওপর সে বসেছিল সেগুলো এদিক ওদিক অজান্তে ছড়িয়ে গেছে, এখন সে প্রায় মেঝের ওপরই বসে আছে। অবশেষে সে উঠে দাঁড়ায়, মঞ্চে উঠে বসে ফ্রিডার হাত ধরে, সে তা দুর্বলভাবে টেনে নেবার চেষ্টা করে।

এবার কে বলে, 'তুমি যা বললে তার মধ্যে কোনটা তোমার কথা আর কোনটা বাড়িওয়ালীর তা আলাদা করে বুঝতে পারলাম না।'

'ওগুলো সম্পূর্ণ বাড়িওয়ালীর ধারণা, বলল ফ্রিডা, 'ওকে আমি সম্মান করি বলেই ওর কথাগুলো আমি শুনেছিলাম, কিন্তু জীবনে এই প্রথম ওর মতামত আমি কোনোমতেই মেনে নিতে পারিনি।

ও যা যা বলেছে সব আমার কাছে দুর্ভাগ্যজনক আর আমাদের সম্পর্ক বিষয়ে ওর ধারণা সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলেই আমার মনে হয়েছে। বরং ও যা কিছু বলেছিল তার উল্টোগুলোই আমার বহু পরিমাণে সত্য বলে মনে হয়েছে। আমার মনে পড়ে গিয়েছিল আমাদের একসঙ্গে রাত কাটাবার পরের বিষণ্ণ সকালটিকে। যেন সবকিছুই হারিয়ে গেছে এমনভাব করে তুমি আমার কাছে বসেছিলে নতজানু হয়ে। আর তখন আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল আমি যা-ই করে থাকি না কেন আসলে তোমার কোনো উপকার না করে বরং তোমার পথে বাধারই সৃষ্টি করছি। আমার জন্যই বাড়িওয়ালী তোমার শত্রু হয়ে উঠেছে, অত্যন্ত প্রভাবশালী এক শত্রু, তার শক্তিকে এখনো তুমি তুচ্ছ করে দেখছ, আমার জন্যই তোমাকে অত চিন্তা করতে হয়েছে, প্রধানের কাছে ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে, শিক্ষকের হাতে তোমার অপমানের শেষ নেই আর সহকারীদের হাতে তোমাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে, আর সবচেয়ে মারাত্মক, আমার

জন্যই সম্ভবত ক্ল্যামের সঙ্গে তোমার সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে গেছে। এখনো যে তুমি ওঁর সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ সেটা ওকে তুষ্ট করার জন্য তোমার দুর্বল চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর নিজেকেই আমি তখন বলেছিলাম বাড়িওয়ালী নানা সম্ভাবনার কথা বলে আসলে আমাকে তিন্ত আত্মধিকারের হাত থেকে বাঁচাতে চাইছে মাত্র, যতই হোক সে তো পৃথিবীটাকে আমার চেয়ে অনেক ভালোই চেনে, গুহেচ্ছাপূর্ণ চেষ্টা কিন্তু অকারণ। তোমার ওপর আমার ভালোবাসাই আমাকে সবকিছু সহ্য করতে শিখিয়েছে। তোমার সাহায্যে তা আসবেই কখনো, দূর ভবিষ্যতে, যদি এই গ্রামে না-ও হয় অন্য কোনোখানে। এ ইতিমধ্যেই শক্তির প্রমাণ দিয়েছে, বারনাবাসের পরিবারের থেকে তোমাকে রক্ষা করেছে।’

‘ঐ সময়ে তোমার ধারণা তাহলে এ রকম ছিল?’ বলল কে, ‘তা সেই মতের পরিবর্তন ইতিমধ্যে হয়েছে কি?’

‘আমি জানি না,’ বলল ফ্রিডা কে-র হাতের দিকে চেয়ে, যে হাত তখনো তার হাত ধরে ছিল, ‘হয়ত কিছুই বদলায়নি কিন্তু বাস্তবে-’ সে কে-র থেকে হাত টেনে নেয়, তার বিপরীতে সিঁধে হয়ে বসে ও মুখ গোপন না করেই কাঁদতে থাকে।

সে তার অশ্রুপূর্ণ মুখটি তুলে ধরে এমনভাবে যেন তার কান্না নিজের জন্য নয় ও তাই তা গোপন করা নিশ্চয়োজন, সে কাঁদতে কে-র বিশ্বাসঘাতকতায় আর চোখের জল দেখাটা তার প্রাপ্য শাস্তি- ‘কিন্তু বাস্তবে সবই বদলে গেল যখন আমি তোমাকে বাচ্চাটার সঙ্গে কথা বলতে শুনলাম।

কী সরলভাবেই না তুমি তার পরিবারের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলে-এটা, সেটা। তখন তোমাকে আমার মনে হচ্ছিল ঠিক সেই রাতের মতো-যখন তুমি ট্যাপরুমে ঢুকলে, সোজা-সরল, খোলামেলা শিশুর মতো একেবারে, ঠিক এমনই ঔৎসুক্য দেখিয়ে তুমি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলে। একটু আগেও তুমি ঠিক তেমনই করলে আর তখন আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল বাড়িওয়ালী এসে একবার দেখুক এখনো সে তার মতামত আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে কিনা।

কিন্তু একটু পরে হঠাৎই লক্ষ্য করলাম তুমি একটা গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলছ। তুমি ওর বিশ্বাস অর্জন করে ফেলেছ-কাজটা খুব সহজ না-নানা মিষ্টি কথা টথা বলে খুব সহজেই তুমি লক্ষ্যভেদ করতে পার আর আমিও ছকটা ধরতে পারছিলাম ধীরে ধীরে কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে। তোমার লক্ষ্য ছিল ওই মেয়েছেলেটা। তোমার আঘাত সমবেদনাপূর্ণ খোঁজবরের মধ্য দিয়ে তোমার নিজস্ব কামনার মত্ততা নগ্ন হয়ে উঠেছিল আমার কাছে। তাকে পাবার আগেই তুমি তাকে ঠকাতে শুরু করে দিয়েছিলে। তোমার কথা থেকে আমি দেখতে পেলাম শুধু আমার অতীতকেই না, আমার ভবিষ্যকেও।

মনে হলো যেন আমার পাশেই বাড়িওয়ালী বসে আছে আর সব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছে, আর সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। কিন্তু গভীর হতাশার সঙ্গে আমি আমার চেষ্টার নিষ্ফলতা বুঝতে পারি, অথচ আমি তো আর প্রবঞ্চিত হতে যাচ্ছি না, আমি নিজে প্রবঞ্চিত হচ্ছি না, হতে হচ্ছে সেই অচেনা স্ত্রীলোকটিকে আর একবার নিজেই সামলে আমি হ্যানসকে জিজ্ঞাসা করলাম

সে কী হতে চায় আর সে উত্তর দিল সে চায় তোমার মতো হতে আর আমি বুঝতে পারলাম সে তোমার প্রভাবে ইতিমধ্যেই পড়ে গেছে সাংঘাতিকভাবে, তাহলে আর তার সঙ্গে আমার প্রভেদ কী রইল? তাকে তুমি ব্যবহার করলে এখানে আর আমাকে করেছিলে ট্যাপরুমে।

‘সমস্ত কিছুতেই,’ কে বলল, শুনতে শুনতে সে যেন হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেল, ‘তুমি যা-ই বল না কেন কোনো না কোনো ভাবে কিছু ন্যায্য কথা থেকেই যায়, তবে পুরোপুরি সত্য নয়, আংশিক মাত্র। ও সমস্তই বাড়িওয়ালীর ধারণা, আমার শত্রুর ধারণা, যদিও তুমি কল্পনা করে নিচ্ছ ওগুলো তোমারই নিজস্ব ভাবনা, আর তাতে আমি সান্ত্বনাও পাচ্ছি।

কিন্তু ওগুলো সিদ্ধান্তমূলক, বাড়িওয়ালীর থেকে শেখার অনেক কিছুই আছে। ওই কথাগুলো অবশ্য সে আমাকে বলেনি যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাকেও কথা শোনাতে ছাড়েনি। বোঝাই যাচ্ছে সে তোমার হাতে এই অস্ত্র তুলে দিয়েছে এই আশায় যে বিশেষ কোনো খারাপ বা চূড়ান্ত অবস্থায় তুমি তা দিয়ে আমার ওপর আঘাত হানবে। আমি যদি তোমার সঙ্গে অসঙ্গত আচরণ করি সে-ও তোমার সঙ্গে তাই-ই করেছে। কিন্তু, ফ্রিডা, শুধু একবার ভাব: এমনকী সব কিছু যদি বাড়িওয়ালীর কথা মতোই ঘটে থাকে তাহলে তো লজ্জার সঙ্গে এটাও ভেবে নিতে হয় তুমি আমায় ভালোবাসনি। তখন, একমাত্র তখনই ভেবে নেওয়া যেতে পারে আমি তোমাকে নানা ছলে, কৌশলে লাভ করেছি, শুধু তোমাকে ভাঙিয়ে লাভ করতে। তাহলে তো ওলগার হাতে হাত জড়িয়ে যে তোমার কাছে হাজির হয়েছিলাম তাও তোমার মনে ঈর্ষার সঞ্চার করতেই। বাড়িওয়ালী বোধ হয় আমার অপরাধের তালিকায় একটা উল্লেখ করতে একেবারেই ভুলে গিয়ে থাকবে।

কিন্তু ব্যাপারটা যদি সত্যিই অতটা খারাপ না হয়ে থাকে, যদি তোমাকে সেই রাতে যে অধিকার করেছিল সে কোনো চতুর শিকারী জানোয়ার না হয়ে থাকে, বরং যদি এমন হয় তুমিই আমার কাছে এগিয়ে এসেছিলে, যেমনভাবে আমি তোমার দিকে অগ্রসর হই, আর ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলে পরস্পরকে আবিষ্কার করি, যদি ব্যাপারটা এমন হয়ে থাকে, তাহলে ফ্রিডা আমায় বল, ঘটনাটা কোথায় দাঁড়ায়। যদি প্রকৃতপক্ষে তাই ঘটে থাকে তাহলে তো আমি নিজের জন্য যা কিছু করেছি তা তোমার জন্যও করেছি, কোনো বিভেদই তো এখানে থাকতে পারে না, একমাত্র কোনো শত্রুর পক্ষেই তা ভেবে নেওয়া সম্ভব। আর সেক্ষেত্রে সবকিছু সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখা দরকার, এমনকী হ্যানসের ঘটনাটাও।

এছাড়া হ্যানসের সঙ্গে কথাবার্তা নিয়ে তুমি আমাকে যেভাবে দোষারোপ করলে তার পিছনেও তোমার অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা ও বিষণ্ণ মন কাজ করেছে, সমস্ত কিছুকেই তারা রঙ চড়িয়ে দেখেছে, কারণ হ্যানস ও আমার উদ্দেশ্য যদি এক না হয়েও থাকে, তাহলেও দুটি উদ্দেশ্যের মধ্যে ঘোর শত্রুতাও একেবারে ছিল না, তুমি যদি অন্যরকম বিশ্বাস করে থাক তাহলে আমাদের ক্ষুদ্রে মানুষটির ওপর ঘোরতর অবিচার করে বসে আছ, আর সে যদি আমাদের কথা বুঝতে না ও পেরে থাকে তাতেই বা কার কী ক্ষতি হলো?’

‘সঠিক পথ খুঁজে পাওয়া যে কী শক্ত!’ বলে ফ্রিডা শ্বাস ফেলে, ‘তোমার সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহই ছিল না। সন্দেহটা যদি বাড়িওয়ালী থেকে আমার মধ্যে সংক্রমিত হয়ে থাকে, তা দূল করতে পারলে আমার চেয়ে সুখি আর কেউ হবে না, এর জন্য নতজানু হয়ে তোমার কাছে ক্ষমাভিক্ষা করছি। কারণ আমি তোমাকে সত্যিই বিশ্বাস করি, সবসময়, যখন কটু কথা বলছিলাম, তখনো। কিন্তু তা হলেও এই সত্যটা থেকেই যাচ্ছে যে তুমি আমার কাছে অনেক কিছুই গোপন কর, তুমি এই আস, এই যাও, আমি বুঝতেও পারি না কোথেকে এলে বা কোথায় যাচ্ছ।

একটু আগেই যখন হ্যানস দরজায় টোকা দিল তুমি চিৎকার করে উঠলে বারনবাসের নাম ধরে। কোনো দূর্বোধ্য কারণে তুমি ভালোবাসায় গদগদ হয়ে যেভাবে ওই ঘৃণিত নামটা ধরে ডাকলে, আমার ইচ্ছে হয় আমার নাম ধরেও তুমি একবার অন্তত ওইভাবে ভালোবেসে ডাক। আমার ওপর যদি তোমার বিশ্বাস না থাকে তাহলে আমার অন্তঃস্থল থেকে যে অবিশ্বাস উঠে আসে তাকে ঠেকাব কীভাবে? এই অবিশ্বাস আমাকে ঠেলে দেয় বাড়িওয়ালীর দিকে, যার ধ্যানধারণাকে তোমার ব্যবহার সমর্থন করছে। তার সমস্ত ধারণাকেই নয় অবশ্য, শুধু আমার জন্যই কি তুমি সহকারীদের বিদায় করনি? আ, তুমি যদি জানতে কত তীব্রভাবে আমি তোমার প্রত্যেকটি কাজে, কথায় সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করি, তা যদি আমাকে কষ্ট দেয়, তাহলেও।’

‘শেষবারের মতো তোমায় বলছি ফ্রিডা,’ বলল কে, ‘তোমার কাছ থেকে কোনো তুচ্ছতম ঘটনাও আমি... করিনি। তুমি নিজেই দেখেছ বাড়িওয়ালী আমাকে কত ঘৃণা করে আর তোমাকে তা থেকে সরিয়ে রাখতে কী আশ্রয় চেষ্টা করে চলেছে, কি কদর্য উপায় সে অবলম্বন করেছে, আর কেমনভাবেই বা তুমি তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছ, ফ্রিডা, কীভাবে তুমি আর বশ্যতা মেনে নিয়েছ। আমাকে বল ফ্রিডা আমি কীভাবে তোমার কাছ থেকে সত্য গোপন করেছি। আমি যে ক্ল্যামের কাছে পৌঁছতে চাইছি তা তুমি জান, তুমি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারবে না জেনে আমাকে নিজেই সচেতন হয়ে তার উপায় খুঁজে নিতে হবে, এ-ও তোমার জানা। তাহলে বুঝি আমাকে আরো দ্বিগুণ অপমানিত হতে হবে আমার সমস্ত প্রচেষ্টায় যেভাবে ব্যর্থতা এসেছে সেসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে? নাকি তোমার কাছে অহংকার করে বলতে হবে সারা সন্ধ্যাটা আমি নিরর্থক অপেক্ষা করেছি আর ঠাণ্ডায় কঁপেছি ক্ল্যামের শ্লেজের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে? এসব ব্যর্থতার গ্লানির চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পেতেই আমি তোমার কাছে ফিরে আসি গভীর অগ্রহ নিয়ে আর তুমি আমাকে অভ্যর্থনা কর এই সব ভরসনা দিয়ে। আর বারনাবাস? আমি সত্যিই ওর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সে ক্ল্যামের বার্তাবাহক, আমি তো আর তাকে তা বানাইনি।

‘আবার বারনাবাস!’ চোঁচিয়ে ওঠে ফ্রিডা, ‘ও খুব সুবিধের বার্তাবাহক বলে তো আমার মনে হয় না।’ ‘হয়ত তুমিই ঠিক’ বলে কে, ‘কিন্তু ওই একটিমাত্র বার্তাবাহকই তো আমার কাছে পাঠানো হয়েছে।’

‘সেটাই তো তোমার পক্ষে খারাপ,’ বলে ফ্রিডা ‘সে কারণেই তো তোমার অনেক বেশি সাবধান হওয়া উচিত, বলে কে হাসিমুখে, ‘ও আসে খুবই কম আর যে খবর

আনে তার গুরুত্বও বিশেষ কিছু নয়, ক্ল্যামের কাছ থেকে আসছে এটুকুই ওদের যা মূল্য।’

‘এবার আমার কথা শোন,’ বলে ফ্রিডা, ‘কারণ এখন ক্ল্যামও তোমার লক্ষ্য নয়, বোধ হয় এই চিন্তাই আমাকে অস্থির করে তুলেছে সবচেয়ে বেশি। আমাকে পেয়ে তুমি যখন ক্ল্যামের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করলে সেটা ভালো হয়নি। কিন্তু এখন যে তুমি ক্ল্যামের কাছে পৌঁছবার চেষ্টাই ছেড়ে দিয়েছ সেটা অকল্পনীয় ভাবে খারাপ, এটা এমনকী বাড়িওয়ালীও কল্পনা করতে পারেনি। বাড়িওয়ালীর কথামতো, প্রশ্নাতীত না হলেও যথার্থ সুখ, সেদিনই শেষ হবে যেদিন তুমি টের পাবে ক্ল্যামকে ভিত্তি করে তোমার যে আশা তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

কিন্তু এখন তুমি সেদিনের অপেক্ষাতেও নেই, হঠাৎ একটা খোকা এসে হাজির হলো আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাকে নিয়ে তুমি তার সাথে ঝগড়া শুরু করে দিলে, এমন ভাবে যেন তুমি জীবন বাঁচাতে লড়ছ।

‘হ্যানসের সঙ্গে আমার কথাবার্তার যে অর্থ তুমি করলে তা যথার্থ,’ বলল কে, ‘ব্যাপারটা বাস্তবিকই তাই। কিন্তু তোমার মন থেকে কি তোমার অতীত জীবনের সমস্ত টা এতটাই মুছে গেছে (বাড়িওয়ালী ছাড়া অবশ্য, সে কিছুতেই নিজেকে মুছে ফেলতে দেবে না), যে তুমি আর মনেই করতে পারছ না মানুষকে চূড়ায় পৌঁছতে কি প্রচণ্ড লড়াই করতে হয়, বিশেষ করে কেউ যদি একেবারে তলা থেকে শুরু করে। সামান্য আশার আলো দেখলেই তাকে কেমনভাবে সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হয়। আর এই মহিলাটি এসেছে দূর্গ থেকে। সে আমাকে প্রথম দিনেই নিজের মুখে এটা জানিয়েছিল যখন আমি ঘুরতে ঘুরতে ল্যাসম্যানের বাড়িদে গিয়ে হাজির হই। এক্ষেত্রে তার থেকে উপদেশ এমনকী সাহায্য চাওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক কী আছে? ক্ল্যামের কাছে যাবার পথে অজস্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার উপায় যদি বাড়িওয়ালীর জানা থাকে তো এই মহিলাটিও জানে কোন পথে ক্ল্যামের কাছে পৌঁছনো যেতে পারে, কারণ সে নিজে সেখান থেকেই এসেছে।’

‘ক্ল্যামের কাছে যাবার পথ।’ জিজ্ঞাসা করে ফ্রিডা।

‘ক্ল্যামের কাছেই, এছাড়া আর কী?’ বলে কে।

এবার সে লাফ দিয়ে ওঠে, ‘কিন্তু এখনি আমাকে লাঞ্চ আনতে যেতে হবে।’

ফ্রিডা তাকে অনুনয় করে আরো কিছুক্ষণ থাকতে, পরিস্থিতির সঙ্গে বেমানানভাবে, যেন তার সঙ্গে সে থাকলে একটু আগে সে তাকে যেসব সান্ত্বনার কথা বলেছে তা সপ্রমাণিত হবে।

কিন্তু এখন কে-র মাথায় ঘুরছিল শিক্ষকের কথা, সে দরজার দিকে ইঙ্গিত করে, সেটা যে কোনো মুহূর্তে সশব্দে খুলে যেতে পারে, ও দ্রুত ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দেয়, ইতিমধ্যে ফ্রিডাকে আর আগুনও জ্বালাতে হবে না, সেটা সে নিজেই করবে। অবশেষে ফ্রিডা নীরবে তার কথা মেনে নেয়। কে যখন বাইরে বরফ ঠেলে ঠেলে এগোচ্ছিল-অনেক আগেই রাস্তা পরিষ্কার করা উচিত ছিল, যেভাবে কাজ ধীরে এগোচ্ছে তাতে অবাধই হতে হয়-সে একজন সহকারীকে দেখতে পেল, ক্লাস্তিতে প্রায় আধমরা।

এখনো রেলিং ধরে বুলছে। এই একজনই, অন্যটা গেল কোথায়? ওদের একজনের সহ্যশক্তি কি কে ভেঙে দিতে পারল শেষ পর্যন্ত? এটাকে দেখা গেল এখনো যথেষ্ট সক্রিয়, কে-কে দেখামাত্র যেন চনমনে হয়ে উঠে উন্মত্তের মতো হয়ে সামনে বাড়িয়ে দেয় আর চোখ ঘোরাতে থাকে।

‘এর জেদ সত্যিই অসাধারণ, কে বলে নিজেকে, কিন্তু তাকে আবার যোগ করতে হয়, ‘এমন চালিয়ে গেলে ব্যাটা রেলিংয়েই একটু পরে জমে যাবে।’

বাহ্যিকভাবে অবশ্যে কে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তাকে শাসায় যার ফলে সে আর এগিয়ে আসতে সাহস পায় না, বস্তুত সে যেন খানিকটা পিছিয়েই যায়। ঠিক এই সময় ফ্রিডা একটা জানলা খোলে, আগুন জ্বালাবার আগে ঘরে বাতাস ঢোকাতে। সঙ্গে সঙ্গে সহকারী কে-র থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে যেন উন্মত্ত জানলার আকর্ষণে গুঁড়ি মেয়ে সেদিকে এগোয়। একদিকে সহকারীটির প্রতি করুণা ও অন্যদিকে কে-র প্রতি ভীতদৃষ্টি ফ্রিডার মুখকে এখন বিচলিত করে তুলেছিল।

সে জানলার বাইরে দ্বিধার সঙ্গে হাত নাড়ে, যাতে ঠিক বোঝা যায় না এটি সহকারীটিকে অভয় দানের মুদ্রা নাকি তাকে দূর হয়ে যাবার নির্দেশ। এসব কিন্তু সহকারীকে আরো কাছে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সংকল্পচ্যুত করতে পারে না। তখন ফ্রিডা বাইরের পাল্লা বন্ধ করে দেয় বটে কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে পাল্লার পিছনে, পাল্লার উপর তার হাত রাখা, মাথা পাশে হেলান, চোখ বিস্ফারিত, মুখে স্মিত হাসি স্থির হয়ে আছে। সে কি জানত ওইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে সহকারীটিকে বিকর্ষিত করার পরিবর্তে আকর্ষণই করবে? কিন্তু সে আর পিছনে তাকায় না, তার মনে হয় তার পক্ষে সবচেয়ে ভালো যত দ্রুত সম্ভব গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসা।

১৪

অবশেষে, বিকেলের একেবারে শেষের দিকে, ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, কে বাগানের পথটা সাফ করে ফেলল, দুদিকে বরফ স্তূপ করে উঁচু করে জমিয়ে পরে তা আচ্ছা করে পিটিয়ে সমান করে আনল। এবার তার দিনের কাজ শেষ। এখন সে বিপুল নিঃসঙ্গতার মধ্যে বাগানের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকঘণ্টা আগেই সে অবশিষ্ট সহকারীটিকে তাড়া করে খেদিয়ে দিয়েছিল কিন্তু আবার ফিরে এসে বাগান ও স্কুলবাড়িটার মধ্যে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে, কোথাও আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না, সে-ও আর দেখা দেয়নি।

ফ্রিডা ভিতরের ঘে রহয় কাপড় কাচতে আরম্ভ করেছে কিংবা এখনো গিজার পোষা বিড়ালটিকে ধুচ্ছে এটাকে ফ্রিডার ওপর গিজার বিশ্বাসের নিদর্শন হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে, অবশ্য এই কাজটা যে ফ্রিডার মনঃপুত হয়নি তা বলাই বাহুল্য, কে নিজেও এটা মেনে নিত না যদি নিজেদের অজস্র দোষত্রুটি বিষয়ে সচেতন হয়ে গিজাকে তুষ্ট করার কোনো সুযোগই হাতছাড়া না করতে চাইত। কে যখন চিলেকোঠা থেকে বাচ্চাদের চান করানোর একটা টাব টেনে নামায়, জল গরম করে ও অবশেষে বিড়ালটাকে সাবধানে তার মধ্যে রাখে তখন প্রশংসার চোখে তা দেখে। তারপর সে

বিড়ালটা ফ্রিডার জিম্মায় দিয়ে সরে পড়ে, কারণ ইতিমধ্যে স্কোয়ারজার, প্রথম সন্ধ্যায় যার সঙ্গে কে-র পরিচিত ঘটেছিল, এসে হাজির হয়েছিল। সে কে-কে অভিবাদন করে কিছুটা বিব্রতভাবে (সেই সন্ধ্যার ঘটনাবলীর কারণে) ও কিছুটা স্পষ্ট ঘৃণার সঙ্গে, ঠিক যেভাবে কেউ অধমর্মনকে দেখে। এরপর সে গিজাকে নিয়ে পাশের ঘরে উধাও হয়। সেই থেকে দুজন ঐ ঘরেই রয়েছে।

কে ব্রীজ ইন-এ শুনেছিল স্কোয়ারজার এই গ্রামে কিছুসময় ধরেই রয়েছে, দুর্গাধক্ষর ছেলে হওয়া সত্ত্বেও, শুধু-গিজার প্রেমে মজে গিয়ে। নানা প্রভাব, যোগাযোগ খাটিয়ে অন্তর্বাসী শিক্ষকের কাজটি সে জোগাড় করে, কাজ বলতে অবশ্য গিজার ক্লাশে নিয়মিত হাজির হওয়া, বাচ্চাদের সঙ্গে বেঞ্চে বসা কিংবা অধিকতর আনন্দের সঙ্গে শিক্ষকের মঞ্চে উঠে গিজার পদতলে বসে থাকা। তার উপস্থিতিতে কারো মনোযোগ বিঘ্নিত হতো না, শিশুরা তাকে মেনে নিয়েছিল, অনায়াসেই সম্ভবত, কারণ স্কোয়ারজার বাচ্চাদের পছন্দ বা অপছন্দ কোনোটাই করত না তাদের সঙ্গে কথাও বলত শুধু যখন গিজার নির্দেশে সে তাদের শরীরচর্চা বিষয়ে পড়া ধরত। এটা বাদ দিয়ে শুধু গিজা যে বাতাস নিচ্ছে সেই একই বাতাস গ্রহণ করে ও তার প্রেমিকার গায়ের উত্তাপে ও ঘনিষ্ঠতায় সে বঁদু হয়ে থাকত।

বিশ্ময়ের বিষয় হলো ব্রীজ ইন-এও স্কোয়ারজার বিষয়ে এক ধরনের সমীহের সঙ্গে কথা বলা হয়েছিল, যদিও তার চালচলন দেখে তখন শ্রদ্ধাবোধের চেয়ে হাসিরই উদ্বেক হয়েছিল, আর গিজাও এই সম্ভ্রমপূর্ণ আবহওয়ার অন্তর্গত ছিল। তা হলেও কে-র অবাক লাগল কেমন করে স্কোয়ারজার ভেবে বসল সে কে-র চেয়ে পদমর্যদাদায় উঁচু জায়গায় আছে, নিজের বিষয়ে এই উঁচু ধারণার ভিত্তিই যেখানে নেই। পদমর্যাদার দিক দিয়ে দেখতে গেলে স্কুলের সব কর্মচারীদের কাছেই স্কুলরক্ষকের একটা গুরুত্ব রয়েছে, স্কোয়ারজারের মতো একজন অতি নগণ্য সহকারী শিক্ষকের কাছে তো বিশেষ করে তা থাকা উচিত ছিল।

কে-র কাজটা এমন যে তাকে অতি অবহেলায় অগ্রাহ্য করা যায় না। কেউ যদি তাকে অপছন্দ করতেও চেয়ে থাকে তাহলেও তার পদমর্যাদার কথাটা মনে রেখে সেই মনোভাব গোপন রাখাটাই যুক্তিসংগত হতো। বিষয়টা, কে ঠিক করল, মনে রাখবে, এছাড়া স্কোয়ারজার তার প্রথম রাতের ব্যবহারের জন্যও কে-র কাছে ঋণী হয়ে আছে। সে ঋণ হ্রাস পায়নি এটা সত্ত্বেও যে পরবর্তী দিনগুলোতে যা যা ঘটেছে তা তার সঙ্গে স্কোয়ারজারের প্রাথমিক আচরণের যথার্থ্যকেই প্রমাণিত করেছে। কারণ এটা ভুললে চলবে না যে স্কোয়ারজার তাকে প্রথমে যেভাবে গ্রহণ করেছিল সেটাই পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের গতি প্রকৃতি সম্ভবত স্থির করে দিয়ে থাকবে। কারণ স্কোয়ারজারের জন্যই গ্রামে এসে পা দেবার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই অযৌক্তিকভাবে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কে-র উপর গিয়ে পড়ে।

ঐ সময় গ্রামে কে একেবারেই অপরিচিত, না আছে কোনো চেনা মানুষ না একটা বিকল্প বাসস্থান। অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে সে যখন অসহায় অবস্থায় খড়ের বস্তায় আশ্রয় নিয়েছে সেই সময়টা সরকারি যে কোনো খেয়াল খুশির সে সহজ শিকার। যদি সেই

রাতটা নির্বিঘ্নে কাটত তাহলে হয়ত সবই অন্যরকম হয়ে যেত, ঘটনালোভ মসৃণভাবে চলতে থাকত, তেমনভাবে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করেই। সেক্ষেত্রে কেউই তার বিষয়ে কিছু জানত না, কিংবা তার ওপর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠত না, তাকে অন্তত এক রাতের পথভোলা পথিক হিসেবেও মেনে নিতে কারো বাধতো না, তার খোলামেলা ব্যবহার, বিশ্বাসযোগ্যতা স্বীকৃত ও আলোচিত হতো এই এলাকায়, আর সম্ভবত চাকর টাকর হিসেবে অন্য কোথাও একটা আশ্রয়ও পেয়ে যেত। অবশ্য কর্তৃপক্ষ তাকে খুঁজেবার করতই।

কিন্তু স্কোয়ারজার তার বিষয়ে মাথা না গলালে কর্তৃপক্ষ হয়তো তার বিষয়ে অনুসন্ধান করত, কিন্তু সেটা করত খুবই অনুচ্চভাবে, যেভাবে অন্যান্য সাধারণ তদন্ত করে থাকে, কারণ তারা সম্ভবত যে ব্যাপারটা সবচেয়ে অপছন্দ করে তা হলো অধৈর্য হয়ে তাড়াহুড়ো করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া। তা এসব তো কে-র দোষ নয়, দোষ স্কোয়ারজারের। কিন্তু স্কোয়ারজার দুর্গাধ্যক্ষের ছেলে। সে আচরণও করেছে নীতিনিয়ম মেনেই, তাই সমস্ত ঝগড়াটো তো কে-কে পোহাতে হবেই।

তার সঙ্গে স্কোয়ারজার মন্দ ব্যবহারই বা করেছিল কেন? হয়তো খুবই তুচ্ছ কারণে, হয়তো গিজা তাকে আচ্ছা করে ঠুসে দিয়েছিল সেদিন, সারারাত স্কোয়ারজারের ঘুম হয়নি অন্তর্দাহে আর তারই শোধ তুলেছিল কে-র উর ঝাল ঝেড়ে। অবশ্য কেউ তর্ক করে বলতে পারে স্কোয়ারজারের আচরণের জন্য কে-র কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ছিল। তার জন্যই এমন ঘটনা আবর্তের সৃষ্টি হয় যা কে একক চেষ্টায় কখনোই ঘটিয়ে তুলতে পারত না, তা ঘটবার সাহস পর্যন্ত পেত না।

যেমন ধরা যাক একেবারে গোড়া থেকেই কর্তৃপক্ষের মুখোমুখি তার সীমিত শক্তি নিয়ে সে যে দৈরথ সমরে নেমে পড়তে সমর্থ হয় তা স্কোয়ারজারের জন্যই। তার এই প্রাপ্তিকে খুব মূল্যবান বলা গেলেও এর জন্য তাকে কোনো রকমের মিথ্যাচার বা চাতুর্যের আশ্রয় নিতে হয়নি যদিও একই সঙ্গে এই প্রাপ্তি তাকে কোনো না কোনোভাবে প্রতিরোধহীন, পঙ্গু করে দিয়েছে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার পর। সে এর ফলে হতাশায় ডুবে ডেত শুধু যদি এই কথাটা মনে না রাখত যে কর্তৃপক্ষের ও তার শক্তির মধ্যে যে তারতম্য রয়েছে তার ফারাক এতই বিশাল যে তার সমস্ত চাতুর্য নিয়েও সে এই পার্থক্য কমিয়ে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসতে পারবে না।

অথচ এই যে চিন্তা তা তো তার নিজেরই সান্ত্বনার জন্য, তার কাছে স্কোয়ারজারের ঋণ সেজন্য হ্রাস পেতে পারে না। তখন সে কে-র ক্ষতি করেছে বলে বর্তমানে তার উচিত কে-কে সাহায্য করতে এগিয়ে আসা। খুব তুচ্ছ সাময়িক বিষয়েও তার সাহায্যের প্রয়োজন। বারনাবাস তো আবার তাকে বেকাদায় ফেলল।

ফ্রিডার জন্যই খোঁজখবর নিতে বারনাবাসের বাড়ি য়়াবার ইচ্ছেটা কে-কে সারাদিন ধরে দমন করে রাখতে হয়েছিল। ফ্রিডার সামনেই বারনাবাসের সঙ্গে কথা বলার সম্ভাবনা এড়িয়ে যেতে সে ঘরের বাইরেই কাজকর্মে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। এরপর সব কাজ শেষ হয়ে গেলেও সে কাজ প্রলম্বিত করে যেতে থাকে এই আশায় যে বারনাবাস আসবে, অথচ বারনাবাস এলই না।

এখন একমাত্র সে তার বোনেদের কাছে যেতে পারে, শুধু দু-এক মিনিটের জন্য সে সেখানে থাকবে, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করবে, তারপর দ্রুত ফিরে আসবে। তাই সে বেলচাটা বরফের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুতপদে রওনা দেয়। বারনাবাসের বাড়ি গিয়ে যখন সে পৌঁছল তখন তার বেদম অবস্থা। খুব জোরে ধাক্কা দিয়ে সে দরজা খুলে ফেলে ও ভিতরে কে আছে না দেখেই জিজ্ঞাসা করে, 'বারনাবাস এখনো ফেরেনি?'

একমাত্র তখনই তার নজরে পড়ে ওলগা সেখানে নেই। ঘরের কোণের দিকে বসে আছে দুজন বয়স্ক মানুষ শূন্য দৃষ্টিতে। দরজার কাছে কী ঘটছে তখনো তারা বুঝে উঠতে পারেনি, খুব ধীরে সেদিকে মুখ ফেরাচ্ছে এখন। সে এরপর দেখে অগ্নিকুন্ডের ধারে অ্যামেলিয়া তার দিকে তাকিয়ে। প্রথম সন্ধ্যায় সে নিজে এই দৃষ্টির সামনে পড়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, পরিবারটি বিষয়ে তার মনে যে তীব্র বিরূপতা দ্রুত জন্ম নেয় তার মূলেও বোধ হয় ছিল এই দৃষ্টি, সেটাকে ঠিক ঘূর্ণাপূর্ণ বলা যায় না; অহংকার ও ঋজুভাবের প্রকাশ বলেই ভাবা যেতে পারে।

'তুমি সব সময় বিষণ্ণ হয়ে থাক অ্যামেলিয়া,' বলল কে, 'কোনো কিছু কি তোমার মনের শান্তি নষ্ট করছে? তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না? তোমার মতো গ্রামের মেয়ে আগে কখনো আমার চোখে পড়েনি। তুমি কি এই গ্রামেরই মেয়ে? এখানেই জন্মেছিল?'

অ্যামিলিয়া মাথা নাড়ায় যেন কে শুধুমাত্র শেষ প্রশ্নটাই জিজ্ঞাসা করেছে এমনভাবে ও তারপর বলে, 'তাহলে আপনি ওলগার জন্যই অপেক্ষা করবেন?'

'তুমি আমাকে যে ওই প্রশ্নটা কেন জিজ্ঞাসা করলে বুঝতে পারছি না।' বল কে।

'আমার পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয় কারণ বাড়িতে আমার প্রেমিকা আমার অপেক্ষায় রয়েছে।'

অ্যামেলিয়া কনুইয়ে ভর দিয়ে হঠাৎ ওঠে, সে তার এই প্রেমের কথা জানত না। কে ফ্রিডার নাম বলে। অ্যামেলিয়া এই নাম আগে শোনেনি। সে জিজ্ঞাসা করে ওলগা তার বাগদানের কথা জানে কিনা।

কে-র তো মনে হয় সে জানে, কারণ-সে তাকে ফ্রিডার সঙ্গে দেখেছে, এ ধরনের খবর গ্রামে নিমেষেই রট্টে হয়ে যায়। অ্যামিলিয়া অবশ্য তাকে নিশ্চিত করে ওলগা এমন কোনো খবরই জানে না। আর জানতে পারলে খুব অসুখি হবে, কারণ সে মনে হচ্ছে কে-র প্রেমে পড়ে গেছে। সে অবশ্য খোলাখুলি ভাবে একথা প্রকাশ করেনি, মেয়েটা বড়োই চাপা প্রকৃতির তো, কিন্তু ভালোবাসা যত গোপনেই রাখ না কেন প্রকাশ হয়ে পড়বেই কোনো না কোনোভাবে। কে অবশ্য নিশ্চিত অ্যামেলিয়াকার ধারণা ভুল।

অ্যামেলিয়া আলগাভাবে হাসে, আর হাসিটা বিষণ্ণ হলেও নিমেষের মধ্যে তার অন্ধকার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তার নীরবতাকে বাজায় করে তুলল, বিচ্ছিন্নতা থেকে নিকটে সরে এল, আর এতক্ষণ ধরে সাবধানে গোপন সব রহস্য আলোয় প্রকাশ পেল, এই রহস্য সে হয়ত আবার লুকিয়ে ফেলবে ভবিষ্যতে, কিন্তু পুরোপুরি আর কখনোই পারবে না। অ্যামেলিয়া বলল সে নিশ্চিত যে সে কোনো ভুলই করেনি, এমনকী আরো একটু এগিয়ে গিয়ে সে একথাও বলতে প্রস্তুত আছে যে কে-রও ওলগার ওপর

একধরনের টান রয়েছে। আর তার এখানে আসার কারণ বাহ্যত বারনাবাসের থেকে খবর সংগ্রহ হলেও, আসলে ওলগাই।

আর অ্যামেলিয়া যখন সব জেনেই ফেলেছে তখন তার আর নিজেকে কঠিনভাবে সংযত রাখার কোনো প্রয়োজন নেই, সে তাদের দেখতে ঘন ঘনই আসতে পারে। তার বলার কথা শুধু এটুকুই। কে মাথা নাড়ে ও তাকে তার বাগদানের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু মনে হলো তার এই বাগদানের বিষয়টাকে সে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ। সে জিজ্ঞাসা করল মেয়েটার সঙ্গে তার পরিচয়টা হলো কবে, সে তো গ্রামে এসেছে মাত্র কয়েকদিন আগে।

কে তাকে হেরেনহফ-এ নিশিাপনের বৃত্তান্তটি বলে। সব শুনে অ্যামেলিয়া সংক্ষেপে মন্তব্য করল যে সে গোড়া থেকেই হেরেনহফে আশ্রয় নেবার বিরোধি ছিল।

ওলগার কাছ থেকে সে তার বক্তব্যের সমর্থন চায়। ওলগা এইমাত্র হাত ভর্তি এক পাঁজা কাঠ নিয়ে ঢুকেছে। বাইরের হিমশীতল হাওয়া মেখে আসায় তাকে এখন দেখাচ্ছিল তাজা চকচকে, শক্তপোক্ত, যেন ঘরের একঘেয়ে উদ্দেশ্যহীন দিন যাপনের গ্লানি থেকে কিছুক্ষণের জন্য অব্যাহতি পেয়ে তার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। সে কাঠের বোঝাটি ছুঁড়ে দেয়?

কে-কে সরলভাবে অভ্যর্থনা করে ও সেই সঙ্গে ফ্রিডার কথাও জিজ্ঞাসা করে কে অ্যামেলিয়ার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে তাকে অবশ্য সামান্যতম বিচলিত বলেও মনে হয় না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কে ফ্রিডা বিষয়ে খোলাখুলি ভাবেই আলোচনা করে, যা সে অন্য পরিস্থিতিতে কিছুতেই করতে পারত না। সে বর্ণনা করতে থাকে স্কুলবাড়িতে তাকে কত অসুবিধার মধ্যে সংসার গুছোবার চেষ্টা করতে হচ্ছে, এবং এই বর্ণনার মধ্যেই তাড়াহুড়ো করে-কারণ সে এখনি বাড়ি ফিরতে চাইছিল-সে তাদের বিদায় জানাবার সময় সব ভুল মেরে দিয়ে দু বোনকে তাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসে। সে বিব্রতভাবে তোতলাতে থাকে যখন তাকে কোনো কথাই বলার সুযোগ না দিয়ে অ্যামেলিয়া উৎসাহের সঙ্গে তার বাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ও অ্যামেলিয়ার স্থির দৃষ্টিতে অস্বস্তি বোধ করে তাদের খোলাখুলি জানিয়ে দিতে আর দ্বিধা করে না যে বিশেষ কিছু না ভেবেই আবেগের বেশ সে তাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বসেছে বটে কিন্তু দুঃখের কথা সেটা বাস্তবে অনুবাদ করাটা ঠিক হবে না যেহেতু, তার কাছে এটা দুর্বোধ্যই, ফ্রিডা ও তাদের পরিবারের মধ্যে তীব্র শত্রুতা রয়ে গেছে।

‘শত্রুতা নয়,’ বলে অ্যামেলিয়া, তার বিছানা থেকে উঠে, কম্বলটা পিছনে ছুঁড়ে দিয়ে, ‘ব্যাপারটা ঠিক অতটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু না, আসলে ও চারদিকে যা সব শুনে আসে তাই তোতাপাখির বুলির মতো আওড়ায় মাত্র।’

তাহলে আর কী, আসুন তাহলে, আপনার যুবতী স্ত্রীলোকটির কাছেই ফিরে যান বলুন। দেখতেই পাচ্ছি খুব তাড়ায় রয়েছেন। আপনার ভয় পাবার কারণ নেই যে আমরা সত্যিই গিয়ে হাজির হব, ওটা আমি আসলে আমি মজা করে বলেছিলাম, দুইমি করে। কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের দেখতে ঘন ঘন আসতে পারেন, কোনো কিছুতেই আটকাবে না, আর বারনাবাসের কাছ থেকেও খবর সংগ্রহের ছুতোও আপনি

সবসময় দেখাতে পারবেন। আমি আপনার এ কাজটাও সহজ করে দেব আপনাকে খবর পাঠিয়ে যে বারনাবাস দুর্গ থেকে কোনো বার্তা আনলেও স্কুলবাড়িতে তা পৌঁছে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনাকে খুঁজে বার করা তার সাধ্যের অতিরিক্ত, বেচারী প্রচণ্ড পরিশ্রমে অতিরিক্ত ক্লান্ত, আপনাকে এখানে এসেই খবর সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হবে।’

এর আগে কে কখনো অ্যামেলিয়াকে এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলতে শোনেনি, তার এই কথাগুলো শুনতে লাগল। তার স্বাভাবিক কথন ভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, বাক্যগুলির মধ্যে স্পষ্টতাই যে একধরনের সহজাত মর্যাদাবোধ প্রকাশ পেল তাতে শুধু কে-ই নয়, ওলগাও প্রভাবিত হয়, যদিও বোনের সব ব্যাপারেই সে অভ্যস্ত। হাত ভাঁজ করে একটু পাশের দিকে সরে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে একটু ঝুঁকে, তার চোখ অ্যামেলিয়ার ওপর নিবদ্ধ, যে আবার কে-র দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল।

‘ভুল,’ বলে কে, ‘একটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা যে আমি আসলে বারনাবাসকে খুঁজতে এখানে আসিনি। আমার গভীরতম উদ্দেশ্য তাই ছিল, আমার একমাত্র উদ্দেশ্য যাতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার কাজের ব্যাপারটা সুচারুভাবে সম্পন্ন হতে পারে। এই কাজে আমাকে সাহায্য করতে পারে বারনাবাসই, আমার সমস্ত আশা তারই ওপর নির্ভর করে আছে। আমাকে মেনে নিতে হবে সে এবার আমাকে ভালোমতোই নিরাশ করেছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তার চেয়ে আমার দোষই ছিল বেশি।’

গ্রামে প্রথম এসে আমি এমনই হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম যে আমার বিশ্বাস হয়েছিল সন্ধ্যাবেলায় অল্প একটু ঘোরাঘুরি করলেই সব মিটে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন অসম্ভব ব্যাপারটা অসম্ভব বলেই প্রতিপন্ন হলো তখন তাকেই এর জন্য দোষ দিয়েছিলাম। ঘটনাটা এমনকী তোমাদের পরিবার ও তোমাদের বিষয়েও আমার মতামতকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু এখন ওসব অতীতের কথা, আমার মনে হচ্ছে তোমাদের আমি অনেক ভালোভাবে চিনতে পারছি, তোমরা এমনকী,’ কে যথার্থ শব্দটি খুঁজতে থাকে, শেষে তাকে তাৎক্ষণিক শব্দেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়, ‘আমার যতখানি অভিজ্ঞতা হয়েছে তা থেকে বলতে পারি এই গ্রামে তোমরা সবচেয়ে উঁচুমাপের ভদ্রলোক।’

কিন্তু একটু আগে অ্যামেলিয়া আমাকে আবার আসল বিষয় থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তুমি শুধু তোমার ভাইয়ের কাজটাকেই খাটো করনি, আমার কাছে তার যে গুরুত্ব তাকেও ছোটো করে দেখেছ। সম্ভবত তুমি ওর পেশার বিষয়ে কিছুই জান না, তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না, কিন্তু যদি ওর কাজকর্ম সম্বন্ধে তোমার কোনো জ্ঞান থেকে থাকে-আমার তাই ধারণা হয়েছে-তাহলে এটাকে মন্দই বলতে হবে, কারণ তা ইঙ্গিত করছে তোমার ভাই আমাকে প্রবঞ্চনা করছে।’

‘শান্ত হোন,’ বলে অ্যামেলিয়া, ‘আমি ওর কোনো কিছুই জানি না, কোনো কিছুই উদ্বেগও না, সেজন্য আমি বহুদূর যেতে প্রস্তুত থাকলেও, কারণ একটু আগেই আপনি বললেন আমরা ভদ্রলোক। আমার ভাইয়ের ব্যাপারটা তার একান্ত নিজস্ব। আমি তার কাজকর্ম বিষয়ে কিছুই জানি না, শুধু এদিক ওদিক থেকে ঘটনাক্রমে যে দু-একটা কথা কানে আসে তা অনিচ্ছায় শুনে ফেলি মাত্র।’

বরং ওলগা ওর সম্পর্কে অনেক খবর দিতে পারবে, ও ওর সব গোপন কথা জানে।’

এরপর অ্যামেলিয়া চলে যায়, প্রথমে বাবা-মার কাছে, তাদের কাছে ফিসফিস করে কী সব বলে তারপর যায় রসুইঘরে। সে কে-র থেকে কোনো বিদায় না নিয়েই চলে যায়, যেন সে জানেই কে আরো অনেকক্ষণ থাকবে, তাকে বিদায় জানাবার কোনো প্রয়োজন নেই।

১৫

একই জায়গায় কে অবকা মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে ওলগা হেসে ওঠে। তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে আগুনের ধারে সেটিতে বসিয়ে দিল। তার পাশে সেও সেখানে বসতে পারবে এই সম্ভাবনায় তাকে মনে হলো বেশ খুশি; তার এই আনন্দ কিন্তু একেবারেই অকৃত্রিম, কোনো রকম ঈর্ষার লেশমাত্রও তাতে ছিল না।

আর সে যে কোনো রকম অসুয়াবোধ থেকে একেবারেই মুক্ত ও সে কারণে কে-র উর তার কোনো অধিকার বোধের প্রকাশ নেই-এতে কে মস্ত স্ববিরোধ করল। সে হুটু মনে তার চোখের দিকে তাকায়। সে চোখে কোনো ছলনা নেই, প্রভুত্ব নেই, সেই চোখদুটি লাজুক, সরল, প্রাণখোলা। তার মনে হলো ফ্রিডা ও বাড়িওয়ালীর অজস্র সতর্কবাণী তাকে ওলগা সম্পর্কে ভীত না করে বরং অনেক বেশি পর্যবেক্ষণশক্তি সম্পন্ন করে তুলেছে। সে-ও ওলগার সঙ্গে হাসিতে যোগ দিল যখন ওলগা বিস্ময়ে থ হয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল কেমন করে কে অ্যামেলিয়াকে ভালোমানুষ আখ্যাটা দিতে পারল, অ্যামেলিয়ার যত গুণই থাক না কেন ভালোমানুষী নিশ্চিতভাবে তার মধ্যে পড়ে না। এতে কে উত্তর দেয় যে আসলে সে প্রশংসাটা করতে চেয়েছিল ওলগাকে কিন্তু অ্যামেলিয়া স্বভাবে এমনই প্রভুত্বপরায়ণ যে তার উপস্থিতিতে যা-ই বলা হোক না কেন সে সবই নিজের উপর টেনে নেয় আর লোকেও স্বেচ্ছায় তাকে সমস্ত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু করে তোলে।

‘তা অবশ্য সত্যি,’ বলে ওলগা একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে, ‘আপনি যতটা ভাবছেন তার চেয়েও বেশি সত্যি। অ্যামেলিয়া আমার চাইতে বয়সে ছোটো, বারনাবাসের চেয়েও ছোটো, কিন্তু সংসারের সমস্ত ভালোমন্দে তার কথাই চূড়ান্ত, সে অবশ্য অণ্যদের চেয়ে ভার বহনও করে বেশি, ভালো বা মন্দ যে কোনো বিষয়েই।’

কে-র মনে হলো ওলগার এই কথাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল কারণ একটু আগেই তো অ্যামেলিয়া বলে গেল সে তার ভাইয়ের কোনো ব্যাপারেই মাথা ঘামায় না, সব জানে ওলগা। ‘এখন এটা আমি বোঝাই কীভাবে?’

বলল ওলগা, ‘অ্যামেলিয়া আমাকে বা বারনাবাসকে নিয়ে মাথা ঘামায় না ঠিকই, ও সবসময় ভাবে শুধু বাড়ির বুড়োবুড়িদের নিয়ে, অহরহই ওদের সেবা করে চলেছে, একটু আগেই দেখলেন না ওদের জিজ্ঞাসা করল কী লাগবে আর রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল ওদের জন্য কিছু রাঁধতে। ওদের জন্যই ও নিজের অসুস্থতাকে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করে চলেছে, আজ দুপুর থেকেই ওর শরীরটা খারাপ, একটু আগে পর্যন্ত সেটিতে শুয়ে ছিল।

কিন্তু ও আমাদের নিয়ে মাথা না ঘামালে কি হবে, আমরা দু ভাইবোন ওর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছি, যেন ও-ই আমাদের চেয়ে বড়ো, ও যদি আমাদের কোনো

বিষয়ে উপদেশ দিত আমরা সঙ্গে সঙ্গে তা মেনে নিতাম, কিন্তু সেটা ও কখনো করে না। ও আমাদের থেকে একদম অন্যরকম। আপনার তো মানুষজন সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা, আপনি এক অজানা দেশ থেকে এসেছেন, আপনারও কি মনে হয় না ও অসাধারণ চতুর?’

‘আমার তো মনে হয় বড়োই দুঃখী,’ বলল কে, ‘কিন্তু ওর উপর তোমাদের এত শ্রদ্ধা দেখেই বলছি, অ্যামেলিয়ার এত আপত্তি, বরং বল ভালো ঘৃণা, থাকা সত্ত্বেও বারনাবাস বার্তাবাহকের কাজটা নিল কী করে? ও ইচ্ছে করলে ওই কাজই দিনরাত করে প্রচুর টাকা কামাতে পারত।’ ‘বেশ, তাহলে,’ কে বলে, ‘ও সেটাকেই তো বার্তাবাহকের বিকল্প কাজ হিসাবে নিতে পারত।’

‘বিকল্প কাজ?’ অবাক হয়ে ওলগা প্রশ্ন করে, ‘আপনার কি ধারণা টাকার জন্য ও ঐ কাজ করে?’

‘করতেও তো পারে,’ কে বলল, ‘কিন্তু তুমি বললে না ওই কাজে ও খুব অখুশি?’

‘ও অসুখি, কিন্তু তার নানা কারণ রয়েছে।’ বলল ওলগা। ‘কিন্তু কাজটা তো দুর্গের,’ ‘তা সে যে কোনো কাজই হোক না কেন।’

‘সেকি,’ কে বলল, ‘তাতেও তোমার সন্দেহ আছে নাকি?’ ‘ঠিক তা নয়,’ বলল ওলগা, ‘বারনাবাস দগুরে যায় ঠিকই, আর ওখানকার কর্মচারীরাও ওকে নিজেদের একজন বলে মেনে নিয়েছে, নানা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও ও দেখতে পায়, দূর থেকেই অবশ্য, ওকে মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ খবরও বিশ্বাস করে দেওয়া হয়, কখনো শুধু মৌখিক বার্তাও, এই তো যথেষ্ট, ওর মতো একজন তরুণ এত অল্প বয়সের মধ্যেই যে এত কিছু করতে পারছে তাতেই তো আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত।’ কে মাথা নাড়ায়। সে এখন আর বাড়ি ফিরে যাবার কথা ভাবছিল না। ‘তাহলে ওর নিজস্ব একটা উর্দিও আছে নিশ্চয়?’ সে জিজ্ঞাসা করে।

‘ওর জ্যাকেটটার কথা বলছেন?’ বলল ওলগা, ‘না, ও বার্তাবাহক হবার অনেক আগেই অ্যামেলিয়া ওকে ওটা তৈরি করে দিয়েছিল, কিন্তু আপনি এইমাত্র একটা ক্ষতস্থানে হাত দিলেন। অনেক আগেই কিন্তু ওর পাওয়া উচিত ছিল-উর্দি নয় অবশ্য, অমন কিছু দুর্গে নেই খুব বেশি-দগুরে থেকে একটা স্যুট, ওকে তা দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে দগুরের আঠারো মাসে বছর আর সবচেয়ে খারাপ হলো এই বিলম্বের কারণটা কেউ জানতেই পারে না। এর অর্থ হতে পারে তার বিষয়টা বিবেচনাধীন আছে, কিন্তু আবার এ-ও হতে পারে বিষয়টা এখনো গৃহীতই হয়নি, বা ধারণা, বারনাবাস এখনো শিক্ষানবিশির পর্যায়ে রয়েছে, আর বহুদিন কেটে যাবার পর এর অর্থ দাঁড়াতে পারে পুরো বিষয়টারই ফয়সলা হয়ে গেছে, কোনো না কোনো কারণে তাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে বারনাবাস আর কখনোই আর প্রতিশ্রুতি স্যুট পাবে না। ওখানে যে ঠিক কী ঘটে তা বোঝার সাধ্য কারো নেই, কিংবা বোঝা গেলেও বহু পরে। আমাদের এখানে একটা প্রচলিত কথা আছে, আপনিও হয়ত শুনে থাকবেন-সরকারি সিদ্ধান্ত হচ্ছে বালিকাদের মতোই লাজুক।’

‘খুব ভালো পর্যবেক্ষণ,’ বলে কে, সে এখন ওলগার চেয়েও বেশি গম্ভীর, ‘বেশ ভালো পর্যবেক্ষণ, তবে বালিকাদের সঙ্গে তুলনা বিষয়ে সিদ্ধান্তের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।’

‘হতে পারে,’ ওলগা বলল, ‘কিন্তু ঐ সরকারি স্যুটের ব্যাপারেই বারনাবাসের একটা গভীর দুঃখ রয়ে গেছে, আর আমরা যেহেতু পরস্পরের কষ্ট ভাগ করে নিই, আমারও দুঃখ কম নয়। আমরা বৃথাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি কেন ও সরকারি উর্দিটা পাচ্ছে না। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা বোঝা সহজ না। আমরা নিজেরাও কিন্তু কোনো সরকারি উর্দি পান না, বারনাবাস আমাদের যতটা বলেছে তা অনুযায়ী আমরা সাধারণ পোষাক পরেই কাজে আসেন, দামী পোষাকেই অবশ্য। আপনি নিজের চোখেই তো ক্ল্যামকে দেখেছেন। আর বারনাবাস তো আমলা নয়ই নিচের তলারও কেউ না, আর কিছু হবার খোঁয়াব দেখে সে কখনো তার অধিকারের মাত্রাও কখনো ছাড়ায়নি।

কিন্তু বারনাবাসের কথা অনুযায়ী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও, যাদের কেউ কখনো এই গ্রামে কেউ দেখেনি, কোনো সরকারি পোষাক নেই। এতে এক ধরনের সান্ত্বনা অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু সেটাও তেমন জোরালো নয়, বারনাবাস কি উচ্চপদস্থ কোনো অফিসার? ও তো তা নয়, ওর উপর পক্ষপাত করেও সেকথা বলা যেতে পারে না, ও যে গ্রামে আসে আর এখানে থাকে এতেই তো তার উল্টোটা প্রমাণিত হয়। উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সাধারণ আমলাদের থেকে অনেক বেশি সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকেন। সম্ভবত সেটাই হওয়া উচিত, তাঁদেরও উপর নানা আধিকারিক রয়েছেন, তার প্রমাণও রয়েছে, তাঁরা কাজও করেন অনেক কম, আর বারনাবাস বলেছে এইসব দীর্ঘদেহ বিশিষ্ট উচ্চ আধিকারিকরা যখন গম্ভীরভাবে করিডোর দিয়ে হেঁটে যান তখন তা নাকি একটা দেখবার জিনিস। গুঁদের বিষয়ে বারনাবাসের বিপুল শ্রদ্ধা। সে যাই হোক, ও খুবই নিচু পর্যায়ের কর্মীদের একজন হতে পারে।

কিন্তু তাদেরও তো সরকারি পোষাক দেওয়া হয়েছে, অন্তত গ্রামে তারা তা পরেই তো আসে, সেগুলোকে অবশ্য উর্দি ঠিক বলা যায় না। ওগুলো দেখতেও নানা রকমের কিন্তু তা হলেও কর্মচারীদের পোষাক দেখেই চিনে নেওয়া যায়। আপনি নিজেই হেরেনহফ ওদের কয়েকজনকে দেখে থাকবেন। ওই পোষাকগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওগুলো খুব আঁটোসাটো ধরনের, কোনো চাষি বা মজুর অমন পোষাক পরে জুত করতে পারবে না। তা, বারনাবাসকে অমন কোনো স্যুট দেওয়া হয়নি আর সেটা যে শুধু লজ্জা বা অপমানের বিষয় তা নয়-তাও সহ্য করা যায় তার চেয়েও বড়ো ব্যাপার হলো আমাদের মন যখন খারাপ থাকে যেটা প্রায় হয়-তখন আমার আর বারনাবাসের মনে সব বিষয়েই সন্দেহ জাগতে থাকে।’

বারনাবাস কি আদপেই দুর্গের কাজে নিযুক্ত, আমরা তখন নিজেদের প্রশ্ন করি- এটা ঠিকই যে ও দগুরে যায় কিন্তু দগুরটা কি আদপে দুর্গেল অংশ? আর যদি দুর্গের মধ্যে দগুর থেকেও থাকে তাহলেও বারনাবাস যে দগুরে ঢুকতে পায় সেটা কি তাই?

বিশেষ কয়েকটা ঘরেই ও ঢুকতে পায় কিন্তু সেগুলো মূলের অংশ মাত্র, কারণ ওই ঘরগুলোর আয়তনের পিছনে আরো ঘর রয়েছে। এই সীমারেখা পার হবার বিষয়ে তার

যে কোনো নিষেধ রয়েছে ঠিক তা নয়, কিন্তু তার দপ্তরের প্রধানদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বিদায় করা হয়। অন্য কোনো ঘরে যাবার সুযোগ আর সে পায় না। এছাড়া প্রত্যেককেই সেখানে কড়া নজরে রাখা হয়, অন্তত আমাদের তো তাই ধারণা।

আর ও যদি আরো ভিতরে ঢুকতেও পায় তাতেই বা ওর কী উপকারটা হবে সেখানে যদি ওর কোনো সরকারি কর্তব্যই না থাকে, শুধুমাত্র অনধিকার প্রবেশ ছাড়া তো আর কিছু নয়? তাই বলে আবার ভেবে বসবেন না বাধা বলতে কোনো নির্দিষ্ট বিভাজন বোঝাচ্ছে। এ কথাটা বারনাবাস আমাকে জোর দিয়েই বলেছে। যে ঘরে ওকে ঢুকতে দেওয়া হয় তার প্রবেশদ্বারেও বাধা রয়েছে। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে কোনো কোনো বাধা অতিক্রম করাটা তার সাধের মধ্যেই রয়েছে আর এই বাধাগুলো যে বাধা সে অতিক্রম করেনি তাদেরই মতো, যা থেকেই দেখা যাবে তা বারনাবাসের দেখা অন্যান্য দপ্তর থেকে অন্য প্রকৃতির। আমাদের মন যখন খারাপ থাকে তখনই আমরা এসব নিয়ে ভাবি।

আমাদের সন্দেহ শুধু সেখানেই থেমে থাকে না, তাকে আমরা কোনো গণ্ডীর মধ্যে আটকে রাখতে পারি না। বারনাবাস আমলাদের দেখতে পায়, বারনাবাসকে নানা বার্তাও দেওয়া হয়। কিন্তু ওই আমলারা আসলে কারা আর বার্তাগুলোই বা কী?

এই সময়টা, সে এ রকমই বলেছে, তাকে ক্ল্যামের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে, উনি ব্যক্তিগতভাবেই ওকে নির্দেশ দেন। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে বলতেই হবে ওর উপর খুবই অনুগ্রহ দেখানো হয়েছে, উঁচু পর্যায়ের কর্মচারীদের পর্যন্ত এতটা সৌভাগ্য হয় না, ব্যাপারটা বিশ্বাস করাই কঠিন, প্রায় বুক হিম করে দেবার মতো। একবার শুধু ভাবুন, ক্ল্যামের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক, ওঁর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলার সুযোগ, কিন্তু ঘটনাটা কি সত্যিই তাই? তাই যদি হবে তবে বারনাবাস কেন সন্দেহ করে যাকে ক্ল্যাম বলা হচ্ছে আসলে সে ক্ল্যাম কিনা।

‘ওলগা,’ বলে কে, ‘তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ। ক্ল্যামের চেহারা বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়, সবাই তো জানে ওঁকে দেখতে কেমন, আমি নিজেই তো ওঁকে নিজের চোখে দেখেছি।’

‘মোটাই না, কে,’ ওলগা বলল, ‘আমি একদম ঠাট্টা করছি না, এ বিষয়ে আমি অত্যন্ত সিরিয়াস। আমি যে আপনাকে এত কথা বলছি তার কারণ এই না যে নিজের মনের বোঝা লাঘব করতে আপনার উপর ভার চাপিয়ে দিতে চাইছি। আসলে অ্যামেলিয়া চায় আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলি যেহেতু আপনি বারনাবাস সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন আর আমারও মত এই যে আপনি যত বেশি জানতে পারবেন আপনার সুবিধাও তত বেশিই হবে। এছাড়া আমি এসব বলছি বারনাবাসের খাতিরেও যাতে আপনি ওর উপর অতিরিক্ত নির্ভর করে বসে না থাকেন আর আশাহত না হন আর ওর প্রাণ ওষ্ঠাগত করে না তোলেন। ও খুবই স্পর্শকাতর প্রকৃতির মানুষ, যেমন ধরুন গত সন্ধ্যায় আপনি ওর ওপর অসন্তুষ্ট হওয়ায় ও কাল সারারাত ঘুমতে পারেনি।

আপনি নাকি ওকে বলেছেন আপনার কপাল খারাপ ওর মতো অপদার্থ একটা বার্তাবাহক আপনার কপালে জুটেছে আর তাতে ও মনে বড়ো আঘাত পেয়েছে। ওই

শব্দগুলো ওকে সারারাত জাগিয়ে রাখে। ও যে কতটা বিচলিত ছিল তা সম্ভবত আপনি লক্ষ্য করেননি। দুর্গের বার্তাবাহকদের সম্পূর্ণ অত্ননিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকাটা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ওর সময়টা ভালো যায়নি, আপনার সঙ্গেও না, অবশ্য আপনার দিক থেকে দেখতে গেলে আপনি যে ওর থেকে অত্যধিক কিছু আশা করেছেন এমন নয়, কারণ বার্তাবাহকদের ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার চিরাচরিত কোনো ধারণা ছিলই আর সেই অনুযায়ীই আপনি ওর কাছ থেকে কিছু দাবি করে থাকবেন। কিন্তু দুর্গে বার্তাবাহকদের কর্তব্য বিষয়ে ধারণা অন্যরকম, যার সঙ্গে আপনার ধারণা মিলবে না, বারনাবাস যদি সেই কর্তব্যপালনে আশ্রয় চেষ্টা করে থাকে, তাহলেও।

এ সব কিছুই মেনে নিতে হবে, কোনো আপত্তি এখানে টিকবে না। শুধু প্রশ্ন করা যেতে পারে বারনাবাস আদপেই কোনো বার্তাবাহক কিনা। বলা বাহুল্য আপনার কাছে সে এই সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে না, তাতে তো তার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে, আইনের চোখেও সে মস্ত একজন অপরাধী বলে চিহ্নিত হবে। আমার কাছেও সে এসব কথা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেনি, তাকে নানাভাবে ভুলিয়ে চুমু খেয়ে তার এই সন্দেহের কথা তার পেট থেকে আমার বার করতে হয়েছে, কিন্তু তবু সে স্বীকার করতে অস্বীকার করেছে যে তার সন্দেহটা আসলে সন্দেহই। ওর মধ্যে কিছুটা অ্যামেলিয়ার ধাত রয়ে গেছে। আমি নিশ্চিত সব কথা ও আমায় বলে না, যদিও আমিই একমাত্র ওর বিশ্বাসী সঙ্গী।

কিন্তু ও প্রায়ই ক্ল্যামের কথা বলে, আমি তাকে অবশ্য দেখিনি। আপনি তো জানেন ফ্রিডা আমাকে পছন্দ করে না। ওঁকে দেখার সুযোগও উনি কখনো আমাকে দেননি। কিন্তু গ্রামের সকলে জানে ওঁকে দেখতে কেমন, কয়েকজন তো ওঁকে চাক্ষুষ দেখেছে, সকলেই ওঁর কথা জানে। আর এই সমস্ত দেখা, শোনা গুজব, এলোমেলো জনশ্রুতি থেকে ক্ল্যামের একটা মূর্তি খাড়া করা হয়েছে যেটা হয়ত কাঠামোর দিক থেকে সঠিকই।

খুঁটিনাটির দিক থেকে সামান্য এদিক ওদিক হতে পারে, কিন্তু ওঁর আসল চোহরা বিষয়ে বোধ হয় ততটা নয়। কারণ শোনা গেছে উনি গ্রামে আসেন এক চেহারা নিয়ে আর ফিরে যান যখন তখন ওঁকে অন্যরকম দেখায়। বিয়ার পান করার আগে ওঁকে দেখতে একরকম আর পরে অন্যরকম। উনি যখন জেগে ওঠেন তখন ওঁর ঘুমন্ত চেহারার সঙ্গে কোনো মিলই থাকে না, যখন উনি একা থাকেন তখন ওঁকে দেখতে একরকম, আর লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় অন্যরকম, আর-এটাই সবচেয়ে দুর্বোধ্য-উদি দুর্গে পৌঁছেই সম্পূর্ণ অন্যমানুষ হয়ে যান। এমনকী গাঁয়ের মধ্যে ওর বিষয়ে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায় তাও এক ধরনের না। ওঁর উচ্চতা, চাল-চলন, আকৃতি, ওঁর দাড়ির আকার বিষয়ে নানা ধরনের মতপার্থক্য রয়েছে। ভাগ্যক্রমে ওঁর একটা বিষয়ে সকলেই একমত, উনি সবসময় একই পোশাক পরে থাকেন কালো রঙের এক প্রভাতি কোট, পিছনের বুলটা লম্বা।

এখন একটা মানুষের আকার সম্পর্কে যে এত মতভেদ তার মধ্যে কোনো ভোজবাজী নেই, খুব সহজেই এটা ব্যাখ্যা করা যায়। এর কারণ যে তাকে পর্যবেক্ষণ

করছে তার মানসিক অবস্থা, তার উত্তেজনার ক্রম, তার অন্তহীন আশা কিংবা হতাশার দোলাচল যখন সে তাকে দেখছে, আর লোকে তো তাঁকে দেখতে পায় দু-এক মুহূর্তের জন্য মাত্র। বারনাবাস আমাদের যা যা বলেছে তার উপর নির্ভর করেই আমি আপনাকে এত কথা বললাম, অন্য কারো কাছে, যার ব্যক্তিগত কোনো কৌতুহল নেই, এই ব্যাখ্যাই যথেষ্ট। আমাদের কাছে অবশ্য নয়; সে যার সঙ্গে কথা বলেছে সে সত্যিই ক্ল্যাম কিনা এটা জানা বারনাবাসের কাছে একটা জীবনমরণের বিষয়।

‘আমার কাছেও কম নয়,’ বলল কে, এবং তারা সেটিতে পরস্পরের আরো কাছে এগিয়ে যায়।

ওলগার কাছ থেকে এরপর হতাশ হবার মতো খবরাখবর পেয়ে কে বেশ কিছুটা দমে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু সে প্রচুর সান্ত্বনাও পায় এই ভেবে যে বেশ কিছু অভাগা অন্তত তারই মতো হতাশাজনক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে আর সে তাদের হাতে হাত মেলাতেও পারবে বহু কিছুতে সমব্যাপি হিসাবে। ফ্রিডার ক্ষেত্রে তো মাত্র দু-একটি বিষয়ে তাদের মিল রয়েছে। বারনাবাসকে দিয়ে তার আশাপূরণ হবে এই বিশ্বাস সে উত্তরোত্তর যত ত্যাগ করছিল ততই সে এখানে তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল।

এই গ্রামের মধ্যেই এমন একটি হতাশাময় লড়াই চলছে এবং বারনাবাস ও তার বোন তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে এটা বিশ্বাস করাও কে-র কাছে অসম্ভব ছিল। অবশ্য এটা এখনো যথেষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়নি। হয়ত দেখা যাবে ঠিক উল্টোটাই ঘটেছে, ওলগার প্রশ্নাতীত সারল্যে মুগ্ধ হয়ে বারনাবাসকে ঋজু স্বভাবের ধরে নেওয়াটা হয়ত সঠিক হবে না। ‘ক্ল্যামের চেহারা সম্পর্কে এই সমস্ত বর্ণনা বিষয়ে বারনাবাস অবহিত আছে,’ বলে চলল ওলগা ‘তাঁর বিষয়ে বহু বিবরণ সে সংগ্রহ করেছে, তাদের তুলনা করে দেখেছে, অসংখ্য বিবরণ, বাড়াবাড়ি রকম বেশিই সম্ভবত, একবার গ্রামেই গাড়ির জানলায় ওঁকে স্বয়ং দেখতে পেয়েছিল, অন্তত তার ধারণা তাই। সুতরাং তাঁকে আবার দেখলে যাতে সে তাকে আবার চিনে নিতে পারে এজন্য সে নিজে, বুঝতেই পারছেন, নানাভাবে প্রস্তুত করেছিল, অথচ-কীভাবে এটা ব্যাখ্যা করবেন-যখন সে দুর্গের দপ্তরে গিয়ে ঢুকল ও বহু আমলার মধ্যে একজনকে তার কাছে ক্ল্যাম বলে উল্লেখ করা হলো, সে তাঁকে চিনতেই পারল না। আবার এর পরেও বহুকালের মধ্যে কিছুতেই সে নিজেকে এই ধারণায় অভ্যস্ত করে তুলতে পারল না উনিই আসলে ক্ল্যাম।

কিন্তু আপনি যদি বারনাবাসকে প্রশ্ন করেন সে দুর্গে গিয়ে যে ক্ল্যামকে দেখে আর তাঁর সম্পর্কে যে বর্ণনা সে শুনেছে তার মধ্যে পার্থক্য কী, ও বলতেই পারবে না। কিংবা যা সে বলার চেষ্টা করবে ও বর্ণনা দেবে দুর্গের সেই ক্ল্যাম নামধারী আমলার সঙ্গে আমাদের শোনা ক্ল্যামের চেহারার কত মিল। তাই যদি হয়, বারনাবাস, আমি ওকে বলি, তুমি তাকে সন্দেহ করছ কেন, নিজেকে এত কষ্ট দাও কেন? এর উত্তরে সে বেদনার সঙ্গে দুর্গের আমলাটির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে বসে, যেন সশব্দে চিন্তা করছে এমনভাবে, আর ঐ বৈশিষ্ট্যগুলো এতই তুচ্ছ, বিশেষ কোনোভাবে তার মাথা নাড়ানো, নমুনা স্বরূপ, কিংবা বোতাম না লাগানো ওয়েস্টকোট, এমনই আর কী, - এগুলো এতই তুচ্ছ যে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়াই কঠিন। আমার কাছে তো আরো অনেক জরুরি বলে মনে হয় যেভাবে ক্ল্যাম বারনাবাসকে গ্রহণ করেন সে ব্যাপারটা।

বারনাবাস অনেকবার আমার কাছে বর্ণনা করেছে, এমনকী ছবি ঐকে দেখিয়েছেন, সেটা ঘরটা। সাধারণত তাকে যে ঘরটায় ঢুকতে হয় সেটা বেশ বড়, কিন্তু সেটা ক্ল্যামের দপ্তর নয়, বিশেষ কোনো আমলারও নয়। এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়াল পর্যন্ত খুব লম্বা একটা পড়ার টেবিল দিয়ে ঘরটাকে দু-ভাগ করা হয়েছে। ঘরটার এক দিকে জায়গা এত কম যে দুজন মানুষও পরস্পরকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না, সেদিকটা আমলাদের জন্য নির্দিষ্ট। অন্য দিকটা খোলামেলা, সেদিকেই যত মানুষজন-দর্শক, কর্মীর দল, বার্তাবাহকদের ভিড়। ডেস্কের উপর মোটা মোটা বই খোলা পড়ে থাকে, পাশাপাশি রাখা আর আমলারা খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের বেশির ভাগই পড়ায় ব্যস্ত। তাঁরা যে সবসময় একই বই পড়েন তা কিন্তু না, কিন্তু তাঁরা বই না সরিয়ে নিজেদের সরান, আর সবসময়ই বারনাবাসের অবাধ লাগে কেমন করে ওঁরা স্থান বদলের সময় ওইটুকু সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে নিজেদের চ্যাপ্টা করে ফেলে পরস্পরকে অতিক্রম করে যেতে পারেন। ঐ ডেস্কটার সামনে ছোটো ছোটো টেবিল রাখা আছে যেখানে কেরানিরা বসে থাকে ডিকটেশন দেন ঠিক তা নয়, আর খুব জোরেও বলেন না, প্রায় ধরাই যায় না তাঁরা আদপেই কিছু বলছেন।

কিন্তু তাঁরা আসলে অনর্গল পড়েই যান, পড়েনও ফিসফিস করে। কিন্তু কেরানিরা সেই ফিসফিসানি শুনে নেয় ঠিকই। প্রায়ই এই ডিকটেশন এত মৃদু হয়ে পড়ে যে কেরানিরা আর আসনে বসে শুনে পায় না তখন তারা লাফিয়ে উঠে। এমনই চলতে থাকে। বুদ্ধির অগম্য। এ সমস্ত খুঁটিয়ে লক্ষ্য করার মতো যথেষ্ট সময় অবশ্য বারনাবাসের থাকে। ওই বড়ো ঘরটায় ওকে ঘন্টার পর ঘন্টা, এমনকী দিনের পর দিন একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, যতক্ষণ না ওর সঙ্গে দেখা করার সময় ক্ল্যামের হচ্ছে। আর ক্ল্যাম যদি ওকে দেখতেও পান আর ও যদি বুক চিত্তিয়ে সামনে এসেও দাঁড়িয়ে তাহলেও কিন্তু কোনো কিছু বোঝায় না কারণ তখনই হয়ত উনি ওর থেকে সরে গিয়ে বইয়ে ডুবে যাবেন ওর কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে। এমন প্রায়ই হয়। ওরা যদি এতই তুচ্ছ তাহলে আর বার্তাবাহকের প্রয়োজনটা কী?

খুব ভোরে যখন বারনাবাস আমাকে জানায় যে সে দুর্গে চলল তখন আমার দমচাপা একটা কষ্ট হয়, খুব সম্ভব তার যাত্রাটাই অর্থহীন, একটা দিন নষ্ট, সম্পূর্ণ অকারণ প্রত্যাশা। এসবের মধ্যে ভালো দিকটা কী আছে? এদিকে দেখুন জুতোর অর্ডারের পাহাড় জমে যাচ্ছে, ও ঠিকমত কাজ করে উঠতে পারছে না। ক্রনসউইক সবসময় তাগাদা দিচ্ছে।

‘তা হোক,’ কে বলল, ‘যতক্ষণ না কাজ পাচ্ছে বারনাবাসকে একটু ধৈর্য ধরে থাকতেই হবে। আসল ঘটনা তো বোঝাই যাচ্ছে। কর্মচারীর সংখ্যা ওখানে অতিরিক্ত বেড়ে গেছে আর প্রত্যেককেই তো আর রোজ কাজ দেওয়া যেতে পারে না। এ নিয়ে তোমার অনুযোগ করাটা ঠিক নয়। ধৈর্য ধরে থাকলে এমনকী বারনাবাসও কাজ পাবে বৈকি। ইতিমধ্যেই তো সে আমার কাছে দুটো চিঠি এনেছে।’

‘এটা হয়ত ঠিকই,’ বলে ওলগা, ‘যে আমাদের অনুযোগ করাটা ঠিক হচ্ছে না, বিশেষ করে আমার মতো সামান্য এক মেয়ের, আমার জ্ঞানের ভিত্তি তো কিছু লোকের

এলোমেলো কিন্তু কথা মাত্র, আর বারনাবাসের মতো ভালোভাবেও সব জানা নেই, সেও নিশ্চয়ই বহু কথাই আমার কাছে গোপন রাখে।

কিন্তু বলি শুনুন চিঠি কিভাবে বন্টন করা হয়, যেমন আপনার চিঠির কথাই ধরুন। বারনাবাস চিঠিগুলো ক্ল্যামের কাছ থেকে সরাসরি পায় না, পায় এক কেরানির কাছ থেকে, বিশেষ কোনো দিনে নয়। বিশেষ কোনো ঘটনাতেও নয়-এ কারণেই কাজটা যত সোজাই মনে হোক না কেন-এত ক্লান্তিকর। বারনাবাসকে সবসময় এর জন্য সতর্ক থাকতে হয়, হঠাৎ কেরানির মনে পড়ে যায় তার কথা ও তাকে তখন ইঙ্গিত করে। ক্ল্যামের কাছ থেকে কোনো তাৎক্ষণিক নির্দেশ পেয়ে নয়, কারণ ক্ল্যাম তো শুধু বইয়ের মধ্যেই ডুবে থাকেন। এটা ঠিক বারনাবাস ঘরে ঢোকার সময় মাঝে মধ্যে ক্ল্যাম চশমা খুলে মোছেন, এটা তাঁর অভ্যাস, তখন হয়ত বারনাবাসের উপর তাঁর চোখ পড়ে যায়, অবশ্য যদি ধরে নেওয়া যত চশমা ছাড়াই তিনি দেখতে পান, বারনাবাসের এ বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে, কারণ ক্ল্যামের চোখ প্রায় বোজাই থাকে, মনে হয় যেন ঘুমের মধ্যে কোনো স্বপ্নের ঘোরে তিনি চশমা মুছে চলেছেন।

এই সময় তাঁর টেবিলের তলা থেকে স্তূপীকৃত কাগজপত্র বার করে এনে বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর হয়ত কেরানিটি হঠাৎ একটা চিঠি বার করে এনে আপনার হাতে ধরিয়ে দিল, খাম দেখে মনে হয় না চিঠিটা সাম্প্রতিক কালের মধ্যে লেখা, সাধারণত চিঠিগুলো খুব পুরনোই হয়, বহুকাল ধরে ওখানে পড়ে থাকে তো! কিন্তু তাই যদি হবে তাহলে বারনাবাসকে ওরা অত অপেক্ষা করিয়ে রাখে কেন? আর আপনাকেও? আর চিঠিগুলোকেও, অবশ্যই, কারণ ওগুলো তো বাতিলের পর্যায়ে চলে গেছে! এসব কারণেই, শুধু ওদের জন্যই বারনাবাসকে অপদার্থ, অলস বার্তাবাহক হিসাবে বদনামের ভাগী হতে হয়েছে। কেরানির আর কী। সে শুধু একটা চিঠি বার করে এনে বারনাবাসের হাতে গছিয়ে দিয়ে বলে।

‘ক্ল্যামের থেকে কে-র প্রতি,’ আর তখনি ওকে বিদায় করে দেয়। কিন্তু বারনাবাস বাড়িতে ফেরে বেদম হয়ে তার বহুকষ্টের অর্জিত চিঠিটা বুকে চেপে। তারপর আমরা ঠিক এভাবে সেটির ওপর এসে বসি।’

সে আমাদের সবকিছু বিস্তারিত ভাবে জানায়, আমরা সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বুঝতে পারি তার সাফল্য খুবই তাৎপর্যহীন। এরপর চিঠিটা বিলি করা বিষয়ে নিরুৎসাহিত হয়ে বারনাবাস সেটা ফেলে রাখে কিন্তু ঘুমতে যায় না, রাত জেগে টুলে বসে জুতোর কাজ করে। এই হলো আসল কথা কে, আমার সব গোপন কথা আপনাকে জানালাম, এখন আর নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন না, কেন বারনাবাসের কাজের ব্যাপারে অ্যামেলিয়া এত নির্লিপ্ত?’

‘তাহলে চিঠিটার কী হয়?’ জিজ্ঞাসা করে কে, ‘চিঠিটা?’

ওলগা বলে, ‘একনাগাড়ে আমি তাগাদা দেবার পর, ধরুন বহুদিন, বা সপ্তাহ খানেক পরে, ও চিঠিটা আবার তুলে নেয় ও বিলি করতে বেরোয়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে ও আমার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। কারণ অল্প সময়ের মধ্যেই ও আমায় যা কিছু বলেছে তার প্রতিক্রিয়া থেকে আমি নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারি। কিন্তু ও পারে না,

বোধ হয় আমার চেয়ে বেশি জানে বলেই। তাই আমি ওকে কিছু না কিছু বলার বিষয় ঠিকই পেয়ে যাই, যেমন ধরুন, 'তোমার লক্ষ্যটা কী বারনাবাস?'

কী ধরনের পদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন দেখছ তুমি? তুমি কি এত উঁচুতে উঠতে চাও নাকি যে আমাদের, আমাদের একেবারে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? যা কিছু তুমি করেছে সে বিষয়ে তোমার যে এত ক্ষোভ, অসন্তোষ তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হিসাবে এমনটা না ভেবে উপায় কি বল? একবার তোমার চারপাশে তাকিয়ে দেখ দেখি আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে কেউ তোমার মতো এতদূর এগিয়েছে কিনা। আমি স্বীকার করি আমাদের চেয়ে ওদের পরিস্থিতি আলাদা, নিজের কাজের বাইরে অন্য কোনো উচ্চাশা পোষণ করার সুযোগই তাদের নেই।

কিন্তু কোনোরকম তুলনার মধ্যে না গিয়েই বলা যায় তুমি বেশ ভালোই আছ। বাধাবিঘ্ন হয়ত রয়েছে, রয়েছে সন্দেহ, হতাশাও, কিন্তু এগুলো তো উদ্দেশ্য সাধনের পথে অবশ্যসম্ভাবী কতগুলো প্রতিক্রিয়া মাত্র। ওসব যে আসবে তা আমাদের আগেই জানা ছিল, কিছু না দিয়ে জীবনে তুমি কিছু পেতে পার না, তুচ্ছতম কিছু পাবার জন্যও তোমাকে কঠিন লড়াই লড়তে হবে, এসবের জন্য তোমার ভেঙে পড়ার পরিবর্তে গর্বিত বোধ করাই তো উচিত ছিল। আমাদের সকলের জন্যও কি তুমি লড়ছ না? তোমার কাছে কি এরও কোনো মূল্য নেই? এই বোধ তোমাকে নতুন করে শক্তি দেয় না? আর এই যে আমি সুখি, তোমার মতো ভাই পেয়ে গর্বিত, এতে তোমার আত্মবিশ্বাস জাগে না?

দুর্গে গিয়ে তুমি কতটা কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছ বা পারনি তা নিয়ে আমি কোনো হতাশা বোধ করি না, আমার হতাশার কারণ তোমার সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও আমার তুচ্ছ প্রাপ্তি। দুর্গতে তুমি ঢুকতে পাও, দপ্তরে তুমি নিয়মিত যাও, ক্ল্যামের সঙ্গে একই ঘরে সারাদিন কাটাতে পার, সরকারিভাবে স্বীকৃত একজন বার্তাবাহক তুমি, সরকারি পোশাকের তোমার অধিকার রয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ কাজ তোমাকে বিশ্বাস করে দেওয়া হয়—তুমি এ সমস্ত কৃতিত্বের অধিকারী, এসবে কোথায় অভিভূত হয়ে বাড়ি এসে আমাদের জাড়িয়ে আনন্দে অশ্রুপাত করবে, তা না আমাদের দেখলেই হতাশায় ভেঙে পড়, সব কিছুতেই সন্দেহ করতে থাক। জুতো বানানো ছাড়া আর সব কাজেই তোমার অনগ্রহ, আর আমাদের ভবিষ্যতের একমাত্র আশা চিঠি পর্যন্ত ফেলে রাখ ঘরের কোণে, এ ভাবেই তখন আমি ওকে বলি। বহুবার একই কথা বলার পর শেষ পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিঠিটা তুলে নিয়ে ও বেরিয়ে যায়।

কিন্তু ও বোধ হয় শুধু আমার তাড়াতেই বেরোয় না, ওকে ঘর থেকে বার করে আবার দুর্গে যাবার ইচ্ছে, কিন্তু বার্তাটা বিলি না করে সেখানে যাবার সাহস সে করে কি করে?' 'তুমি যা বললে তা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক।'

বলল কে, 'তুমি যেভাবে ব্যাপারটা ধরেছ তা সত্যি অবাক করার মতো। অসম্ভব পরিষ্কার তোমার মাথা।'

'না,' ওলগা বলে, 'আমার চিন্তায় আপনিও আছেন, বোধ হয় সে-ও রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ও পেলটা কী? ওকে দপ্তরে ঢুকতে দেওয়া হয়। কিন্তু ওটাকে তো দপ্তর

বলেই মনে হয় না। ও ক্ল্যামের সঙ্গে কথা বলতে পায় কিন্তু সে কী ক্ল্যাম? সে কী ক্ল্যামের মতোই দেখতে অন্য কেউ নয়? খুব সম্ভব ক্ল্যামের কোনো সেক্রেটারি যাকে ক্ল্যামেরই মতো দেখতে, সাদৃশ্য আরো বাড়াতে সে হয়ত ক্ল্যামের আধ ঘুমন্ত স্বপ্নিল ভাবেরও অভিনয় করে, ক্ল্যামের অমন ভঙ্গি অনুকরণ করা খুবই সহজ, অনেকেই অমন করে যদিও বুদ্ধিমানের মতো ওর বেশি আর এগোয় না। আর ক্ল্যামের সান্নিধ্য এতই কাম্য ও তাঁর দর্শন পাওয়া এতই দুর্লভ যে নানা মানুষের কল্পনায় তিনি নানা মূর্তি ধরে বিরাজ করেন। উদাহরণস্বরূপ, এই গ্রামে মমুস নামে তাঁর একজন সেক্রেটারী আছেন। আপনি তাঁকে চেনেন, তাই না? তিনিও আড়ালে থাকতেই পছন্দ করেন, কিন্তু আমি তাঁকে বেশ কয়েকবার দেখেছি। বেশ শক্তপোক্ত দেখতে এক যুবক, ঠিক কিনা? ওঁর সঙ্গে ক্ল্যামের চেহারার সামান্য সাদৃশ্যও নেই।

কিন্তু গ্রামে বহু লোককেই শপথ করে বলতে শুনবেন মমুসই আসলে ক্ল্যাম, তিনি ছাড়া আর কেউ নন। এভাবেই লোকে ওঁকে বেমালাম গুলিয়ে ফেলেছে। দুর্গে সেক্ষেত্রে অন্যরকম হবে কেন বলুন? কেউ ওই বিশেষ আমলাকেই ক্ল্যাম বলে বারনাবাসকে ইঙ্গিত করেছিল। আর ক্ল্যামের সঙ্গে তার সাদৃশ্যের কারণেই বারনাবাসের মনেও সব সময় ওই সন্দেহটা আছেই। আর সমস্ত কিছুই এই সন্দেহের দিকে ইঙ্গিত করছে। এটা কী ভাবা সম্ভব যে ক্ল্যাম স্বয়ং ওই রকম সাধারণ একটা ঘরে চিড়েচ্যাপটা হয়ে ঢুকবেন কানে পেনসিল গুঁজে? তা একেবারেই অসম্ভব।

বারনাবাস প্রায়ই বলে, শিশুদের মতোই অবশ্য, কিন্তু শিশুদের সততায়, ‘ওই আমলাটি ঠিক ক্ল্যামেরই মতো, আর উনি যদি নিজের অফিসে নিজের টেবিলের সামনে বসে থাকতেন, সামনের দরজায় নিজের নামের ফলক লাগিয়ে তাহলে আমার সামান্য সন্দেহও থাকত না। কথাটা শিশুদের মতো অপরিণত কিন্তু যুক্তিসংগত। আরো বুদ্ধির কাজ হতো যদি বারনাবাস ওখানে গিয়ে আরো কিছু লোককে প্রশ্ন করে আসল সত্য জানবার চেষ্টা করত, ওর কথামতো জায়গাটাতে প্রচুর জন এদিক সেদিক দাঁড়িয়ে থাকে।

এমন কি যে লোকটা নিজে থেকে ক্ল্যাম বিষয়ে ইঙ্গিত করেছিল তার মতো অন্যান্যদের কথাও যদি নির্ভরযোগ্য না হতো, তা হলেও নানা ভিন্ন মত এক করে তাদের মধ্যে তুলনা করার ক্ষেত্র তো একটা পাওয়া যেতেই পারত। এই ধারণাটা অবশ্য আমার না, বারনাবাসেরই, তবু সে এটা করে উঠতে সাহস পায় নি, পাছে সে অজান্তে অজানা কোনো বিধান ভঙ্গ করে ফেলে কাজটা খোয়ায় এই ভয়েই সে কারো সঙ্গে কথা বলার সাহস পায়নি। ও সবসময় কেমন এক অনিশ্চয়তায় ভোগে আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। ওর সদাসর্বদা এই অনিশ্চিতভাবই বুঝিয়ে দেয় ওখানে ওর অবস্থাটা আসলে কেমন, ওর শত বর্ণনার চেয়েও অনেক ভালোভাবে।

সামান্য একটা নির্দোষ কথা বলার জন্য মুখ খুলতে পর্যন্ত যখন ও ভয় পায় তখন বোঝাই যাচ্ছে ওখানে ওর অবস্থাটা কেমন ভীতিকর হয়ে উঠেছে। একথা মনে এলেই আমি নিজেকে দোষ দিই ওকে একা ওই অচেনা ঘরে যেতে দিই বলে। যার ফলে ওর অমন ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হয়। স্বভাবে যদিও ভীতু তো নয়ই বরং দুর্দান্ত সাহসী। অথচ এখানে এসে যখন দাঁড়ায় তখন মনে হয় ‘ও আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে।’

‘এইখানে আমার মনে হয় তুমি একেবারে মোক্ষম জায়গায় আঙুল রেখেছে,’ বলে কে, ‘এটাই আসল কথা। তুমি আমায় যা কিছু বললে তা থেকে সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। যে কাজের ভার সে নিয়েছে তার পক্ষে বারনাবাস একেবারেই অপরিণত। ও তোমাকে যা কিছু বলেছে তার কোনো কিছুই তোমার গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়াটা উচিত হবে না।

সবসময়ই যদি সে ওখানে অত আতঙ্কে থাকে তাহলে কোনো কিছু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার শক্তি ওর থাকবে নী করে? তাই তুমি যখন ওকে বাধ্য কর ওখানে যা সে দেখেছে সেসব তোমাকে বলতে তখনো তোমাকে যা কিছু বলে সবই অসংলগ্ন মনগড়া কতগুলো কথা মাত্র। আমি অবশ্য তাতে অবাধ হচ্ছি না। শাসকশ্রেণির ভয় তোমাদের মজ্জায় মজ্জায়। সারা জীবন ধরে সব বিষয়ে, চতুর্দিক থেকে ভয়ের নানা ইঙ্গিত, কল্পনা তোমাদের কাবু করে রাখে। তোমার নিজেরাও এই ভয়কে যথাসাধ্য স্ফীত করে চলেছ। এতেও অবশ্য আমার নিজের কোনো আপত্তি নেই, শাসক দক্ষ হলে লোকে তাকে ভয় পাবে নাই বা কেন? আসলে ব্যাপারটা হলো বারনাবাসের মতো অনভিজ্ঞ কোনো তরুণকে, গ্রামের বাইরে যে কখনো পা রাখিনি পর্যন্ত, উচিত হুয়নি হঠাৎ করে দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া আর তারপর আশা করা সে একেবারে নিখুঁত বর্ণনা দেবে সেখানকার সবকিছুর।

একেবারেই অনুচিত হলো তার প্রত্যেকটি বাক্যকে মহা সত্য ধরে নিয়ে তার উর জীবনের সুখ শান্তির ভিত নির্মাণ করা। এর চাইতে বড়ো ভুল আর কিছুই হতে পারে না। আমি স্বীকার করছি আমি নিজেও ঠিক একইভাবে তার দ্বারা বিপথচালিত হয়েছিলাম, তার উপর আশাভরসা করেছিলাম আর তার দ্বারাই অত্যন্ত হতাশাপীড়িত হয়েছি, শুধু তার কথার উপর নির্ভর করে, প্রায় কোনো, ভিত্তি ছাড়াই বলতে কী।’

ওলগা চুপ করে থাকে। ‘আমার পক্ষে খুব সহজ কাজ নয়,’ কে বলে চলে, ‘ভাইয়ের উপর তোমার যে গভীর বিশ্বাস তা নষ্ট করা, কারণ দেখতেই পাচ্ছি তুমি তাকে কত ভালোবাস, কতকিছু তার কাছ থেকে আশা কর।

কিন্তু আমাকে তা করতেই হবে। অন্তত সেই ভালোবাসা ও প্রত্যাশার কারণেই। আমি তোমাকে বলতে চাই কোনো কিছু একটা আছে-সেটা কী আমি জানি না-যা তোমাকে দেখতে দিচ্ছে না বারনাবাস কতটা অর্জন করেছে আর কতটা তাকে অর্পণ করা হয়েছে। ওকে দগুৱে ঢোকান অনুমতি দেওয়া হয়, কিংবা তুমি চাইলে ঘরেও বলতে পারি, তার দরজা দিয়ে আরো ভিতরে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে, সাহস থাকলে বাধাও অগ্রাহ্য করা কঠিন নয়। আমার তো মনে হয় পাশের এই ঘরটাও একেবারেই অপ্রবেশ্য, অন্তত বর্তমানে। ওখানে বারনাবাস কার সঙ্গে কথা বলে তা আমার জানা নেই, হয়ত কোনো কেরানির সঙ্গে কিংবা একেবারেই শেষ ধাপের তুচ্ছ কোনো অধস্তনের সঙ্গে, কিন্তু সেই লোকটি ক্ষুদ্রতম পদে থাকলেও, তার ঠিক উদ্ধৃতনের সঙ্গে তার কোনো না কোনো সম্পর্ক তো রয়েছেই, সে বারনাবাসকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারে, কিংবা এমন কারো কাছে তাকে পাঠাতে পারে যে তাকে সেই নামটা বলে দেবে।

এই তথাকথিত ক্ল্যামের সঙ্গে আসল ক্ল্যামের সামান্য কোনো সাদৃশ্য না থাকতেই পারে, বারনাবাস ছাড়া কারো চোখেই হয়ত সেই সাদৃশ্যের কোনো অস্তিত্ব নেই, বারনাবাস তো আতঙ্কে অর্ধেক অন্ধ হয়ে রয়েছে, সে হয়ত ক্ষুদ্রতম কোনো আমলা, কিংবা আদপে কোনো আমলাই না। কিন্তু এসব সম্ভাবনা সত্ত্বেও এটা তো ঠিক তার ডেস্কে কোনো না কোনো নির্দিষ্ট কাজ করে, বিশাল বই থেকে সে কিছু না কিছু পড়ে, কেরানিকে ফিসফিস করে কিছু বলে, বারনাবাসের উপর মাঝে মধ্যে চোখ পড়লে কিছু একটা ভাবে, আর এ সমস্ত যদি সত্য না-ও হয়, তার সমস্ত কাজ যদি তাৎপর্যহীনও হয়, তবু এটা মনে রাখা দরকার কেউ না কেউ কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই তাকে ওখানে বসিয়েছে। এর সোজা অর্থ হলো কিছু একটা ওখানে রয়েছে যার সামান্যতম সুযোগের সম্ভাবহার বারনাবাস কোনো না কোনো ভাবে করতেই পারত।

কিন্তু এসব কিছুই না করে বারনাবাস যদি সন্দেহ ভীতি আর আশঙ্কার বেশি আর এগোতে না পেরে থাকে সেটাকে তার নিজেরই দোষ বলতে হবে বইকি। সমস্ত কিছুই তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে নাকি? এবার চিঠিগুলোর কথা ধর। আমি ওগুলো খুব মূল্যবান বলে মনে করি না, কিন্তু বারনাবাস যেভাবে বলেছে তার চেয়ে ওদের মূল্য টের বেশি। ঠিকই, যে ওগুলো কতগুলো পুরনো বাতিল চিঠি; পুরনো মূল্যহীন চিঠির স্তূপ থেকে খেয়াল খুশি মতো এলোমেলোভাবে বাছবিচার না করে টেনে বার করে আনা, যেভাবে মেলায় লাভ বার্ড কাগজের স্তূপ থেকে ঠোট দিয়ে লোকের ভাগ্য টেনে বার করে আনে, তা হোক, কিন্তু আমার ভাগ্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রয়ে গেছে। ওই চিঠিগুলো তো আমার জন্যই লেখা হয়েছিল, আমার ভালোর জন্য না হলেও, আর গ্রামপ্রধান ও তার স্ত্রীর সাক্ষ্য অনুসারে ক্ল্যাম নিজের হতে ওগুলো লিখেছিলেন, আর প্রধানের সাক্ষ্য অনুযায়ীই ওগুলোর একটা তাৎপর্য রয়েছে। সেটা একান্ত ব্যক্তিগত ও ঝাপসা ধরনের হতে পারে কিন্তু তবু তা অতি মহৎ।

‘প্রধান মশাই নিজে আপনাকে এ কথা বলেছেন?’ জিজ্ঞাসা করে ওলগা।

‘হ্যাঁ, তিনি নিজে বলেছেন,’ উত্তর দেয় কে।

‘এটা তো বারনাবাসকে বলতেই হবে,’ বলে ওলগা দ্রুতস্বরে, ‘এতে ও খুব উৎসাহিত হবে।’ ‘কিন্তু ওর তো উৎসাহিত হবার কোনো প্রয়োজনই নেই,’ বলে কে, ‘ওকে উৎসাহিত করার অর্থ হলো ওকে বোঝানো ও সব বিষয়েই যথার্থ ও সে যা যা এখন করছে তাই সে করে চলুক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ও যদি তাই করে তাহলে কখনোই কিছু করে উঠতে পারবে না।

কোনো মানুষের চোখ যদি বাঁধা থাকে তাকে শত উৎসাহ দিতে পারো বাঁধনের বাইরে তাকাতে কিন্তু সে কিছুই দেখতে পাবে না। বন্ধন তার চোখ থেকে খুলে নিলেই শুধুমাত্র সে দেখতে পাবে। বারনাবাসের প্রয়োজন সাহায্য, উৎসাহ নয়। একবার শুধু ভাবো, ওখানে উপরে এক বিপুল শক্তিমান শাসকবর্গের প্রবল জটিল কর্মপ্রক্রিয়া যার থেকে মুক্ত হবার ক্ষমতা কারো নেই-এখানে আসার আগে আমি মনে করেছিলাম তার প্রকৃতি সম্পর্কে আমার একটা চলনসই ধারণা আছে, কিন্তু পরে বুঝলাম কী হাস্যকর ছিল সেই ধারণা। ওই উপরে রয়েছে সেই শাসকবর্গ, যাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে

বারনাবাস: কি করণেভাবে একক, সহায় সম্বলহীন বারনাবাস। সেখানে সে বিস্মৃত কোনো দপ্তরের এক অন্ধকার কোণে সমস্ত জীবন কাটিয়ে মরে যাবার সম্মুখীন হই শুধু পেতে পারে।’

‘বারনাবাসকে ওখানে যে কত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সেটা ভুলে যাবেন না কে,’ বলল ওলগা, ‘শাসকবর্গের উপর আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা যে আছে সেটা আপনি নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন।’

‘কিন্তু এই সম্মানটা দেখানো হচ্ছে সম্পূর্ণ ভুল জায়গায়,’ বলে কে। ‘এ এক এমন ধরনের শ্রদ্ধা প্রদর্শন যা মূল বিষয়টাকেই অসম্মান করে চলেছে। এই যে বারনাবাস দপ্তরে ঢোকার দূর্লভ সৌভাগ্য লাভ করে, কিন্তু সেখানে কিছুই না করে সময় নষ্ট করে বেরিয়ে এসে এই যে সুযোগের অপব্যবহার করছে একে তুমি শ্রদ্ধা প্রদর্শন বল? কিংবা এই যে সে সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে এসে নালিশ করে সেই লোকদের বিরুদ্ধে যাদের সামনে ওখানে ও থরথর করে কাঁপে কিংবা সে যে চূড়ান্ত রকমের হতাশ হয়ে হাতে পাওয়া চিঠিগুলো পর্যন্ত বিলি করে না ও এর ফলে ওর উপর ন্যস্ত বিশ্বাসের অমর্যাদা করে- এ সবকে তুমি শ্রদ্ধা বিলি করে না ও এর ফলে ওর উপর ন্যস্ত বিশ্বাসের অমর্যাদা করে- এ সবকে তুমি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নমুনা বলতে চাও? কোনো ভাবেই তা হতে পারে না।

কিন্তু ওলগা আমার আরো বলার আছে, তোমাকেও আমি দোষ দিতে চাই; তুমিও ক্রটিমুক্ত নও, যদিও তোমার ধারণা কর্তৃপক্ষকে তুমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা কর তবু বারনাবাস একেবারেই অপরিণত, দুর্বল, অসহায় হওয়া সত্ত্বেও তুমি তাকে দুর্গে যেতে দিয়েছ, অন্তত তাকে সেখানে যাওয়া থেকে বিরত করার কোনো চেষ্টা করনি।

‘আপনি আমায় যে ভরসনা করলেন,’ ওলগা বলল, ‘তা আমি নিজেই নিজেকে করে চলেছি গোড়া থেকে। আমি বারনাবাসকে দুর্গে পাঠিয়েছি বলে নয়, আমি তাকে পাঠাইনি, সে নিজের ইচ্ছাতেই সেখানে গিয়েছে, কিন্তু আমার উচিত ছিল আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে আটকানো, দেহের জোরে, কৌশলে কিংবা বুঝিয়ে সুজিয়ে, যেভাবেই হোক,-কিন্তু আমাকে এই মুহূর্তে যদি আবার স্থির করতে হয়, আর তখনকার মতো বারনাবাসের অবস্থা যদি একই রকম শোচনীয় থেকে যায়, আর আমাদের পরিবারেও- আর বারনাবাস, সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতা ও বিপদের কথা ভালোভাবে জেনেও যদি একটু মৃদু হেসে একইভাবে আমার কথা অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে যায় আজও আমি ওকে আটকাব না, এর মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে যা কিছু ঘটে গেছে তা সত্ত্বেও, আর আমার বিশ্বাস আমার জায়গায় থাকলে আপনিও ঠিক তাই করতেন।

আমরা যে দুর্দশার মধ্যে আছি আপনি জানেন না। এ কারণেই আমাদের উপর আপনি একটু অবিচার করে ফেলছেন। বিশেষ করে বারনাবাসে উপর। এখনকার তুলনায় আগে আমাদের আশা ভরসা অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তখনো এমনকী আমাদের ভরসা এমন কিছু বেশি ছিল না, আর দুর্দশা তো চরমই ছিল, ঠিক আজকেও তাই। ফ্রিডা আমাদের বিষয়ে আপনাকে কিছু বলে নি?’

‘সামান্য কিছু ইঙ্গিত দিয়েছে মাত্র,’ বলল কে, ‘তেমন স্পষ্টভাবে কিছু নয়, কিন্তু তোমার নাম শুনেই তো ও ক্ষেপে যায় দেখি।’

‘আর বাড়িওয়ালীও কিছু বলেনি?’

‘না, কিছুই না।’

‘অন্য কেউ না?’

‘কেউ না।’

‘তা তো ঠিকই। লোকে আর আপনাকে কিছু বলবে কেন? প্রত্যেকেই আমাদের সম্পর্কে কিছু না কিছু জানে, হয় কিছু সত্যি কথা, যতটা অন্তত তারা জানতে পেরেছে, নয়ত ফাঁপিয়ে তোলা কিছু গুজব, বেশির ভাগই বানানো, আর লোকে মনে করে আমাদের বিষয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্তই জানে।

কিন্তু আসলে কেউই মুখ খুলবে না কোনো বিষয়ে। লোকে এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে লজ্জা পায় আর সেটা খুবই স্বাভাবিক। এমনকী কে, এ বিষয়ে আপনাকে বলাটাও কঠিন আর আপনি যদি সব শোনেন, খুব সম্ভব আপনি এখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবেন। কখনো আর আমাদের সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখবেন না, ঘটনাটায় আপনার তেমন কিছু এসে না গেলেও। সেক্ষেত্রে আমরা আপনাকে হারাব আর আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই এই মুহূর্তে দুর্গে বারনাবাসের কাজের চেয়েও আপনি নিজে আমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান।

কিন্তু তবু-সারা সন্ধ্যাটা আমি এই নিয়েই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম-তবু আপনাকে সব কথা খুলে বলতেই হবে, তা না হলে আমাদের ভিতরের অবস্থাটা আপনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারবেন না আর, আমি যে বিষয়ে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়ি, বারনাবাসের উপর ক্রমাগত অবিচার করে চলবেন। আমাদের মধ্যে যথার্থ বোঝাপড়া কখনো গড়ে উঠবে না, আপনি আমাদের কখনো সাহায্যও করতে পারবেন না। আমাদের কাছ থেকেও কোনো অতিরিক্ত উপকার গ্রহণ করবেন না। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে: আপনি কী সত্যিই চান আমি সব বলি?’

‘তুমি জিজ্ঞাসা করছ কেন?’ কে বলল, ‘যদি প্রয়োজন হয় আমি নিশ্চয়ই সব শুনব, কিন্তু বিশেষ করে ওই প্রশ্নটার অর্থ কী?’

‘সংস্কার আর কি,’ বলে ওলগা, ‘আপনি তাহলে আমাদের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বেন, বারনাবাসের মতো আপনিও আসলে সরল প্রকৃতির মানুষ তো!’

‘তাড়াতাড়ি বল,’ বলল কে, ‘আমি কোনো ভয় পাই না। মেয়েদের স্বভাব মতোই ব্যাপার যত না গুরুতর তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বকে তুমি সমস্তটাই আরো খারাপ করে তুলছ।’

অ্যামেলিয়ার গোপন কথা :

‘সেটা আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন,’ বলল ওলগা, ‘গোড়াতেই কিন্তু আপনাকে সতর্ক করে দিছি সব শুনে প্রথমে আপনার সবকিছু অতি সাধারণ বলেই মনে হবে, গোড়ায় কেউ বুঝতেই পারবে না ঘটনাটাকে গুরুত্ব দেবার কী আছে। দুর্গে একজন মস্ত পদাধিকারী আছেন, নাম সরটিনি।’

‘আমি ইতিমধ্যেই ওঁর নাম শুনেছি’ বলল কে, ‘আমাকে এখানে আনার পিছনে ওঁর হাত ছিল।’

‘আমার তা মনে হয় না,’ বলল ওলগা, ‘সরটিনি প্রকাশ্যে কখনো আসেনই না, আপনি ওঁকে সরডিনির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেননি তো? বানান ‘ডি’ দিয়ে।’

‘তুমি ঠিকই বলেছ?’ বলল কে, ‘সে তাহলে সরডিনিই হবে।’

‘হ্যাঁ, বলল ওলগা, ‘সরডিনি খুবই সুপরিচিত, আমলাদের মধ্যে সবচেয়ে পরিশ্রমী বলে ওঁর খ্যাতি রয়েছে, ওঁর নাম প্রায়ই উল্লিখিত হয়। অন্যদিকে সরটিনি আড়ালে থাকতে পছন্দ করেন। বেশি মানুষ ওঁকে চেনে না।

তিন বছর আগে আমি ওঁকে প্রথম দেখি আর সেটাই আমার শেষ দেখা। দিনটা ছিল ৩ জুলাই। দমকল বাহিনীর একটা উৎসবে, দুর্গ থেকেও তাতে অনুদান এসেছিল, সেই সঙ্গে কয়েকটা ফায়ার ইঞ্জিন। দমকলের কোনো একটা অনুষ্ঠান পরিচালনা করার কথা ছিল সরটিনির, সম্ভবত অন্য কারো বদলেই ওঁর আসার কথা ছিল আমলারা এ ভাবেই এ ওর পিছনে মুখ লুকোতে অভ্যস্ত, তাই ঠিক করে বলা কঠিন কাজের আসল দায়িত্ব কার উপর দেওয়া হয়েছে। তো, সরটিনির উপর এই ফায়ার ইঞ্জিনগুলো হস্তান্তর করার ভার ছিল। বলা বাহুল্য দুর্গ থেকে আরো অনেক লোক এসেছিলেন, আমলারা, পরিচারকেরা, আর তাঁর স্বভাবমতো সরটিনি সবার আড়ালে রইলেন। ছোটোখাটো, দুর্বল, চিন্তাশীল গোছের দেখতে ভদ্রলোককে আর যারা তাঁকে দেখে তারাই তার একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য না করে পাবে না-তাঁর কপালের কুঞ্জন রেখা। বয়স তাঁর মাত্র চল্লিশ হলেও তাঁর কপালে অগুনতি ভাঁজ, নাক থেকে শুরু করে বৃত্তাকার কপালের উপর ছড়িয়ে পড়েছে ভাঁজগুলো। এখন আমি কারো মধ্যে দেখিনি।

সে যাই হোক, আমাদের এখানে উৎসবটা তো হলো। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে অ্যামেলিয়া আর আমার উত্তেজনার শেষ ছিল না, এই উপলক্ষ্যে আমাদের পোশাক-টোষাক গোছগাছ করে রাখলাম। কয়েকটা প্রায় বেশ নতুনই ছিল। বিশেষ করে অ্যামেলিয়ার পোশাকটা তো দারুণ সুন্দর দেখতে; সাদা কামিজের উপর ঢেউ তোলা লেসের কাজ, একটার পর একটা, যত লেস ছিল মা ওখানেই লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আমার খুব হিংসে হয়েছিল। উৎসবের আগের রাতটা প্রায় কেঁদেই কাটাই। একমাত্র যখন ব্রীজ ইন-এর বাড়িওয়ালী সকালে আমাদের দেখতে এলেন-; ‘ব্রীজ ইন-এর বাড়িওয়ালী?’

জিজ্ঞাস করে কে। ‘হ্যাঁ,’ ওলগা বলল, ‘উনি আমাদের মস্ত বন্ধু ছিলেন, যাই হোক, উনি এসে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন অ্যামেলিয়াকে সবার চেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে, আর আমাকে সান্ত্বনা দিতে উনি আমাকে গারনেট বসানো একটা নেকলেস ধার দিলেন। আমরা যখন বেরোবার জন্য প্রস্তুত, অ্যামেলিয়া আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমরা সবাই তার প্রশংসা করছি আমার বাবা বললেন, ‘আজকে, শুনে রাখো সবাই, অ্যামেলিয়া তার স্বামী খুঁজে পাবেই,’ তখন, ঠিক বলতে পারব না কেন, আমি আমার অহংকার, গলার নেকলেসটা খুলে অ্যামেলিয়ার গলায় পরিয়ে দিলাম।

আমার মধ্যে আর হিংসের ছিটেফোঁটা রইল না। তার ঐশ্বর্যের কাছে আমি মাথা নোয়ালাম, আমার মনে হলো অন্য সকলকেও নোয়াতে হবে। আমাদের সম্ভবত যেটা সবচেয়ে অবাধ করেছিল সেটা তার দৈহিক পরিবর্তন, ওকে ঠিক সুন্দরী বলা যায় না

কিন্তু ওর মলিন বিষণ্ণ দৃষ্টি, সেদিন থেকে তা আর বদলাল না, আমাদের সবার বহু উপরে যেন নিবন্ধ ছিল আর অচেতনেই সবাই যেন তার কাছে মাথা নত করেছিল, প্রায় আশ্চর্যকরভাবেই। প্রত্যেকেই ঐ বিষয়ে মন্তব্য করছিল, এমনকী ল্যাসম্যান ও তার স্ত্রী পর্যন্ত, আমাদের নিতে এসে।’

‘ল্যাসম্যান?’ জিজ্ঞাসা করল কে।

‘হ্যাঁ, ল্যাসম্যান,’ বলল ওলগা, ‘আমাদের সকলেই খুব সম্মান করত। আমাদের বাদ দিয়ে উৎসব শুরু করার কথা ভাবাই যেত না কারণ আমার বাবা দমকলের তিন নম্বর কর্তাব্যক্তি ছিলেন।’

‘তখনো তোমার বাবা কর্মপটু ছিলেন?’ প্রশ্ন করে কে।

‘বাবা?’ উল্টো প্রশ্ন করে ওলগা, যেন কে-র প্রশ্নটা সে বুঝে উঠতে পারে নি, ‘তিন বছর আগে বাবাকে এখনকার তুলনায় যুবকটাই বলা যেত। যেমন ধরুন, হেরেনহফে একবার আগুন লাগলে বাবা জেলেটার নামে এক কর্মীকে,’ বেশ ভারি মানুষ, নিজের কাঁধে চাপিয়ে দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। আমি নিজে তখন ওখানে ছিলাম। সত্যি কোনো বিপদ হয়নি। আসলে চুল্লির কাছে শুকনো কিছু কাঠে আগুন ধরে গিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল।

কিন্তু জেলেটার আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে জানলা থেকে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে থাকে। দমকল আসে আর ইতিমধ্যে আগুনটা গুলেও বাবাকে ওকে পিঠে নিয়ে বার করতে হয়। অবশ্য জেলেটারের নড়াচড়া করতে খুব কষ্ট হতো আর তাই অমন পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমি আপনাকে এ সমস্ত বলছি শুধু বাবার ব্যাপারটা বোঝাতে। এরপর তিনটে বছর তো মাত্র কেটেছে। অথচ ওঁর দিকে একবার চেয়ে দেখুন।’ শুধুমাত্র এই সময়ই কে সচেতন হলো কখন যেন অ্যামেলিয়া ঘরে ঢুকেছে। অবশ্য এই মুহূর্তে সে অনেকটা দূরে একটা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেখানে তার বাবা মা বসে। সে তার মাকে খাইয়ে দিচ্ছে। মা তার বেতো হাত তুলতে পারে না। আর বাবাকে আরো একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে বলে মৃদু ভর্ৎসনা করছে, একটু পরেই তার পালা আসবে। কিন্তু অ্যামেলিয়ার এই বকুনিতে কোনো কাজ হয় না। কারণ তার বাবা স্যুপের বাটিতে প্রলুব্ধ হয়ে দেহের দুর্বলতা অগ্রাহ্য করে প্রথমে একটা চামচ দিয়ে স্যুপটা খেতে যায়, তার পাত্র থেকে সরাসরিভাবে।

কিন্তু তার এই চেষ্টা সফল না হওয়ায় রাগে গজরাতে থাকে। চামচটা তার মুখ পর্যন্ত পৌঁছবার এগই শূন্য হয়ে যায় ও বাটিতেও তার মুখ স্যুপ স্পর্শই করতে পারে না, কারণ তার আগেই তার ঝোলা গাঁফ বাটিতে ঢুকে তার মুখ ছাড়া চতুর্দিকেই ঝোল ছিটিয়ে দেয়।

‘তাহলে তিন বছরের মধ্যেই ওর এই অবস্থা হয়েছে?’ প্রশ্ন করে কে, অথচ এই বৃদ্ধ দম্পতির জন্য কোনো সহানুভূতিও সে বোধ করতে পারে না, টেবিল সুদ্ধ ঐ ঘরের কোণটি তার বিতৃষ্ণার উদ্বেক করছিল মাত্র।

‘তিন বছর,’ ওলগা ধীরে ধীরে উত্তর দেয়, ‘কিংবা আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে, কয়েক ঘন্টা, ওই উৎসবের পর থেকে। উৎসবটা হয়েছিল গ্রামের একটা মাঠে,

পাশ দিয়ে একটা ছোটো নদি বয়ে গেছে। আমরা ওখানে গিয়ে পৌছবার আগেই বেশ ভিড় জমে গিয়েছিল, হৈ হউগোল, চিংকার কান পাতাই দায়। বাবা তো, বল্ই বাহুল্য, আমাদের প্রথমই দমকলের ইঞ্জিন দেখাতে নিয়ে গেল। যন্ত্র দেখে বাবা আহ্লাদে আটখানা। ঝাঁ চকচকে ইঞ্জিনগুলো খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বাবা আমাদের সেগুলো বোঝাতে থাকল। কারো কোনো আপত্তি গ্রাহ্য না করে বাবা আমাদের নিচু হয়ে, এমনকী হামাগুড়ি দিয়ে ইঞ্জিনের তলায় ঢুকতে বাধ্য করল। যেন সেখানকার কোনো মহাবস্তু আমাদের দেখতে চায় আর এমনকী বারনাবাসকেও একচেট নিল সে তা করতে অস্বীকার করেছিল বলে।

শুধু অ্যামেলিয়াই এইসব ইঞ্জিন টিঞ্জিনে কোনো মন দিল না। দারুণ পোষাকে সে সেখানে শুধু দাঁড়িয়ে রইল। তাকে কিছু বলে এমন সাহস কারো ছিল না। আমি মাঝে মধ্যে দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরে টানছিলাম। কিন্তু সে কোনো কথা বলছিল না। আমি এমনকী আজকেও বুঝে উঠতে পারিনি। কেমন করে আমরা ওই ইঞ্জিনগুলোর সামনে অতক্ষণে দাঁড়িয়ে রইলাম অথচ সরটিনিকে লক্ষ্য করলাম না। তাঁকে দেখলাম শুধু সেই মুহূর্তে যখন বাবা পিছন ফিরল, তার আগে পর্যন্ত বাবা তো ইঞ্জিনের পিছনের চাকায় হেলান দিয়ে সব খোল নলচে নিবিষ্ট মনে দেখছিল। আমাদের চারদিকে অবশ্য সাংঘাতিক আওয়াজ হচ্ছিল, মেলায় স্বাভাবিক হৈ হউগোলেরই শুধু নয়, কারণ দুর্গ থেকে দমকলের ইঞ্জিন ছাড়াও কিছু ট্রামপেট-উপহার দেওয়া হয়েছিল, অসাধারণ-বাদ্যযন্ত্র, সেগুলো থেকে সামান্য চেষ্টাতেই-একটা শিশুর কাছে পর্যন্ত তা সহজ-ভয়ানক, অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে তোলার মতো আওয়াজ বার করা কঠিন ছিল না।

ওই আওয়াজ কানে গেলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল ধারে কাছেই তুর্কীরা রয়েছে। আর হাজার চেষ্টা করেও, কেউ ওই আওয়াজের সঙ্গে জীবনেও অভ্যস্ত হতে পারবে না। ওই যন্ত্র থেকে নির্গত বিস্ফোরক আওয়াজে প্রত্যেকবার লোককে লাফিয়ে উঠতে হচ্ছিল। আর ট্রামপেটগুলো নতুন ধরনের হওয়ায় প্রত্যেকেই একবার তা চেষ্টা করে দেখতে চাইছিল আর উৎসবের মেজাজের সঙ্গে তাল রেখে তাদের তাতে অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল। ঠিক আমাদের কানের কাছেই, বোধ হয় অ্যামেলিয়াই তাদের আকর্ষণ করে এনে থাকবে, বেশ কিছু লোক শিঙে ফুকছিল। এই হটরোলের মধ্যে মাথা ঠিক রাখাই দুষ্কর, কোনোমতে আমরা বাবার কথা অনুযায়ী দমকলের ইঞ্জিনগুলোতে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করছিলাম, এই কারণেই সম্ভবত আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে থাকবেন, আর এছাড়া আমরা জানতামও না উনি কে। ‘ওই যে সরটিনি’ ল্যাসম্যান আমার বাবা কানে ফিসফিস করে বলল আর বাবা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে আভূমি মাথা নোয়াল ও আমাদেরও তা করতে ইঙ্গিত করল। এর আগে বাবা সরটিনিকে কখনো চোখে না দেখলেও তাঁকে দমকলের একজন বিশেষজ্ঞ বলে বরাবরই শ্রদ্ধা করে এসেছে।

ওঁর সম্পর্কে বাড়িতেও নানা আলোচনা করেছে। তাই সরটিনিকে সামনে থেকে সচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার হয়ে উঠল। সরটিনি অবশ্য আমাদের দিকে কোনো মনোযোগ দিলেন না, এটা তাঁর পক্ষে নতুন কিছুও নয় কারণ সাধারণের থেকে সরকারি কর্মচারীরা নিজেদের আলাদা রাখতেই

পছন্দ করেন। এছাড়া উনি ক্লান্তও ছিলেন খুব, শুধুমাত্র কর্তব্য পালন করতেই ওঁকে ওখানে দাঁড়াতে হয়েছিল। অন্য আমলারাও অবশ্য সাধারণের সঙ্গে মিশে গিয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিলেন। উনি কিন্তু ইঞ্জিনের সামনেই দাঁড়িয়ে রইলেন আর যারা তাঁর সঙ্গে আলাপ জমাতে এগিয়ে এল, তোষামোদ করে বা কোনো বিষয়ে অনুগ্রহ চেয়ে, তাদের সবাইকে চুপ করিয়ে দিলেন কঠিন নৈঃশব্দ দিয়ে।

সূতরাং এটাই সম্ভব যে আমরা ওকে দেখার অনেক পরে উনি আমাদের লক্ষ্য করেছিলেন। শুধু আমরা যখন গভীর শ্রদ্ধার মাথা নোয়ালাম আর আমাদের পক্ষ থেকে বাবা তাঁর কাছে বার বার ক্ষমা চাইতে লাগল, শুধু তখনই আমাদের দিকে ফিরলেন, আমাদের একে একে জরিপ করতে লাগলেন ক্লান্তভাবে, যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে যে তাঁকে একজন, তারপর আরো একজনকে দেখতে হবে, যতক্ষণ না তাঁর চোখ গিয়ে শুদ্ধ হলো অ্যামেলিয়ার উপর। তাঁকে এবার মাথা তুলতে হয় কারণ তার চেয়ে অ্যামেলিয়া অনেক লম্বা। তাকে দেখেই তিনি চমকে উঠে একটা বড়োসড়ো লোহার ডান্ডার উপর লাফ দিয়ে দ্রুত তার কাছে পৌঁছতে চাইলেন, আমরা প্রথমে তাঁকে ভুল বুঝে তার কাছে এগোতে লাগলাম, বাবা সবার আগে; কিন্তু তিনি হাত তুলে আমাদের নিষেধ করলেন ও আমাদের চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন হাত নেড়ে। ঘটনাটা এটুকুই।

শেষ পর্যন্ত সে তাহলে জীবনসঙ্গী পেল এই বলে আমরা অ্যামেলিয়াকে নানাভাবে খেপালাম, আর সারা বিকেলটা আমরা ভারি আনন্দে কাটলাম, শুধুমাত্র অজ্ঞাতবশত। কিন্তু অ্যামেলিয়া অন্যান্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি চুপচাপ ছিল।

‘সরটিনির প্রেমে মেয়েটা একেবারে মজে গেছে,’ বলল ব্রুনসউইক। সবসময়ই লোকটার ভাবভঙ্গি ভারি অসভ্য ধরনের আর অ্যামেলিয়ার মতো মেয়ের প্রকৃতি বোঝার মতো বুদ্ধিও ওর মগজে ছিল না।

তবু আমাদেরও মনে হলো ও খুব একটা ভুল কিছু বলছে না। আমাদের সারা দিনটা কাটল গভীর উত্তেজনার মধ্যে। আমরা সবাই, এমনকী অ্যামেলিয়াও, যখন মাঝরাতে বাড়ি ফিরে এলাম তখন সবাই যেন দুর্গের মিষ্টি মদ গিলে একেবারে নেশাগ্রস্ত হয়ে রয়েছে।’

‘আর সরটিনি?’ প্রশ্ন করে কে।

‘হ্যাঁ, সরটিনি,’ বলল ওলগা, ‘সারা বিকেলে বেশ কয়েকবার আমি ওঁকে দেখেছিলাম, পাশ দিয়ে যাবার সময়, হাত ভাঁজ করে ইঞ্জিনের শ্যাফটের উপর স্থির বসেছিলেন, সন্ধ্যাবেলায় দুর্গের গাড়ি তাঁকে তুলে নিতে আসা পর্যন্ত। ফায়ার ড্রিল চলাকালীন পর্যন্ত উনি ওঠেননি তা দেখতে অথচ বাবা তার বয়সের তুলনায় প্রবল উৎসাহে অন্যদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল শুধু এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে স্বয়ং সরটিনি তাকে দেখছেন।’

‘এরপর বুঝি সরটিনির কোনো খবর আর পাওনি?’ জিজ্ঞাসা করে কে, ‘তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সরটিনির উপর তোমার বিপুল শ্রদ্ধা।’

‘ওম, নিশ্চয়ই, শ্রদ্ধা,’ বলল ওলগা, ‘শ্রদ্ধা তো বটেই, আর আমাদের সঙ্গেও ওর যোগাযোগও হয়েছিল বইকি।’

পরদিন খুব ভোরে অ্যামেলিয়ার চিৎকারে আমাদের গভীর ঘুম ভেঙে যায়, অন্যান্যরা বিছানায় আবার পাশ ফিরে শুলেও আমি পুরোপুরি জেগে উঠে ওর কাছে দৌড়ে যাই। ও জানলার ধারে একটা চিঠি হাতে ধরে দাঁড়িয়েছিল। সামান্য আগে একটা লোক চিঠিটা জানলা গলিয়ে দিয়ে বাইরে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিল। চিঠিটা ছোটো, অ্যামেলিয়া ইতিমধ্যেই তা পড়ে ফেলেছে, তার অবশ্য হাতে সেটা তখনো ধরা ছিল। ওর এই ক্লান্ত ভঙ্গিটা আমার খুব প্রিয়, আমি ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে চিঠিটা পড়ে ফেললাম। সেটা পড়া শেষ করতে না করতেই অ্যামেলিয়া আমার দিকে একবার তাকিয়েই চিঠিটা ছিনিয়ে নিল কিন্তু সেটা আবার পড়ার মানসিকতা তার আর ছিল না। ও করল কি চিঠিটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে সেই ছিন্নপত্র বাইরের লোকটির মুখে ছুঁড়ে দিয়েই জানলা বন্ধ করে দিল। সেই সকালটাই আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিল।

আমি ‘নির্ধারণ’ বললাম বটে কিন্তু আসলে আগের বিকেলের প্রতিটি মুহূর্তই ছিল চূড়ান্ত।’

‘চিঠিটায় কী ছিল?’ জিজ্ঞাসা করল কে।

‘হ্যাঁ, এখনো আপনাকে তা বলিনি বটে,’ বলল ওলগা, ‘চিঠিটা এসেছিল সরটিনির কাছ থেকে গারনেটের নেকলেশ পরা একটি বালিকার উদ্দেশ্যে। বিষয়বস্তু সবটা বলা সম্ভব নয়। হেরেনহফে তার কাছে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তখন, কারণ আর আধঘন্টার মধ্যেই তাকে চলে যেতে হবে। কদর্য ভাষায় চিঠিটা লেখা, অমন ভাষা আগে কখনো পড়িনি।

অ্যামেলিয়াকে একদম চেনে না এমন কেউ চিঠিটা পড়লে তার নিশ্চয়ই এই ধারণা হতো যে সে এমনই মন্দ প্রকৃতির মেয়ে যে তাকে অমন কুৎসিত চিঠি লেখা যেতেই পারে। যদিও বাস্তবে কেউ কখনো তাকে স্পর্শ করেনি। আর চিঠিটা প্রেমপত্রও ছিল না। একটা নরম শব্দও সেখানে ব্যবহার করা হয়নি, বরং স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল সরটিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছে কারণ অ্যামেলিয়া তার মনের স্বৈর্য্য নষ্ট করে দিয়েছে ও সে এর ফলে কাজে মন বসাতে পারছে না। পরে আমরা নিজেদের স্বার্থেই টুকরো ঘটনাগুলোকে জোড়া দিয়েছিলাম। সরটিনির নিশ্চয়ই সন্ধ্যাবেলা দুর্গে ফিরে যাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু পরিবর্তে শুধু অ্যামেলিয়ার কারণেই তাকে গ্রামে থাকতে হয়, আর সারা রাত ধরেও তার কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে না পেরে রাগে দিশাহারা হয়ে সকালে ঐ চিঠিটা লেখে।

অমন একটা চিঠি পড়ার পর যে কোনো মানুষেরই খুন করার ইচ্ছে হবে, সবচেয়ে ঠান্ডা মাথার মানুষেরও, কিন্তু যদিও চিঠিটার চাপা শাসানিতেই বেশির ভাগ মানুষের ভীত হয়ে পড়ার কথা, অ্যামেলিয়া কিন্তু শুধু ক্রুদ্ধই হয়েছিল। ভয়ের লেশমাত্র ওর চরিত্রে নেই, না নিজের জন্য, না অপরের জন্য। আর বিছানায় ফিরে গিয়ে আমি যখন চিঠিটার শেষ বাক্যটা আওড়াচ্ছিলাম যেটা মাঝপথেই অর্ধসমাপ্ত ছিল।

‘তুমি কিন্তু এখনই আসবে নয়ত-’ তখন অ্যামেলিয়া জানলার ধারে বসে বাইরের দিকে চেয়েছিল যেন সে আরো বার্তাবাহক আশা করছে যাদের সে ঠিক প্রথমজনের মতোই বেশ করে টিট করে দিতে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।’

‘আমলাদের চারচলন এই ধরনেরই হয়,’ কে অনিচ্ছায় বলে, ‘ওদের মধ্যে এরকম মানুষের অভাব নেই। তা তোমার বাবা কী করলেন? উনি নিশ্চয়ই যথাস্থানে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান যদি না অবশ্য সরাসরি হেরেনহফেই হাজির হয়ে ব্যাপারটার আরো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে চেয়ে থাকেন?’

গল্পটার সবচেয়ে মন্দ দিক অ্যামেলিয়ার অপমানিত হওয়াটা নয়। সহজেই তা থেকে ফায়দা তোলা যেতে পারত। ভূমি কেন যে এত বাড়াবাড়ি রকম গুরুত্ব দিচ্ছে তা আমার বুদ্ধির অগম্য, সরটিনির পাঠানো চিঠিটার কারণে সারা জীবন অ্যামেলিয়ার কলঙ্কিত হয়ে থাকার যুক্তি কী আছে? তোমার গল্প শুনে তো লোকের এমনটাই মনে হবে।

কিন্তু তা একেবারেই অসম্ভব। দিন কয়েকের মধ্যেই তো অ্যামেলিয়ার সব ভুলে যাবার কথা, আসলে সরটিনি নিজেই নিজেকে কলঙ্কিত করেছে, অ্যামেলিয়াকে নয়। আসলে আমি আশঙ্কিত হচ্ছি সরটিনির কথা ভেবে, তার ক্ষমতার এমন অপব্যবহারের কথা ভেবে যা একবার বার্থ হয়ে গেল অমন নগ্ন নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রকাশ করার জন্য আর অ্যামেলিয়ার মতো শক্ত মেয়ের তীব্র প্রতিরোধ। এই চেষ্টাই সম্পূর্ণ সফল হতে পারত আরো হাজার পরিস্থিতিতে সামান্য অনুকূল অবস্থায় আর তখন শিকার নিজেও তা বুঝে উঠতে পারত না।’

‘চুপ,’ বলল ওলগা, ‘অ্যামেলিয়া এদিকেই তাকিয়ে আছে।’ এর মধ্যে অ্যামেলিয়া বাবা মাকে খাওয়ানো শেষ করেছে।

এখন সে মার পোষাক পরিবর্তন করতে ব্যস্ত। মার স্কাটটা আলগা করে সে মা-র বাহু নিজের কাঁধে ন্যস্ত করে দেহটা একটু তুলে ধরে ও তারপর তলা থেকে স্কাটটা খুলে নেয় ও মাকে আবার খুব ধীরে নিচে বসিয়ে দেয়। সে আগে মার পোষাক পরিবর্তন করেছে বলে ক্ষুব্ধ হয়ে বাবা নিজেই পোষাক খোলার চেষ্টা করতে থাকে একবারও চিন্তা করে না যে তার স্ত্রী তার চেয়ে অনেক বেশি অক্ষম। এছাড়াও এমনটা করে সে তার কন্যাকে বোধ হয় কাল্পনিক শ্লথতার জন্য ভর্ৎসনা করতে চেয়েছিল।

কিন্তু যদিও সে সবচেয়ে সহজ ও কম প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়েই শুরু করে, পা থেকে তার বিশালাকার চটিজোড়াটা খুলতে যায় যার মধ্যে পা দুটি শক্ত হয়ে আটকে আছে। সে তা টেনে বার করার পর্যাপ্ত শক্তি পায় না, কয়েকবার বেশ জোরে হাঁফ টানতে টানতে বাধ্য হয়ে সেই চেষ্টায় ইতি টানে, পিঠ শক্তভাবে আবার চেয়ারে হেলান দেয়।

‘কিন্তু আসলে আপনি এখনো মোক্ষম ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না,’ বলল ওলগা, ‘আনি যা কিছু বললেন তা হয়ত সবই ঠিক, কিন্তু হেরেনহফ-এ না যাওয়াটা অ্যামেলিয়ার জীবনের একটা চূড়ান্ত ঘটনা হয়ে দাঁড়াল, বার্তাবাহকের সঙ্গে সে যে ব্যবহার করেছিল তার জন্য হয়ত তাকে মার্জনা করা হতো। ঘটনাটার উল্লেখই হতো না হয়ত। কিন্তু আমাদের পরিবারে অভিশাপ নেমে এল সে হেরেনহফ-এ না যাওয়ায়। আর সেটাই দূতের সঙ্গে তার দূর্ব্যবহারের অপরাধকে অক্ষমণীয় করে তুলল, হ্যাঁ, এটাই এমনকী তার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হয়ে দাঁড়ায়।

‘কী? সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে ওঠে কে কিন্তু তখনই গলা নামিয়ে নেয় যেহেতু ওলগা অনুনয়ের ভঙ্গিতে হাত তোলে, ‘তুমি কি তার বোন হয়েও বলতে চাইছ অ্যামেলিয়ার হেরেনহফ-এ দ্রুত যাওয়া উচিত ছিল সবটিনির ডাক পেয়ে?’

‘না,’ বলল ওলগা, ‘এমন সন্দেহ থেকে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন, আপনি এমনটা ভাবতে পারণে কী করে? আমি এমন কাউকে চিনি না যে অ্যামেলিয়ার মতো প্রত্যেকটি কাজ এত সৎভাবে করতে পারে। ও যদি হেরেনহফ-এ যেত তাহলে সেটাকেও আমি এমনভাবেই যথার্থ ভাবতাম, কিন্তু সেখানে না গিয়ে সে বাস্তবিকই অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। আমার নিজের ক্ষেত্রে বলতে পারি, খোলাখুলি বলতে লজ্জা নেই, এমন কোনো চিঠি পেলে আমি তো যেতামই। না গেলে আমার কী সর্বনাশ হতে পারে তা ভেবেই আমি পাগল হয়ে যেতাম। অ্যামেলিয়ার পক্ষেই শুধু এমন স্থির থাকা সম্ভব ছিল।

কারণ জটিলতার শেষ ছিল না। অন্য কোনো মেয়ে হলে সাজতে-টাজতেই বসে যেত, এতে কাটত বহু সময়। তারপর সে যখন হেরেনহফ-এ গিয়ে হাজির হতো তখন হয়ত শুনত সরটিনি চলে গেছেন, দেখা যেত হয়ত দূত পাঠাবার পরই চলে গেছেন। এমন সম্ভাবনাই প্রবল ছিল কারণ ভদ্রলোক খুব অস্থিরমতি।

কিন্তু অ্যামেলিয়া ওসব কিছুই করল না, সে গভীরভাবে অপমানিত বোধ করেছিল। ও যদি বাধ্যতার ভানও করত ঠিক সময় যদি হেরেনহফের চৌখাট ডিঙোত তাহলে আমাদের শাস্তি হয়ত মকুব করে দেওয়া হতো, আমাদের এখানে অনেক দক্ষ উকিল আছে যারা শূন্য থেকেও বড়ো অঘটন ঘটাতে পারে, কিন্তু এখানে আমাদের ক্ষেত্রে সেই শূন্যটুকুর অবলম্বন পর্যন্ত তাদের ছিল না, বরং অক্ষমণীয় অপরাধ হয়েছিল সরটিনির চিঠিকে অসম্মান ও বার্তাবাহককে অপমান করার।’

‘কিন্তু এসব শাস্তি, টাস্তি উকিল-এসবের কথা উঠছেই বা কেন?’ বলল কে, ‘নিশ্চিতভাবে অ্যামেলিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা বা তাকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে না সরটিনির দণ্ডার্হ কৃতকর্মের জন্য?’

‘হ্যাঁ,’ বলল ওলগা, ‘করা যেতে পারে, সাধারণ আইন অনুসারে নয়, তাকে সরাসরি কোনো শাস্তি দেওয়া হয়নি, কিন্তু দণ্ড তাকে পেতেই হয়েছে অন্যভাবে, তাকে ও সমস্ত পরিবারকেই, আর সেই শাস্তি যে কী ভয়ানক তা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে শুরু করেছেন। আপনার মতে সমস্তটাই অন্যায়। অমানবিক, কিন্তু সারা গ্রামে শুধু আপনিই এমন মতো পোষণ করছেন, আমাদের কাছে আপনার এই মত অবশ্যই অনুকূল, তা থেকে আমরা কিছুটা সাবুনাও পেতে পারতাম যদি না তা দাঁড়িয়ে থাকত ভুলের ওপর ভিত্তি করে। আমি সহজেই একথা প্রমাণ করতে পারি আর আমি যদি এই প্রসঙ্গে ফ্রিডাকে টেনে আমি আমাকে মার্জনা করবেন, ফ্রিডা আর ক্ল্যামের মধ্যেও, তাদের চূড়ান্ত পরিণতির কথা বাদ দিলে, গোড়ায় ব্যাপারটা ঘটেছিল ঠিক অ্যামেলিয়া আর সরটিনি মতোই, কিন্তু তবু দেখুন, গোড়ার দিকে আঘাত পেলেও, এখন কেমন আপনি সেটাকে স্বাভাবিক বলেই আপনি মেনে নিয়েছেন। আর তা শুধু এজন্য নয় যে আপনি এ ধরনের ঘটনায় অভ্যস্ত।

শুধুমাত্র অভ্যাস মানুষের সাধারণ বিচার শক্তিকে ভোঁতা করে দিতে পারে না, আসল ব্যাপার হলো আপনি সংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পেরেছেন।’

‘না, ওলগা,’ কে বলল, ‘তুমি কেন এসবের মধ্যে ফ্রিডাকে টেনে আনছ আমি বুঝতে পারছি না। তার ব্যাপারটা মোটেই এক ধরনের ছিল না, দুটো আলাদা বিষয়কে এক ভেবে গুলিয়ে ফেল না, এবার তোমার গল্পটা বল!’

‘দয়া করে রাগ করবেন না,’ বলল ওলগা, ‘যদি আমি তুলনাটা চালিয়ে যাই। তার ওপর আপনার এক ধরনের অন্ধ সংস্কার থেকেই আপনি ফ্রিডাকে কোনো রকম তুলনা থেকে বাঁচাতে চাইছেন, ওকে কোনোভাবেই রক্ষা করার প্রয়োজন নেই, ও বরং প্রশংসারই যোগ্য। দুটো ব্যাপারের তুলনা করে আমি বোঝাতে চাইছি না দুটোই একদম একই প্রকৃতির। সাদা আর কালোর মধ্যে যে ফারাক, তাদের দুজনের মধ্যেও তাই, আর সাদাটা হচ্ছে ফ্রিডা। লোকে বড়োজোর ফ্রিডাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করতে পারে, যেটা আমি পানশালায় গিয়ে করেছিলাম একটু রুঢ়ভাবেই -পরে অবশ্য সেজন্য অনুতপ্ত বোধও করেছি-কিন্তু কেউ যদি তাকে বিদ্রূপও করে তা সে করবে হিংসে বিদ্বেষ থেকে, খুব বেশি হলে কিছুটা হাসাহাসি। উল্টোদিকে, অ্যামেলিয়াকে লোকে শুধু ঘৃণাই করতে পারে যদি অবশ্য সে রক্তের সম্পর্কের কেউ না হয়। এ জন্যই দুটো ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, আপনি যেমন বললেন, কিন্তু তারা একই গোত্রের।’

‘তারা মোটেই এরকম নয়,’ কে বলল গৌয়ারের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে, ‘ফ্রিডাকে এসব থেকে বাদ দাও। সরটিনির মতো কারো কাছ থেকে ফ্রিডা চিঠি পায়নি আর ক্ল্যামের উপর ওর ভালোবাসাও নিখাদ ছিল, এ বিষয়ে তোমার কোনো সন্দেহ থাকলে ওকে জিজ্ঞাসা করতে পার। ও এখনো তাকে ভালোবাসে জেনো।’

‘কিন্তু সেটাই কি একমাত্র প্রভেদ?’ ওলগা জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি কি মনে করেন ক্ল্যামও একই ভঙ্গিতে ফ্রিডাকে লিখতে পারতেন না? ডেস্ক ছেড়ে ওঠার পর অধিকাংশ ভদ্রলোকই অমনটা হয়ে যান, বাইরের জগতের সঙ্গে নিজেদের তাঁরা মানিয়ে নিতে পারেন না। আর এই বিচ্ছিন্নতা বোধ থেকেই তাঁদের কথাবার্তা পশুর মতো হয়ে যায়, সবার না, কিন্তু অনেকেরই।’

অ্যামেলিয়াকে লেখা চিঠিটা হয়ত তড়িঘড়ি করে এক মুহূর্তে লেখা হয়েছিল, ভাষার কী অর্থ দাঁড়াতে পারে তা অগ্রাহ্য করেই কতগুলো শব্দ সাদা পাতায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঐ ভদ্রলোকরা কী ভাবেন তা আমরা বুঝব কী ভাবে? আনি নিজের কানেই শোনে ননি ফ্রিডার সঙ্গে ক্ল্যামে কী সুরে কথা বলেন? ক্ল্যাম তার রুঢ়তার জন্য কুখ্যাত, ঘটটার পর ঘটটা উনি হয়ত বোবা হয়ে বসেই কাটিয়ে দিলেন।

তারপর হঠাৎ এমন নিষ্ঠুর একটা কিছু করে বসলেন যে লোকের বুক আতঙ্কে হিম হয়ে গেল। সরটিনি সম্পর্কে এমন কিছু শোনা যায়নি। অবশ্য ওঁর সম্পর্কে লোকে জানেও সামান্যই। আসলে সেটা স্পষ্টভাবে জানা গিয়েছে তা হলো সরটিনির নামের সঙ্গে ওঁর নামের মিল রয়েছে। দুজনের নামের ওই মিলটা না থাকলে হয়ত লোকে তাঁকে আদপেই চিনত না। এমনকী দমকলের অন্যতম কর্তা হিসাবেও সরটিনির সঙ্গে ওঁকে গুলিয়ে ফেলা হয়। সরটিনিই কিন্তু আসল। সরটিনি তার সঙ্গে নামের মিলের

সুযোগটা নিয়ে অনেক কাজ সরটিনির কাঁধে চাপিয়ে দেন যাতে উনি নিজে নির্বন্ধাটে নিজের কাজ করে যেতে পারেন।

এখন, সংসার অনভিজ্ঞ সরটিনির মতো মানুষ যখন হঠাৎ আবিষ্কার করেন কোনো গ্রাম্য বালিকার প্রেমে পড়ে গেছেন তখন তাঁর আচরণ তো পাশের বাড়ির মিস্ত্রীর সাকরেদের চেয়ে আলাদা রকমের হবেই। আর এটাও মনে রাখা দরকার যে একজন আমলার সঙ্গে গ্রামের এক মুচির মেয়ের বিশাল ব্যবধান রয়েছেই, যেটা যেভাবেই হোক তাকে অতিক্রম করতেও হবে। আর সরটিনি সেটাই করতে চেয়েছিলেন ওই ভাবে, অন্য কেউ হয়ত অন্য পদ্ধতিতে এগোতে। অবশ্য ধরে নেওয়া হয় আমরা সকলেই দুর্গের অধিকারের মধ্যেই আছি। আমাদের দু পক্ষের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকার কথা নয়।

কিন্তু বাস্তবিকই অনেক ঘটনা ঘটার পর আমরা অনেক ভয়ানক প্রমাণের মধ্য দিয়ে বুঝছি আসল ঘটনা মোটেই তা নয়। সে যাই হোক, সব বিচার করে দেখলে সরটিনির আচরণ আপনার কাছে আর দুর্বোধ্য বলে মনে হবে না, অনেক কম দানবিকও মনে হবে, ক্র্যামের তুলনায় অনেক বেশি যুক্তিসংগতও বটে, অনেক বেশি সহনীয়। ক্র্যাম যখন প্রেমপত্র লেগেন তা সরটিনির সবচেয়ে নিষ্ঠুর চিঠির চেয়েও ঢের বেশি যন্ত্রণাদায়ক। আমাকে ভুল বুঝবেন না, ক্র্যামকে সমালোচনা করার সাহস আমার নেই, আমি দুজনের কোনো তুলনাও করছি না, কারণ কোনো রকম তুলনাই আপনি শুনতে রাজি নন। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে ক্র্যাম স্বৈচ্ছাচারী। উনি প্রথমে কাউকে ওঁর কাছে যেতে আদেশ দেন, তারপর আরো একজনকে, কিন্তু কাউকেই বেশিক্ষণ সহ্য করেন না, যেভাবে আসতে হুকুম দিয়েছিলেন সেভাবেই তাদের তাড়িয়ে দেন। ক্র্যাম এমনকী প্রাথমিক কোনো চিঠি লেখার কষ্টটুকুও স্বীকার করেন না।

সেক্ষেত্রে সরটিনি যে নিজের হাতে চিঠি লিখেছিলেন সুন্দর হস্তাক্ষরে সেটাকে কী অমানবিক বলা যাবে, ভাষা যতই আপত্তিকর হোক না কেন? ভদ্রলোক তেমন ভয়ানক প্রকৃতিরও নন তার স্ত্রীলোক বিষয়ে তাঁরা তেমন বদনামও তেমন শোনা যায়নি। সেক্ষেত্রে ক্র্যামের অনুকূলে বিষয়টা না গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে গেলেও ফ্রিডার ভালোবাসা তার উল্টোটা প্রমাণ করছে কীভাবে বলুন দেখি।

স্ত্রীলোক আর আমলাদের মধ্যে সম্পর্কটা এখানে, আমাকে বিশ্বাস করুন, নির্ধারণ করা বেশ জটিল ব্যাপার, কিংবা খুবই সহজ। সব কিছুর মধ্যে ভালোবাসা ঢুকে যাবেই। আমলার অসুখী প্রেম বলে কোনো বস্তুর অস্তিত্বই নেই। কথাটা মনে রাখলে এটা মোটেই প্রশংসার কথা নয় যদি বলা হয় কোনো মেয়ে-ফ্রিডা ছাড়াও আমি অনেক মেয়ের কথা বলছি-কোনো আমলার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে শুধু ভালোবাসার খাতিরে। সে তাকে ভালোবেসেছে ও তা রকছে আত্মসমর্পণ করেছে, এইমাত্র, এর মধ্যে প্রশংসার কিছুই নেই।

কিন্তু আপনি হয়ত প্রতিবাদ করে বলবেন অ্যামেলিয়া তো আর সরটিনিকে ভালোবাসেনি। হতে পারে, সে তাকে ভালোবাসেনি, কিন্তু ভালোবাসতেও তো পারে? কে স্থির করবে? সে নিজেও তা পারবে না। সে জোর দিয়ে কী করে বলতে পারে

তাকে ভালোবাসেনি যখন সরটিনিকে এমন ভীষণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল যেভাবে কোনো আমলা কখনো প্রত্যাখ্যাত হননি? বারনাবাস বলে সে নাকি সেই তিন বছর আগের জানলা বন্ধ করার হিংস্রতা স্মরণ করলে আজও কেঁপে ওঠে।

ঘনটানা সত্যি; এজন্য কেউ তাকে কোনো কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারে না, সরটিনির সঙ্গে তার সমস্ত ব্যাপার ঢুকে গেছে, সে শুধু এটুকুই জানে; তাকে ভালোবাসে কি বাসে না তা তার জানা নেই। কিন্তু আমরা ভালোভাবেই জানি কোনো মেয়েরই সাধ্য নেই কোনো আমলাকে ভালো না বসে যদি তাকে কোনোভাবে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলে, হ্যাঁ, অনেকে তো এমনকী আগে থাকতেই তাদের প্রেমে পড়ে যায় তা তারা যত অস্বীকারই করুক না কেন। সরটিনি শুধু অ্যামেলিয়াকে উস্কেই দেননি, নিজেও তাকে দেখে ইঞ্জিনের বাস-এর উপর দিয়ে লাফ মেরে এগিয়ে এসেছিলেন পর্যন্ত। ডেস্কের সামনে বসে বসে পা শক্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তিনি লাফটা দিয়েছিলেন ঠিক বড়ো লোহার ডান্ডাটার উপর দিয়েই। কিন্তু বলতে পারেন অ্যামেলিয়া এর ব্যতিক্রম।

হ্যাঁ, সে ঠিক তাই, সরটিনির কাছে না যেতে চেয়ে সে তাই-ই প্রমাণ করেছে, এতেই তার ব্যতিক্রমী চরিত্রটি বোঝা যায় ভালোভাবে। কিন্তু সেই সঙ্গে সে যদি সরটিনির প্রেমেও না পড়ে থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে লোকের বোঝার পক্ষে তার ব্যতিক্রম একটু বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায়। সেই বিকেলে আমরা উত্তেজনা অঙ্ক হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু মানসিক অস্থিরতার মধ্যেও কিন্তু আমরা অ্যামেলিয়ার মধ্যে প্রেমে পড়ার লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলাম। এতে বোঝা গিয়েছিল তখনো আমাদের বুদ্ধিশক্তি কিছু অবশিষ্ট ছিল। তাহলে সব হিসেব করে দেখলে বলুন দেখি ফ্রিডার সঙ্গে অ্যামেলিয়ার তফাত কতখানি থাকে এটুকু শুধু ছাড়া যে সে সেই কাজ করতে আপত্তি করেছে যেটা ফ্রিডা মেনে নিয়েছিল।

‘হতে পারে,’ বলল কে, ‘কিন্তু আমার কাছে আসল তফাতটা হলো এই যে আমি ফ্রিডার কাছে বাকদণ্ড আর অ্যামেলিয়া বিষয়ে আমার একমাত্র আশ্রয়ের কারণ এই যে সে দুর্গের বার্তাবাহক বারনাবাসের বোন আর অ্যামেলিয়ার অদৃষ্টের সঙ্গে বারনাবাসের কর্তব্য পালনের কোনো না কোনো সম্পর্ক থেকে যেতে পারে। দুর্গের কোনো আমলার হাতে অ্যামেলিয়াকে যদি নিষ্ঠুর অত্যাচার সহ্য করতে হয়ে থাকে,’ তোমার গল্পের গোড়ায় তেমনই একটা ইঙ্গিত ছিল, তাহলে হয়ত আমি বিষয়টা গুরুত্বের সঙ্গেই নিতাম, অ্যামেলিয়ার প্রতি ব্যক্তিগত সহানুভূতির কারণেই শুধু নয়, তার চেয়েও বেশি, সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে।

কিন্তু তুমি এইমাত্র যা বললে তাতে তো বিষয়টাই ঘুরে গেল, এমনভাবে যে আমি ঠিক বুঝেই উঠতে পারছি না তবু সব মেনে নিতে প্রস্তুত আছি; যেহেতু কথাগুলো বলছ তুমি, আর সে কারণে পুরো আলোচনাটার এখানেই ইতি-টানতে চাইছি। আমি দমকলের কোনো কর্মী নই, সরটিনিকে আমি চিনি না।

কিন্তু ফ্রিডা আমার কাছে তুচ্ছ নয়, ওকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এসেছি আর ভবিষ্যতেও ওর উপর বিশ্বাস করতে চাই, আর আমি অবাক হচ্ছি তুমি অ্যামেলিয়ার কথা বলতে বলতে কীভাবে বিষয়ান্তরে গিয়ে ফ্রিডাকে আক্রমণ করে বসলে, এভাবে

তুমি তার উপর আমার বিশ্বাসের ভিতটাই নড়িয়ে দিতে চাইছ। আমি অবশ্য মনে করি না তুমি কোনো পরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে তা করছ, কোনো বিদ্বেষ থেকে তো অবশ্যই নয়, তেমন হলে অনেক আগেই আমি বিদায় নিতাম। তুমি যে উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে কিছু করছ না তা আমি জানি, আসলে পরিস্থিতিই তোমাকে এমনভাবে ভাবতে বাধ্য করছে। অ্যামেলিয়াকে তুমি এত ভালোবাস যে তুমি তাকে সমস্ত স্ত্রীলোকের উপর স্থান দিয়েছ আর যেহেতু তুমি তার মধ্যে এমন কোনো গুণ খুঁজে পাওনি যাতে তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে, তুমি অন্যদের ছোটো করতে চাইছ তাকে তুলে ধরতে।

অ্যামেলিয়া যা করেছে তা খুবই উল্লেখযোগ্য কিন্তু তুমি যতই বলছ ততই স্থির করা শক্ত হয়ে উঠছে তার কৃতকর্ম মহান না তুচ্ছ, চতুর না নির্বোধের মতো, বীরত্বব্যাজক নাকি কাপুরুষোচিত। অ্যামেলিয়া তার উদ্দেশ্য নিজের বুকের মধ্যেই গোপন রেখেছে, কেউ তা কখনো জানতে পারবে না। ফ্রিডা, অন্যদিকে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু করেনি, সে শুধু হৃদয়ের অনুশাসন মেনে চলেছে, যে কেউ সহানুভূতি দিয়ে তার বিষয়টা বিবেচনা করলেই তা স্পষ্ট বুঝতে পারবে, তার ব্যবহারে লজ্জাজনক কিছুই নেই। সে যাই হোক, আমি অ্যামেলিয়াকেও ছোটো করতে চাই না আর ফ্রিডার হয়ে সওয়াল করারও আমার কোনো ইচ্ছে নেই, আমি শুধু ফ্রিডার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী তা বোঝাতে চাইছি, ফ্রিডার উপর যে কোনো আক্রমণ মানেই আমার উপর আক্রমণ। আমি এখানে স্বেচ্ছায় এসেছিলাম, স্বেচ্ছায়-ই বসবাস শুরু করেছি।

কিন্তু আমি আসার পর থেকে আমার ক্ষেত্রে যা কিছু ঘটেছে, সবচেয়ে বড়ো কোনো সম্ভাবনা যদি দেখা দিয়ে থাকে, তার জন্য আমি ফ্রিডার কাছে গভীরভাবে ঋণী। কোনো তর্ক করেই তুমি আমাকে সেটা ভোলাতে পারবে না। ঠিক কথা যে আমিন হিসেবেই আমাকে এখানে নিয়োগ করা হয়েছিল।

কিন্তু সেটা একটা ছুতোমাত্র, আমাকে নিয়ে ওরা খেলছিল শুধু, আমাকে সমস্ত বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর আজও ওরা আমায় নিয়ে খেলে যাচ্ছে, কিন্তু আমি যতই জটিল কোনো খেলার অঙ্গীভূত হয়ে পড়ি না কেন, তবু আমি তো কিছু পেয়েছি, তেমন বেশি কিছু না হলেও কিছু একটা আশ্রয়, একটা পদ আর করার মতো যথার্থ কিছু কাজ, বাকদত্তা এক রমণী, যে আমার পেশাগত কর্তব্যের ভার কাঁধে তুলে নেয় যখন আমি অন্যত্র কাজে ব্যস্ত থাকি। আমি খুব তাড়াতাড়ি ছাড়াও ক্ল্যামের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত একটা যোগাযোগও রয়ে গেছে। যদিও এখন পর্যন্ত তার সদ্ব্যবহার আমি করে উঠতে পারিনি। এসব নিশ্চয়ই যথেষ্ট আর আমি যখন তোমার কাছে আসি তুমিই বা আমাকে স্বাগত জানাও কেন?

কেনই বা তুমি তোমার পরিবারের ইতিহাস বিশ্বাস করে আমায় বললে? তুমি কেন আশা করে রয়েছ আমি তোমাকে সম্ভবত সাহায্য করতে পারব? নিশ্চিতভাবে এজন্য নয় যে আমি এমন একজন কানুনগো যাকে ল্যাসম্যান ও ব্রুনসউককের মতো মানুষ এক সপ্তাহ আগেও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল? বরং আমি একজন মানুষ যার পিছনে শক্তি রয়েছে। কিন্তু এজন্য আমার ঋণ ফ্রিডার কাছে কম নয়। সে এত বিনীত প্রকৃতির মেয়ে যে তুমি যদি তাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন কর দেখবে সে জানেই না এর

কোনো অস্তিত্ব রয়েছে। এই কারণে, সব কিছু বিচার করে মনে হয় অ্যামেলিয়া অহংকারের বশবর্তী হয়ে যতটা না করতে পেরেছে ফ্রিডা সিধে সরলভাবে পেরেছে তার অনেক বেশি, কারণ, আমার ধারণা তুমি অ্যামেলিয়ার সাহায্য চাইছ, আর কার কাছ থেকে? শেষ আশ্রয় হিসাবে আর কেউ না, সেই ফ্রিডার কাছ থেকেই।’

‘আমি কি ফ্রিডা সম্পর্কে এতই ঘৃণ্যভাবে কথা বলেছি?’ জিজ্ঞাসা করে ওলগা, ‘আমি একেবারেই ওভাবে কিছু বলতে চাইনি, বলেছি বলে মনেও করি না, তবে তা সম্ভব হতেও পারে। আমাদের অবস্থাটা খুব শোচনীয়, আমাদের নিজস্ব জগত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, আর তাই আমরা যখন অনুযোগ করতে শুরু করি আমাদের মস্ত ব্যবধান। তিন বছর আগে আমরা ছিলাম সম্ভ্রান্ত আর ফ্রিডা সমাজ থেকে বহিস্কৃত, ব্রীজ ইন-এর একটা সামান্য ঝি মাত্র, ওর পাশ দিয়ে যাবার সময় আমরা ওর দিকে তাকাতাম না পর্যন্ত। স্বীকার করি, আমরা একটু উদ্ধত প্রকৃতিরই ছিলাম, কিন্তু আমরা তো ওভাবেই বড়ো হয়েছি। কিন্তু সেদিন হেরেনহফ-এ গিয়ে আপনি সম্ভবত আমাদের পরিবর্তিত অবস্থানটা বুঝে নিয়েছেন। ফ্রিডার হাতে চাবুক আর আমি ঝি চাকরদের ভিড়ে। ব্যাপারটা কিন্তু তার চেয়েও খারাপ।

ফ্রিডা আমাদের অপছন্দ করতেই পারে, এখন তার যে মর্যাদা তা করার অধিকারও রয়েছে তার। বর্তমান পরিস্থিতিও তাকে এমনটা করতে বাধ্য করে থাকবে। কিন্তু এমন কে আছে যে আমাদের অপছন্দ করে না? যে আমাদের ঘৃণা করবে সেই সাদরে গৃহীত হবে এই এলাকায়। ফ্রিডার জায়গায় যে মেয়েটা এসেছে তাকে চেনেন। লোকে তাকে পেপি বলে। ওর সঙ্গে গত পরশু রাতে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। গোড়ায় ছিল শয়নঘরের পরিচারিকা। আমাকে ঘৃণা করার ব্যাপারে ও দেখলাম ফ্রিডারও এক কাঠি সরেশ। বিয়ারের জন্য আমি যখন ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম ও আমাকে জানলা দিয়ে দেখে ও দরজার কাছে দৌড়ে গিয়েই খিল তুলে দেয়। এর ফলে বহুক্ষণ ধরে আমাকে সেখানে দাঁড়িয়ে অনুনয় বিনয় করতে হলো।

শেষে যখন তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে তাকে আমার মাথার ফিতেটা দেব তখনই শুধু দরজা খুলে দিল। কিন্তু জিনিসটা যখন তার হাতে দিলাম তখন সে তা ছুঁড়ে ফেলে দিল এক কোণে। এখনো যদি আমায় অপছন্দ করে আমার তোমাদের ঘৃণা করার কারণ যোগাতে পারে তা বুঝতে আমি অক্ষম।’

‘ও কে,’ বলর ওলগা, ‘এমনকী আপনিও যে বুঝতে পারছেন না লোকে যে আমাদের ঘৃণা করে তার মূলে সরটিনির প্রতি অ্যামেলিয়ার ব্যবহার?’

‘ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। অ্যামেলিয়ার আচরণের জন্য লোকে তার প্রশংসা কিংবা নিন্দে করতে পারে। কিন্তু ঘৃণা? আর আমার বুদ্ধির অগম্য কোনো কারণে লোকে যদি তাকে ঘৃণা করেও থাকে সেই ঘৃণা তোমাদের আবৃত্ত করবে কেন? নিরীহ এক পরিবারকে? আর পেপি যে তোমাকে অপমান করেছে তার আসল কারণ তো তার নিবুদ্ধিতা, আবার হেরেনহফ-এ গেলে তাকে আমি এ কথাটা ভালোভাবেই বুঝিয়ে দেব।’

‘আপনি যদি বেরিয়ে পড়েন কে যারা যারা আমাদের ঘৃণা করে তাদের সবাইকে বদলাতে তাহলে আপনার কাজটাই খোয়াবেন কারণ সমস্ত কলকাঠি তো নাড়া হচ্ছে

দুর্গ থেকেই। যে বিকেলের কথা আমি আপনাকে বলেছি তার পরের দিনের সকালের খুঁটিনাটি আমি এখনও স্পষ্ট মনে করতে পারি। যথারীতি ক্রনসউইক এসে হাজির হয়েছিল, সে তখন আমাদের সহকারী, কাজকর্ম সেরে সে বিদায় নেয়। আমরা তখন প্রাতরাশ ঘিরে বসে আছি। আমরা সবাই, সেখানে অ্যামেলিয়া ও আমিও ছিলাম, বাবা উৎসব বিষয়ে ক্রমাগত বকে যাচ্ছিল, দমকল সম্পর্কে তার নানা পরিকল্পনাও আমাদের ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিল। আপনার জানা জরুরি দুর্গের নিজস্ব দমকল বাহিনী রয়েছে, উৎসবে সেখান থেকে প্রতিনিধিদের পাঠানো হয়েছিল, এ বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হলো, দুর্গের ভদ্রলোকেরা আমাদের ক্রিয়াপদ্ধতি খুঁটিয়ে দেখেন ও গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন আর খোলাখুলিই আমাদের সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে দুর্গের দমকল বাহিনী সম্পর্কে প্রতিকূল মতামতও দেন যার ফলে দুর্গের দমকলকে গ্রামের কোনো নির্দেশকের সহায়তার ঢেলে সাজানোর কিছু কথাও হয়, এর জন্য সম্ভাব্য পদপ্রার্থীরও অভাব ছিল না।

কিন্তু বাবার আশা ছিল তাকেই মনোগীত করা হবে। ওই নিয়েই বাবা কথা বলছিল আর তার স্বভাবসিদ্ধ মজার ভঙ্গি করে অর্ধেক টেবিলটায় প্রায় দুহাতে আঁকড়ে ধরে বসেছিল আর খোলা জানলা দিয়ে বাবা যখন খোলা আকাশের দিকে তাকাল তার মুখটা দেখাল একেবারে কোনো সতেজ যুবকের মতো। আশায় জুলজুল করছে। আর ওই শেষ আমি বাবার অমন মুখ দেখি। ঠিক তখন অ্যামেলিয়া স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে বলল, ওর মুখে অমন ভয় আমি আগে কখনো দেখিনি, দুর্গের ভদ্রলোকদের কথায় অতটা আস্থা রাখাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।

ওই ধরনের অনুষ্ঠানে নানা মধুর কথা বলাই ওঁদের অভ্যাস, কিন্তু বাস্তবে কথাগুলোর মূল্য সামান্যই কিংবা কিছুই নয়, কথাগুলো ওঁদের মুখ থেকে বেরোবার আগেই ওঁরা ওগুলো বেমালুম ভুলে যান, লোকে শুধু আরো একবার কথাগুলো শুনতে প্রস্তুত থাকে মাত্র। মা ওকে নিষেধ করল অমন ধরনের কথা বলতে, কিন্তু বাবা শুধু আবার হাসতে লাগল তার মহাজ্ঞানের নমুনা শুনে, কিন্তু হঠাৎ বাবা চমকে উঠল, চারদিকে তাকাতে লাগল যেন কী একটা ঠিক ধরতে পারছে না এমনভাবে-কিন্তু ধরবার কিছু ছিল না-আর বলল ক্রনসউইক বাবাকে একটা বার্তাবাহক ও ছেঁড়া চিঠি বিষয়ে কী যেন একটা গল্প বলেছে, এ বিষয়ে কি আমরা কিছু জানি? আমরা চুপ করে রইলাম। বারনাবাস সেই সময় একেবারে ছাগল ছানার মতো চনমনে ছিল। সে বোকার মতো কী একটা যেন বলেছিল। এরপর আলোচনার বিষয় বদলে যায় আর আমাদের মন থেকেও ব্যাপারটা মুছে যায়।

অ্যামেলিয়ার শান্তি :

এর বেশ কিছুকাল পরে অবশ্য চিঠির কাণ্ড বিষয়ে চতুর্দিকে থেকে হাজার প্রশ্নবাণে আমাদের দিশাহারা অবস্থা হয়ে উঠল। বন্ধুবান্ধব, শত্রুরা, পরিচিত লোকজন, সম্পূর্ণ অচেনা মানুষ আমাদের বাড়িতে দলে দলে আসতে লাগল। তাদের কেউই বেশিক্ষণ রইল না, বন্ধুরা সরে পড়ল সবার আগে। ল্যাসম্যান ধীর স্থির গভীর প্রকৃতি লোক। সে

এল এমন তাড়াহুড়ো করে যেন আমাদের ঘরের আয়তনটা মাত্র দেখতে এসেছে, একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করেই সে বিদায় নিল, তার পলায়নটা হলো শিশুদের কোনো ভীতিকর খেলার মতো। বাবা অন্যদের থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে তার পিছনে দরজা পর্যন্ত দৌড়ে গেল, তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

ব্রানসউইক এসে নোটিশ দিল আর খুবই স্পষ্টভাবে জানাল সে একাই ব্যবসা করতে চায়, অতি-ধূর্ত লোক, মোক্ষম মুহূর্তে সুযোগের সদ্যবহার জানে; খরিদদররা এসে বাবার গুদাম ঘরে এদিক ওদিক হাটকাতে লাগল যে বুটগুলো তারা মেরামত করতে দিয়েছিল সেগুলোর খোঁজে। প্রথমে বাবা তাদের মতো পরিবর্তন করাবার চেষ্টা করল—আমরাও তাকে এ ব্যাপারে যতটা পারি সাহায্য করলাম—কিন্তু শেষে বাবা হাল ছেড়ে দিল, একটাও কথা আর না বলে তাদের জিনিস খুঁজে দিল, অর্ডার-বুকে লাইনের পর লাইন খরিদদারদের অর্ডার খারিজ হয়ে গেল। আমাদের হাতে যত চামড়া ছিল সব ফিরিয়ে দিতে হলো। আমাদের কাছে যার যত ঋণ ছিল তাও শোধ হয়ে গেল। সমস্ত কিছুই হলো ন্যূনতম বাধা ছাড়াই, খুবই মসৃণভাবে। সবাই শুধু চাইছিল আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে যত দ্রুত সম্ভব, তাতে যদি তাদের ক্ষতিও হয়, তাহলেও কোনো পরোয়া নেই। এবং আমাদের অনুমান মতো সিম্যান এসে হাজির হলো, দমকলের ক্যাপ্টেন।

এখনো আমি দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখতে পাই, সিম্যান দাঁড়িয়ে আছে, লম্বা, শক্তপোক্ত কিন্তু ফুসফুসে সংক্রমণের জন্য অল্প একটু বুকো পড়া, বেশ গম্ভীর প্রকৃতির লোক, হাসি বলতে কী বোঝায় তা সারা জীবনে জেনে উঠতে পারেনি। সে দাঁড়িয়ে আছে বাবার সামনে। বাবার সে গুণগ্রাহী, সে এমনকী বাবাকে গোপনে সহকারী ক্যাপ্টেনের পদ পাইয়ে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দিয়েছিল। সেই তাকেই বাবাকে জানাতে হলো যে তাকে আর দমকলের কোনো প্রয়োজন নেই, আর তার কাছ থেকে ডিপ্লোমার পদকটা ফেরত চাইল। সেই মুহূর্তে যত লোক আমাদের বাড়িতে উপস্থিত ছিল সবকিছু ভুলে দুজনকে ঘিরে দাঁড়াল। সিম্যান কথা বলতে পারছিল না, সে শুধু বাবার কাঁধে টোকা দিচ্ছিল, যেন তার চেষ্টা যে কথা সে বলতে চায় অথচ বলতে পারছে না তা এইভাবে টোকা দিয়ে বাবারই মুখ দিয়ে বার করবে।

আর সে একনাগাড়ে হেসে যাচ্ছিল সম্ভবত নিজেকে আর উপস্থিত জনগণকে একটু স্ফুর্তির যোগান দিতে। কিন্তু যেহেতু সে কখনো হাসেনি আর কেউ তাকে আগে হাসতে শোনেনি কারো খেয়ালই হলো না যে সে হাসছে। কিন্তু সারাদিন ধরে সবাইকে তাদের জিনিসপত্র খুঁজতে সাহায্য করতে করতে বাবা অত্যন্ত ক্লান্ত আর মরিয়া হয়ে উঠেছিল। কী যে ঘটছে তা বাবার ক্লান্ত মাথাতে এলই না আমরাও হতশায় ভেঙে পড়েছিলাম, কিন্তু বয়স অনেক কম থাকায় আমাদের যে চূড়ান্ত সর্বনাশ হয়ে গেছে তা বুঝতে পারিনি, তাই আশা করছিলাম বিপুল সমাগত অতিথিদের মধ্যে কেউ এগিয়ে এসে এসবের পূর্ণচ্ছেদ টানবে, আবার ঘটনাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেবে। আমরা নির্বোধের মতো ভেবেছিলাম সিম্যানই সেই মানুষ। আমরা সার দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম কখন তার হাসি থামবে আর অবশেষে তার মুখ থেকে উচ্চারিত হবে চূড়ান্ত আগু বাক্যটি।

আমাদের উপর এমন অর্থহীন বোকার মতো অবিচার করা হয়েছে বলেই না সে এমন বিদ্রোহের হাসি হাসছে? ও ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন, এবার ওদের আদল কথাটা বলে দাও। আমরা ভাবছিলাম। আমরা তার ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িলাম কিন্তু সে যেন কুঁচকে গেল অতি অদ্ভুতভাবে। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য সে আবার কথা কইতে শুরু করল, আমাদের গোপন ইচ্ছা পূরণের মতো করে নয়, বরং জনতার ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত চিৎকারের জবাবেই যেন।

কিন্তু তবু আমরা আশা ছাড়িনি। সে আরম্ভ করল বাবাকে প্রশংসা করে একেবারে স্বর্গে তুলে দিয়ে। তাকে সে আখ্যা দিল দমকলের অলংকার, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এক আদর্শ দৃষ্টান্তস্বরূপ, এমন এক অপরিহার্য সদস্য যার অপসারণে, দমকরের পতন কেউ রুখতে পারবে না। এই পর্যন্ত ঠিক ছিল।

কিন্তু সে বলে চলল, এসব সত্ত্বেও যখন ঠিক করা হয়েছে, সাময়িকভাবেই অবশ্য, যে তাকে পদত্যাগপত্র জমা দিতে বলে হবে তখন সবাইকেই বুঝতে হবে পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর বলেই দমকল কর্তৃপক্ষ এমন ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছেন। আগের দিন যদি বাবা উৎসবে নিজেকে অত বিশিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত না করত তাহলে হয়ত অতটা চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিতে হতো না, কিন্তু তার দক্ষতার কারণেই আমলাদের দৃষ্টি দমকলের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে আর দমকলকে এত উল্লেখযোগ্য করে তুলেছে যে তার প্রশ্নাতীত খ্যাতি আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে গেছে। এ কারণে একজন বার্তাবাহক অপমানিত হওয়ায় দমকল এখন অসহায়, আর সিম্যান নিজেই এমন অস্বস্তি কর পরিস্থিতিতে পড়ে গেছে যে তাকেই সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দেবার দায়িত্ব নিতে হয়েছে। তার আশা বাবা বিষয়টাকে আরো ঘোরালো করে তুলবে না।

বক্তব্যটা শেষ করতে পেরে সিম্যান এখন স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল। নিজের উপরেই সে এত খুশি হয়ে উঠেছিল যে একটু আগের ফাঁপিয়ে তোলা কথাগুলো ভুল মেরে দিয়ে দেয়ালে ঝোলানো ডিপ্লোমার দিকে আঙুল তোলে। বাবা মাথা ঝাঁকিয়ে সেটা আনতে যায় কিন্তু তার হাত এত কাঁপে যে হুক থেকে ডিপ্লোমাটা নামাতেই পারে না। আমি একটা চেয়ারে উঠে তাকে সাহায্য করি। এই মুহূর্ত থেকেই বাবা একদম ঝিমিয়ে পড়ে, ফ্রেম থেকে এমনকী ডিপ্লোমাটা বার পর্যন্ত করে না, সবগুণ সিম্যানের হাতে তুলে দেয়। এরপর একটা কোণে গিয়ে বসে পড়ে। সামান্য নড়ে না, কারো সাথে কথা বলে না। অবশিষ্ট যে কটা লোক তখনো ছিল তাদের আমরাই সঙ্গ দিই।

‘তা এসব কিছুর মধ্যে দুর্গের হস্তক্ষেপটা তুমি দেখলে কোথায়?’ জিজ্ঞাসা করে কে, ‘এতক্ষণ পর্যন্ত দুর্গের কোনো হাত তো এসবের পিছনে দেখলাম না। তুমি এতক্ষণ যা কিছু বলেছ তাতে প্রকাশ পেয়েছে শুধু মানুষের অতি সাধারণ অর্থহীন ভয়, প্রতিবেশীকে আঘাত করার একধরনের হিংস্র আনন্দ, উদার বন্ধুত্ব-যে কোনো জায়গাতেই এসব দেখা যায়, আর আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমার বাবার কথা ধরলে- আমার অন্তত এটাই মনে হচ্ছে-বলতে হয় তার ভাবভঙ্গি খুবই মামুলি ধরনের, কারণ ডিপ্লোমাটা আসলে কী? তাঁর সামর্থ্যের একটা চিহ্ন বই তো কিছু নয়? তো, তাঁর সদগুণগুলো তো কেউ কেড়ে নেয়নি। ওগুলো তার চরিত্রে থাকলে উনি উঁচু মাথা করে

ভিপ্লোমাটা ক্যাপ্টেন কোনো কথা বলার আগেই যদি তার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিতেন নিজের থেকে তাহলেই বরং ক্যাপ্টেনের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াত।

কিন্তু আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে যে তুমি এত কথার মধ্যে অ্যামেলিয়ার কথা উল্লেখ পর্যন্ত করলে না। সব কিছুর জন্য অ্যামেলিয়াই তো দোষী অথচ সে পিছনে চূপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত বাড়িটা ধ্বংসে যেতে দেখল।

‘না,’ বলল ওলগা, ‘কাউকেই দোষ দেওয়া উচিত হবে না, কারোরই কিছু করার ছিল না, সবকিছু পূর্বনির্ধারিতভাবেই ঘটেছিল দুর্গের প্রভাবে।’

‘দুর্গেরই প্রভাবে,’ পুনরাবৃত্তি করল অ্যামেলিয়া, সে তাদের অগোচরে বারান্দা থেকে কখন যেন ঘরে এসে ঢুকেছিল, বুড়োবুড়িরা অনেক আগেই বিছানায় শুয়ে পড়েছে।

‘দুজনে মিলে দুর্গের কেচ্ছা আলোচনা করছ? এখনো দুমাথা এক করে বসে রয়েছ? অথচ এসেই তো কে আপনি যাবার জন্য উতলা হয়ে পড়েছিলেন আর এখন প্রায় রাত দশটা বাজে। ওই সমস্ত কেচ্ছায় সত্যিই কি আপনার আগ্রহ আছে? গ্রামের অনেক মানুষ তো ওসব নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়, তারা আপনাদের দুজনের মতোই মাথায় মাথা ঠেকিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা নানা কাহিনি নিয়ে মেতে থাকে।

কিন্তু আমার জানা ছিল না আপনিও তাদের একজন।’

‘ঠিক উল্টোভাবে বলা যায়,’ কে বলল, ‘আমি ঠিক তাদেরই একজন। যারা এসব গল্পগুজবে নির্লিপ্ত থেকে অন্যদের উপর তা করার ভার দেয় তাদেরই বরং আমার আকর্ষণীয় বোধ হয় না।’

‘তা হতে পারে,’ অ্যামেলিয়া বলল, ‘নানা মানুষের নানা বিষয়ে কৌতূহল, জানেনই তো। একবার একটা যুবকের কথা শুনেছিলাম দিনরাত দুর্গের কথা ছাড়া সে আর কিছু ভাবতে পারত না, কোনো কিছুতে তার মন ছিল না, লোকে ভাবল ওর মাথাটাই বিগড়ে গেছে, সবসময় দুর্গের চিন্তাতেই মগ্ন থাকত। অনেক পরে অবশ্য দেখা গেল সে যে ঠিক দুর্গ নিয়ে বাবে তা না, ভাবে আসলে ওখানকার একটা ঠিকে ঝি-র মেয়ের কথা। মেয়েটাকে ও পেয়েও যায় আর ওর কাণ্ডজ্ঞানও ফিরে আসে।’

‘ছেলেটাকে তো আমার ভালোই লাগছে,’ বলল কে।

‘ছেলেটাকে ভালো লাগার যে কথা বললেন তাতে আমার সন্দেহ থেকে গেল, আসলে আপনার তো ভালো লাগার কথা ওর বউকে। যাই হোক, আমি আর আপনাদের বিরক্ত করতে চাই না, আমারও বিছানায় যাবার সময় হলো, বুড়ো মানুষদের খাতিরে আলোটাও নিভিয়ে দেওয়া দরকার। ওরা এখন একবারে নিঃসারে ঘুমচ্ছে, কিন্তু আসলে এক ঘন্টার বেশি ঘুমতে পারে না, তারপর সামান্য আলোতেও ওদের ব্যাঘাত হয়, ‘শুভরাত্রি,’ এবং বাস্তবিকই এরপর ঘর অন্ধকার হয়ে যায় ও অ্যামেলিয়া মেঝেতে তার বাবা মার কাছে কোথাও শুয়ে পড়ে।

‘যে যুবকের কথা বলল সে কে?’ প্রশ্ন করল কে।

‘আমি জানি না,’ বলল ওলগা, ‘বোধ হয় ফ্রেনসউইক। যদিও ওর সঙ্গে পুরোটা ঠিকঠাক মিলছে না, তবে অন্য কেউও হতে পারে। ওর কথার অর্থ বোঝা সোজা নয়

কারণ কখন যে ও বিদ্রূপ করে বলছে আর কখন যে ও আন্তরিকভাবে কিছু বলছে তা ধরা যায় না। বেশিরভাগ সময়ই ও কথা বলে সরলভাবে কিন্তু শোনায়ে শ্রেষ্টের মতো।’

‘তোমায় ব্যাখ্যা করতে হবে না,’ বলে কে, ‘তুমি ওর উপর এতটা নির্ভরশীল হয়ে পড়লেই বা কী করে? বিপর্যয়টা ঘটান আগেও কি এমনই ছিলে? নাকি এটা হয়েছে পরে? তোমার কখনো ওর থেকে মুক্ত হতে ইচ্ছে হয় না? তোমার এই নির্ভরতার কোনো যুক্তি আছে কি? ও তো সকলের ছোটো, তোমার কাছেই বরং ওর মাথা নোয়ানোর কথা।’

অজান্তেই হোক কিংবা জ্ঞানতই হোক ওই কিন্তু তোমাদের পরিবারের সর্বনাশের কারণ। কোথায় সে তোমাদের কাছে প্রতিদিন ক্ষমা প্রার্থনা করবে সে জন্য, না সে সবার চেয়ে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে, নিজের বাবা মার বিষয়ে খেয়ালখুশি মতো কাজ করা ছাড়া আর কোনো ব্যাপারেই ওর মাথাব্যথা নেই। কিছুতেই ও তোমার কোনো ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চায় না, আর যদি তোমার সঙ্গে কোনো কথাও বলে তা নাকি আন্তরিকতার সঙ্গে যদিও তা শোনায়ে বিদ্রূপের মতো। সে কী তোমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে, সৌন্দর্যের কারণে? এটা তুমি বেশ কয়েকবারই বলেছ ইতিমধ্যে। তোমাদের তিন জনকে দেখতে কিন্তু অনেকটা একরকম।

কিন্তু অ্যামেলিয়া মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা কিন্তু ওর পক্ষে মোটেই প্রশংসার ব্যাপার না, সেটা দেখে প্রথমেই আমি ওর উপর এক ধরনের বিকর্ষণ বোধ করেছিলাম, আমি ওর ঠান্ডা কঠিন চোখের কথা বলতে চাইছি। আর বয়সে ও সবার ছোটো হলেও কিন্তু ওকে দেখে একদম তা মনে হয় না, বরং যেন মনে হয় ওর বয়স স্থির হয়ে জমে গিয়েছে, ওর কোন বৃদ্ধি নেই কিন্তু ও যেন কখনো অল্পবয়স্কও ছিল না। তুমি ওকে রোজ দেখ বলে ওর মুখের কাঠিন্য তোমার নজরে আসেনি। এই কারণে, ওর উপর সরটিনির তীব্র আকর্ষণটাকে আমি বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইছি না, সম্ভবত ও চিঠিটা পাঠিয়েছিল ওকে শান্তি দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই, নিজের কাছে ডেকে আনতে হয়।’

‘আমি সরটিনি বিষয়ে কোন তর্ক করতে চাই না,’ বলল ওলগা, ‘কারণ দুর্গের ভদ্রলোকদের পক্ষে সবই করা সম্ভব, যে কোনো মেয়ে যত সুন্দর বা কুৎসিতই হোক না কেন।’

কিন্তু অ্যামেলিয়ার বিষয়ে অন্য যা কিছু বললেন সবই সম্পূর্ণ ভুল। অ্যামেলিয়ার উপর আপনাকে সদয় করে তোলার ইচ্ছের পিছনে আমার কোনো উদ্দেশ্য নেই, আমি যদি তা করতে চেয়ে থাকি তা শুধু আপনার ভালোরই জন্য। এটা সত্যি যে আমাদের বিপর্যয়ের জন্য কোনো না কোনোভাবে দায়ী কিন্তু এমনকী আমাদের বাবা পর্যন্ত, যাকে সবচেয়ে কঠিন আঘাত পেতে হয়েছিল আর যার জিভের ধারণও খুব কম নয়, বিশেষ করে বাড়িতে, সেই বাবা পর্যন্ত অ্যামেলিয়াকে সামান্য ভর্ৎসনা পর্যন্ত করেনি। এইজন্য নিশ্চয়ই নয় যে বাবা তার আচরণে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল? বাবা সরটিনির একেবারে অনুগত ছিল।

তার পক্ষে মেয়ের আচরণ সমর্থনই বা কী করে করা সম্ভব? সব কিছু বুঝে ওঠা তার সুদূরতম চিন্তার বাইরে ছিল। সরটিনির জন্য বাবা এমনকী নিজেকে আর তার যা

কিছু ছিল সমস্ত অকাতরে বিসর্জন দিতে পারত, অবশ্য ঘটনা ঘটল তার প্রেক্ষাপটে নয়, যেটাকে সরটিনির ক্রোধেরই বহিঃপ্রকাশ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আমি ধরে নেবার কথা বললাম কারণ আমরা আর কখনো সরটিনির কাছ থেকে কোনো সাড়া পাইনি। ঘটনা ঘটানোর আগে উনি যদি স্বল্পবাক থেকে থাকেন, পরে যেন মারাই গেলেন। সেই সময় আপনি যদি অ্যামেলিয়াকে একবার দেখতেন। আমরা সবাই জানতাম আমাদের কোনো নির্দিষ্ট শাস্তি হবে না। আমরা শুধু পরিত্যক্ত হয়েছি।

গ্রাম আমাদের ত্যাগ করেছে, দুর্গও, কিন্তু যদিও এই গ্রামের ত্যাগ করাটা আমরা লক্ষ্য না করে পারলাম না, দুর্গ কিন্তু আমাদের কোনো ইঙ্গিতই দিল না সে ব্যাপারে। অবশ্য অতীতে আমরা যে দুর্গ থেকে অনুকূল ব্যবহারের ইঙ্গিত পেতাম তা নয়। সুতরাং প্রতিকূলতার কথাও ওঠা উচিত নয়। এই নৈঃশব্দই সবচেয়ে সাংঘাতিক। এখানকার মানুষজন যে আমাদের ত্যাগ করেছিল তার চেয়েও বহুগুণ মন্দ, কারণ তারা যে আমাদের ছেড়ে গেল তা কোনো স্থির বিশ্বাস থেকে নয়, আমাদের বিরুদ্ধ তাদের তেমন বড়ো কিছু অভিযোগ ছিল না, আজকের মতো তখন তারা আমাদের অত ঘৃণাও করত না, তারা যা করেছিল তার মূলে ছিল শুধু ভয়। তারা অপেক্ষা করছিল পরবর্তী ঘটনাক্রমের।

আর পরিত্যক্ত হবার পর আমাদেরও তেমন ভয় হয়নি, কারণ আমাদের অধমর্নরা সবাই ধার শোধ করে দিয়েছিল, সমস্ত পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলই ছিল। কোনো জিনিসপত্রের অভাব ঘটলে আমাদের আত্মীয়রা গোপনে পাঠিয়ে দিচ্ছিল; আমাদের জীবন সচ্ছলই চলছিল। সময়টা ছিল ফসল কাটার। আমাদের কোনো জমিজমা ছিল না আর কেউ আমাদের কাজও দেবে না। এজন্য জীবনে এই প্রথম প্রায় কর্মহীন অবস্থায় অভিশপ্তভাবে দিন কাটাতে আমরা বাধ্য হলাম। তাই আমরা জুলাই অগাস্ট মাসের গরমে দরজা জানলা বন্ধ করে বসে রইলাম। কোনো আমন্ত্রণ নেই, কোনো খবর আসে না, অতিথির দেখা নেই। একদম কিছুই না 'বেশ,' কে বলল, 'কিছুই যদি না ঘটে থাকে, তোমাদের মাথার উপরও যদি নির্দিষ্ট কোন শাস্তির খাঁড়া না ঝুলে থাকে তাহলে ভয়টা কীসের ছিল? তোমরা কেমন ধরনের মানুষ?'

'আমি আপনাকে কী করে বোঝাই!'

ওলগা বলল, 'আমরা ভবিষ্যতের কোনো কথা ভেবে তো ভয় পাইনি, আমরা তাৎক্ষণিক বর্তমানের চাপের মধ্যে ছিলাম, বাস্তবপক্ষে তখনই আমাদের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছিল। গ্রামের অন্যান্যরা অপেক্ষা করে ছিল আমরা কখন তাদের কাছে যাব, বাবা কখন আবার কর্মশালা খুলবে, অ্যামেলিয়া বনেদি পরিবারের জন্য পোষাক বানানোর সিদ্ধান্ত, কবে আবার সে অর্ডার নিতে বেরোবে, আসলে গ্রামের সব মানুষই তাদের ব্যবহারের জন্য মরবে মরে ছিল।

কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারকে গ্রামীণ সমাজ থেকে একঘরে করলে প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই তারা যখন আমাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা ভেবেছিল তারা তা করছে কর্তব্যের তাগিদেই, তাদের জ্ঞানগায় আমরা থাকলেও ঐ একই কাজই করতাম। ব্যাপারটা যে ঠিক কী হয়েছিল সে বিষয়ে তাদের কারোরই সুস্পষ্ট ধারণা

ছিল না, তারা শুধু এটুকুই জানত যে বর্তবাহক হেরেনহফ-এ ফিরে গেছে একমুঠো ছেঁড়া কাগজের টুকরো নিয়ে। তাকে আসতে ও যেতে দেখেছিল একমাত্র ফ্রিডা, তার সঙ্গে দু-একটা কথাও বলেছিল- তারপর তার এই অভিজ্ঞতাটুকুই সে সর্বত্র রাষ্ট্র করে দিয়েছিল, কিন্তু আমাদের উপর কোনো বিদ্বেষবশত নয়, অমন অবস্থায় লোকে যা করে থাকে সে-ও সেটুকু করেছিল মাত্র।

আর, একটু আগেই যেমন বললাম, সমস্ত ঘটনাটার সমাপ্তিটা মিলনাত্মক হলে সকলেই খুশি হতো। আমরা যদি হঠাৎ বেরিয়ে এসে খবর দিতাম যে সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, যে পুরো ব্যাপারটাই ভুল বোঝাবুঝির ফল আর তা মিঠে গেছে, কিংবা সত্যিই কোনো অপরাধের কারণ ঘটেছিল কিন্তু তা সংশোধিত হয়েছে, কিংবা-এটাতেও লোকে খুশি হতো- যদি বলা হতো দুর্গে আমাদের প্রভাবের কারণে বিষয়টা খারিজ হয়ে গেছে। এ সমস্ত বললে আমরা নিশ্চিতভাবে আবার সাদরে গৃহীত হতাম, চুমু টুঁমু খাওয়া হতো, সংবর্ধনাও দেওয়া হতো, আমি আমার জীবনে অন্যদের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটা ঘটতে দেখেছি।

এমনকী অত কিছু বলারও দরকার ছিল না। আমরা যদি শুধু বেরিয়ে এসে দেখা দিতাম, সবার সঙ্গে আবার সুসম্পর্ক স্থাপন করতাম চিঠির কথা উল্লেখমাত্র না করে তা হলেই যথেষ্ট হতো, তারাও ওই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে পেরে খুশি হতো। তারা যে আমাদের থেকে সরে গিয়েছিল তা শুধু ঘটনাটার বেদনার দিকটার কারণেই নয়, এর সঙ্গে মিশে ছিল আতঙ্ক, এ বিষয়ে কোনো কিছু শোনার কিংবা আলোচনার বা চিন্তা করার আতঙ্ক অথবা কোনোভাবে তাতে জড়িয়ে পড়ার মর্মান্তিক ভীতিবোধ। কারণে যাতে পুরো এলাকা জানতে পারে কী ঘটেছে ও তার থেকে সবাই শতহাত দূরে থাকে। আসলে অপবিত্র বোধ করে লোকে আমাদের ঘৃণা করেনি, করেছিল ঘটনাটাকে, যার সঙ্গে আমাদের পরিবারটা জড়িয়ে গিয়েছিল মাত্র।

তাই আমরা যদি আবার চুপচাপ এগিয়ে যেতাম অতীতের কথা ভুলে আর ব্যবহারে বুঝিয়ে দিতাম ব্যাপারটার ইতি হয়ে গেছে, যে কোনো ভাবে হোক না কেন, আমরা আমাদের বন্ধুদের কাছে ফিরে পেতাম ঠিক আগের মতোই, আর সমস্ত ঘটনা ভুলে যাওয়া আমাদের পক্ষে যদি অসম্ভবও হতো, বন্ধুরা নিজেরাই সহানুভূতির সঙ্গে এগিয়ে এসে আমাদের সাহায্য করত সেসব একদম ভুলে যেতে। এসব কিছুই না করে আমরা ঘরে বসে রইলাম।

ঠিক জানি না আমরা তখন ঠিক কী আশা করছিলাম। সম্ভবত অ্যামেলিয়ার কোনো সিদ্ধান্ত কারণ সকাল থেকেই সেই যে সে পরিবারের হাল ধরল তার রাশ আর কখনো টিলে করেনি। কোনো বিশেষ পরিকল্পনা কিংবা নির্দেশ বা অনুরোধ ইত্যাদি ছাড়াই সে সংসারে কর্তৃত্ব কায়ম করেছিল। আমরা বাকিরা অবশ্য অন্তর্হীন আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলছিল একনাগাড়ে ফিসফিসানি। কখনো বা হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে বাবা আমাকে কাছে ডেকে নেয় আর আমিও তার বিছানার ধারে মাঝ রাত পর্যন্ত বসে থাকতে বাধ্য হই।

কিংবা কখনো আমরা গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে যাই, আমি আর বারনাবাস, প্রথম দিকেটার সামান্য ধারণাও ছিল না কি ঘটছে আমাদের পরিবারে, সবার কাছে শুধু

খ্যাপার মতো ব্যাখ্যা চেয়ে বেড়াতে। কারণ সে এটা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল তার বয়সী ছেলেরা যে চিন্তাহীন নির্ভর জীবনযাপনের জন্য উন্মুক্ত হয়ে থাকে তা তার আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে চিরদিনের জন্য। তাই আমরা মাথায় মাথা ঠেকিয়ে বসে থাকতাম, কে, ঠিক এখন আমরা যেভাবে রয়েছি আর খেয়ালও করতাম না কখন রাত শেষ হয়ে সকাল হয়ে গিয়েছে। আমাদের মধ্যে মা ছিল সবচেয়ে দুর্বল কারণ বোধ হয় এই যে মাকে শুধু সার্বিক দুঃখই ভোগ করতে হয়নি, আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যথা বেদনাও তাকে সহ্য করতে হয়েছিল।

আর তাই আমরা আতঙ্কিত হয়ে তার বিপুল অবক্ষয় লক্ষ্য করলাম ও বুঝতে পারলাম আমাদের প্রত্যেকের জন্য একই পরিণতি অপেক্ষা করে রয়েছে। মায়ের প্রিয় জায়গা ছিল সোফার কোনটা, অনেক আগেই অবশ্য-সোফাটা বিদায় হয়েছে, এখন সেটাকে দেখা যাবে ব্রুনসউইকের বড়ো বসার ঘরে, সে যাক, মা ওখানেই বসত আর-ঠিক বলতে পারব না মা-র গন্ডগোলটা কোথায় হয়েছিল-হয় বসে ঝিমোত নয়ত বিড়বিড় করে নিজের সঙ্গেই লম্বা কথোপকথন চালিয়ে যেত, আমরা সেটা বুঝতে পারতাম শুধু মা-র ঠোঁট নাড়া দেখে। আমাদের কাছে রোজকার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সবসময় চিঠিটা নিয়ে আলোচনা করা। আমরা তার জানা দিকগুলো নিয়ে চুলফেরা বিশ্লেষণ করতাম ও তা থেকে অন্তহীন সম্ভাবনা টেনে বার করে আনতাম। এই সঙ্গে কী করে আবার অতীতের সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনা যায় এ বিষয়ে নানা পরিকল্পনা পেশ করে আমরা প্রত্যেকে পরস্পরকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতাম। এটাই ওই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক, অপরিহার্য ছিল।

কিন্তু তাকে ভালো বলা যায় না, যে বিষয়টাকে আমরা এড়িয়ে যেতে চাইছিলাম ঠিক তার ভিতরেই আমরা আরো গভীরভাবে ঢুকে যাচ্ছিলাম। আর যতই উজ্জ্বল বলে মনে হোক না কেন ঐসব উদ্দীপক আলোচনায় ভালোটা আর কী হলো? কোনো পরিকল্পনাই তো আসলে অ্যামেলিয়াকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারত না কিন্তু অ্যামেলিয়া সব সময় নির্বাক হয়ে থাকায় সেগুলো আর বাস্তবায়িত হয়ে ওঠার কোনো সুযোগ পেল না। আমার বলতে ভালো লাগছে যে তখনকার অ্যামেলিয়ার চেয়ে এখনকার অ্যামেলিয়াকে আমি অনেক ভালো চিনি, সেই সময় ওকে সহ্য করতে হয়েছিল আমাদের সকলের চেয়ে বেশি, বোঝা কঠিন কি করে অত দুঃখ কষ্ট ভোগ করেও ও আজও বেঁচে আছে। মা হয়ত আমাদের সবার দুঃখ একা ভোগ করেছে কিন্তু ওগুলো মার উপর বর্ষিত হয়েছিল কিন্তু দীর্ঘকাল মা সেগুলো আঁকড়ে বসে থাকেনি, কেউ বলতে পারবে না আজকেও সেগুলো মা মনের মধ্যে পোষণ করে। এমনকী সেই সময়ও মার মন অন্যরকম হয়ে যেতে শুরু করেছিল।

কিন্তু অ্যামেলিয়া শুধু কষ্টই সহ্য করেনি, সে তার দুঃখের কারণটাও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল। আমরা শুধু ফলাফলই দেখতে পাচ্ছিলাম কিন্তু সেই শুধু কারণটা জানত, আমরা আশা করছিলাম ছোটোখাটো কোনো না কোনো নিশ্কৃতির কিন্তু সে জানত যে সবকিছুই অমোঘ, আমরা চাপা স্বরে বল কইছিলাম কিন্তু তাকে থাকতে হচ্ছিল নীরব হয়ে। সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকে বাঁচবার চেষ্টা করতে হচ্ছিল যেমনটা তাকে

এখনো করতে হচ্ছে আর তাকে সহ্য করে নিতে হচ্ছে সবকিছু। সমস্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আমরা ওর চেয়ে ভালো ছিলাম। বলা বাহুল্য, ঘর ছাড়তে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। ব্রুনসউইক বাড়িটা নিয়ে নিল, আর কপালে জুটল এই কুঁড়েঘরটা, একটা ঠেলাগাড়িতে করে বেশ কয়েকবার যাতায়াত করে আমাদের জিনিসপত্র আমরা এ বাড়িতে নিয়ে আসি। আমি আর বারনাবাস সামনে থেকে গাড়িটা টানি আর বাবা ও অ্যামেলিয়া পিছন থেকে ঠেলে, মা আগেই এসে এখানে একটা সিন্দুকের উপর বসেছিল, তাকেই আমরা আগে চালান করেছিলাম, আসার সময় পুরো পথটা মা চাপা গলায় গুঁড়িয়ে কেঁদেছিল।

কিন্তু তবু আমার মনে পড়ছে সেই যাতায়াতের কঠিন শ্রমের মধ্যেও-সেটা যন্ত্রণাদায়কও ছিল কম না। কারণ পথে দেখা হয়ে যাচ্ছিল ফসলভরা শকটের সঙ্গে আর আমাদের দেখে লোকেরা চুপ মেরে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিল-এমনকী সেই যাত্রার মধ্যেও বারনাবাস ও আমি আমাদের দুর্দশার কথা আলোচনা করছিলাম, আমাদের পরিকল্পনার কথাও। আর গাড়ি টানতে টানতে হঠাৎ মাঝপথে স্থির দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম, আর বাবা তখন পিছন থেকে তাড়া দিয়ে উঠছিল, ‘কী হলো’ বলে।

কিন্তু সমস্ত আলোচনাই-নিষ্ফল হয়ে গেল আমরা সরে আসার পর। এবার আমরা বুঝতে শুরু করলাম দারিদ্রের কামড় কাকে বলে। আমাদের আত্মীয়রা আমাদের জিনিসপত্র পাঠানো বন্ধ করে দিল, হাতের টাকাকড়িও আস্তে আস্তে ফুরিয়ে এল। সেই সময় থেকেই লোকজন আমাদের ঘৃণা করতে শুরু করে আজও যা দেখছেন। তারা দেখতে পেল যে কলঙ্ক আমাদের গায়ে লেগেছে তা মুছে ফেলার মতো শক্তি আমাদের আর অবশিষ্ট নেই আর এতে তারা রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠল। তারা যে আমাদের সমস্যাটাকে খাটো করে দেখল ঠিক তা বলা যাবে না।

যদিও সেগুলো যে ঠিক কী তা তাদের জানা ছিল না আর তারা এও জানত তাদের নিজেদের জীবনে এমন ঘটলে আমাদের চেয়ে ভালোভাবে যে তারা তার মোকাবিলা করতে পারতো তাও নয়, কিন্তু তবু আমাদের থেকে শতহাত দূরে থাকাটাই তাদের কাছে শ্রেয় বলে মনে হলো-আমরা যদি সব বাধা কাটিয়ে জয়যুক্ত হয়ে তাদের সামনে হাজির হতে পারতাম তারা আমাদের যথোচিত সম্বর্ধনা দিত। কিন্তু যেহেতু আমরা হেরে গেলাম তারা সাময়িক চিন্তাটাকে স্থির সিদ্ধান্তে বদলে দিল। কেউ আর আমাদের সাধারণ মানুষ বলে মনে করত না, আমাদের নাম কেউ উচ্চারণ পর্যন্ত করত না, আর যদি উল্লেখ করতাই হয় তো বলত বারনাবাসের পরিবার কারণ তার দোষই সবচেয়ে কম বলে মনে করা হয়েছিল। এমনকী আমাদের কুটিরটার পর্যন্ত দুর্নাম হয়ে গেল, আপনি নিজেও স্বীকার করবেন, যদি আপনি সৎ হন, আপনিও প্রথমবার এখানে ঢুকে সেই দুর্নামকে যুক্তিযুক্ত ভেবেছিলাম।

পরবর্তীকালে মাঝে মধ্যে কেউ এসে উপস্থিত হলেও আমাদের ছোটোখাটো বিষয়ে নাক গলিয়ে খুঁত বার করত, যেমন ধরুন, টেবিলের উপর তেলের বাতিটাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে কেন। কিন্তু টেবিলের উপর ছাড়া ওটাকে ঝোলানোই বা যায় কোথায়? তবু তারা এটাকেও দোষের ঠাওয়ালো। কিন্তু আমরা যদি লণ্ঠুনটাকে অন্য

কোথাও ঝোলাই তাহলেও তারা সেটাকে সুনজরে দেখবে না। আমরা যাই-ই করি না কেন, আমাদের যাই-ই থাকুক না কেন, সবই অশোভন, সবই-মন্দ।

আবেদন পত্র :

আর ইতিমধ্যে আমরা কী করে বসলাম জানেন? যার থেকে মন্দ কাজ আর হয় না, আমাদের আসল অপরাধের চেয়েও ঢের বেশি নিন্দনীয় কাজ-আমরা অ্যামেলিয়ার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলাম, আমরা তার নীরব আত্মবিশ্বাসের গোড়ায় আঘাত হানলাম। আমরা আর ও ভাবে চলতে পারছিলাম না, কোনো না কোনো আশা ছাড়া আমাদের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। আর এ কারণে আমরা প্রত্যেকেই নিজের মতো করে প্রার্থনা করছিলাম দুর্গ যেন আমাদের ক্ষমা করে। আমরা অবশ্য জানতাম আমাদের অবস্থানটা এমন নয় যে আমরা কোনোভাবে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারি, আর এর ভালোভাবে জানা ছিল দুর্গের সঙ্গে আমাদের সংযোগের একমাত্র উপায় ছিলেন যে সরটিনি, যিনি বাবার উদ্ধৃতন ছিলেন ও তাকে সুনজরে দেখতেন-তার সঙ্গেও আমাদের সংযোগ ছিল হয়ে গেছে ঘটনাটার পর, কিন্তু তবু আমরা হাল ছাড়লাম না।

বাবাই আরম্ভ করল, একের পর এক চিঠি লিখে যেতে লাগল গ্রামপ্রধানকে, সচিবদের, উকিলদের, কেরানিদের। কেউই তার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলো না। কিন্তু যদি ভাগ্যক্রমে বা কৌশলের সাহায্য নিয়ে বাবা দু-একজনের সাক্ষাৎকার জোগাড় করে উঠতে পারল-তেনন কোনো খবর পেলে আমাদের আনন্দ আর দেখে কে? উৎসাহে আমরা হাতে হাত ঘষতে থাকতাম-তাতেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো ফল হলো না, সাক্ষাৎকার শুরু হতে না হতেই তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো, কখনো আর ঢুকতে না দিয়ে। তাছাড়া তার প্রশ্নের জবাব দেওয়াটাও খুব সহজসাধ্য ছিল, দুর্গের সেই সুবিধা বরাবরই থাকে। সে কী চায় আসলে? তাকে কী করা হয়েছে? তাকে ক্ষমাই বা করা হবে কোন অপরাধের জন্য?

দুর্গ কে কখন তার বিরুদ্ধে আঙুল পর্যন্ত তুলেছে? স্বীকার করা যেতে পারে সে দরিদ্র হয়ে পড়েছে, খরিদদার হারিয়েছে ইত্যাদি, কিন্তু এগুলো তো দৈনিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে কিছু দুর্ঘটনা মাত্র, সমস্ত দোকান বাজারে হামেশাই ঘটছে, এ সমস্ত ব্যাপারেই কি তাহলে দুর্গ ব্যস্ত থাকবে নাকি সবসময়? দুর্গ নিয়োজিত থাকে সার্বিকভাবে মানুষের কল্যাণে অবশ্যই কিন্তু দুর্গতো জাগতিক ঘটনাস্রোতে কোনো রকম ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে না কোনো বিশেষ মানুষের স্বার্থরক্ষার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। সে কি এমনটা আশা করছে নাকি আমলাদের পাঠানো হবে তার খদ্দেরদের জোর করে ধরে আনতে?

কিন্তু বাবা প্রতিবাদ করে বলত-আমরা সাক্ষাৎকারগুলো আগে পরে আলোচনা করতাম যেন অ্যামেলিয়াকে এড়াতেই কোণের দিক ঘেঁষে, সে অবশ্য ভালোমতোই জানত আমরা কী আলোচনা করছি কিন্তু কোনো গা দিত না-সে যাই হোক, বাবা প্রতিবাদ করত যে সে তার দারিদ্রের ব্যাপারে কোনো অনুযোগ করছে না। যা কিছু

বাবা হারিয়েছে তা সহজেই উদ্ধার করে নিতে পারবে, তা না হলেও তার কোনো আপত্তি নেই যদি তাকে শুধু ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

কিন্তু ক্ষমা করার কীইবা আছে?—উত্তর এল, তার বিরুদ্ধে তো কোনো অভিযোগ দায়ের করাই হয়নি, অন্তত রেজিষ্টারে তেমন কিছু উল্লিখিত হয়নি, সেই রেজিষ্টারে, যেটা সাধারণ উকিলের নাগালের মধ্যে থাকে। যতদূর দেখা গেছে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই নেই কিংবা কোনো কিছু বিষয়ে তার বিরুদ্ধে কোনো তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়নি। সে কী তার বিরুদ্ধে জারি করা হয়েছে এমন বিশেষ কোনো হুকুমনামার উল্লেখ করতে পারে? বাবা তা পারল না। বেশ, সে যখন কিছুই জানে না, আর কিছুই যদি না ঘটে থাকে তাহলে সে চাইছেটা কী? তাকে ক্ষমা করার প্রশ্নই বা তাহলে উঠছে কোথা থেকে? সে আজীবাজেভাবে বহুমূল্য সময়ের অপচয় করছে মাত্র আর সেটাই তার আসল অক্ষমণীয় পাপ। বাবা কিন্তু এতেও হাল ছাড়ল না, সেই সময়ে তার সামর্থ্যও ছিল প্রচুর। এছাড়া বাধতামূলক বিশ্রামের কারণে তার যথেষ্ট অবসরও ছিল। অ্যামেলিয়ার সম্মান আমি পুনরুদ্ধার করবই আর একাজে আমার সময়ও বেশি লাগবে না, বাবা প্রায়ই বারনাবাসকে একথা বলত আর আমাকেও দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার, অবশ্য বলত নিচু গলায় যাতে অ্যামেলিয়া শুনতে না পায়, কিন্তু বলত আসলে তাকে শোনাতেই। কারণ বাবা প্রকৃতপক্ষে অ্যামেলিয়াকে নিয়ে চিন্তিত ছিল না। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল দুর্গের ক্ষমালাভ করা।

কিন্তু মার্জনা পেতে হলে তার অপরাধটা তো আগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার, কিন্তু সমস্ত দণ্ডরই তা করতে অস্বীকার করল। তখন হঠাৎ এই ধারণাটা তার মাথায় ঢুকল—আর এ থেকেই বোঝা গেল মাথাটা তার এবার বিগড়াতে শুরু করেছে—তার অপরাধটা যে কী তা তার কাছে গোপন রাখা হয়েছে কারণ সে যথোপযুক্ত অর্থব্যয় করেছে না। এতদিন পর্যন্ত আমরা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনাই দিয়ে আসছিলাম, আমাদের আয়ের তুলনায় সেটা খুব কম ছিল না।

কিন্তু এখন বাবার ধারণা হলো আরো বেশি টাকা দেওয়া দরকার। এটাও একটা মস্ত ভুল ছাড়া আর কিছু নয় কারণ আমাদের আমলারা মাঝে মধ্যে ঝগড়াট কিংবা কটকচালী এড়াতে ঘুষ নিলেও ওভাবে আমাদের সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব ছিল না। তবু বাবা যখন ঐ পথই বেছে নিল আমরা বিরুদ্ধতা করে তাকে আরো হতাশার দিকে ঠেলে দিতে চাইলাম না।

সামান্য যেটুকু সম্পত্তি পড়ে ছিল আমরা বেচে দিলাম—তার সবই আমাদের কাছে অপরিহার্য ছিল—শুধু বাবাকে তার নবপ্রচেষ্টায় অর্থ যোগাতে আর বহুদিন ধরে প্রত্যেক সকালে এটা জেনে আমাদের শান্তি হতো যে বাবা যখন সারাদিন ঘুরে বেড়াবে তার পকেটে অন্তত কিছু টাকা পয়সা ঝনঝন করবে। বলা বাহুল্য সমস্ত দিন আমাদের প্রায় উপোস করেই কাটাতে হতো। আর কিছু পয়সা কড়ি পকেটে থাকায় বাবার এইটুকু উপকার হতো যে তার আশা ও আনন্দটা সজীব থাকত।

কিন্তু এসবে যে বিশেষ সুবিধা হলো তা মোটেই বলা যায় না। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে বাবার অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে উঠল আর দ্রুত স্বাভাবিক কোনো

পরিসমাপ্তিতে না গিয়ে অর্থব্যয় বরং তার কাজকে অন্তহীনভাবে প্রলম্বিত করে চলল। বাবার থেকে টাকা বাগাবার বিনিময়ে বাস্তবে যেহেতু বেশি কিছু করা সম্ভবই ছিল না, এখানে সেখানে কেরানিরা ভান করতে লাগল যে তারা অর্থগ্রহণের পরিবর্তে কিছু দিচ্ছে, কেউ প্রতিশ্রুতি দিল তার ব্যাপারটার খোঁজ খবর করবে, কিংবা কোনো একটা সমাধান সূত্র খুঁজে পেয়েছে আর শুধু বাবার প্রতি অনুগ্রহবশতই, কর্তব্যের খাতিরে নয়, তারা সেটা অনুসরণ করবে, আর বাবাও তাদের আচরণে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কিছু দেখার বদলে আরো বেশি করে তাদের বিশ্বাস করতে লাগল।

যেন কেবলা ফতে হয়ে গেছে এমন ভাব করে যত রাজ্যের জঞ্জাল প্রতিশ্রুতিগুলো বাবা বাড়ি বয়ে নিয়ে আসতে লাগল। আমার কাছে যন্ত্রণার ছিল যখন অ্যামেলিয়ার পিছনে বসে বাবা মুখ নাচিয়ে হাসত আর চোখ বড়ো করত অ্যামেলিয়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে আর আমাদের ইস্তিতে বোঝাত যে তার মুক্তির দিন খুব কাছেই ঘনিয়ে আসছে বাবার ক্রমাগত চেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে, কিন্তু এসব গোপন খবর আমরা যেন প্রকাশ করে না দিই। আরো বহুদিন হয়ত এই অবস্থা চলত যদি না তাকে টাকা দেবার মতো অবস্থা আমাদের আর থাকত। এর মধ্যে ব্রুনসউইক বারনাবাসকে সহকারীর কাজে নিয়েছিল অন্তহীন কাকুতি মিনতির পর এই শর্তে যে সে তার কাজ নিয়ে যাবে ঠিক সন্ধ্যার আগে আর আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবে অন্ধকার নামার পর-স্বীকার করতেই হবে আমাদের জন্য ব্রুনসউইক ব্যবসায় কিছুটা ঝুঁকি নিয়েছিল-কিন্তু এর পরিবর্তে বারনাবাসকে প্রায় কিছুই দিত না।

বারনাবাস একেবারে আদর্শ কর্মী হওয়া সত্ত্বেও যে টাকাটা সে মজুরী হিসেবে ঘরে আনত তা দিয়ে সার্বিক অনাহারের বদলে আমরা খুঁদকুড়ো খেয়ে অতিকষ্টে প্রাণটা টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন মাত্র। খুব সাবধানে যথাসম্ভব নরমভাবে আমরা বাবাকে জানালাম যে তাকে দেবার মতো টাকা সব শেষ হয়ে গেছে। আর বাবাও সব শুনল শান্তভাবে। ঘটনাস্রোতে মাথা গলিয়ে দিয়ে তাকে ঘোরাবার সমস্ত চেষ্টা যে কত অর্থহীন তা বোঝার শক্তি বাবা হারিয়ে ফেলেছিল ঠিকই কিন্তু ক্রমাগত হতাশার চাপে বাবার শক্তিও নিঃশেষ হয়ে এসেছিল।

বাবা বলল, এবার আর আগেকার মতো স্বভাবসিদ্ধ সুস্পষ্টভাবে নয়, যে তার আর সামান্য টাকারই শুধু দরকার ছিল কারণ পরের দিন বা সেদিনই তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা খোলসা হয়ে যাবার কথা। কিন্তু টাকার অভাব হলে তার এত দিনের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। ধ্বংস হয়ে যাবে তার সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন, এইসব আর কি। কিন্তু যে সুরে বাবা এসব বলে যাচ্ছিল তা বুঝিয়ে দিচ্ছিল যা কিছু বলছে তা বাবা নিজেই বিশ্বাস করে না। এছাড়াও বাবা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিজে থেকে একটা ফন্দি বার করল।

যেহেতু সে তার অপরাধ প্রমাণ করতে অপারগ হয়েছে ও তার ফলে সরকারি দিক থেকে তার পক্ষে আশা করার আর কিছুই নেই, তাকে এবার নির্ভর করতে হবে শুধু ব্যক্তিগত আবেদনের ওপর যাতে আমলাদের মন গলানো যায়। তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু সংবেদনশীল মানুষ আছেন যারা কর্তব্যের গণ্ডিতে বন্ধ থেকে সহানুভূতি দেখতে

পারছেন না। কিন্তু তাদের অফিসের কাজের পর বাবা যদি তাদের ঠিক সামনে ধরতে পারে নিশ্চয়ই তারা শুনবেন।’

কে এতক্ষণ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে সব শুনছিল। সে হঠাৎ ওলগার কথায় বাধা দিয়ে প্রশ্ন করে উঠল, ‘তোমার কি মনে হয় না তোমার বাবা ঠিকই ভেবেছিলেন?’

যদিও গল্পসূত্রে তার প্রশ্নের উত্তর স্বাভাবিকভাবে একটু পরেই আসতে বাধ্য তবু কে প্রশ্নটার জবাব চটজলদি আশা করে।

‘না’ বলল ওলগা, ‘সহানুভূতি বা ওই ধরনের কিছুর কোনো প্রশ্নই ছিলো না। অপ্রাপ্তবয়স্ক আর অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তখনও আমাদের তা জানা ছিল। আর বাবাও তা জানত অবশ্যই, কিন্তু অন্যান্য কিছুর মতো বাবা সেটাও প্রায় ভুলে গিয়েছিল। তার পরিকল্পনাটা ছিল দুর্গের সামনে প্রধান সড়কের ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা। এই পথ ধরেই ঘোড়ার গাড়িতে আমলারা যাতায়াত করেন, তারপর সুযোগ বুঝে তার ক্ষমা ভিক্ষার আদেশটি পেশ করা।

সত্যি বলতে কি, এই মতলবটা ছিল একেবারেই আজব আর কাভ্যজনহীনের মতো। ধরুন সবচেয়ে অসম্ভবটাও যদি সম্ভব হয়ে উঠত, কোনো আমলার কানে তার আবেদন গিয়ে পৌঁছত তাহলেই বা কী হতো? শুধুমাত্র একজন আমলা তাকে ক্ষমা করার কে? সেটাতো করতে পারে একমাত্র শাসকবর্গ।

কিন্তু তারাও শুধু দন্ড দিতেই পারেন। তারা তা মওকুফ করতে পারেন না। এসব মেনে নিয়েও ধরুন কোনো আমলা গাড়ি থেকে নেমে এলেন ঘটনাটা কী তা জানতে কিন্তু সেক্ষেত্রেও বাবার মতো বয়স্ক, ক্লান্ত, গরিব মানুষের মুখ থেকে নির্গত কিছু বিড়বিড় শব্দ শুনে পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে তাঁর কোনো স্পষ্ট ধারণা করে ওঠা কি আদর্শেই সম্ভব ছিল? আমলারা সবাই অতি উচ্চাশিক্ষিত কিন্তু একপেশে। নিজের দপ্তরে বসে কোনো আমলা শুধু একটা শব্দ থেকেই সমস্ত চিন্তাক্ষেত্রটি আত্মস্থ করে নিতে পারেন কিন্তু অন্য দপ্তর থেকে যদি কোনো কিছু তাঁকে এক ঘন্টা ধরেও ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয় তিনি সুভদ্রভাবে মাথা নেড়ে যাবেন কিন্তু তার বিন্দু বিসর্গও বুঝে উঠতে পারবেন না।

সেটা খুবই স্বাভাবিক, সাধারণ মানুষের খুব তুচ্ছ কোনো বিষয় নিয়েও যদি আপনি ভাবতে শুরু করেন ও তা বোঝার চেষ্টা করেন, যেটা কোনো আমলা কাঁধ ঝাঁকিয়েই ঝেড়ে ফেলেছেন, আপনি নিয়ে কিন্তু সারা জীবনেও তার মর্মোদ্ধার করে উঠতে পারবেন না।

কিন্তু বাবার সঙ্গে যদি কোনো দায়িত্বশীল আমলারও দেখা হয়ে যেত, তা হলেও প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছাড়া তাঁর পক্ষে কোনো কিছু সমাধান করে ওঠা সম্ভব হতো না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো নয়ই। কাউকে মার্জনা করার তাঁর অধিকারই নেই। তিনি শুধু সরকারিভাবেই সবকিছুর সমাধানের চেষ্টা করতে পারেন। আর তাই তিনি সরাসরি সরকারি প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে বাবাকে উপদেশ দিতেন। বাবার ক্ষেত্রে সে উপায়টা তো ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত ব্যর্থতার পর্যবসতি হয়েছিল। অমন একটা মতলব বানিয়ে বাবা নিজেকে একটা মস্ত ফাঁদের মধ্যেই আটকে ফেলেছিল। ওইভাবে সমস্যা সমাধানের

যদি সামান্যতম আশাও থাকত তাহলে রাস্তাটা তো আবেদনকারীদের ভিড়ে ঠাসা হয়ে থাকত ।

কিন্তু যেহেতু এটা একটা চূড়ান্ত অবাস্তব পরিকল্পনা, ক্ষুদ্রে ক্ষুল পড়ুয়ার মাথাতেই একমাত্র আসতে পারে, রাস্তাটা প্রায় জনহীনই থাকে কিন্তু হয়ত এটাই বাবার আশাকে আরো উজ্জীবিত করে তুলেছিল । বাবা সবকিছুতেই আশা করার কিছু খুঁজে পেত । আর তা তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়ও ছিল । কারণ সুস্থ মনের মানুষ তো খুব জটিল হিসেব নিকেশের গোলকধাধায় ঘুরে মরে না, সে বাহ্যিক প্রমাণ থেকেই বুঝে নেয় কোন বিষয়টা অসম্ভব । যখন আমলারা গ্রামে আসেন বা এখান থেকে দুর্গে ফিরে যান তা তাঁরা ফুটি করতে করেন না । করেন গ্রামে বা দুর্গে তাদের প্রপূর কাজ রয়েছে বলে । তাই তাঁদের ভ্রমণের গতি হয় অতি দ্রুত, এই সময় গাড়ির জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে আবেদনকারী খুঁজতে থাকবেন এমনটা বোধহয় সম্ভব নয় । এছাড়া গাড়ি ঠাসা থাকে কাগজপত্রে যেগুলো তাঁরা গাড়িতে বসে পড়েন ।

‘কিন্তু,’ বলল কে, ‘আমি এক আমলার শ্বেজের ভিতরটা দেখেছি, সেখানে কোনো কাগজই তো ছিল না’ ওলগার গল্পটা তার সামনে এমন এক বিশাল কিন্তু প্রায় অবিশ্বাস্য জগত তুলে ধরছিল যে সেও তার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা তাতে যুক্ত করার লোভ সামলাতে পারছিল না, যেন সেই জগত যে তারই মতো বাস্তব এটা নিজেকে বোঝাতে ।

‘তা অসম্ভব,’ বলল ওলগা, ‘আর আপনার ক্ষেত্রে তো ব্যাপারটা আরো খারাপ কারণ যা বললেন তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে সেই আমলাটির কাজ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কোনো মূল্যবান নথিপত্র বা প্রচুর পরিমাণে কাগজপত্র তার সঙ্গে রাখা সম্ভব ছিল না, আর আমলারা গাড়ি ছোটান পূর্ণ বেগে । সে যাই হোক, বাবার মতো সময় তাদের কারোরই ছিল না । এবং এছাড়াও দুর্গে যাবার আরো নানা পথ ছিল । কখনো কোনো রাস্তা খুবই চালু হয়ে ওঠে । বেশির ভাগ ঘোড়ার গাড়ি তখন পথ ধরেই যায় ।

আবার কিছুদিন পর হয়ত অন্য একটা রাস্তায় যাওয়াটাই প্রথা হয়ে দাঁড়াল, কি কারণে যে কোনো বিশেষ একটা পথ হঠাৎ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তা কখনো নির্ধারণ করা যায়নি । এক সকালে, আটটার সময় হঠাৎ দেখা যায় তাঁরা অন্যপথ দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু দশ মিনিট পরেই তৃতীয় রাস্তা ধরেন । আবার আধঘন্টা বাদে আবার ফিরে আসেন প্রথম রাস্তায় । তারপর সারাদিন হয়ত তাঁরা প্রথম রাস্তাটাতেই রইলেন । কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই পথ পরিবর্তনের একটা সম্ভাবনা থেকেই যায় ।

বলা বাহুল্য, সব পথগুলিই গ্রামের কাছে এসে মিশেছে । কিন্তু সেখানে গাড়িগুলো ছোটো উন্মত্তের মতো বেগে । কিন্তু দুর্গের, কাছে পৌঁছলে গতি আর অত তীব্র থাকে না । আর পথ নির্বাচনের মতো গাড়ির সংখ্যাও দুর্বোধ্যভাবে পরিবর্তিত হয় । দিনের পর দিন কেটে যায়, কিন্তু একটা গাড়ির দেখা মেলে না । কিন্তু কোনোদিন দেখা গেল গাড়ির ভিড় লেগে গিয়েছে । এবার আপনি বাবার ব্যাপারটা মনে রেখে এসব ভাবুন তো । তার সবচেয়ে ভালো স্যুটটা, যেটা তার একমাত্র স্যুটে এসেই দাড়িয়েছিল, পরে বাবা প্রত্যেক সকালে বাড়ি থেকে বেরোতো আমাদের সবার শুভেচ্ছা নিয়ে । সঙ্গে নিত

ছোটোমতো দমকলের একটা ব্যাজ, যেটা তার রাখবার অধিকার ছিল না, গ্রামের পথ বেরিয়েই বাবা ব্যাজটা পকেটে পুরে ফেলত, কারণ বাবার ভয় ছিল গ্রামের কেউ সেটা দেখে ফেলতে পারে।

যদিও সেটা এতই ছোটো ছিল দুহাত দূর থেকেও চোখে পড়ার কথা না। কিন্তু বাবা জোর দিয়ে বলত সেটাই নাকি একমাত্র চলন্ত গাড়িতে কোনো আমলার দৃষ্টি তার দিকে আকর্ষণ করে আনতে পারে। দুর্গের প্রবেশপথের কাছেই একটা সুরম্য উদ্যানের সামনে একটা বাজার রয়েছে। সেটার মালিক বারটুচ বলে একটা লোক। পাথুরে ধাপের ওপর বাবা তার থানা গাড়ল। বারটুচ কোনো আপত্তি করল না কারণ বাবার সঙ্গে তার হৃদয়তা গভীর ছিল আর এছাড়াও বাবা তার পুরনো খন্দের। তার একটা পা খোঁড়া ছিল আর বুঝলেন তার ধারণা ছিল একমাত্র বাবাই তার পায়ের উপযোগী বুট তৈরি করে দিতে সক্ষম। যাই হোক, বাবা তো সেখানে দিনের পর দিন গিয়ে বসে থাকতে লাগল। সময়টা ছিল স্যাঁতসেতে ঝোড়ো হেমন্তকাল। কিন্তু তাতে বাবার কোনো ক্রম্পে নেই।

প্রত্যেকদিন ভোরে নিয়মমতো বাবা খিল খুলে আমাদের বিদায় জানাত। আর সন্ধ্যাবেলা ভেজা কাক হয়ে বাড়ি ফিরত। প্রত্যেকদিন মনে হতো বাবা আরো একটু কুঁজো হয়ে গেছে, তারপর এক কোণে নিজেকে ছুঁড়ে দিত। প্রথম প্রথম তার সারাদিনের ছোটোখাটো অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের শোনাত।

যেমন, সহানুভূতি ও পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে কেমনভাবে বারটুচ বেড়ার বাইরে তার দিকে একটা কন্মল ছুঁড়ে দিয়েছে, কিংবা চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে সেদিন বাবা কোন কোন আমলাকে দেখে চিনতে পেরেছে, কিংবা কোনো এক কোচোয়ান তাকে চিনতে পেরে তার গায়ে চাবুক বুলিয়ে দিয়েছে, -এইসব। কিন্তু কিছুদিন পর বাবা এসব গল্প করা বন্ধ করে দিল। বোঝাই যাচ্ছিল ওখানে গিয়ে যে তার কোনোরকম কার্যোদ্ধার হতে পারে তেমন আশা বাবা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল। এটাকে সে শুধু একটা কর্তব্য বলে মনে করত মাত্র, এক ক্লাস্তিকর কর্তব্য, সেখানে প্রতিদিন যাওয়া আর সারাদিনটা সেখানে কাটিয়ে আসা।

এই সময়েই বাবার বাতের ব্যথা শুরু হয়। শীতের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছিল। তুষারপতন শুরু হয়ে গেল। শীতটাও সেবার এসে গেল আগেই। রাতে বাবা যন্ত্রণার আর্তনাদ করতে থাকল। সকালে উঠে অনেকবার ইতস্তত করত বেরোবে কিনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা কাটিয়ে বেরিয়ে পড়ত। মা হাত টেনে ধরে কিছুতেই তাকে যেতে দিতে চাইত না। এইভাবে আস্তে আস্তে বাবা হয়ে এল নিস্তেজ। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর তার বাধ্য নয়। শেষে মাও বাবার সঙ্গে বেরোতে লাগল আর মায়ের শরীরেও জ্বালা যন্ত্রণা আরম্ভ হলো। আমরাও তাদের কাছে গিয়ে হাজির হতাম কখনো তাদের খাবার পৌঁছে দিতে অথবা শুধুমাত্র তাদের দেখতে কিংবা বুঝিয়ে সুজিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে।

কতবার দেখেছি দুজনে দুজনের কাঁধে মাথা রেখে সংকীর্ণ জায়গাটার চাপ করে বসে আছে, পাতলা একটা কন্মলে তাদের শরীর ঢাকা, তাদের চতুর্দিকে ধূসর কুয়াশা

আর চাপ চাপ বরফ ছাড়া কিছু নেই, ধারে কাছে কোনো জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। একটা দৃশ্য, বুঝলেন কে, একটা দেখার মতো দৃশ্য। এক সকালে বাবা শক্ত পা নিয়ে বিছানা থেকেই আর নড়তে পারল না, কোনো সাহায্যেও কাজ হলো না। প্রলাপের মধ্যে বাবার মনে হলো সে দেখতে পাচ্ছে এক রাজপুরুষ বারটুচের বাগানের কাছে গাড়ি থামিয়ে সেই মুহূর্তে নামলেন, তারপর পুরো বেড়ার ধার ঘেঁষে তাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন, তারপর ক্রুদ্ধভাবে আবার গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়লেন মাথা ঝাঁকিয়ে। সেই মুহূর্তে বাবা বিকটভাবে চিৎকার করে উঠল।

যেন এতদূর থেকে সে রাজপুরুষের কাছে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করতে চাইছে আর অনুপস্থিত হবার জন্য তার কোনো দোষ নেই সেটাও বুঝিয়ে দিতে চাইছে। এরপর বাবা বহুদিন অনুপস্থিত রইল। না, আর কখনো ফিরে যায়নি। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে বিছানা ছেড়েও উঠতে পারল না। অ্যামেলিয়া শুশ্রূষার ভার নিল। বাবাকে ও শুধু খাওয়ায়, পাশে বসে থাকে, মাঝে মাঝে কিছু বিরতির কথা বাদ দিলে আজও সে তা চালিয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণা কমানোর কিছু ওষধি ওর জানা আছে, ওর ঘুমের দরকার হয় না, ও কখনো ভয় পায় না, কখনো অধৈর্য্য হয় না। এই বুড়োবুড়ির জন্য যা কিছু করা দরকার সব ও করে।

আমরা যখন আসলে কোনো সাহায্যই না করে এদিক ওদিক ছটফট করে অস্বস্তি তে মরছিলাম ও সব অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিল। এরপর যখন সবচেয়ে মন্দটা কেটে গেল আর বাবা কোনোমতে আমাদের দুজনের দুদিকে ভর দিয়ে বিছানা থেকে নামতে সমর্থ হলো অ্যামেলিয়া আবার আড়ালে চলে গেল বাবাকে আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে।

ওলগার পরিকল্পনা :

এবার দরকার হয়ে পড়ল বাবার শরীরের কথা মনে রেখে তার উপযোগী একটা কাজ খুঁজে বার করা। এমন একটা কাজ যাতে তার মনে হয় পারিবারিক গ্লানির বোঝা কমাতে সে অন্তত কিছু একটা করতে পারছে। তেমন কিছু একটা খুঁজে পেতে অসুবিধাও তেমন হলো না, বারটুচের বাগানের কাছে বসে থাকার চেয়ে যে কোনো কাজই অনেক উঁচুমানের কিন্তু আমি এমন একটা কাজ দেখতে পেলাম যাতে অন্তত কিছুটা আশা আছে, অন্তত আছে বলে আমার মনে হলো।

আমলা বা কেরানি কিংবা অন্য কেউ আমাদের অপরাধের প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা করলেই সরটিনির বার্তাবাহকের অপমানের কথাটাই কোনো না কোনোভাবে এসে পড়ত। এই গণ্ডীর বাইরে যেতে কেউ সাহস পেত না। এখন আমি নিজেকেই বললাম, যেহেতু জনমত, অন্তত প্রকাশ্যভাবে, এই বার্তাবাহকের অপমানের অতিরিক্ত আর কোনো অপরাধ স্বীকার করেনি তাহলে সবকিছু মিটে যেতে পারে যদি বার্তা বাহককে প্রসন্ন করা যায়, বাস্তবিক কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি, আমাদের তাই-ই জানানো হয়েছিল, কোনো দণ্ডও সে কারণে ঘটনায় হস্তক্ষেপ করেনি।

সুতরাং বার্তাবাহকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে অপরাধ মার্জনা করে দেবার, এর ফলে অবশ্যই গৃহীত সিদ্ধান্ত বদলে যেতে পারত ও তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটত না। শুধু একটা সাদৃশ্যমূলক কিছু ঘটার সুযোগ থাকত মাত্র আর তা থেকে যা বেরিয়ে আসত তাও আরেক সাদৃশ্য।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হলো এতেই আমার বাবা নিশ্চিতভাবে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে আর যে কেরানিরা তাকে অমনভাবে হেনস্থা করেছে তারাও যে কম অশান্তি ভোগ করবে না এটা নিশ্চয়ই বাবার খুব তৃপ্তিকর মনে হবে। কিন্তু সবার আগে তো দরকার সেই বার্তাবাহককে খুঁজে বার করা। বাবাকে যখন আমি এই পরিকল্পনাটা জানালাম বাবা প্রথমে খুবই বিরক্ত হলো। কারণ সত্যি বলতে কি, বাবা ভীষণ গোঁয়ার প্রকৃতির হয়ে উঠেছিল, শুধু নিজে যেটা ভালো বুঝবে তাই করবে; একটা দৃঢ় বিশ্বাস তার মনে গড়ে বসেছিল-তার অসুখের সময়ই এটা ঘটে-আর সেটা হচ্ছে আমরাই তাকে চূড়ান্ত সাফল্যে পৌঁছতে দিইনি, প্রথমে তার অর্থবরাদ্দ বন্ধ করে ও পরে তাকে বিছানা থেকে উঠতে না দিয়ে।

নতুন কোনো পরিকল্পনার অর্থ বোঝার মতো মানসিক শক্তি তার আর অবশিষ্ট ছিল না। আমি আমার মতলবটা পুরোপুরি বলার আগেই বাবা সেটা একেবারে খারিজ করে দিল। তার স্থির বিশ্বাস তার আসল কর্তব্য বারটুটির বাগানের কাছে গিয়ে আগের মতো অপেক্ষা করে থাকা আর যেহেতু সেখানে রোজ একা যাবার মতো সামর্থ্য তার শরীরে নেই আমাদের উচিত একটা হাতগড়িতে বসিয়ে তাকে নিয়মিত সেখানে পৌঁছে দেওয়া।

কিন্তু আমি হাল ছাড়লাম না আর ধীরে ধীরে বাবাও আমার পরিকল্পনাটা মেনে নিল, শুধু যেটা তার সুবিধের মনে হলো না তা হচ্ছে পুরো ব্যাপারটায় তাকে আমার ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবে কারণ আমিই একমাত্র বার্তাবাহককে দেখেছিলাম, বাবা তাকে চেনে না। আসলে সব বার্তাবাহককেই দেখতে প্রায় একরকম। আমি নিজেও তাকে আবার দেখলে চিনতে পারব কিনা এ বিষয়ে আমার সংশয় ছিল। কয়েকদিন পর থেকে আমরা হেরেনহফে যাওয়া শুরু করলাম, আর চাকরদের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করতে আরম্ভ করলাম। বলা বাহুল্য বার্তাবাহক সরটিনির কাজে নিযুক্ত ছিল আর সরটিনিও গ্রামে আসা বন্ধ করে দিয়েছিল।

কিন্তু ভদ্রলোকদের অভ্যাস ক্রমাগত তাদের ভৃত্য পরিবর্তন করা। আজ যে একজনের চাকর, দেখা যায় কালই সে অন্য কারোর কাজে নিযুক্ত হয়েছে। এই কারণে কোনো বিশেষ ভৃত্যকে যদি খুঁজেও না পাওয়া যায় তাহলে অন্য চাকরদের থেকে তার খবর সংগ্রহ করা খুব কঠিন কাজ নয়। এজন্য অবশ্য দরকার হচ্ছিল রোজ গিয়ে হেরেনহফে হাজিরা দেওয়া।

কিন্তু কোনো জায়গাতেই মানুষ জন তো আমাদের দেখে খুব খুশি হয় না, আর ওরকম জায়গায় তো নয়ই। এছাড়া নগদ পয়সার খরিদদার হিসাবেও যে ওখানে যাব তেমন সামর্থ্য আমাদের কোথায়? কিন্তু দেখা গেল কোনো না কোনোভাবে ওরা আমাদের কাজে লাগছেই। আপনি তো জানেনই চাকরগুলোকে নিয়ে ফ্রিডার কেমন

পাগল হবার উপক্রম হয়েছিল। আসলে লোকগুলো যে খারাপ তা না, শুধু কাজ না করে অসম্ভব অলস, অশিষ্ট হয়ে উঠেছে। আমাদের এখানে রাজপুরুষেরা পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করেন যে প্রিয় আঙবাক্যটি বলে তা হলো, ‘আপনি চাকরের মতো সুখে থাকুন।’

সত্যিই, সহজ জীবনযাত্রার কথা যদি বলতে হয় তাহলে দুর্গের আসল প্রভু এই ভৃত্যরাই। তারা নিজেদের মর্যাদা বিষয়ে খুব সচেতন। আর দুর্গে, যেখানে তাদের নিয়ম কানুন সব মেনে চলতে হয়, তাদের আচরণ শান্ত, সম্ভ্রান্ত ধরনের বলেই লোকের কাছে গুনেছি। এখনকার চাকরদের মধ্যেও তার ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু খুবই ক্ষীণ কারণ তার জেনে গেছে যে দুর্গের মতো কঠোর নিয়মকানুন এই গ্রামে নেই আর তাই এখানে চাকরদের চরিত্র অণ্য প্রকৃতির হয়ে উঠেছে। একেবারেই বিশৃঙ্খল ধরনের। তাদের সামলানোই দায়, কোনো নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে নিজেদের সদাঅতৃপ্ত প্রবৃত্তি অনুসারে তারা চলে।

তাদের চারিত্রিক অধঃপতনের কোনো সীমা নেই। তারা যে অনুমতি ছাড়া হেরেনহফ ছেড়ে বেরোতে পারে না সেটা গ্রামের সৌভাগ্যই বলতে হবে। কিন্তু হেরেনহফের মধ্যেও ওদের সঙ্গে মানিয়ে চলা খুব সহজ কাজ না।

ফিডাও নমুনাস্বরূপ, কাজটাকে অত্যন্ত কঠিন বোধ করে আনন্দের সঙ্গে তাদের ঠাণ্ডা রাখার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছিল। দুবছরেরও বেশি সময় ধরে সপ্তাহে অন্তত দুবার চাকরদের সঙ্গে আমার রাত কাটাতে হয়েছে। আস্তাবলে। তারও আগে যখন বাবার হেরেনহফে যাবার মতো শক্তি ছিল আমার সঙ্গে, তখন বাবা গিয়ে ঘুমোত ট্যাপরুমের কোনো একটা জায়গায় আর সকালবেলায় অপেক্ষায় থাকত আমি কখন তার কাছে কোনো খবর নিয়ে যাব। তেমন যে কোনো খবর থাকত তা নয়।

আজ পর্যন্ত সেই বার্তাবাহককে আমরা খুঁজে পাইনি। সে নিশ্চয়ই সরটিনির কাছেই আছে, প্রভুর কাছে তার দাম খুবই বেশি। সরটিনি যখন দূরের কোনো দপ্তরে কাজ নিয়ে চলে যান সেও নিশ্চয়ই তাকে অনুসরণ করেছে। তাকে আমরা শেষ দেখার পর অধিকাংশ চাকররাও তাকে আর দেখতে পায়নি, দু-একজন তাকে দেখেছে বলে দাবী করলেও সম্ভবত সেটা ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু না, সুতরাং বলা যেতেই পারে আমার পরিকল্পনাটা বাস্তবে ব্যর্থই হলো। কিন্তু তবু পুরোপুরি নয় বোধহয়। এটা সত্যি যে সেই বার্তাবাহককে আমরা খুঁজে পাইনি আর হেরেনহফ-এ নিয়মিত গিয়ে ও সেখানে রাতের পর রাত কাটিয়ে বাবার স্বাস্থ্যও একেবারে ভেঙে পড়ে, গত দুবছর ধরে বাবা এখন যেমন দেখছেন তেমনই অর্থহীন হয়ে আছে, কিন্তু তবু বলব মার চেয়ে বাবার অবস্থা তুলনায় ভালো।

প্রত্যেকদিন আমরা মায়ের মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকি। অমানুষিক চেষ্টা দিয়েই শুধু অ্যামেলিয়া মায়ের মৃত্যু ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু হেরেনহফ-এ আমার লাভটা হয়েছে এই যে দুর্গের সঙ্গে একধরনের সম্পর্ক সেখানে গিয়েই আমি স্থাপন করতে পেরেছে। আমার ওপর যেন আবার রাগ করবেন না যদি বলি আমি যা করেছি তার জন্য আমার কোনো অনুতাপ নেই। দুর্গের সঙ্গে আমার আবার কী সংযোগ স্থাপিত হতে পারে এমন

একটা সন্দেহ আপনার মনে নিশ্চয়ই উঁকি দিচ্ছে। আর আপনার সন্দেহটুকু ঠিক কারণ সংযোগ তেমন কিছু না। এখন আমি প্রচুর ভৃত্যকে চিনি, গত দুবছরে গ্রামে যত ভদ্রলোকদের চাকর এসেছে তাদের প্রায় সবাইকেই। তাই আমি যদি কখনো দুর্গে যাই নিজেকে আমার আর সেখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত বলে মনে হবে না।

বলা বাহুল্য, গ্রামেই শুধু তারা চাকর হিসাবে থাকে, দুর্গে তাদের সম্পূর্ণ অন্যরূপ। সেখানে তারা আমাকে কিংবা গ্রামে যাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হয়েছিল কাউকেই হয়ত চিনতে পারবে না, নিশ্চিতভাবেই, যদিও পশুশালায় কয়েক শ বার শপথ করে তারা আমাকে জানিয়েছে যে দুর্গে আবার আমার সঙ্গে দেখা হলে নাকি তাদের আনন্দের শেষ থাকবে না। ঐ সব শপথের মূল্য যে কতটুকু তা আমার হাড়ে হাড়ে জানা আছে। কিন্তু এটাও আসল ব্যাপার না। শুধু মাত্র চাকরদের মাধ্যমেই যে আমি দুর্গের সঙ্গে একধরনের সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছি তা নয়।

কারণ সেটা ছাড়াও আমার আশা ও বিশ্বাস এই যে ওখানকার কেউ ক্রমাগত আমার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করে চলেছে আর সেই পর্যবেক্ষক শেষ পর্যন্ত অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি, সদয়ভাবে আমার বিষয়টাকে দেখবে। সে হয়ত অনুধাবন করবে আমি কেমনভাবে আমার পরিবারের জন্য লড়াই করে চলেছি ও বাবার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি, যত দুর্বলভাবেই হোক না কেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি সে বিষয়টাকে দেখে তাহলে সে হয়ত চাকরদের আমার থেকে অর্থগ্রহণ করে নিজের পরিবারের পেছনে তা খরচ করার অপরাধও ক্ষমা করবে। এছাড়া আমার আরো একটা মস্ত লাভ হয়েছে যার জন্যও আপনি বোধ হয় আমাকে দোষ দেবেন।

দীর্ঘ সময় কখনো বা বছরের পর বছর ধরে নানা সরকারি জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে না গিয়ে কোনো পথে সহজ দুর্গে যাওয়া যায় সেটা আমি চাকরদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছি। এভাবে কাজ জোগাড় করলে অবশ্য কেউ নিজেকে সরাসরিভাবে দুর্গের কর্মচারী বলে দাবী করতে পারে না। সে শুধু আধা সরকারি, ঠিকে কর্মচারী মাত্র হিসেবেই চিহ্নিত হবে। তার না থাকবে কোনো অধিকার না কোনো কর্তব্য-এই কর্তব্য না থাকাটাই সবচেয়ে খারাপ-কিন্তু একটা সুবিধে তার থাকবে আর সেটা হচ্ছে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে সে অনুকূল সুযোগের অপেক্ষা করতে পারবে ও তা থেকে ফয়দা তুলতে পারবে। সে হয়ত প্রথাগতভাবে কর্মচারী নয়।

কিন্তু কপাল ভালো হলে কোনো কাজ তার জুটেও যেতে পারে। হয়ত কোনো আসল কর্মচারী হাতের কাছে পাওয়া গেল না। কিন্তু ডাক পড়েছে, তখন তাকেই দৌড়ে যেতে হতে পারে তাতে সাড়া দিতে এবং এক মুহূর্ত আগেও সে যা ছিল না তা হয়ে উঠল, এক কর্মচারী। এখন কথা এই, এমন সুযোগ তার আসতে পারে কবে? কখনো সঙ্গে সঙ্গেই, কেউ হয়ত সবে গিয়ে পৌঁছেছে; কিন্তু-ঘাড় ঘোরাবার আগেই হয়ত দুম করে সুযোগটা সে পেয়ে গেল, কিন্তু অনেকের আবার উপস্থিতিবুদ্ধি থাকে না, সবে কাজে ঢুকেছে তো, তাই সুযোগটা পেয়েও কাজে লাগাতে পারল না, কিন্তু অন্য কারো ক্ষেত্রে আবার হয়ত দেখা গেল তাকে বহু বছর অপেক্ষা করে থাকতে হলো, সরকারি কর্মচারীর চেয়েও দীর্ঘ সময়, আর লম্বা সময় ধরে আধা সরকারি কর্মচারী হয়ে

থাকতে থাকতে এমন অবস্থা হয় যে তার আর কখনো সরকারিভাবে নিযুক্ত হবার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না।

সুতরাং এমন কাজ নেবার আগে লোকে থমকে যেতেই পারে। কিন্তু তা মনে বেশিক্ষণ স্থান পায় না যদি কেউ একবার ভেবে দেখে যে সরকারিভাবে কর্মনিযুক্ত প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দুরূহ আর কোনো সন্দেহজনক পরিবার থেকে আগত কারো প্রার্থপদ আগেই বাতিল হয়ে যায়। ধরুন এমনই কেউ হয়ত নিজেকে পরীক্ষিত হতে দিল, এরপর আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে বছরের পর বছর পরীক্ষার ফলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। ঠিক প্রথম দিন থেকেই লোকে অবাক হয়ে তাকে প্রশ্ন করে চলেছে এমন আহাম্মকের মতো কাজ করার মতো সাহস তার হলো কী করে-কিন্তু সে তবু আশা করে বসে থাকে। এই আশাটুকু ছাড়া সে প্রাণ ধারণ করবে কি করে?

তারপর বহু বছর পরে সে তখন সম্ভবত একেবারেই বুড়ো, সে যখন জানতে পারে তাকে বাতিল করা হয়েছে সে অনুভব করে তার সব শেষ হয়ে গেছে, তার সমস্ত জীবনটাই চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ। এখানে অবশ্য, বলা বাহুল্য, ব্যতিক্রম রয়েছে। এই কারণেই লোকে সহজে প্রলুদ্ধ হয়ে পড়ে। মাঝে মধ্যে এমনও ঘটে, যে লোকটাকে কাজে নিয়োগ করা হলো সে আদর্শে খুবই সন্দেহজনক প্রকৃতির। দুর্গে এমন অনেক আমলা রয়েছেন যারা তাদের সততা সত্ত্বেও এই বেআইনী লোকগুলোর প্রতি একধরনের আকর্ষণ বোধ করেন, প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় এমন মানুষ জন দেখা মাত্র তাঁরা বাতাস শুঁকতে শুরু করেন, টোঁট চাটেন, তাদের দিকে অক্ষিগোলক ঘোরান। যেন ওই লোকগুলোকে তাদের ভারি উপাদেয় বলে মনে হচ্ছে, আর তারাও ভয় পেয়ে নীতিনিয়মের জাবদা খাতার আড়ালে আত্মগোপন করতে চেষ্টা করে তাদের নিয়োগকর্তাদের সেই দৃষ্টি থেকে অব্যাহতি পেতে।

কখনো অবশ্য পদপ্রার্থীরা তাতেও ছাড় পায় না, অন্তহীন ভাবে প্রাথমিক তদন্তে ছেদ পড়তে থাকে। কিন্তু কোনো ভাবেই তা বানচাল হয় না। শুধুমাত্র প্রার্থীর মৃত্যু হলেই তদন্তসূত্র ছিন্ন হয়। সুতরাং সরকারি নিয়োগের ব্যাপারটা এত জটিল যে তা বাইরে স্পষ্ট বলে মনে হলেও ভেতরে বহু কিছু লুকনো রয়েছে। তাই এই ক্ষেত্রে পা ফেলার আগে দরকার সমস্ত ভালোমন্দ খুব সতর্কভাবে বিচার করে দেখা। এখন আমি আর বারনাবাস ঠিক তাই করলাম। আমি হেরেনহফ থেকে ফিরে আসার পরই আমরা দুজন একত্রে বসতাম আর সেখান থেকে আমি যে সমস্ত তাজা খবর সংগ্রহ করে উঠতে পেরেছি তা বারনাবাসকে জানাতাম, দিনের পর দিন আমরা তা নিয়ে আলোচনা করতাম আর এর ফলে বারনাবাসের নিজের কাজ আর করে ওঠা হতো না, তার পক্ষে ক্ষতিকর ভাবেই কাজের পাহাড় জমে উঠত। এখানেও হয়ত আপনি আমার দোষ ধরবেন। আমি ভালোই জানি চাকর টাকরদের গল্পে বেশি নির্ভল করাটা ঠিক নয়।

দুর্গের খবর আমাকে দেবার ব্যাপারে তাদের আশ্রয়ের যে অভাব ছিল তাও আমার অজানা ছিল না। তারা এ কারণে প্রায়ই প্রসঙ্গ বদলে ফেলত, প্রতিটি শব্দ তাদের কাছ থেকে খুঁচিয়ে বার করতে হতো, কিন্তু এর পরই হয়ত সকলে মিলে একসঙ্গে কথা

কইতে শুরু করত আর অকারণে বকে যেত যত আজগুবি কথা, নিজের ঢাক পেটাত, অন্যকে ছাড়িয়ে যেতে অসম্ভব সব মিথ্যে কথা বলতে থাকত ।

সুতরাং অন্ধকার পশুশালার কুঠুরিতে সেই চাকরদের চিংকার হৈ চৈ এর মধ্য থেকে সত্যের কিছু সুস্পষ্ট গুঁড়ো মাত্র পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল, কিন্তু আমি কোনোকিছু জানা মাত্রই তা বারনাবাসকে জানাতাম ।

কিন্তু তখন তার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না কোনোটা ঠিক আর কোনোটা ভুল কিন্তু পরিবারের অবস্থা চিন্তা করে সে সমস্তই গোথ্রাসে গিলত, সব শুনে যেন সে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ত । আরো শোনার আগ্রহে তার উন্মত্ত অবস্থা । সত্যি বলতে কি, আমার পরিকল্পনার একটা খায়াই ছিল বারনাবাস । চাকরদের থেকে বেশি কিছু আর পাওয়া সম্ভব ছিল না । সরটিনির বার্তাবাহক কে খুঁজে পাওয়া যায়নি, কখনো আর পাওয়াও যাবে না । বার্তাবাহককে নিয়ে সরটিনি যেন দূর থেকে আরো দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিলেন । তাদের আকৃতি, নাম ইতিমধ্যেই বহু মানুষের স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে এসেছিল ।

বহুক্ষণ ধরে তাদের কথা বলার পর কোনো চাকর হয়ত অতি কষ্টে তাদের নাম স্মরণ করতে পারল কিন্তু দেখা গেল এর বেশি কিছুই আর তার মনে পড়ছে না । এদিকে আমার পক্ষে স্থির করা সম্ভব ছিল না চাকরদের সঙ্গে আমার মেলামেশাটাকে কোনো চোখে দেখা হচ্ছে, আমার শুধু আশা ছিল আমারই মতো দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্গ বিষয়টাকে দেখবে ও তার ফলশ্রুতি হিসাবে আমাদের পরিচারের অপরাধের বোঝা কিছুটা লাঘব করে দেবে । কিন্তু তেমন কোনো বাহ্যিক ইঙ্গিত আমার চোখে পড়ল না । কিন্তু তবু আমি লেগে রইলাম কারণ এ ছাড়া দুর্গ থেকে কীভাবে আমি সামান্য কিছু আদায় করতে পারি তা আমার মনে এল না ।

কিন্তু বারনাবাসের ব্যাপারে অন্য একটা সম্ভাবনার কথা আমার মাথায় এল । চাকরদের সঙ্গে কথাবার্তা থেকে আমি এই ধারণায় পৌঁছেছিলাম যে দুর্গে কেউ কাজ পেয়ে গেলে নিজের পরিবারের জন্য অনেক কিছু করতে পারে । কিন্তু এখানে আবার প্রশ্ন ওঠে এই ধারণার ভিত কতটা মজবুত? এ বিষয়ে অবশ্য নিশ্চিত হবার উপায় নেই, কিন্তু তবু কিছুটা ক্ষীণ সম্ভবনা হয় ছিলই । কারণ একবার কোনো এক চাকর, যাকে আমি আর কখনো দেখব না, কিংবা ভবিষ্যতে দেখলে চিনতেই পারব না,' গম্ভীরভাবে আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করল যে সে আমার ভাইকে দুর্গে একটা চাকরির ব্যাপারে সাহায্য করবে, কিংবা বারনাবাস যদি দুর্গে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আসে তাকে অন্যভাবে সহায়তা দেবে কিংবা নিদেনপক্ষে পাশে দাঁড়াবে-কারণ চাকরদের গল্প অনুসারে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে করতে কর্মপ্রার্থীদের অনেকেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে ।

কিংবা অনেকের মধ্যে পাগলামি দেখা দেয় আর এই অবস্থায় তাদের পাশে যদি কোনো বন্ধু না থাকে দেখাশোনার জন্য তাহলে তাদের সর্বনাশ হয়ে যায়-এমন কিছু বারনাবাসের ক্ষেত্রে ঘটলে তার পাশে দাঁড়াতে বলে অনেক চাকর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু তা ছিল একেবারেই অসার । কিন্তু বারনাবাসের তা মনে হয়নি । আমি অবশ্য

তাকে ওই প্রতিশ্রুতিতে কোনো রকম বিশ্বাসস্থাপন করতে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু এতদিনে সে আমার পরিকল্পনাটাকে একেবারে আত্মস্থ করে নিয়েছে।

আমার সন্দেহে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে চাকরদের গল্পগুলোকে সে একেবারে বেদবাক্যের মতো বিশ্বাস করে বসেছিল। আর তাই আক্ষরিকভাবেই যেন আমাকে আমার ওপরই ছুঁড়ে দেওয়া হলো। বাবা মা একমাত্র বুঝত অ্যামেলিয়াকে, আমি নিজের মতো করে যতই বাবার মূল পরিকল্পনাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম ততই অ্যামেলিয়া আমার থেকে নিজে-ক-গুটিয়ে নিতে থাকল। আপনি কিংবা অন্য কেউ সামনে থাকলে অ্যামেলিয়া আমার সঙ্গে কথা বলে বটে কিন্তু আমরা একা হলেই সে মুখে কুলুপ এঁটে থাকে। হেরেনহফ এর চাকরদের কাছে আমি একটা খেলনা ছাড়া আর কিছুই ছিলাম না।

অনেকবার তীব্র আক্রোশে এই খেলনাটাকে তারা গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে চেয়েছে, ওই দু-বছরে তাদের সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গ কথা পর্যন্ত আমি বলিনি। তাদের বলেছি শুধু চতুর, মিথ্যা ও সস্তা কিছু কথা। তাই আমার কথা বলার সঙ্গী ছিল একমাত্র বারনাবাস, কিন্তু তখন তার বয়স খুবই কম। তাই আমি তাকে ওসব কথা বলার পর যখন তার চোখে আলো জ্বলে উঠতে দেখলাম, যে আলো আজও তার চোখে রয়েছে, আমার আতঙ্কে বুক শুকিয়ে গেল।

কিন্তু তবু আমি থামলাম না, পরিকল্পনার ঝুঁকিটা এতই সাংঘাতিক ছিল। আমি স্বীকার করছি, বাবার মতো শূন্যগর্ভ না হলেও বিশাল মাপের পরিকল্পনা করার সাধ্য আমার ছিল না, পুরুষদের মতো দৃঢ়তারও অভাব ছিল আমার মধ্যে। বার্তাবাহকের অপমানটা কিভাবে ভালোর দিকে মোড় ফেরানো যায় শুধু এটুকু পরিসরের মধ্যেই আমি আমার ক্ষুদ্র চেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম, আর সামান্য আশা ছিল আমার এই চেষ্টাকেই আমার কৃতিত্ব বলে দেখা হবে। কিন্তু আমি নিজে যা করতে ব্যর্থ হয়েছি তাই আমি অন্যভাবে বারনাবাসকে দিয়ে করাতে চাইছিলাম। আমরা এক রাজদূতকে অপমান করে বহুদূরের কোনো দপ্তরে ঠেলে দিয়েছি।

সুতরাং এক্ষেত্রে এর চেয়ে আর কী বেশি স্বাভাবিক হতে পারে যে নতুন বার্তাবাহক হিসাবে বারনাবাসকে এগিয়ে দেওয়া যাতে করে সেই বার্তাবাহকের কাজকর্ম বারনাবাস চালিয়ে নিতে পারে ও অপমানিত বার্তাবাহকটি যতদিন ইচ্ছে শান্ত ভাবে বিশ্রাম উপভোগ করতে পারে, যতদিন না অন্তত সে অপমানটি বিস্মৃত হয়। আমি অবশ্য সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম যে আমার পরিকল্পনাটা যতই বিনীত ধরনের হোক না কেন, তার মধ্যে একধরনের ঔদ্ধত্য ঠিকই ছিল, যেন আমরা কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিতে চাইছি কী ভাবে আমাদের ব্যক্তিগত সমস্যাটার সমাধান করা উচিত, কিংবা যেন তাদের গৃহিত সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত বিষয়ে সন্দেহ ব্যক্ত করছি আমাদের কোনো পদক্ষেপ নেবার বহু আগেই তাদের কী, করা কর্তব্য ছিল।

কিন্তু তখনই আবার আমার মনে হলো কর্তৃপক্ষ যে আমাকে এতটা ভুল বুঝবেন তা একেবারেই অসম্ভব। কিংবা যদি তাই বোঝেন তা হবে এমনই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যে আমি কিছু করার আগেই তা খারিজ করে দেবেন। তাই আমি যেমন হাল ছাড়লাম না,

বারনাবাসের অশান্তি তাকে হার স্বীকার করতে দিল না। শুধু প্রতুতিপর্বেই বারনাবাস এতটা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল যে জুতো বানাবার কাজটা তার কাছে একেবারেই নগণ্য বলে বোধ হতে লাগল।

কিন্তু ভবিষ্যতের দগুর কর্মী? হ্যাঁ, সেটা তার যোগ্য কাজ, সে এমনকি এ নিয়ে সাহস করে অ্যামেলিয়ার মতের বিরুদ্ধেও কথা বলল, একেবারে খোলাখুলি, যখন অ্যামেলিয়া তার বিষয়ে দু-একটা মন্তব্য করল। তার স্বপ্নস্বামী সুখে অবশ্য আমার বিশেষ ভাবান্তর হয়নি, কারণ প্রথম দিন দুর্গে যাবার পরই যে তার যত সুখ ও ঔদ্ধত্য উপে যাবে তা সহজেই আগে থাকতে আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম। আর এর পরই শুরু হলো তার কাজের প্রহসন, সেটা আমি আপনাকে আগেই বলেছি। সেই প্রথম দিনই বারনাবাস যেভাবে অতি সহজে দুর্গে ঢুকতে পারল তা সত্যিই বড়ো বিস্ময়ের কিংবা আরো ঠিকভাবে বলতে গেলে যেভাবে সে দগুরে ঢুকল; সেটাই তার আসল জায়গা হয়ে দাঁড়ায় কালক্রমে।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে বারনাবাস যখন তার সাফল্যের খবরটা আমার কাছে ফিসফিস করে বলল তখন আমি তো একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠলাম, আমি অ্যামেলিয়া কাছে দৌড়ে গেলাম, জাপটে ধরে কোনে টেনে নিয়ে গেলাম ও চুমু খেলাম এত বন্যভাবে যে সে ভয়ে ও আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। উত্তেজনায় আমি আর কিছু বুঝিয়ে উঠতে পারি না। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরে তার সঙ্গে আমার বাক্যলাপও ছিল না। তাই পরের দিন কিংবা তারও পরের দিনের আগে আমি তাকে কিছুই বললাম না। পরের কয়েক দিনে অবশ্য বলবার মতো আর বিশেষ কিছু ছিল না। প্রথম দ্রুত সাফল্যটার পর আর কিছু ঘটল না।

দীর্ঘ দুবছর ধরে বারনাবাস এই হৃদয়বিদারক জীবন কাটাচ্ছে। চাকরগুলো আমাদের একেবারেই ভাঁওতা দিল। আমি বারনাবাসের হাতে একটা চিরকুট পাঠিয়েছিলাম তাদের উদ্দেশ্যে তার কথাটা একটু ভেবে দেখার অনুরোধ করে। তাদের পূর্বপ্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দিয়ে। এরপর বারনাবাস ধারে কাছে কোনো চাকর দেখতে পেলেই চিরকুটটা তার সামনে মেলে ধরতে লাগল।

কিন্তু সেই চাকর আমাকে চিনুক বা না চিনুক সেটা দেখেই ক্ষেপে যেতে লাগল, নিঃশব্দে তার সেটা চোখের সামনে মেলে ধরার ভঙ্গি থেকে-বারনাবাস ওখানে কথা বলত না ভয়ে-কেউ যে ওকে কোনো সাহায্য করল না এ বড়ো লজ্জার কথা। আর আমরা হাঁফ ছেড়েই বাঁচলাম যখন একটা চাকর, বোধ হয় বার বার ওই চিরকুট দেখে মেজাজ হারিয়ে একদিন বারনাবাসের হাত থেকে সেটা কেড়ে নিয়ে বাজে কাগজের বুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিল, যেটা আমাদের নিজেদেরই অনেক আগে করা উচিত ছিল।

আমার মনে হলো চাকরটা যেন ঐ কাজটা করে বলতে চাইল 'চিঠি নিয়ে তোমরা ঠিক এই কাজটাই তো কর।'

কিন্তু পরবর্তী দিনগুলো বারনাবাসের একেবারে বন্ধ্যা কাটলেও অন্য দিক দিয়ে তার একটা ভালো ফল বলল তার উপর, যদি অবশ্য তার অকালপক্কতাটাকে ভালো বলা যায়, সময়ের আগেই সে পূর্ণবয়স্ক হয়ে উঠল, হ্যাঁ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো বহু

মানুষের চেয়েই বেশি রাশভারি ও বুদ্ধিমান, মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকিয়ে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। মাত্র দুবছর আগের একটি বালকের সঙ্গে ওর তুলনা করি।

কিন্তু এটাও ঠিক পুরুষ মানুষ হয়ে উঠে সে আমাকে অনেক বেশি স্বস্তি ও নির্ভরতা দিতে চেয়েছে। আমাকে বাদ দিয়ে সে দুর্গে ঢুকতে পারত না বটে কিন্তু সেখানে ঢোকার পর আর আমার ওপর তাকে নির্ভর করতে হয়নি। আমিই তার একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিন্তু আমি নিশ্চিত সে আমাকে তার চিন্তার সামান্যই ভাগ দেয়, ও আমাকে দুর্গ বিষয়ে বহু কথা বলে কিন্তু তার প্রচুর গল্প থেকে, অভিজ্ঞ খুঁটিনাটি থেকে কেউ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারবে না সেসব তাকে অমনভাবে বদলে দিল কীভাবে।

বিশেষ করে আমার বুদ্ধির অগম্য কি ভাবে তার মতো দুর্ধর্ষ একটি বালক-ওকে নিয়ে আমাদের আশঙ্কার অন্ত ছিল না-পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হয়ে উঠে অমন ম্যাডমেডে ধরনের হয়ে গেল। অবশ্য এটা ঠিক যে সারাদিনভাবে অর্থহীনভাবে অপেক্ষা করতে করতে, দিনের পর দিন ওভাবে কাটিয়ে, সুসময়ের সমস্ত আশাই হারিয়ে দিনযাপন করতে বাধ্য হলে যে কোনো লোকই ভেঙে পড়তে বাধ্য, তার আত্মবিশ্বাসও সম্পূর্ণ চূর্ণ হয়ে যাবেই আর একেবারে শেষে ঐভাবে আশাহীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে একেবারে যে অক্ষম হয়ে পড়বে এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু একেবারে গোড়াতেই বা ও এ নিয়ে লড়াই শুরু করেনি কেন? বিশেষ করে যখন দেখা গেল যে সে বুঝতে পেরেছে আমি তাকে যা বলেছিলাম তা যথার্থ, যে ওখানে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের কোনো সুযোগই সে পাবে না, যদিও অবশ্য আমাদের পরিবারের পক্ষে আশাজনক কিছু ঘটতেও পারে। কারণ ওখানে চাকরদের খেয়ালখুশি সত্ত্বেও সমস্ত কিছুই চলতে থাকে খুবই সুশৃঙ্খলভাবে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেহেতু কাজের মধ্যেই শুধু তৃপ্তি খোঁজে ও ওখানে কর্মধারা ধাবিত হয় ক্রমাগত উর্দ্ধস্তরের দিকে, উচ্চাকাঙ্ক্ষার কোনো অস্তিত্বই আর থাকে না আর সেখানে, সস্তা কামনা বাসনার কোনো স্থান নেই ওখানে। তা হলেও বারনাবাস অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিল, আমাকে সেরকমই সে বলে, যে ওখানে গিয়ে সে দেখতে পায় রাজকর্মচারীদের জ্ঞানের শক্তি কি বিপুল।

যে দপ্তরে সে প্রবেশাধিকার পেয়েছে তার অনেক আমলারাও, যদিও তাদের অনেকের সততাই প্রশ্নাতীত নয়, কি দ্রুতই না তারা কেরানিদের নির্দেশমূলক পাঠ দেন, চোখ অর্ধমুদিত রেখে, সংক্ষিপ্ততম ভঙ্গি করে, অস্থির ভৃত্যকে শুধুমাত্র একটি আঙুল তুলে নিরস্ত করে ও তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে যখন তাদের কঠোরভাবে শাসন করছেন। এইসব ব্যাপার ও আরো অনেক ঘটনা বারনাবাসকে সেই আমলাদের বিপুল শক্তি সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা দিয়েছিল। তার মনে হয়েছিল একবার যদি ধৈর্য্য ধরে থেকে সে একবার তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে ও সেই দপ্তরে তাঁদের সঙ্গে দু-একটা কথা বলার সুযোগ পায়, আগন্তুক হিসাবে নয়, সহকর্মী হিসাবে-অবশ্য খুবই নিম্নস্তরের অধীনস্থ একজন সহকর্মী-তাহলে আমাদের পরিবারের জন্য অকল্পনীয় অনেক কিছু সে লাভ করতে পারবে।

কিন্তু ব্যাপারটা কখনো অত দূর পর্যন্ত গেলই না, বারনাবাস আর সাহস করে সেটাকে ঠেলেও কাছে নিয়ে যেতে পারল না, যদিও সেই অল্প বয়সেই সে জানত পরিবারে যে তাকে জীবিকা আহরণের কঠিন ভূমিকা নিতে হয়েছে তার পেছনে সেই দূর্ভাগ্যজনক ঘটনাটাই দায়ী ছিল। এবার শেষ স্বীকারোক্তি: আপনি এসে হাজির হবার ঠিক এক সপ্তাহ পরের কথা। হেরেনহফ-এ গিয়ে কারো মুখে কথাটা শুনেছিলাম কিন্তু আমি গুরুত্ব দিইনি। কোনো এক জমির আমিন নাকি এসেছেন।

কিন্তু আমি আমিনের মানেই তখন জানি না। কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যাবেলা বারনাবাস ঘরে ফিরল অন্যদিনের একটু আগেই। বসার ঘরে অ্যামেলিয়াকে দেখল। তারপর আমাকে হাত ধরে রাস্তায় নিয়ে গেল, তারপর আমার কাঁধে হাত রেখে বেশ কিছুকাল কাঁদল। সে যেন আবার সেই বালক বয়সে ফিরে গেছে, তার এমন কিছু একটা ঘটেছে যার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। যেন হঠাৎ তার সামনে নতুন একটা পৃথিবীর দরজা খুলে গেছে ও সে যেন এই বিপুল নবীনতার জন্য তীব্র আনন্দ ও আশঙ্কা আর সহ্য করতে পারছে না।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ছিল এই যে তাকে একটা চিঠি দেওয়া হয়েছে আপনাকে বিলি করতে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এটাই তার প্রথম চিঠি, তার প্রথম কাজ যা সে এতদিনে পেল।’

ওলগা থামল। মাঝে মধ্যে বৃদ্ধ মানুষের ভারি শ্বাসপতনের শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই কোথাও। কে শুধু আলগাভাবে বলল, যেন ওলগার গল্পটাকে শেষ করতেই, ‘তোমরা সকলেই আমাকে নিয়ে খেলা খেলেছ। বারনাবাস আমার কাছে চিঠিটা নিয়ে এসেছিল এমন একটা ভাব করে যেন সে কতই পুরনো ব্যস্ত বার্তাবাহক আর ভূমি ও অ্যামেলিয়া এমন ভান করেছিলে যেন বার্তা করা বা চিঠি-ফিট বিলানোর কাজটা একেবারেই এলেবেলে একটা কাজ।’

‘আমাদের আপনি অবশ্যই এক করে দেখবেন না।’ বলল ওলগা, ‘চিঠিটা হাতে পেয়েই বারনাবাস আবার যেন আগের মতো এক সুখি বালক হয়ে উঠেছিল। নিজের সামর্থ্য বিষয়ে তার অতীতের সমস্ত সন্দেহ সত্ত্বেও। সেই সন্দেহ সে সীমাবদ্ধ রেখেছিল শুধু নিজের ও আমার মধ্যে।

সে একেবারে খাঁটি একটা বার্তাবাহক হয়ে উঠতে বদ্ধপরিকর ছিল, তার কল্পনায় আসল বার্তাবাহকের যে ছবি আঁকা ছিল তেমনই একজন আর কি, এবার যখন তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল একটা সরকারি উর্দি গায়ে দেবার আমি তার প্যান্টালুন সেলাই করতে বসলাম ও সেটা করলাম ঠিক দু-ঘন্টায়, ও বানিয়ে দিলাম এমন ভাবে যেন সেটাকে সরকারি প্যান্টালুনের মতো আঁটো সাঁটো দেখায় আর সে আপনার সামনে হাজির হতে পারে এমন ভাবে যে আপনি সেটাকে আসল উর্দি বলেই সহজে মেনে নেন, এই গেল বারনাবাসের কথা।

কিন্তু অ্যামেলিয়া সত্যিই তার বার্তাবাহকের কাজটাকে অত্যন্ত অপছন্দ করে। এখন, সে যখন দেখতে পেল বারনাবাসের অল্প স্বল্প সাফল্য এসেছে-বারনাবাস ও আমার ফিসফাস, গোপন আলোচনা থেকে সে সহজেই এটা অনুসন্ধান করে নিতে

পেরেছিল-সে তার কাজটাকে আগের চেয়েও বেশি ঘৃণা করতে লাগল। তাই সে আপনাকে যা কিছু বলেছে তা সত্যি মনে করই।

কিন্তু কে আপনার যদি মনে হয়ে থাকে বারনাবাসের কাজটাকে আমি ছোটোচোখে দেখেছি তাহলে মনে রাখবেন তা আপনাকে ঠকাতে করিনি, করেছি উৎকণ্ঠা থেকেই। বারনাবাসের হাত দিয়ে যে দুটো চিঠি পাঠানো হয়েছিল তাই তার প্রথম সৌভাগ্য চিহ্ন, সেটা প্রশ্নাতীত না হতে পারে কিন্তুগত তিন বছরে আমাদের পরিবারে ওটুকুই প্রাপ্তি, এটুকুই পরিবর্তন, যদি এটা কোনো ছলনা না হয়ে সত্যিকারের পরিবর্তনই হয়ে থাকে-পরিবর্তনের চেয়ে ছলনাই তো ঘটে বেশি-তা আপনার এখানে এসে উপস্থিত হবার সঙ্গে ঘনষ্ঠিভাবে জড়িত হয়ে আছে আর আমাদের ভাগ্যও একরকম আপনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সম্ভবত ওই দুটো চিঠিতে তারই সূত্রপাত হয়েছিল।

তারপর বারনাবাসের কর্মক্ষমতা হয়তো অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হবে শুধুমাত্র আপনাকে চিঠি বিলি করার কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে-আমাদের আশা সেটাই- কিন্তু আপাতত আপনিই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। এখন, ওখানে দুর্গে, আমাদের জন্য যা নির্দিষ্ট হবে তা আমরা সম্ভ্রষ্ট মনেই মেনে নিতে বাধ্য। কিন্তু এখানে নিচে আমরা হয়ত নিজেরাও কিছু করতে পারি।

যেমন ধরুন আপনার শুভেচ্ছা লাভ করা কিংবা অন্তত আপনাকে অসম্ভ্রষ্ট না করা, অথবা আরো জরুরি, আমাদের অভিজ্ঞতা, শক্তি দিয়ে আপনাকে নিরাপত্তা দেওয়া, যাতে দুর্গের সঙ্গে আপনার সংযোগ কোনোভাবে নষ্ট না হয়। এখন সর্বশ্রেষ্ঠ কোনো উপায়ে আমরা তা করতে পারতাম বলুন তো? যাতে আপনি আমাদের কোনোমতেই সন্দেহ না করেন যখন আমরা আপনার কাছে এগিয়ে গেলাম- কারণ আপনি এখানে নবাগত ও সেই কারণে আপনার মন নানা সন্দেহে পূর্ণ হয়ে থাকাটা খুবই স্বাভাবিক, খুবই যুক্তিযুক্ত।

আর এছাড়া সকলেই তো আমাদের ঘৃণা করে আর আপনিও নিশ্চয়ই জনমত দ্বারা প্রভাবিত হবেন, বিশেষ করে আপনার প্রেমিকার দ্বারা, এমন সম্ভাবনাটা ছিলই। এই অবস্থায় বলুন কীভাবে আমরা সরাসরি আপনার কাছে যেতে পারতাম অন্তত অনিচ্ছাকৃতভাবে আপনার প্রেমিকার মতের বিরুদ্ধে না গিয়ে ও তার ফলে আপনাকে অসম্ভ্রষ্ট না করে? আর যে বাতর্টি পাঠানো হয়েছিল, সেটা আপনি পাবার আগেই আমি পড়ে গিয়েছিলাম, বারনাবাস সেটা পড়েনি, বার্তাবাহক হিসেবে সে সেই স্বাধীনতা নিতে পারে না। তো সেই বাতর্টি আমার কাছে খুবই পুরনো মামুলি বলে মনে হয়েছিল প্রথম দৃষ্টিতে কিন্তু সেটাই অসাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল যখন দেখা গেল তারা আপনাকে গ্রামপ্রধানের কাছে পাঠাচ্ছেন।

এখন, এই পরিস্থিতিতে আপনার সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহারটা যুক্তিযুক্ত হতো? আমরা যদি চিঠিটাতে বেশি গুরুত্ব দিতাম তাহলে মামুলি জিনিসকে মূল্যবান বলে চালাচ্ছি বলে নিজেদের সন্দেহের পাত্রী করে তুলতে হতো আর মনে করা হতো বাতর্টি থেকে আমরা ব্যক্তিগত কোনো সুবিধা লাভ করতে চাইছি, আপনার কথা না ভেবে।

আরো, সেক্ষেত্রে আপনার চোখেই চিঠিটার মূল্য কমে যেতে আর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমরা আপনার হতাশার কারণ হতাম। আবার আমরা যদি চিঠিগুলোতে কোনো গুরুত্ব

না দিতাম তাহলেও আমাদের একইভাবে সন্দেহের শিকার হতে হতো কারণ সেক্ষেত্রে আমরা ওগুলো বিলি করার কষ্টই বা স্বীকার করলাম কেন যখন ওগুলো অতই তাৎপর্যহীন?

আমাদের কথায় ও কাজে এত স্পষ্ট বৈপরীত্যই বা কেন? কেন এভাবে আমরা আপনাকে, চিঠির প্রাপককেই শুধু নয় প্রেরককেও হতাশ করেছি? তারা তো আর চিঠিটা এই উদ্দেশ্যে পাঠাননি যে আজবাজে ব্যাখ্যা দিয়ে আমরা চিঠির মর্যাদা কে প্রাপকের কাছে লঘু করে দেখাব? তাহলে দৃষ্টিভঙ্গির ভারসাম্য রক্ষা করে, কোনো দিকেই বাড়াবাড়ি না করে, চিঠিগুলোর যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করা কি অসম্ভব হয়েই দাঁড়ায় না?

চিঠিগুলোই তো নিজেদের মূল্য অন্তহীনভাবে বদলে চলেছে, তারা যে চিন্তা প্রক্রিয়ার জন্ম দেয় তারও কোনো শেষ নেই, দৈবক্রমেই শুধু বোঝা যেতে পারে কোথায় সেই চিন্তাধারার ইতি টানতে হবে, আর তাই আমরা তাদের যে মূল্য নির্ধারণ করি তারও ভিত সেই আকস্মিকতারই ফলাফল মাত্র। আর এ সব কিছুর উপর আপনার বিষয়ে আশঙ্কা যুক্ত হলো। সবকিছু যেন গুলিয়ে গেল, আমি যা কিছু বললাম তা আপনি অতিরিক্ত কঠোরভাবে যেন বিচার করবেন না।

যখন নমুনাস্বরূপ, বারনাবাস এসে খবর দিল যে তার কাজে আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন ও এই প্রথম আঘাতপ্রাপ্তিতে-তার পেশাগত অহমিকাতে যে আঘাত লেগেছিল এটা আমাকে স্বীকার করতে হবে-সে সিদ্ধান্ত নিল যে সে তার কাজ থেকে একেবারেই অবসর নেবে তখন তার ভুলটা শোধরাতে আমি প্রস্তুত হলাম প্রয়োজনীয় সব কিছু করতে-ঠকাতে, মিথ্যে বলতে, বিশ্বাসঘাতকতা করতে-সব কিছু করতে যা তাকে কোনো না কোনো ভাবে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু তখনো আমি একই রকম করতে প্রস্তুত ছিলাম আপনার জন্যও।'

হঠাৎ একটা টোকা শোনা গেল। ওলগা দৌড়ে গেল দরজার খিল খুলে দিতে। কালো লঠন থেকে এক চিলতে আলো এসে চৌখাটে পড়ল। গভীর রাতে আগন্তুক নিচু গলায় কি সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল ও তাকে ওভাবেই ফিসফিস করে উত্তর দেওয়া হলো।

কিন্তু মনে হলো সে সন্তুষ্ট হয়নি ও জোর করে ঘরে ঢুকতে চাইছে। একক শক্তিতে তাকে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব বুঝে ওলগা অ্যামেলিয়াকে ডাকতে লাগল নিশ্চয়ই এই আশা করে যে তার ডাকের ফলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে না আর অ্যামেলিয়া এই লোকটিকে কোনোভাবে ঠিকই বার করে দিতে পারবে। আর সত্যিই সে দ্রুত বেরিয়ে এসে ওলগাকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিয়ে রাস্তায় নামল দরজা পেছনে বন্ধ করে দিয়ে। সেখানে সে থাকল নিমেষমাত্র, তারপর প্রায় মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এল। যে কাজটা ওলগার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটাই সে সারল এত তৎপরতায়।

কে ওলগার কাছ থেকে জানতে পারল লোকটা এসেছিল তারই খোঁজে। লোকটা আসলে সহকারীদের একজন। ফ্রিডার আদেশেই তাকে খুঁজতে এসেছিল। ওলগা

আসার ব্যাপারটা স্বীকার করতে চাইলে করতে পারে কিন্তু সহকারীর মাধ্যমে সেটা ফাঁস হয়ে যাওয়া অবশ্যই সম্ভব হবে না। কেও কথাটা মেনে নিল।

কিন্তু ওলগা যখন সেখানেই তাকে নিশিষাপনের আহ্বান করল যাতে যে বারনাবাসের জন্য অপেক্ষা করতে পারে, সে অসম্মতি জানাল। নিজের ব্যাপার হলে সে হয়ত রাজি হতো কারণ রাতও অনেক হয়েছে, আর তার মনে হলো বর্তমানে, সে চাক বা না চাক, সে এই পরিবারটির সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে এখানে শয্যাগ্রহণ করা নানা কারণে যন্ত্রণাদায়ক হলেও, এই পারস্পরিক বন্ধনের কথা মনে রাখলে সমস্ত গ্রামে সম্ভবত সবচেয়ে কাম্য তার কাছে।

এসব সত্ত্বেও সে ওলগার প্রস্তাবে আপত্তি করল, সহকারীর আগমনে যে সতর্ক হয়ে উঠেছে। তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হলো কেমন করে ফ্রিডা, সে তার ইচ্ছা অনিচ্ছা ভালোই বোঝে, আর সহকারীরা যারা তাকে ভয় করতে শিখে নিয়েছে, আবার এভাবে মিলিত হলো, এতটাই যে একটা সহকারীকে, তার খোঁজে পাঠিয়ে দিতে ফ্রিডার সঙ্কোচমাত্র হলো না, তাও আবার শুধু একজনকে।

অন্যজনকে হয়ত মজুত রাখা হয়েছে তাকে সঙ্গ দিতে। সে ওলগাকে জিজ্ঞাসা করল তার কাছে কোনো চাবুক আছে কিনা, না তার নেই, তবে বাদামডালের লিকলিকে একটা বেত আছে বটে, এবং কে সেটাই হাতে নিল, এরপর সে জিজ্ঞাসা করল বাড়িটা থেকে বেরোবার অন্য কোনো উপায় আছে কিনা, হ্যাঁ, উঠোনের দিকে একটা পথ আছে, শুধু ওখানে একটা পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগানে নামতে হবে, তারপর সেটার মধ্য দিয়ে কিছুক্ষণ হাটলেই রাস্তা পেয়ে যাবে।

কে স্থির করল সে তাই করবে। ওলগা যখন তাকে উঠোনে পথ দেখাচ্ছিল কে ব্যস্তভাবে তার ভয় কাটিয়ে নিশ্চিত করার চেষ্টা করছিল। তাকে সে বলল যে সে তার কথায় সামান্যও ত্রুদ্ধ হয়নি, তার সব কথা সে ঠিকই অনুধাবন করতে পেরেছে, তাকে ধন্যবাদ দিল বিশ্বাস করে কে-কে সে সমস্ত গল্পটা বলেছে বলে ও তাকে বলল সে যেন বারনাবাসকে স্কুলে পাঠিয়ে দেয় সে আসামাত্রই। অনেক রাত হলেও। এটা ঠিকই বারনাবাসের আনা খবরই তার একমাত্র আশা নয়, তা হলে তার অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠত।

কিন্তু তা হলেও সেটাকে সে হিসেবের বাইরে রাখতে চায় না। সে তার ওপর ভরসাও করবে ও ওলগাকেও ভুলবে না, কারণ যে কোনো বার্তার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার কাছে ওলগা, তার সাহসিকতা, স্থির বুদ্ধি। তাকে যদি ওলগা ও অ্যামেলিয়ার মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হয় তাকে বিশেষ চিন্তা করতে হবে না। এবং আরেকবার ওলগার হাতে উষ্ণভাবে চাপ দিয়ে সে দেয়াল উপকে সংলগ্ন বাগানে নেমে পড়ে।

১৬

রাস্তায় পৌঁছে সে দেখতে পেল একটু দূরে অন্ধকার অস্পষ্টতার মধ্যে তার সহকারীটি তখনো পায়চারী করে চলেছে বারনাবাসদের বাড়ির সামনে। মাঝে মাঝে সে থামে ও ঘরের ভেতরে ঝোলানো পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করে। কে

তাকে ডাক দিল। বাহ্যত সামান্যও না চমকে সে বাড়িটার উপর গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে কে-র দিকে এগিয়ে এল।

‘তুমি কাকে খুঁজছিলে হে!’ জিজ্ঞাসা করে কে, লিকলিকে বাদাম ডালের বেতটাকে নিজের পায়ের উপর পরখ করে।

‘আপনাকে,’ উত্তর দিল সহকারী কাছে এগিয়ে এসে।

‘কিন্তু তুমি কে?’ প্রশ্ন করে বসে কে অকস্মাৎ, কারণ এ লোকটিকে তার সহকারী বলে মনে হলো না। একে দেখতে অনেক বেশি বয়স্ক, চিত্তাশ্রম ও বলিরেখাপূর্ণ। আর মুখটাও অনেক ভরাট। এর হাঁটা তার সহকারীর দ্রুত লাফ মেরে হাঁটার চেয়েও আলাদা। তার সহকারীর হাঁটার সময় মনে হতো তার অস্থিসন্ধিতে বিদ্যুৎ পোরা আছে। এ চলন শ্রুত, বিরতি দিয়ে, কিছুটা সম্ভ্রান্ত ধরনের।

‘আপনি আমায় চিনতে পারলেন না?’

লোকটা জিজ্ঞাসা করে, ‘জরমিয়া, আপনার পুরনো সহযোগি।’

‘ও, আচ্ছা,’ বলে কে বাদামডালের বেতটা আবার বের করে এনে, এটা সে ততক্ষণ পিছনে গোপন রেখেছিল।

‘কিন্তু তোমাকে তো একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে।’

তার কারণ আমি এখন নিজের মতো আছি,’ বলল জারমিয়া, ‘আমি যখন নিজের আসল রূপে ফিরে আসি আমার তারুণ্য শক্তি অন্তর্হিত হয়।’

‘কিন্তু আর্থার কোথায়?’ জিজ্ঞাসা করে কে।

‘আর্থার?’ বলে জারমিয়া, ‘স্কুদে বন্ধুটি? সে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। আপনি আমাদের উপর যে ব্যবহারটা করেছেন তা বড়োই নির্দয়ের মতো, বুঝলেন, ওর মতো নরম মনের ছেলে তা সহ্য করতে পারবে কেন? ও দুর্গে গেছে নালিশ করতে।’

‘আর তুমি?’ জিজ্ঞাসা করে কে। ‘এখানে টিকে থাকার মতো শক্তি আমার আছে।’ বলে জারমিয়া, ‘আর্থার আমার হয়েও নালিশ জানাবে।’

‘তোমাদের নালিশটা কি বিষয়ে?’ প্রশ্ন করে কে,

‘যে, আপনি ঠাট্টাও বোঝেন না। আমরা করেছি কী?’

একটু আধটু মস্করা করেছি; সামান্য হাসাহাসি করেছি, আপনার প্রেমিকাকে নিয়ে একটু মজা করেছি, এই তো? তাও যা করেছি তা আমাদের ওপর নির্দেশ মেনেই। যখন গেলেটার আমাদের আপনার কাছে পাঠালেন-’

‘গেলেটার?’

জিজ্ঞাসা করে কে, ‘হ্যাঁ গেলেটার-’, ‘জারমিয়া উত্তর দেয়, ‘সে সময় উনি স্বয়ং ক্র্যামের জায়গায় অস্থায়ী ভাবে ছিলেন।

উনি যখন আপনার কাছে আমাদের পাঠান তখন বলেছিলেন-আমি সেটা প্রায় মুখস্থ করে নিয়েছিলাম, সেটাই আমাদের কাজ,-তোমরা ওখানে নিচে যাবে কানুনগোর সহকারী হিসেবে, আমরা উত্তরে বললাম: কিন্তু আমরা তো ঐ কাজের কিছুই জানি না।

তখন তিনি বললেন, ‘সেটা আসল ব্যাপার না, প্রয়োজন হলে উনি তোমাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন। তোমাদের আসল কাজটা হলো ওঁকে একটু চাঙ্গা করে

তোলা। আমার খবর অনুসারে উনি সবকিছুই বড়ো বেশি গম্ভীরভাবে নেন। উনি সবে গ্রামে এসে পৌঁছেছেন কিন্তু সেটাকেই একটা মস্ত অভিজ্ঞতা বলে ভেবে নিয়েছেন, বাস্তব কিছুরই তো হয়নি, তোমাদের কাজ হলো গুঁকে এটা বুঝিয়ে দেওয়া।’ ‘তাহলে?’ বলল কে, ‘গেলেটার কি সঠিক বলেছিলেন আর তোমরা কি তার নির্দেশ পালন করেছ?’

‘তা জানি না,’ বলল জারমিয়া, ‘এত অল্প সময়ের মধ্যে তা বোধহয় সম্ভবও না। আমি শুধু জানি আপনি আপনাদের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছেন, সেই বিষয়েই আমরা নালিশ জানিয়েছি। আমি বুঝতেই পারি না কী করে নিজে একজন কর্মচারী হয়েও, তাও দুর্গের কর্মচারী না, আমাদের কাকটা কত কষ্টের আর সেটাকে আমাদের মতো গরিব মানুষের ক্ষেত্রে আরো বেশি কষ্টকর করে তোলা কত বড়ো অন্যায় আপনি বুঝতেই চাইলেন না, বরং খেয়ালখুশি মতো, ছেলেমানুষের মতো আমাদের উপর দুর্ব্যবহার চালিয়ে গেলেন।

সামান্য সহানুভূতি না দেখিয়ে আপনি আমাদের রেলিঙের ধারে ঠাণ্ডায় প্রায় জমে যেতে দিয়েছেন আর খড়ের বিছানার উপর আর্থারকে ঘুষি মেরে প্রায় কুপোকাৎ করে দিয়েছিলেন-সেই আর্থারকে, যে একটা শক্ত কথা শুনলেও বহুদিন মনমরা হয়ে থাকে-এছাড়া সারা বিকেলটা আমায় তাড়া করে বেড়িয়েছেন। পাক্কা একঘণ্টা লেগেছিল আমার তার ধকল সামলাতে। এখন, আমি আগের মতো জোয়ান তো আর নই।’

‘প্রিয়া জারমিয়া,’ বলল, কে ‘তুমি যা কিছু বললে সবই যথার্থ, কিন্তু তুমি এসব গেলেটারকে জানাও গে যাও। তিনি নিজের খুশিতে তোমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আমি সেজন্য তার হাতে পায়ে ধরিনি। আর যেহেতু আমি তোমাদের ডেকে আনিনি তখন তোমাদের ফেরত পাঠিয়ে দেবার মতো অধিকারো আমার আছে। আর তোমার মতো আমিও সবকিছু অহিংসভাবে করতেই পছন্দ করি।

কিন্তু তোমাদের সঙ্গে অমন ব্যবহার করা ছাড়া উপায় ছিল না। তাছাড়া, যখন প্রথম আমার কাছে এলে তখন তো কই এমন খোলাখুলিভাবে সব কথা বলনি।’

‘কারণ সে সময় আমি কাজে নিযুক্ত হয়েছিলাম,’ বলল জারমিয়া।

‘এটা বোঝা তো শক্ত না।’ ‘তাহলে, এখন তুমি আর কাজে নেই?’ জিজ্ঞেস করল কে।’

‘ঠিক তাই’ বলল জারমিয়া।

‘আর্থার দুর্গে নোটিশ দিয়ে দিয়েছে যে সে ও আমি কাজ ছেড়ে দিচ্ছি, নিদেনপক্ষে সেই বিষয়েই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এখন, যার ফলে আমরা অল্পদিনের মধ্যেই কাজ থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাব।’

‘কিন্তু তুমি তো একটু আগেও আমায় এমনভাবে খুঁজছিলেন যেন এখনও তুমি একজন কর্মচারী রয়েছো।’ বলল কে।

‘না’ উত্তর দিল জারমিয়া, ‘আমি আপনাকে খুঁজছিলাম শুধু ফ্রিডার দৃষ্টান্ত দূর করতে। আপনি যখন বারনাবাসের বোনটার জন্য তাকে পরিত্যাগ করে এলেন তখন ও ভেঙে পড়েছিল, আপনাকে হারানোর জন্য ততটা না, যতটা বেইমানীর জন্য। এছাড়াও

ও আগেই জানত এমন একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে আর সে কারণে গোপনে বহু দুঃখ ভোগ করেছে। আগের চেয়ে আপনার কান্ডজ্ঞান আরো বাড়ল কিনা দেখতে আমি আর একবার স্কুলবাড়ির জানলায় গিয়ে উঁকি দিয়েছিলাম।

কিন্তু আপনি সেখানে ছিলেন না। ফ্রিডা একা বেঞ্চের উপর বসে কেঁদে যাচ্ছিল। তাই আমি তার কাছে গেলাম ও আমাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হলো। সব ঠিক হয়ে গেছে। হেরেনহফ এ আমি ওয়েটারের কাজ নেব, অন্তত দুর্গে আমার পদত্যাগের ব্যাপারটার যতদিন একটা নিষ্পত্তি না হয়, আর ফ্রিডাও আবার ট্যাপক্রমের কাজে ফিরে যাবে। ফ্রিডার পক্ষে সেটাই ভালো হবে। তার পক্ষে আপনার স্ত্রী সঙ্গে থাকার কোনো অর্থ হয় না। আপনার জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে যে সে রাজি তার খবরও আপনি রাখেন না।

কিন্তু তার নরমমনে এখনও যথেষ্ট বিবেচনা অবশিষ্ট আছে। হয়ত সে আপনার ওপর অবিচারই করেছে, তার মনে হয়েছে, হয়ত আপনি বারনাবাসেদের মেয়েটির ধারেকাছেই যান না। যদিও আপনি আসলে কোথায় আছেন সে বিষয়ে আমার সামান্য সন্দেহও ছিল না, তবু আমি সেখানে গিয়ে হাজির হলাম নিজের চোখেই সব দেখে একেবারে নিঃসন্দেহ হতে। কারণ দুশ্চিন্তিত ফ্রিডার অন্তত শান্তিতে ঘুমনোটো দরকার। নিজের কথা বাদই দিলাম।

তাই আমি ওখানে গেলাম আর শুধু আপনাকেই দেখলাম না, ঘটনাক্রমে মেয়েটাকেও আপনার গায়ে গা লাগিয়ে বসে থাকতে দেখলাম। ওই কালো মেয়েটার কথা বলতে চাইছি বিশেষ করে, নিজের টুপিটা যে আপনার মাথায় পরিয়ে দিয়েছিল। থাকগে, যে যার রুচিমতোই চলবে। তবু বলি, ওই পাঁচিল ডিসিয়ে বাগানের পাশ দিয়ে অত ঘোরপ্যাঁচ করে আপনার পালাবার কোনো দরকার ছিল না, পথটা আমার চেনা।’

তাহলে ব্যাপারটা সেভাবেই ঘটল যা সে আগেই অনুমান করতে পেরেছিল, কিন্তু যেটাকে সে আটকাতে পারল না। ফ্রিডা তাকে ত্যাগ করেছে। এটা কিছুতেই চূড়ান্ত হতে পারে না, অতটা খারাপ নিশ্চয়ই কিছু ঘটেনি, ফ্রিডাকে ফিরে পাওয়া যাবেই, যে কোনো বার্তাবাহকের পক্ষে তাকে প্রবাবিত করা খুবই সহজ, এই সহকারীদের পক্ষেও, যারা মনে করে পদমর্যাদার দিক দিয়ে ফ্রিডা তাদের সমগোত্রীয়।

আর যেহেতু তারা নিজেরা কাজ ছেড়ে দেবার নোটিশ দিয়েছে, ফ্রিডাকেই ঠিক তাই করতে জপিয়েছে। কিন্তু একবার কে, তার কাছে সশরীরে হাজির হয়ে যখন নিজের স্বপক্ষে ভালো খবরগুলো তাকে দেবে সে নরম হয়ে নিশ্চয়ই তার কাছে আবার ফিরে আসবে, বিশেষ করে সে যদি তাকে বোঝাতে পারে ওই মেয়েগুলোর সঙ্গে দেখা করার ফলে ব্যক্তিগতভাবে সে তার কাজে কতটা সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে।

কিন্তু তবু, এমনভাবে চিন্তা করে সত্ত্বেও, যার দ্বারা ফ্রিডা বিষয়ে নিজেকে আশ্বস্ত করতে চাইছিল, সে তেমন নিশ্চিত হতে পারল না। কয়েক মিনিট আগেও সে ওলগার কাছে ফ্রিডার কত প্রশংসা করেছে।

ফ্রিডাকে তার একমাত্র ভরসা বলেছে, কিন্তু এমন তো দেখা যাচ্ছে ‘ভরসা’ টি খুব পোক্ত ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে নেই, ফ্রিডাকে কে-র থেকে কেড়ে নিতে প্রবল কোনো

প্রতিপক্ষেরই দরকার হলো না-তা করতে দেখা গেল সহকারীরূপী এই ভাঁড়াটাই যথেষ্ট, যাকে কখনো সখনো দেখে লোকের মনে হতে পারে সে ঠিকমতো বেঁচে নেই, একটা হাত পা নাড়া পুতুল মাত্র।

জারমিয়া ইতিমধ্যেই মিলিয়ে যেতে শুরু করেছিল। কে তাকে আবার ডেকে আনল। ‘জারমিয়া’ সে বলল, ‘আমি তোমার সঙ্গে খোলাখুলি হতে চাই। ঠিক আগের মতো করেই তুমি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি। এখন আর আমাদের মধ্যে প্রভু-ভূত্যের সম্পর্ক নেই। এটা যে শুধু তোমার ক্ষেত্রেই শ্রাঘ্যার ব্যাপার তা নয় আমার ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রে আমাদের পরস্পরকে ঠকানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এখানে তোমার চোখের সামনেই আমি এই বেতটা ভেঙে ফেলছি, এটা তোমার ওপর প্রয়োগ করব বলেই হাতে নিয়েছিলাম। আমি তোমার ভয়েই পিছনের পথ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম, তোমার এই ধারণাটাও ঠিক না।

হঠাৎ পিছন থেকে এসে তোমাকে এই বেতের ক ঘা মেরে তোমাকে চমকে দেব বলেই তা করেছিলাম। ব্যাপারটাকে মন্দভাবে নিও না, ওসব তো চুকেই গেল। দপ্তর যদি তোমাকে চাকর হিসাবে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে না দিত, তুমি যদি আমার কাছে বন্ধুর মতো আসতে তাহলে আমাদের সময়টা দারুণভাবেই কেটে যেত, তোমার উপস্থিতি মাঝে মাঝে আমাকে বিচলিত করলেও। তা আমরা আগে যা হারিয়েছি তা এখন পুষিয়ে নিতে পারি।’

‘আপনি তাই মনে করেন বুঝি?’ বলল সহকারী হাই তুলে ও ক্লান্তভাবে চোখ বুঁজে, ‘বিষয়টা আমি আরো ভালোভাবে অনেকক্ষণ ধরে বোঝাতে পারতাম আপনাকে। কিন্তু হাতে সময় কম। আমাকে ফ্রিডার কাছে ফিরে যেতে হবেই। বেচারী মেয়েটা আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে রয়েছে, এখনো সে কাজে যোগ দেয়নি, সরাইমালিক তাকে কয়েক ঘণ্টার ছাড় দিয়েছে— সে সব দুঃখ ভুলতে তখনই কাজ শুরু করতে চাইছিল, -আমরা ঐ সময়টা অন্তত এক সঙ্গে কাটাব। আর আপনি যে প্রস্তাবটা দিলেন, আমার আপনাকে ঠকবার যেমন কিছু নেই বিশ্বাস করে বলার কথাও খুবই নগণ্য।

সোজা কথায়, আমার ব্যাপারটা আপনার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যতদিন আমি আপনার চাকর ছিলাম আপনি আমার চোখে খুবই মান্যগণ্য ছিলেন, আপনার বিশেষ কোনো গুণ ছিল বলে না, আমার কর্তব্যের খাতিরে শুধু, আমি প্রাণ দিয়েও আপনার হুকুম তামিল করতে প্রস্তুত ছিলাম।

কিন্তু এখন আর আমার কাছে আপনার কোনো গুরুত্বই নেই। একটু আগে আপনি যে ডালটা ভেঙে ফেললেন তাতেও আমার মনে সামান্য ভাবান্তর হয়নি। সেটা বরং আমায় মনে করিয়ে দিল কি নির্দয় এক প্রভু আমার কপালে জুটেছিল, আপনি হিসেব করেই অমন করেছেন যাতে আমাকে পটাতে পারেন।’

‘তুমি এমনভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছ যেন তুমি নিশ্চিতই হয়ে গেছ ভবিষ্যতে আমার দিক থেকে তোমার আর ভয়ের কোনো কারণই ঘটবে না। ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক অমন নয়। যত দূর দেখা যাচ্ছে তুমি কিন্তু আমার থেকে এখনো মুক্ত নও। এখানে ঘটনা অত দ্রুত ঘটে না—’

‘কখনো এর চেয়েও দ্রুত ঘটে, ‘জারমিয়া জবাবটা ছুঁড়ে দিল।

‘কখনো’ বলল কে, ‘কিন্তু সেটা যে এখন তার ইঙ্গিত কিন্তু পাওয়া যায়নি, অন্তত তুমি বা আমি কেউই অত স্পষ্টভাবে কিছু দেখতে পাইনি। কাগজপত্র চালাচালি সব শুরু হয়েছে, তাই তো মনে হয়। আমি এখনও নিজের প্রভাব খাটাতে শুরু করিনি তাতে বাগড়া দিতে। কিন্তু-আমি তা দেব। ঘটনাস্রোত যদি তোমার বিরুদ্ধে যায় তাহলে তুমি হাড়ে হাড়েই বুঝতে পারবে তুমি নিজেকে মোটেই তোমার মনিবের প্রিয়পাত্র করে তোলনি। আর বাদামের ডালটা ভেঙে ফেলাটাও আসলে লোক দেখানো মাত্র। ফ্রিডার আশকারা পেয়ে নিজেকে তুমি ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে দেখতে শুরু করেছে।

কিন্তু তোমার ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান দেখিয়েই বলছি, যদিও তেমন কিছু তোমার আমার প্রতি লেশমাত্র নেই, ফ্রিডাকে আমি যদি শুধু দু-একটা কথা বলি তাহলেই যথেষ্ট হবে-আমি ভালোভাবেই জানি-তাতেই তুমি তার কাছে মিথ্যের যে প্রাসাদ তৈরি করেছে তা চুরমার হয়ে যাবে। শুধু মিথ্যে দিয়েই ফ্রিডাকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা যেতে পারে।’

‘আপনার এসব শাসানিতে আমি ভয় পাচ্ছি না।’

বলল জারমিয়া, ‘আপনি আমাকে সহকারী হিসেবে একেবারেই চান না, সহকারী যখন ছিলাম তখন পর্যন্ত আপনি আমাকে ভয় করতেন, সহকারীদের দেখলেই আপনার আতঙ্ক হয়। শুধুমাত্র, ভয় থেকেই বেচারার আর্থারকে আপনি এমনভাবে মেরেছিলেন।’

‘হয়ত তাই,’ বলল কে, ‘কিন্তু তাতেও কি আঘাতটা কম লেগেছিল? আমার মনের মধ্যে তোমাদের নিয়ে যে ভয় তা হয়ত একইভাবে প্রকাশ করব বহুবার, আমি যদি দেখি সহকারীর কাজ করে তুমি আর আনন্দ পাচ্ছ না, আমার সন্তুষ্টির শেষ থাকবে না। আমার ভয় সত্ত্বেও, তোমাকে সেই কাজ করতেই যদি বাধ্য করতে পারি। আর এছাড়াও আমি আশ্রয় চেষ্টা করব তোমাকে একা পেতে। আর্থারকে বাদ দিয়ে, তোমার ওপর তখন আমি অনেক বেশি মনোযোগও দিতে পারব।’

‘আপনি কি মনে করেন,’ বলল জারমিয়া ‘আমি তাতে বিন্দুমাত্র ভয় পাই?’

‘তা আমি মনে করিনা।’

বলল কে, ‘তুমি সামান্য ভয় পেয়েছ এটা নিশ্চিত, আর যদি কাণ্ডজ্ঞান থেকে থাকে মারাত্মক ভাবে ভীত, তা না হলে সোজা তুমি ফ্রিডার কাছে ফিরে গেলে না কেন? আমায় বল দেখি, তুমি কি তাহলে ওর প্রেমে পড়েছ?’

‘প্রেমে?’ বলল জারমিয়া, ‘ও দারুণ চালাক চতুর মেয়ে একটা, ক্র্যামের প্রাক্তন প্রণয়ী, সব দিক দিয়েই ওকে শ্রদ্ধা করা যায়, আর সে যখন আমার কাছে অনুনয়ন করছিল তাকে আপনার হাত থেকে বাঁচাতে আমিই বা তাকে সেটুকু দাক্ষিণ্য দেখাব না কেন, বিশেষ করে এতে যখন আমি আপনার ক্ষতি করছি না, নিজের চোখেই না কেন, বিশেষ করে এতে যখন আমি আপনার ক্ষতি করছি না, নিজের চোখেই যখন দেখতে পেলাম বারনাবাসের ওই হতচ্ছাড়া ছুড়িদের নিয়ে আপনি ভারি খোশমেজাজেই রয়েছেন।’

‘এবার আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি তুমি কি সাংঘাতিক ভয় পেয়েছ।’

বলল কে, 'ভয়ে তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে একেবারে, মিথ্যে কথা বলে তুমি এখন আমাকে বাগে পেতে চাইছ।

ফ্রিডা আসলে চেয়েছিল সহকারীরূপী নোত্রা শুয়োরগুলোর হাত থেকে অব্যাহতি পেতে, যারা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত আমি তার ইচ্ছে পুরোপুরি পালন করতে পারিনি। আর আমার সেই অবহেলার পরিণাম এই।'

'আমিন মশাই, আমিন মশাই,' বলে রাস্তার প্রান্ত থেকে কেউ চেষ্টা করে উঠল। লোকটা বারনাবাস। দৌড়ে এল সে বেদম হয়ে, কে-কে সেই অবস্থাতেও অভিবাদন করতে ভুলল না।

'করা হয়ে গেছে।' সে বলল। 'কি করা হয়েছে?' জিজ্ঞাসা করল কে, 'আমার অনুরোধ ক্ল্যামের কাছে পৌঁছে দিয়েছে?'

'সেটা করা যায়নি।' বলল বারনাবাস, 'আমি আশ্রয় চেষ্টি করেছিলাম, কিন্তু কাজটা অসম্ভব, আমার অত্যন্ত তাড়া ছিল। আমাকে কেউ না বললেও আমি সারাদিন ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম ডেক্সের এতটা কাছ ঘেঁষে যে একটা কেরানি তো একবার আমাকে ধাক্কা দিয়েই সরিয়ে দিল।

ক্ল্যাম মাথা তোলা মাত্রই আমি হাত তুলে নিজেকে দেখালাম-এটা বে-আইনী-দণ্ডের একমাত্র আমিই পড়েছিলাম। সব লোকেরা চলে গেছে, শুধু চাকরদের সঙ্গে পড়ে আছি, কিন্তু কপাল ভালো, দেখলাম ক্ল্যাম ফিরে এসেছেন, কিন্তু দেখা গেল আমার জন্য না, একটা বইয়ে খুব দ্রুত তাঁর কিছু দেখে নেবার ছিল, তা করে তখনি আবার চলে গেলেন। আমি তখনো স্থানত্যাগ করছি না দেখে চাকরেরা আমাকে প্রায় ঝাঁট দিয়েই দরজার বাইরে ফেলে দিল।

আমি আপনাকে এত কিছু বললাম যাতে আপনি কখনো আর অনুযোগ না করেন যে আমার চেষ্টায় কোনো ঘাটতি থাকে।'

'তোমার এই চেষ্টায় আমার ভালোটা কি হচ্ছে বারনাবাস,' বলল কে, 'সামান্যতম সাফল্যের নামগন্ধও তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমি কিন্তু সফল হয়েছি,' উত্তর দিল বারনাবাস, 'আমি যখন দণ্ডের ছেড়ে আসছিলাম আমি দেখতে পেলাম এক ভদ্রলোক ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন সরু বারান্দা দিয়ে, তিনি বাদে সেখানে আর কেউ নেই। তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি তাও ঠিক করলাম তার জন্য অপেক্ষা করব। আরো একটু বেশিক্ষণ ওখানে সময় কাটাবার পক্ষে ওটা ছুতোও বটে, যত দেরি পর্যন্ত ওখানে কালক্ষেপ করা যায় ততই আমার পক্ষে ভালো, আপনার জন্য ব্যর্থতার খবরটা আনতে হয় না।

কিন্তু এসব বাদ দিলেও যে আসছিল তাঁর জন্য ব্যর্থতার খবরটা আনতে হয় না। কিন্তু এসব বাদ দিলেও যে আসছিল তাঁর জন্য অপেক্ষা করায় লাভই আছে, কারণ লোকটির নাম আর্লেন্ডার, আপনি ওকে চেনেন না? উনি ক্ল্যামের অন্যতম মুখ্য আধিকারিক। ছোটোখাটো ক্ষীণ দেখতে ভদ্রলোককে, অল্প একটু খুঁড়িয়ে হাটেন। আমাকে দেখেই চিনলেন, তিনি বিখ্যাত তার স্মৃতিশক্তির ও মানুষজন বিষয়ে জ্ঞানের জন্য। তিনি শুধু একবার দ্রুত একস্থানে জোড়া দেন ও যে কোনো লোককে

নিমেষে মনে করতে পারেন। তিনি এমন মানুষকে চিনতে পারেন যাকে তিনি কখনো দেখেননি।

শুধু তার বিষয়ে একবার কিছু শুনেছেন বা পড়ছেন। যেমন ধরণ আমাদের তো তাঁর দেখারই কথা নয়। কিন্তু যদিও তিনি কাউকে দেখামাত্রই চিনে ফেলেন, তিনি এমনভাবে প্রশ্ন করেন যেন তিনি নিশ্চিত হতে পারছেন না। এভাবেই তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি বারনাবাস না?'

তারপর বলে চললেন, 'তুমি তো কানুনগোকে চেন, তাই না?' তারপর বললেন, 'যাগগে ভালোই হলো। আমি এখনই হেরেনহফ-এ যাচ্ছি। কানুনগো যেন সেখানে গিয়ে আমাদের কাজ দাখিল করেন। আমি ১৫ নম্বর ঘরে থাকব। কিন্তু উনি যেন এশুনি আসেন। ওখানে গিয়ে আমাদের সামান্য কয়েকটা জিনিস করতে হবে, সকাল ৫ টার আগেই আমাদের আবার দুর্গে ফিরে যেতে হবে। ওঁকে জানিয়ে দিও ওর সঙ্গে আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে।'

হঠাৎ জারমিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। উত্তেজনায় এর আগে বারনাবাস তার উপস্থিতি লক্ষ্যই করেনি। সে জিজ্ঞাসা করল, 'জারমিয়া কোথায় যাচ্ছে,' 'আর্লেঙ্গারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার আটকাতে।' বলল কে ও সেও জারমিয়ার পশ্চাদ্ধাবন করল, তাকে গিয়ে ধরল, তার বাহু আকড়ে বলল, 'হঠাৎ ফ্রিডার উপর টান উঠলে উঠেছে বুঝি? আমারও ঠিক তাই হয়েছে, বুঝলে, তাই চল আমরা পাশাপাশি একসঙ্গেই যাই।'

১৭

অন্ধকার হেরেনহফ-এর কাছে কয়েকজন মানুষের ছোটো একটা দল দাঁড়িয়ে রয়েছে, দু'তিন জনের হাতে লণ্ঠন, সেই আলোতে এখানে ওখানে দু-একজনের মুখ দেখা যাচ্ছে। কে তাদের মধ্যে শুধু একজনকে চিনে উঠতে পারল, কোচোয়ান গারষ্টেকার, সে কে-কে এই প্রশ্নটা দিয়ে অভ্যর্থনা করল।

'এখনো গ্রামে রয়েছেন?'

'হ্যাঁ' উত্তর দিল কে, 'আমি এখানে তো থাকতেই এসেছি।' তাতে আমার কিছু যায় আসে না,' বলল গারষ্টেকার হঠাৎ কাশির দমকে আক্রান্ত হয়ে ও তারপর সে অন্যদের কাছে ফিরে গেল।

দেখা গেল এরা সবাই আর্লিঙ্গারের জন্য অপেক্ষা করছে। আর্লিঙ্গার ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছেন কিন্তু কোনো দরখাস্তকারীকে ঢুকতে দেবার আগে তিনি মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে নিচ্ছেন। তাদের ভিতরে অপেক্ষা করতে না দিয়ে বরফের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে বলে তারা সবাই অনুযোগ করছিল। আবহাওয়া খুব ঠাণ্ডা ছিল না বটে কিন্তু তাদের যে বাড়িটার সামনে অন্ধকারে সম্ভবত কয়েক ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে এতে বিবেচনার অভাব সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যাচ্ছিল। দোষটা নিশ্চিতভাবে আর্লিঙ্গারের নয়। লোকটি তিনি খুবই উপকারী প্রকৃতির, তিনি এই লোকগুলোকে যে কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে তার কিছুই জানতেন না। তাকে এ বিষয়ে জানানো হলে নিশ্চিত ভাবেই তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হতেন। দোষটা আসলে ছিল হেরেনহফ-এর

বাড়িওয়ালীর। সব সময় একেবারে টিপটপ থাকার যে একধরনের দৃঢ়মনস্কতা তার মধ্যে কাজ করে সেটাই এতগুলো লোককে একসঙ্গে হেরেনহফ-এ ঢুকতে দেবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল।

‘ওদের ভেতরে ঢোকাটা যদি অপরিহার্যই হয়ে উঠে,’ সে বলেছিল, ‘তাহলে ভগবানের দোহাই, ওরা যেন এক এক করে আসে।’

লোকগুলো প্রথমে দাঁড়িয়েছিল ঢাকা বারান্দায়, তারপর সিঁড়ির ওপর, শেষে গিয়ে ট্যাপরুমে। কিন্তু বাড়িওয়ালী অন্তিমে তাদের একেবারে রাস্তার উপর বার করে দিয়ে তবে ক্ষান্ত হলো। কিন্তু তাতেও তার শান্তি হলো না। তার কাছে অসহনীয় ছিল এই চিন্তা যে তাকে অবরোধের মধ্যে রাখা হয়েছে তারই নিজের বাড়িতে। এটা তার বুদ্ধির পক্ষে অগম্যই এত লোকের এখানে এসে অপেক্ষা করার দরকারটাই বা কী, ‘দরজার সামনেকার সিঁড়ি নোংরা করতে’ এক কর্মচারী তাকে একবার বলেছিল, ‘স্পষ্টতই বিরক্ত হয়ে, কিন্তু কথাটা তার কাছে ভারি সারগর্ভ বলে মনে হয়। এতটাই যে বহুবার সেটির পুনরুক্তি করেও সে ক্লান্ত হয়নি। সে আশ্রয় চেষ্টা করেছিল-এবং ঐ কাজে পদপ্রার্থীদেরও আন্তরিক সমর্থন ছিল-হেরেনহফ-এর উল্টোদিকে যাতে একটা বাড়ি বানানো হয় যেখানে দরখাস্তকারীরা অপেক্ষা করতে পারবে। তার সবচেয়ে কাম্য ছিল যতরাজ্যের সাক্ষাৎকার, পরীক্ষা এসব হেরেনহফ-এর একেবারে বাইরে যেন করা হয়।

কিন্তু এতে সরকারি তরফের আপত্তি এল ও স্বভাবতই আমলাদের কাছে বাড়িওয়ালী কোনো সুবিধে করে উঠতে পারল না যদিও ছোটোখাটো ব্যাপারে তার শাসন অব্যাহত ছিলই।

যাই হোক শাসকবর্গের পছন্দ ছিল ট্যাপরুমে বা নিজেদের ঘরে বসে কাজকর্ম করতে, সম্ভব হলে খালি খাবার সময় কিংবা রাতে শুতে যাবার আগে অথবা ভোরে, যখন তাঁরা বিছানা ছেড়ে ওঠার আগে হাত পায়ে আড় ভেঙে নেন। বাইরে একটা অপেক্ষালয় করার প্রস্তাবটা অবশ্য কিছুদিন পর হঠাৎ অনুকূল দৃষ্টিতেই দেখা হতে লাগল, কিন্তু এক্ষেত্রেও বাড়িয়ালিকে একটা মস্ত ধাক্কা খেতে হলো। লোকে এনিয়ে অল্প একটু হাস্যাসৌন্দর্য করছিল যখন দেখা গেল এই অপেক্ষালয় বানানোর ব্যাপারেও অন্তঃসীম সাক্ষাৎকার, সভার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, যার ফলে বাড়ির বারান্দাটা এক মুহূর্তও আর খালি থাকছে না।

এসব নিয়েই ফিসফিস করে কথা বলে দলটা সময় কাটাচ্ছিল। কে একটু অবাধ হয়েই লক্ষ্য করল তাদের অসন্তোষ সার্বিক হলেও আর্লেক্সার যে মধ্যরাত্রে দরখাস্তকারীদের ডেকে পাঠিয়েছেন তাতে কারো আপত্তি নেই। সে যখন জিজ্ঞাসা করল এর কারণ কী তখন উত্তর পাওয়া গেল আর্লেক্সারের ওপর তাদের সব দিক দিয়েই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তাঁর শুভেচ্ছা ও অসাধারণ কর্মনিষ্ঠাই তাকে গ্রামে টেনে এনেছে-তিনি ইচ্ছে করলে অনায়াসেই তাঁর কোনো অধস্তনকে পাঠাতে পারতেন সমস্ত কিছু নথিভুক্ত করতে।

অথচ তিনি তা কখনো করেননি, তিনি সবকিছু নিজের চোখে দেখতে চান। নিজের কানে শুনতে চান। আর এজন্য তাঁকে রাতের ঘুম বিসর্জন দিতে হয়, কারণ তাঁর বরাদ্দ কাজের সময়ের মধ্যে তাঁর গ্রামে আসার কোনো সুযোগ নেই।

কে আপত্তি করে বলল যে এমনকি ক্ল্যামও দিনে গ্রামে এসে থাকেন, এমনকি কয়েকদিন পর্যন্ত এখানে কাটিয়ে যান তাহলে কি আর্লেন্ডার, একজন সামান্য সহায়ক, তাঁর চেয়েও বেশি অপরিহার্য ওখানে? শুনে দু'একজন প্রণখোলা হাসি হাসল, বাকিরা একটু বিব্রত হয়ে চুপ করে রইল। কের প্রশ্নের উত্তর কেউ দিল না। একটু পরে শুধু একজন কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে বলল, ক্ল্যামও অবশ্যই অপরিহার্য, যেমন দুর্গে তেমনই এই গ্রামে।

এই সময় দরজা হাট করে খুলে গেল ও বেরিয়ে এল মমুস, দু'পাশে দুজন লোক, তাদের হাতে লণ্ঠন। 'যে দুজনকে প্রথমে হের আর্লেন্ডারের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হবে।'

সে বলল, 'তারা হচ্ছেন গারষ্টেকার আর কে। এই দুজন কি এখানে আছেন?'

তারা নিজেদের ঘোষণা করল কিন্তু তারা সামনে এগোবার আগেই জারমিয়া পিছলে চুকে পড়ল। 'আমি এখানকার একজন ওয়েটার' বলে ও মমুস হাসিমুখে তার পিঠে একটা চাপড় মারার পর সে ভেতরে অদৃশ্য হলো।

'ওই জারমিয়া ব্যাটার ওপর আমায় কড়া নজর রাখতে হবে,' বলল কে নিজে, যদিও তার ভালোই জানা ছিল একই সময়ে যে জারমিয়া আর্থারের চেয়ে অনেক কম বিপদজনক, সেতার বিরুদ্ধে দুর্গে ঘোট পাকাচ্ছে, সম্ভবত তার পক্ষে বিচক্ষণতার কাজ হতো এই দুটো লোককে সহকারী হিসেবে কাছে রেখে দেওয়া হাজার বিরক্তি সত্ত্বেও, তাদের উপর থেকে নজরদারি না করে ছেড়ে দেবার পরিবর্তে। সেক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে তারা ষড়যন্ত্র করতে পারত না। সে কাজটায় তাদের স্বাভাবিক একটা দক্ষতা রয়েছে।

কে যখন মমুসের কাছ দিয়ে যাচ্ছে তখন মমুস চমকে উঠল, যেন কেই যে জমির আমিন এটা সে প্রথম আবিষ্কার করল, 'আ, এই যে আমিন মশাই, সে বলল, 'সেই ব্যক্তি' পরীক্ষিত হতে যার আপত্তি ছিল সেই তিনিই এখন তাড়াহুড়ো করে চলেছেন পরীক্ষা দিতে। তা সেই সময় এটা আমায় করতে দিলেই তো ব্যাপারটা সহজে চুকেবুকে যেত। সত্যি, ঠিক সময়টা বেছে নেওয়া যে কী শক্ত।'

তার কথা শুনে কে দাঁড়িয়ে পড়ায় মমুস আবার বলল, 'যান যান ভিতরে যান, তখন আমার আপনার উত্তরে প্রয়োজন ছিল, এখন আর তা নেই।'

তবুও কে উত্তর দিল, মমুসের কলার ভঙ্গিতে রেগে গিয়ে, 'আপনারা শুধু ভাবেন নিজেদের কথাই। কেউ কোনো একটা পদে আছে বলেই আমি কারো কথার উত্তর তখনো দিইনি। এখনো দেব না।'

মমুস উত্তর দিল, 'কাকে দেবেন তাহলে শুনি? ওখানে যে বসে আছে সে তাহলে কে? নিজের দিকে একবার তাকান।'

তারা হলে গিয়ে ঢোকার পর একটি পরিচারক এসে পুরনো পথ দিয়ে, রাস্তাটা ইতিমধ্যেই কের কাছে পরিচিত, নিয়ে গেল। বারান্দা অতিক্রম করে, অন্য একটা প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে ঢালু মতন একটা সরু বারান্দা ধরে। ওপরতলার ঘরগুলো বোঝাই যাচ্ছিল বড়ো বড়ো আমলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা আছে।

অন্যদিকে সহায়কদের ঘর সব এই বারান্দা সংলগ্ন, আর্লেন্সারের ঘরও তাই, যদিও তাঁর পদমর্যাদা সবার উপরে। চাকররা লঠনগুলো নিভিয়ে দিল কারণ এখানে বিদ্যুতের আলোয় সব ঝলমল করছিল। সবই এখানে ছোটোমাপের কিন্তু সুরচিসম্পন্ন ভাবে সাজানো। প্রতিটি শূন্যস্থানের যথাযথ সন্ধ্যাবহার করা হয়েছে এখানে। গলিপথটা ঠিক ততটাই উঁচু যাতে একটা লোক মাতা না ঝুঁকিয়ে চলতে পারে।

দু-ধারের দরজা প্রায় পরস্পরকে স্পর্শ করছে। দেওয়াল ছাদ পর্যন্ত পৌঁছয়নি। বাতাস চলাচলের জন্যই সম্ভবত, কারণ এখানে ভূগর্ভস্থ ঘরের মতো নিচু বারান্দাটির ক্ষুদ্রে ঘরগুলোর জানলা বসানোর জায়গা নেই। আধা দেওয়াল থাকার অসুবিধেটা হলো এই যে এই বারান্দাটা ও ঘরগুলো নানা শব্দে মুখর হয়ে থাকে। মনে হয় অনেকগুলো ঘর ভর্তি হয়ে আছে মানুষজনে। বেশির ভাগ ঘরেই লোক এখনো জেগে আছে।

শোনা যায় গলার আওয়াজ। হাতুড়ি ঠোকার শব্দ। কাঁচের টুং টাং। কিন্তু সব মিলে অবস্থাটা মনোরম বলা যায় না। কণ্ঠস্বরগুলো জড়ানো, মাঝে মধ্যে এখানে ওখানে দু একটা উচ্চরিত শব্দ বুঝে ওঠা যায়, কোনো কথোপকথন বলেও মনে হয় না, মনে হয় কেউ যেন কাউকে পাঠ দিচ্ছে। কিংবা জোরে জোরে কিছু পড়ছে।

আর বিশেষ করে কাঁচের ও প্লেটের টুং টাং শব্দ আসছিল। যেখানে কোনো কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল না। আর ঘরের ভেতর হাতুড়ির শব্দ কে-কে মনে পড়িয়ে দিল যেন তাকে কে কবে কোথায় বলেছিল কর্মচারীরা কেউ কেউ ছুতোরের কাজ কিংবা ইঞ্জিনের মডেল বানানোর কাজে নিজেদের মগ্ন রেখে ক্রমাগত মানসিক চাপ থেকে কিছুটা হাঁফ ছাড়ার চেষ্টা করেন।

সারা বারান্দাটা শূন্যই ছিল একজনকে বাদ দিলে। বিবর্ণ লম্বা, সরুমতন এক ভদ্রলোকটির গায়ে একটা ফারের কোট। তাঁর ফাঁক দিয়ে তার রাতের পোশাক উঁকি দিচ্ছিল। তিনি বসেছিলেন একটা ঘরের ঠিক সামনেই। ঘরে সম্ভবত তাঁর অত্যন্ত গরম বোধ হওয়াতেই তিনি বাইরে এসে বসে একটা খবরের কাগজ পড়তে শুরু করেছিলেন।

কিন্তু পড়ায় তার মন ছিল না, প্রায়ই তিনি হাই তুলেছিলেন, কাগজ সরিয়ে রাখছিলেন, তারপর ঘাড় বাঁকিয়ে বারান্দাটা দেখছিলেন, সম্ভবত কোনো সাক্ষাৎপ্রার্থীর জন্য অপেক্ষাই করছিলেন যাকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন কিন্তু সে আসেনি। তাঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় চাকরটি বলল গারস্টেকারকে, ‘ঐ যে পিনসখোয়ার’।

গারস্টেকার মাথা ঝাঁকাল ‘উনি খুব বেশিক্ষণ এখানে আসেননি।’ সে বলল, ‘খুব বেশিক্ষণ নয়,’ চাকরটি তাকে সমর্থন করল। অবশেষে তারা এসে দাঁড়াল একটা ঘরের সামনে যেটা অন্যান্য ঘরের চেয়ে কোনো দিক দিয়েই আলাদা নয়।

কিন্তু তার পিছনদিকে, চাকর তাদের বোঝাল, রয়েছেন স্বয়ং আর্লেন্সার। চাকরের নির্দেশমতো কে তাকে কাঁধে তুলে নিল যাতে যে ছাতের নিচের ফাঁকটা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিতে পারে। ‘উনি শুয়ে আছেন।’ বলল চাকরটি কে-র কাঁধ থেকে নেমে।

‘বিছানার উপর জামাকাপড় পরেই, কেন জানি না আমার মনে হয় উনি সবসময়ই ঘুমোন গ্রামে এসে মাঝে মধ্যেই উনি এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েন। অভ্যাস নেই তো।

আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। উনি জেগে উঠলেই ঘন্টা বাজবেন। এছাড়া এমনও আগে অনেকবার হয়েছে যে গ্রামে থাকাকালীন পুরো সময়টা উনি ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলেন তারপর জেগে উঠেই হয়ত সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দুর্গের দিকে রওনা দিতে হলো। এখানে তিনি যে কাজটা করেন তা সম্পূর্ণ স্বৈচ্ছায় তো!’ ‘সেক্ষেত্রে বোধ হয় ওঁর ঘুমিয়ে থাকাটাই ভালো।’ বলল গারস্টেকার।

‘কারণ জেগে ওঠার পর ওঁর হাতে যখন কম সময় থাকবে উনি ঘুমিয়ে পড়ার জন্য তখন বিব্রত হয়ে উঠে তাড়াহুড়ো করে সব সেরে ফেলতে চাইবেন। এতে কেউ একটা কথা বলার সুযোগই তো পাবে না।’

‘তুমি নতুন বাড়িতে কোচোয়ানের কাজের একটা চুক্তির ব্যাপারে এসেছ তো?’ জিজ্ঞাসা করল ভৃত্যটি।

গারস্টেকার মাথা ঝাঁকাল, চাকরটিকে টেনে এক কোণে নিয়ে গিয়ে গলা নামিয়ে কি যেন বলল। কিন্তু চাকরটি কিছুই শুনছিল না, সে গারস্টেকার থেকে চোখ সরিয়ে স্থির দৃষ্টিতে অন্যদিকে চেয়ে রইল, তার থেকে সে একমাথা উঁচু, ও ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে চুলে হাত বোলাতে লাগল।

১৮

এইসময়, সে যখন উদ্দেশ্যহীনভাবে চতুর্দিকে তাকাচ্ছিল, কে বহুদূরে বারান্দার একটা বাঁকের মাথায় ফ্রিডাকে দেখতে পেল। তাকে দেখে মনে হলো সে যেন তাকে চিনতেই পারছে না ও তার দিকে ভাবলেশহীন মুখে অপলক চেয়ে রইল; তার হাতে একটা ট্রের ওপর কয়েকটা খালি প্রেট। সে চাকরটিকে বলল, সে অবশ্য তার কথায় সামান্য কর্ণপাতও করল না-তার সঙ্গে লোক যত বেশি কথা বলে ততই বোধ হয় তার অন্যমনস্ক হয়ে পড়া স্বভাব-যে একটু পরেই সে ফিরে আসবে। তারপর ফ্রিডার দিকে ছুট দিল। তার কাছে পৌঁছেই সে তার কাঁধ আঁকড়ে ধরল এমনভাবে যেন সে তার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেছে ও তার চোখে চোখ রেখে কয়েকটা মামুলি প্রশ্ন করল।

কিন্তু ফ্রিডার দেহের কাঠিন্য তাতে কোমল হলো না একটুও। তার বিহ্বল ভাবটা গোপন করতে সে ট্রের ওপর ডিশগুলো এদিক ওদিকে সরিয়ে বলল, ‘আমার কাছে তোমার কী দরকার? ওদের কাছেই আবার যাও না-কাদের কথা বলছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ওদের কাছ থেকেই তো এইমাত্র এলে, আমি সব জানি।’ কে সঙ্গে সঙ্গে তার কৌশল পালটে ফেলল। এতটা অতর্কিতে ব্যাখ্যাদানটা সঠিক হবে না ও তা সবচেয়ে দুর্বল জায়গা থেকে গুরু করাটাও বৈঠক রয়েছে,’ সে বলল।

ফ্রিডা তার দিকে অবাক চোখে তাকাল ও তারপর তার মুক্ত হাতটা নরমভাবে তার জু ও গালের ওপর বুলিয়ে দিল। মনে হচ্ছিল সে যেন ভুলে গেছে তাকে দেখতে আগে কেমন ছিল। এখন সে তা স্মরণ করতে চেষ্টা করছে। কেউ খুব কষ্ট করে কিছু মনে করতে চেষ্টা করলে তার চোখে যে ভাব ফুটে ওঠে ফ্রিডার চোখেও তেমনই ঝাপসা দৃষ্টি।

‘আমাকে আবার ট্যাপরুমের কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে।’ সে বলল অবশেষে স্বাভাবিকভাবে, যেন সে যা বলছে তা শুধু কথার কথা মাত্র কিন্তু একই সঙ্গে সে যেন কে-র সঙ্গে অন্য একটা কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছে, যেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ-‘এখানকার কাজটা আমার না, যে কেউ কাজটা করতে পারে; যে কেউ, যদি সে বিছানা প্রস্তুত করতে পারে, যার স্বভাব হাসিখুশি আর সে বোর্ডারদের লোচ্চামিতে তেমন কিছু মনে তো করেই না বরং সেটাকে উপভোগই করে। কোনো মেয়ের মধ্যে এই গুনগুলো থাকলেই সে শোবার ঘরে পরিচারিকা হতে পারে। কিন্তু ট্যাপরুমের কাজ সম্পূর্ণ অন্যরকম, আমাকে সরাসরি ট্যাপরুমের কাজ দেওয়া হয়েছে এ সত্ত্বেও যে বিশেষ কোনো কৃতিজ্ঞ দেখিয়ে কাজটা ছাড়িনি।

কিন্তু সরাইমালিক আনন্দের সঙ্গেই আমাকে আবার কাজে ফিরিয়ে নিয়েছে। সরাই মালিক বরং ঝুলোঝুলি গুরু করে দিয়েছিল যাতে আমি কাজটা নেই। তুমি যদি একটু ভাব ট্যাপরুমটা আমাকে কিসের কথা মনে করিয়ে দেয় তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে। শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক করলাম আমি কাজটা নেব। আমি এখানে এখন অস্থায়ীভাবে আছি। পেপি আমাদের কাছে অনুন্নয়ন করেছিল আমরা যেন তাকে হঠাৎ ট্যাপরুম ছেড়ে চলে যেত বাধ্য করে তাকে গভীর লজ্জার মধ্যে ফেলে না দিই। যে আন্তরিকতার সঙ্গে এই কদিন সে কাজ করেছে ও বাধ্যের মতোই কাজটা ছেড়ে দিচ্ছে তা চিন্তা করে আমরা তাকে চব্বিশ ঘন্টা মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছি।

‘ব্যবস্থা তো খুবই পাকাপোক্ত দেখছি,’ বলল কে, ‘কিন্তু তুমিই তো কিছুদিন আগে আমার জন্য ট্যাপরুমের কাজ ছেড়ে চলে এসেছিলে, আর কদিনের মধ্যেই যখন আমাদের বিয়ে হতে যাচ্ছে তুমি আবার কাজে ফিরে যাচ্ছি?’

‘বিয়ে হবে না,’ বলল ফ্রিডা।

‘তোমার কাছে অবিশ্বাসী হয়েছে বলে?’ ফ্রিডা মাথা নাড়াল।

‘শোন ফ্রিডা,’ বলল কে, ‘আমরা ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার আমার তথাকথিত অবিশ্বাসের কাজ করা বিষয়ে আলোচনা করেছে। আর প্রত্যেকবারই শেষ পর্যন্ত তুমি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে তোমার সন্দেহ অমূলক।

তারপর থেকে যেহেতু আমার দিকে থেকে কোনো পরিবর্তনই হয়নি আমি প্রথমে যেমন ছিলাম এখনো ঠিক তেমনই নির্দোষ আছি। সবসময়ই তা থাকবে। তাহলে পরিবর্তনটা নিশ্চয়ই হয়েছে তোমার দিক থেকে, কোনো অচেনা লোকের কান ভাঙানিতে বা এমনই কোনো কারণে। যে ভাবেই ব্যাপারটা দেখা যাক না কেন তুমি আমার উপর অবিচার করছ, কেন তা ওই দুটি মেয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঠিক কি তা গুনলেই বুঝতে পারবে। ওদের মধ্যে গাঢ় রঙের মেয়েটি -এত বিশদভাবে সব উল্লেখ করে আত্মপক্ষ সমর্থন করাটা আমার পক্ষে খুবই লজ্জার, কিন্তু এছাড়া তুমি উপায় রাখলে না-সেই মেয়েটি তোমার কাছে যতটা অপ্রীতিকর আমার কাছে ঠিক ততটাই। যতভাবে সম্ভব আমি তার থেকে দূরে দূরে থাকি, আর সেও কাজটা সহজ করে দেয় কারণ তার মতো অর্ন্তমুখী মেয়ে আমি আর দেখিনি।

‘হ্যাঁ,’ চোঁচিয়ে উঠল ফ্রিডা, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই শব্দটা যেন ছিটকে বেরিয়ে এল।

কে খুশির সঙ্গে লক্ষ্য করল তার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, যা সে বলতে চায় তা বলতে পারছে না, 'হ্যাঁ,' তুমি হয়ত তাকে অন্তর্মুখী, একাচোরা বলেই মনে কর। তুমি হয়ত এও ভাব ওদের মধ্যে সবচেয়ে নির্লজ্জ যারা তারাও এমনই একাচোরা প্রকৃতির আর-অবিশ্বাস্য মনে হলেও তুমি যে আন্তরিকভাবেই তা বিশ্বাস কর আমি তা জানি।

তোমার বিষয়ে একবার ব্রীজ ইন এর বাড়িওয়ালীও বলেছিল, 'আমি ওর কথা জানতে পারি এটা ঠিক কিন্তু ওকে একটা ছেড়ে দিতেও ভরসা হয় না যেমনভাবে কেউ সদ্য হাঁটতে শেখা কোনো শিশুকে দূরে একা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে না, তার হাঁটায় বাধা দিতে এগিয়ে যাবেই।'

'একবার অন্তত তার উপদেশটা পালন কর।' বলল কে স্মিতহাস্যের সঙ্গে, 'কিন্তু ওই মেয়েটা-সে একাচোরাই হোক বা নির্লজ্জই হোক, ওর বিষয়ে আমি আর কিছু শুনতে চাই না।'

'কিন্তু তুমি ওকে একাচোরাই বা বলছ কেন?' জিজ্ঞাসা করল ফ্রিডা কৌতূহলের সঙ্গে-তার এই কৌতূহল, কে-র মনে হলো তার নিজের পক্ষে খুবই অনুকূল, 'তুমি কি নিজের চোখে তাকে অমন দেখেছ। নাকি তুমি অন্য কারো কথা ভেবে কথাটা বললে?'

'এটাও নয়, ওটাও নয়, কে বলল, 'আমি কৃতজ্ঞতা থেকেই তার বিষয়ে ও কথা বলেছি কারণ সেই আমাকে সাহায্য করেছে তাকে অগ্রাহ্য করতে। সে যদি আমাকে দুটো কি একটা কথাও বলত, আমার পক্ষে আর কখনো ওখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব হতো না আর সেটা আমার কাছে মস্ত ক্ষতির ব্যাপার হতো, কারণ আমাদের দুজনের ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমাকে ওদের বাড়িতে যেতেই হবে, বুঝতেই তো পারছ। এই সোজা কারণেই আমাকে অন্য মেয়েটার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেই হয়েছে।

আমাকে স্বীকার করতেই হবে মেয়েটাকে আমি তার ক্ষমতা, উপকার করার শক্তি ও বুদ্ধির জন্য শ্রদ্ধা করি কিন্তু কেউ-ই বলতে পারবে না সে ভ্রষ্টা।'

'চাকরদের অভিমত কিন্তু অন্যরকম।' বলল ফ্রিডা।

'সে তো আরো বহু বিষয়েই।' বলল কে, 'তুমি কি চাকরদের রুচি অনুসারে আমাকে চরিত্রহীন বলে ঠাওরালে?' ফ্রিডা চুপ করে রইল।

কে যখন তার হাত থেকে ট্রেটা নিয়ে মাটিতে নামিয়ে রাখল তখনো কিছু বলল না। এরপর কে তার হাতে হাত জড়িয়ে সরু বারান্দায় ধীরে ধীরে পায়চারী করতে লাগল 'বিশ্বস্ততা কাকে বলে তুমি জান না।' সে বলল।

কে-র ঘনিষ্ঠতা তাকে একটু সতর্ক করে তুলেছিল, 'মেয়েটার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা কতটা সেটা খুব বড়ো ব্যাপার না, তুমি যে আজও ওই বাড়িটায় যাও আর ওদের রান্নাঘরের গন্ধ জামায় নিয়ে ফিরে আস সেটাই আমার কাছে অসহনীয় একটা অপমান। তুমি আমাকে একটা কথাও না বলে হঠাৎ স্কুল থেকে ছুটে বেড়িয়ে গেলে। আর তারপর মাঝরাত পর্যন্ত ওদের সঙ্গে দিল্লি কাটিয়ে দিলে। তারপর যখন তোমার খোঁজ করা হলো তুমি মেয়ে দুটোকে শিখিয়ে দিলে যেন বলে তুমি সেখানে নেই।

বিশেষ করে সেই 'একাচোরা মেয়েটাই খুব জোর দিয়ে সেটা জানিয়েছিল। আর তারপর সাপের মতো গোপন পথ দিয়ে বেরিয়ে এলে, সম্ভবত সেই ভালো মানুষ মেয়েদের সম্মান রক্ষা করতেই, তাদের সুনাম, বাঁচাতে। না, এ নিয়ে আর কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই।'

'হ্যাঁ, এ নিয়ে আমরা আর আলোচনা করব না।' বলল কে, 'কিন্তু অন্য বিষয় নিয়ে করতে হবে বেকি ফ্রিডা।

তাছাড়া এ সম্বন্ধে বলারও আর বিশেষ কিছু নেই। আমাদের যে কেন ওখানে যেতে হয়েছিল তা তো তুমি জান। আমার পক্ষে তা সহজ ছিল না। কিন্তু আমাকে সেই অস্বস্তি অগ্রাহ্য করতে হয়েছিল। তুমি আর সেটাকে আরো কঠিন করে তুলো না। আজ রাতে আমি একবার শুধু উঁকি দিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত বারনাবাস এসেছে কিনা, অনেক আগেই আমার জন্য তার একটা খবর নিয়ে আসার কথা ছিল। সে তো এল না।

কিন্তু সে যে আসবেই এ বিষয়ে আমাকে নিশ্চিত করা হয়েছিল। আর তার সম্ভাবনাও প্রবল ছিল। আমি চাইনি সে আমার খোঁজে এখানে আসুক কারণ সেক্ষেত্রে তার উপস্থিতিতে তুমি অপমানিত বোধ করতে। বহু ঘন্টা কেটে গেল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে এল না।

কিন্তু তার জায়গায় এল এমন একজন যাকে আমি ঘৃণা করি। সে যে আমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করবে এটা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। তাই আমি সংলগ্ন বাগানের পথটা ধরে বেরিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তাই বলে তার থেকে আমি লুকিয়েও থাকতে চাইনি। রাত্তায় নেমেই আমি সরাসরি তার কাছে এগিয়ে গিয়েছিলাম, অবশ্য স্বীকার করি আমার হাতে তখন বাদাম ডালের একটা ছড়িও ছিল। এই হলো আসল ব্যাপার। এ নিয়ে বেশি কিছু আর বলারও নেই।

কিন্তু অন্য বিষয়ে বহু কিছু বলার রয়েছে। আমার সহকারীদের বিষয়ে তোমার কি বলার আছে, যাদের নাম আমার কাছে ততটাই বিতৃষ্ণার যতটা ওদের পরিবার তোমার কাছে। তোমার সঙ্গে সম্পর্কটা তুলনা কর তো আমার সঙ্গে ওদের পরিবারের সম্পর্কের সাথে। বারনাবাসের পরিবার বিষয়ে তোমার যে ঘোর অপছন্দ রয়েছে তা আমি বুঝতে পারি ও আমি তার ভাগও নিতে পারি। আমি শুধু নিজের স্বার্থেই কখনো ওখানে গিয়েছি ও মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে আমি ওদের কাছ থেকে অন্যায় সুযোগ নিচ্ছি ও তাদের একরকম অপমান করছি।

কিন্তু তুমি আর সহকারীরা? তুমি কখনো অস্বীকার করনি যে ওরা তোমার পিছনে সবসময় ঘুরঘুর করে বেড়ায় আর তুমিও ওদের প্রতি আকৃষ্ট। আমি তো এজন্য তোমার ওপর রাগ করিনি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম এমন একটা শক্তি কাজ করে চলেছে যার মোকাবিলা করা তোমার সাধ্যের মধ্যে নেই।

কিন্তু তুমি যে অন্তত তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ খাড়া করার চেষ্টা করছ তাতেই আমি খুশি হয়েছিলাম। তোমাকে রক্ষা করার চেষ্টাও করেছিলাম।

কিন্তু যেই না কয়েক ঘন্টার জন্য তোমাকে ঘরে রেখে বেরোলাম, তোমার বিশ্বস্ত তার উপর বিশ্বাস রেখে আর এই নির্ভরতা নিয়ে যে ঘরটা ভালোভাবেই বন্ধ করা আছে, অবশ্য স্বীকার করছি আমি তাদের ক্ষমতাকে ছোটো করে দেখেছিলাম, তোমাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য বেরোতে না বেরোতেই এই জারমিয়া-যে লোকটাকে কাছ থেকে দেখলে বোঝা যায় কত অসুস্থ ও বুড়োটে-তার বাড়ি এতদূর বাড়ল যে জানলার কাছে গিয়ে ভিতরে উঁকি দেবার মতো তার সাহস হলো; শুধুমাত্র এই কারণেই নাকি ফ্রিডা আমার তোমাকে হারাতে হবে আর তোমার মুখ থেকে শুনতে হবে-বিয়ে হবে না।’

‘আমরাই কি বরং ধমক দেওয়া উচিত নয়? কিন্তু না, আমি তা করিনি।’

এবং আরো একবার কে-র মনে হলো ফ্রিডার মনকে অল্প একটু বিক্ষিপ্ত করে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ও সে তাকে অনুরোধ করল তার জন্য কোনো খাবার নিয়ে আসতে কারণ দুপুর থেকে তার পেটে কিছুই পড়েনি। স্পষ্টতই এই অনুরোধে যেন কিছুটা হাঁফ ছেড়ে ফ্রিডা মাথা নেড়ে কোনো খাদ্যের খোঁজে ছুট দিল। বারান্দা থেকে বেশি দূরে অবশ্য নয় যেখানে কে অনুমান করল রান্নাঘরটা রয়েছে। ফ্রিডাকে বাদিকে অল্পই যেতে হলো। অল্প পরেই সে ফিরে এল একটা প্লেটে এক টুকরো মাংস ও একটা মদের বোতল নিয়ে।

কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল খাবারটা কারো উচ্ছিষ্ট মাত্র। মাংস গুলো তাড়াহুড়ো করে সাজানো হয়েছে সেই সত্য চাপা দিতে। মদের বোতলটা তিনভাগ খালি। কে অবশ্য কোনো মন্তব্য করল না। তীব্র খিদে নিয়ে সে খাবারের উপর হামলে পড়ল। ‘তুমি রান্নাঘরে ঢুকেছিলে?’ সে প্রশ্ন করল। না, আমার নিজের ঘরে,’ সে উত্তর দিল, ‘ওখানে পিছন দিকে আমার একটা ঘর আছে।’

‘তাহলে তো তুমি আমাকে ঘরেই নিয়ে যেতে পার। সেখানে বসেই আমি খাওয়াটা সারতে পারি।’ বলল কে।

‘আমি বরং তোমাকে একটা চেয়ার এনে দি।’ বলেই ফ্রিডা চলতে শুরু করল। ‘ধন্যবাদ’ বলল কে তাকে টেনে ধরে ‘আমি তোমার ঘরেও যাব না, চেয়ারেরও দরকার নেই।’ ফ্রিডা অনিচ্ছাতেই যেন তার হস্তক্ষেপ সহ্য করল একটু উদ্ধতভাবে, মাথা নোয়াল ও ঠোঁট কামড়ে ধরল।

‘বেশ, তাহলে শোন ও আমার ঘরেই আছে,’ সে বলল, ‘তুমি কি অন্য কিছু আশা করেছিলে? আমার বিছানাতেই ও গুয়ে আছে ও বাইরে থেকে ওর ঠান্ডা লেগে গেছে, ঠকঠক করে কাঁপছে, কোনো খাবার খায়নি। তুমিই তো যত নষ্টের গোড়া। তুমি যদি সহকারীদের তাড়িয়ে দিয়ে ওই লোকগুলোর পেছনে ধাওয়া না করতে, এখনো আমরা দুজনে স্কুলবাড়িতে শান্তিতে বসে থাকতে পারতাম। তুমি একা আমাদের দুজনের সুখশান্তি নষ্ট করলে। তুমি কি মনে কর কাজে নিযুক্ত থাকলে জারমিয়া আমাকে তোমার থেকে কেড়ে নিতে সাহস পেত? এখানে যে সবকিছু কোনো নিয়ম নীতি মেনে চলে তা তুমি একেবারেই বোঝনি। সে আমাকে চাইছিল, নিজে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল, সে আমাকে চোখে চোখ রাখছিল, কিন্তু সমস্তই ছিল একটা খেলা মাত্র,

অনেকটা একটা ক্ষুধার্ত কুকুরের খেলার মতো যে কোনো মতেই টেবিলের ওপর লাফিয়ে ওঠার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে না।

আমার সম্পর্কেও ঠিক এক কথা খাটে। আমি তার প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। আমার শৈশবে সে ছিল আমার খেলার সাথী-আমরা দুজনে দুর্গ পাহাড়ের ঢালে কত খেলাই না খেলেছি কত অপূর্বভাবেই না সময় কেটেছে তখন— তুমি তো আমার ছোটোবেলার কথা কখনো আমাকে জিজ্ঞাসাই করনি কিন্তু আমাদের কোনো সম্পর্কই চূড়ান্ত রূপ নিতে পারেনি, দুর্গের চাকরি তাকে পিছন থেকে টেনে রেখেছিল বলে আর ভবিষ্যৎ স্ত্রী হিসেবে তোমার ওপর আমার কর্তব্যবোধের জন্য। এই সময়ই তুমি সহকারীদের তাড়িয়ে দিলে। আর নিজের এই কৃতিত্বে একেবারে ডগমগ হয়ে উঠলে যেন আমার জন্য একটা মস্ত কাজ করে ফেলেছ, অবশ্য একদিক দিয়ে সেটা সত্যি।

আর্থারের ক্ষেত্রে তোমার মতলবটা খেটে গেল। সাময়িকভাবেই অবশ্য, সে হালকা পলখা ছেলে, জারমিয়ার অদম্য প্রেম তার নেই। এছাড়া সেই রাতে তুমি তাকে যে থাবড়াটা মেরেছিলে তাতেও তার স্বাস্থ্য প্রায় ভেঙে পড়ে-আঘাতটা আমার সুখকেও ধাক্কা দিয়েছিল একটা-সে তো দুর্গে দৌড়ল নালিশ করতে। সে যদি আবার ফিরেও আসে তাকে আগের রূপে কখনোই আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু জারমিয়া থেকে গেল। সে যখন কর্মচারী তখন মানিভের সামান্য জ্রুটিকেও আতঙ্কের চোখে দেখে। কিন্তু যখন কর্তব্যকর্ম থেকে মুক্ত, জগতের কোনো কিছুকেই সে ডরায় না। সে এসেই আমাকে অধিকার করল। তুমি যখন আমায় পরিত্যাগ করে গেলে আর সে এসে আমায় হুকুম করল আমি কোনো বাধা দিতে পারলাম না। স্কুলের দরজাও আমাকে খুলতে হয়নি। জানলা চুরমার করে সে আমাকে তুলে নিয়ে আসে। আমরা এখানেই চলে এলাম। সরাইওয়ালা ওর দেখাশোনার ভার নিয়েছে। খদ্দরোও তাকে ওয়েটার হিসেবে পেয়ে খুবই খুশি, আমাদের তখনি কাজে নিয়ে নেওয়া হয়েছে, সে আমার সঙ্গে ঘর করছে না, যদিও-আমরা দুজন একই ঘরে আছি।’

‘তা সত্যেও,’ বলল কে, ‘আমি বলব ওই সহকারী দুটোকে তাড়িয়ে আমি কোনোভাবেই অনুতপ্ত নই। তুমি যেমন বললে ঘটনা যদি ঠিক তেমনই হয়, আর তোমার বিশ্বস্ততা যদি ঐ সহকারীদের কাজে থাকা না থাকার ওপর নির্ভর করে থাকে তাহলে সব সম্পর্ক চুকে যাওয়াটা ভালোই হয়েছে। যে বিবাহিত জীবনের সুখশান্তি নির্ভর করে থাকে অমন দুটো হিংস্র পশুর ওপর, যাদের শুধু চাবুকের ওপর রাখা দরকার, সে সুখ খুব কাক্ষানীয় নয়। এই ক্ষেত্রে বরং আমি কৃতজ্ঞাবোধ করছি ওই পরিবারটির প্রতি যা অজ্ঞাতসারেই আমাদের বিচ্ছেদে কোনো একটা ভূমিকা নিয়েছে।’

এবার তারা নীরবে পাশাপাশি আবার সামনে পিছনে পদচারণা করতে লাগল, যদিও বলা শব্দ কে প্রথম তা শুরু করেছিল। পাশাপাশি চলা সত্যেও যে কে আবার হাত তুলে নিল না এতে ফ্রিডা ক্ষুণ্ণ হলো, ‘তাহলে তো দেখা যাচ্ছে সবই ঠিক ঠাক হয়ে গেছে, আমরাও এবার স্বচ্ছন্দে পরস্পরকে বিদায় জানাতে পারি।’

বলল কে, ‘তুমি তোমার জারমিয়ার কাছে ফিরে যাও। বাগানে তাড়া করে আমি তার ঠান্ডা লাগিয়ে দিয়েছিল। তুমিও তাকে অনেকক্ষণ একা ফেলে রেখেছ, আর

আমিও কিরে যাই শূন্য স্কুলে। কিংবা তুমি ছাড়া আমার সেখানে ঠাই হবে না জেনে অন্য যে কোনো জায়গায় যেখানে কেউ আমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে। তবু এখনো যে আমি ইতস্তত করছি তার কারণ তুমি যা কিছু বললে তাতে আমার একটু খটকা লাগছে। আর সেটাও অকারণে নয়, জারমিয়া সম্পর্কে আমার ধারণাটা একটু অন্যরকম।

সে যতদিন চাকরিতে ছিল সে সবসময় তোমার পায়ে পায়ে ঘুরত আর আমি বিশ্বাস করি না তার চাকরির মতো তোমাকে খ্রাস করার চেষ্টা করছে কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়েই গেছে তার মানসিকতা নিশ্চয়ই আগের মতো নেই। আমি যদি ব্যাপারটা এভাবে ব্যাখ্যা করি তো ক্ষমা কোর : যেহেতু তুমি আর তার প্রভুর প্রেমিকা নও তোমার প্রলোভনও তার কাছে আর আগের মতো নেই। তুমি তার ছোটোবেলার বন্ধু হতে পারো কিন্তু ওর সঙ্গে আজ রাতের সংক্ষিপ্ত কথোপকথন থেকেই আমি ওকে চিনতে পেরেছি— কিন্তু আমার মতে ও এই ধরনের ভাবাবেগকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। ওকে যে কেন তোমার খুব আবেগপ্রবণ বলে মনে হয়েছে তা আমার বুদ্ধির অগম্য।

আমার তো মনে হলো ও বরং ঠিক উল্টোভাবে খুবই ঠান্ডা ধরনের। আমার বিষয়ে ও গেলেটারের কাছ থেকে কিছু নির্দেশ পেয়েছিল, সেগুলো সম্ভবত আমার অনুকূল নয়, আর সেও সেই নির্দেশ পালনে খুব তৎপর হয়ে উঠেছিল, গভীর কর্তব্য পরায়ণতা থেকেই, আমাকে স্বীকার করতে হবে। সেই নির্দেশের একটা ছিল এই যে আমাদের দুজনের সম্পর্কটা তাকে চুরমার করে দিতে হবে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে নানা উপায় অবলম্বন করে, তার একটা ছিল শয়তানী লোচা দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে পটানোর চেষ্টা করা। অন্যটা -এ ব্যাপারে বাড়িওয়ালীও তাকে সাহায্য করে ছিল-আমার চরিত্রহীনতা বিষয়ে নানা কল্পকাহিনী প্রচার করা, তার এইসব প্রচেষ্টা সফল হলো। তার সঙ্গে ক্ল্যামের কোনো না কোনো স্মৃতি জড়িয়ে থাকায় তার পক্ষে কাজটা সহজ হয়।

এটা সত্যি যে সে তার কাজ হারিয়েছে। কিন্তু সেই সময়টাতেই, যখন তার আর কাজের দরকার নেই; এবার সে তার খাটনির ফয়দা তুলতে এগিয়ে এল। স্কুলের জানলা দিয়ে তোমায় তুলে নিয়ে এল; এবার তার কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে। আর কোনো দায়িত্ব পালনের তৎপরতা তার থাকার কথা নয়, এবার তার সব একঘেয়ে লাগতে বাধ্য। সে এবার বরং আর্থারের জায়গায় থাকতে চাইবে। আর্থার উপরে তো সত্যি কোনো কোনো নালিশ জানাতে যায়নি, সে ওখানে বরং প্রশংসা ও নতুন নতুন কাজের দায়িত্ব লাভ করেছে। কিন্তু নিচে কারো তো থাকা দরকার পরিবর্তিত পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে। এখন এই যে তোমার রক্ষণাবেক্ষণের একঘেয়ে দায়িত্বটা তার ঘাড়ে চাপল এটা তার কাছে বোঝার মতো মনে হবে। তোমার উপর তার ভালোবাসা এক রতিও নেই, সে আমার কাছে তা খোলাখুলিই স্বীকার করেছে।

ক্ল্যামের এক প্রেমিকা হিসেবে সে অবশ্য তোমাকে শ্রদ্ধাই করে, আর তোমার শোবার ঘরে ঢুকে নিজেকেও এক ক্ষুদ্রে ক্ল্যাম ভাবা তার কাছে আরামদায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তোমার দাম এখন তার কাছে কিছুই না, তোমার জন্য এখানে একটা জায়গা খুঁজে বার করাটাও তার মূল কাজের একটা অংশ মাত্র, তুমি যাতে

অশান্ত না হয়ে ওঠো সে জন্য সে নিজেও এখানে থেকে গেছে, কিন্তু জেনে রেখো এটাও সাময়িক, সে থাকবে ততক্ষণই যতক্ষণ না দুর্গ থেকে কোনো খবর আসে আর তোমার প্রতি তার নিভে আসা আকর্ষণটা পুরোপুরি না ছাই হয়ে যায়।’

‘কতভাবেই না নিন্দে করলে ওর,’ বলল ফ্রিডা তার দুই ছোটো মুষ্টিতে আঘাত করে।

‘নিন্দে?’ বলল কে, ‘না ওকে নিন্দে করার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। কিন্তু আমি ওর ওপর একটা অবিচার বোধ হয় করে ফেলেছি। আমি ওর সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বললাম তা তো ওকে ওপর থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। অন্যভাবেও ওর আচরণকে ব্যাখ্যা করা যেতেই পারে। কিন্তু নিন্দে? নিন্দে করার উদ্দেশ্য একটাই হতে পারত আর তা হলো তোমার ভালোবাসাকে আঘাত করা। সেটার যদি প্রয়োজন হতো আর আমার কাছে নিন্দে করাই যদি একমাত্র উপায় হতো আমি নির্দ্বিধায় তার নিন্দে করতাম। তার জন্য কেউ আমার দোষও দিতে পারত না।

আমার তুলনায় তার অবস্থানটা এত বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে যে, শুধু নিজের সামান্য বুদ্ধির উপর নির্ভর করে কারো একটু আধটু নিন্দেমন্দ করে নিজের অবস্থার একটু উন্নতি করাটা বেঠিক হতো বলে আমার মনে হয় না। সেই প্রচেষ্টাকে মোটামুটি নির্দোষই বলা যেতে, শক্তিশীনের পক্ষে আত্মরক্ষার অন্তিম প্রচেষ্টা মাত্র। সুতরাং তোমার মুঠি নামাও।’

এবং কে ফ্রিডার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল। ফ্রিডা তা ছড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল একটু হেসে ও তার চেষ্টাও তেমন আন্তরিক মনে হলো না। ‘কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তার নিন্দে করার কোনো প্রয়োজনই আমার নেই।’

বলল কে, ‘কারণ তুমি ওকে ভালোইবাসো না। যদিও তোমার ধারণা তাকে ভালোবাসো আর এ কারণে আমি তোমাকে মোহমুক্ত করছি বলে বরং আমার ওপর কৃতজ্ঞই বোধ করবে পরে। একবার ভেবে দেখো কেউ যদি তোমার কাছ থেকে আমাকে কেড়ে নিতে চায়, কোনো হিংসা ছাড়াই কিন্তু সুপরিকল্পিত ভাবে তাহলে তার পক্ষে তা করা সম্ভব একমাত্র এই সহকারীদের মাধ্যমেই। তাদের উপস্থিতি খুবই আকর্ষণীয়, সুঠাম, শিশুর মতো সরল, হাসিখুশি, যেন আকাশ থেকে নেমে এল, আসলে দুর্গ থেকে, তার সঙ্গে আবার একটু শৈশব স্মৃতির মিশেলও রয়েছে। এ সমস্ত কিছু ভারি চটকদার মনে হবারই কথা।

বিশেষ করে আমি যখন সমস্ত গুণাবলীর ঠিক বিপরীত মেরুতে রয়েছি, তার ওপর আবার ক্রমাগত দৌড়ে বেড়াচ্ছি এমন সব কিছুর পিছনে যা বুঝে ওঠাই কঠিন ও তোমার কাছে রীতিমতো বিরক্তিকর, আর এছাড়াও আমাকে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এমন সব মানুষজনের সঙ্গে মিশতে হচ্ছে যাদের তুমি ঘৃণারও অযোগ্য বলে মনে কর। যে ঘৃণা থেকে আমিও অব্যাহতি পাইনি নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও। আমাদের সম্পর্কের মধ্যে যে ফাঁকটুকু ছিল তাকে শয়তানির সঙ্গে অত্যন্ত সুচতুরভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। প্রতিটি সম্পর্কের মধ্যে কিছু ত্রুটি বিদ্যুতি থাকেই। আমরা দুজন দু-জগত থেকে এসেছিলাম।

তারপর পরস্পরকে জানার পর আমাদের বদলে যাবারই কথা, একেবারে নতুন জীবনে আমাদের মধ্যে এক ধরনের অনিশ্চয়তা বোধও খুবই স্বাভাবিক। আমি নিজের কথা বলছি না, আমার তেমন গুরুত্বও নেই, সত্যি কথা বলতে কি প্রথম যখন তুমি আমার দিকে তাকিয়েছিলে তখনই আমার জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছিল। আর অন্যের ধনে নিজেকে অভাস্ত করে তোলাটাও খুব কঠিন কাজ নয়।

কিন্তু অন্য কিছু বাদ দিলেও তোমাকে ক্ল্যামের কাছ থেকে উপড়ে আনা হয়েছিল। সেটা যে তোমার পক্ষে কত সাংঘাতিক তা অনুমান করার ক্ষমতা পর্যন্ত আমার নেই। খুব ধীরে ধীরে ঝাপসা একটা ধারণামাত্র আমার হয়েছে, তুমি নিজেকে আর খুঁজে পাচ্ছিলে না, তোমাকে পদে পদে হোঁচট খেতে হচ্ছিল, আর আমি তখন তোমার পাশে থাকলেও, সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলাম না, আমি তোমার পাশে থাকাকালীনও তুমি বন্দি হয়ে থাকতে নিজস্ব স্বপ্নের মধ্যে কিংবা বাস্তবধর্মী অন্য কিছুর মধ্যে, যেমন বাড়িগুলি কিংবা-সে যাই হোক, সংক্ষেপে মাঝে মধ্যে এমন সময় আসত যখন তুমি আমার থেকে দূরে সরে যেতে, কামনা করতে, বেচারি, ব্যাখ্যাভীত অস্পষ্ট কোনো কিছুর।

আর ঠিক এই সময় মামুলি কোনো মানুষও তোমার সেই স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়লে তুমি নিজেকে তার মধ্যে হারিয়ে ফেলবে এটাই তো স্বাভাবিক। তুমি আত্মসমর্পণ করলে নিজেকে এক মস্ত মরীচিকার মধ্যে যার মধ্যে মিশে রয়েছে অতীতের প্রেত, বিগত স্মৃতি, অতীতের যা কিছু ও তা গর্ভে অন্তহীনভাবে প্রবিষ্ট হওয়া অপসূর্যমান বর্তমান, যে জীবন অতীত হয়ে গেছে-এ সমস্ত অধিকার করে রইল তোমার বাস্তব দৈনিক জীবন।

ভুল ফ্রিডা, ভুল, অতীতে যেমন, বর্তমানেও তুমি তেমনি ভুল করে চলেছ। ঘৃণিত ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তুমি আমাদের সমঝোতার সম্ভাবনাকে প্রত্যাঘাত করে চলেছ। নিজের মধ্যে ফিরে এস, নিজেকে সংযত কর; এমনকি তুমি যদি ভেবেও থাক ক্ল্যামই সহকারীদের পাঠিয়েছিলেন-যদিও তা সম্পূর্ণ অসত্য। তারা এসেছে গেলেটারের কাছ থেকে-আর তারা যদি নিন্দনীয় কৌশল ও লাস্পটের সাহায্যে তোমার উপর মোহ বিস্তার করতে সমর্থ হয়েও থাকে ও তাদের মধ্যে তুমি ক্ল্যামের ছায়া দেখে থাক, তাহলেও মনে লেখ পশুপালকের চাকরদের চেয়ে তার কোনো অংশেই উন্নত নয়। বরং স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে তারা তাদের চেয়ে অনেক দুর্বল।

সামান্য টাটকা বাতাসেই তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে ও বিছানায় গুয়ে পড়তে বাধ্য হয়। দুর্বলতাটা অবশ্য তারা চাকর সুলভ চাতুরি দিয়ে ঢেকে রাখে সবসময়।

ফ্রিডা তার মাথাটা কে-র কাঁধে ন্যস্ত করেছিল; পরস্পরের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তারা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে পায়চারী করছিল।

‘আমরা যদি শুধু,’ বলল ফ্রিডা একটু পর, খুব ধীরে, শান্তভাবে, স্নিগ্ধস্বরে, যেন সে জানে কে-র কাঁধটিতেই তার একমাত্র তাৎক্ষণিক শান্তির আশ্রয় নির্দিষ্ট হয়ে আছে, ও সে তা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করে নিতে চায়, ‘যদি আমরা সেই রাতে অন্য কোথাও চলে যেতাম, এখন আমরা কত শান্তিতে থাকতে পারতাম বল তো, সব সময় একসঙ্গে, যখন ইচ্ছে তোমার হাতে হাত রাখতে পারি, তোমার সাহচর্য আমি কতই না কামনা

করি তোমাকে চেনার পর। তোমায় এক মুহূর্ত না দেখলেই নিজেকে কি অসহায়ই না মনে হয়েছে, তোমার সাহচর্য লাভ, বিশ্বাস কর, আমার একমাত্র স্বপ্ন ছিল, অন্য কিছু নয়।’

এই সময় বারন্দার পাশ থেকে কেউ ডেকে উঠল, লোকটা জারমিয়া। একদম নিচের ধাপে দাঁড়িয়ে রয়েছে, গায়ে কুর্তা, ফ্রিডার একটা চাদরে নিজেকে আবৃত করেছে। চুল এলোমেলো, তার পাতলা দাড়ি যেন ভিজে ঝুলে পড়েছে, তার চোখ যন্ত্রণা ও ভর্ৎসনায় বিস্ফারিত। শীর্ণ গাল রক্তাভ আর তার নগ্ন পদদ্বয় ঠান্ডায় এত প্রবলভাবে কাঁপছিল যে তার গায়ে লম্বা আলোয়ানের প্রান্ত পর্যন্ত আন্দোলিত হচ্ছিল। তাকে দেখে মনে হয় যেন হাসপাতাল পলাতক কোনো রুগী, তাকে দেখামাত্র একটা চিন্তাই মনে আসতে পারে আর তা হলো যত সত্ত্বর সম্ভব তাকে বিছানায় পাঠিয়ে দেওয়া দরকার।

ফ্রিডার মনেও ঠিক একই অনুভূতির সঞ্চার হয়ে থাকবে। কে-র থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিমেষের মধ্যে সে জারমিয়ার পাশে গিয়ে উপস্থিত হয়। তার ঘনিষ্ঠতা, যে উদ্বেগের সঙ্গে সে ভালোভাবে তার গায়ে চাদরটা জড়িয়ে দেয়, যেভাবে ব্যস্ততার সঙ্গে সে তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, মনে হলো জারমিয়াকে নতুন করে শক্তি দিয়েছে, যেন এতক্ষণ পর সে কে-কে লক্ষ্য করল। ‘আ, আমিন মশাই যে।’

সে বলল ফ্রিডার গালে হাতে বোলাতে বোলাতে, ফ্রিডা তাকে কথা বলা থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করছিল, ‘বাধা দিলাম বলে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন আমি মোটেই ভালো নেই। আর সেটাই আমার একমাত্র কৈফিয়ত। আমার জ্বর জ্বর লাগছে, একটা চা আমায় খেতেই হবে, তাহলেই ঘাম হবে। স্কুলের বাগানের ধারের ওই জঘন্য রেলিংটা, আমি সহজে ওটার কাথা ভুলতে পারব না, আর তারপর হাড়ে মজ্জায় জমে গিয়েও সারারাত ধরে দৌড়দৌড়ি করা।

এমন অনেক কিছুর জন্য মানুষ স্বাস্থ্যের বারোটা বাজায় যার মূল্য প্রায় কিছুটা নেই, সেটা অবশ্য সেই সময়ে কারো মনে থাকে না। সে যাই হোক, আমিন মশায় আপনি এ নিয়ে চিন্তিত হবেন না, আমাদের সঙ্গে ঘরে আসুন, আমার মতো অসুস্থ লোককে একটু দর্শন দিন, আর ঐ একই সময়ে আপনার প্রাণে যত কথা জমে আছে ফ্রিডার কাছে খোলসা করে বলুন। যখন দুজন পরিচিত মানুষ পরস্পরকে বিদায় জানায়, এটাই স্বাভাবিক শেষ মুহূর্তে তাদের বলার মতো কথা অনেক থাকবে যেটা কোনো তৃতীয় ব্যক্তি, যে বিছানায় শুয়ে গরম চায়ের জন্য প্রতীক্ষা করছে, সম্ভবত বুঝে উঠতে পারবে না।

কিন্তু অনুগ্রহ করে ঘরে আসুন, আমি একেবারেই চুপ করে থাকব।’

‘যথেষ্ট হয়েছে,’ বলল ফ্রিডা তার হাত টেনে ধরে, ‘ওর এমন জ্বর, ও কী চলছে নিজেই জানে না।

কিন্তু কে, তুমি এসো না, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি না আসতে। এই ঘরটা আমারও জারমিয়ার কিংবা বলা ভালো আমারই ঘর, একমাত্র আমার, আমি তোমাকে

আসতে নিষেধ করছি। তুমি আমাকে সব সময় কাঠগোড়ায় দাঁড় করাও, ও কে, কেন তুমি আমার দোষ ধর সব কিছুতে? আমি কিছুতেই তোমার কাছে ফিয়ে যাব না, কখনো না। সেই সম্ভাবনার কথা ভাবলেও আমার হৃৎকম্প হয়। তোমার মেয়েদের কাছেই বরং ফিরে যাও, আগুনের সামনে তোমাকে নিয়ে চাতুর্যসম্বল বসে থাকে যে মেয়েরা আর তোমার খোঁজে কেউ গেলে তার গায়ে থুথু ছিটোয় যারা।

সেই তো তোমার প্রাণের আরাম সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থান। আমি নানাভাবে চেষ্টা করেছি তুমি যোতে সেখানে না যাও। সফল হইনি। তবু আমি হাল ছাড়িনি, যাই হোক আমি খুব ক্লান্ত আর ও সবও অতীতের কথা, তুমি এখন মুক্ত। তোমার সামনে দারুণ এক জীবন অপেক্ষা করে আছে, ওদের মধ্যে একটার জন্য তোমাকে চাকরদের সঙ্গে অল্প স্বল্প ঝগড়া করতে হতে পারে কিন্তু অন্যটাকে নিয়ে তোমার কোনো সমস্যাই হবে না। স্বর্গে মর্ত্যে কেউ তোমাকে হিংসে করবে না ওর জন্য। তোমার মিলন আসলে ভবিষ্যৎ, অস্বীকার কর না। আমি জানি তুমি সব কিছুই অপ্রমাণ করে ছাড়তে পার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো কিছুই অপ্রমাণিত থাকে না।

একবার ভাব জারমিয়া, ও সব কিছুই উড়িয়ে দিতে ওস্তাদ।' তারা দুজনেই একটু হাসে, যেন কোনো গোপন বোঝাপড়ার ভিত্তিতে। কিন্তু ফ্রিডা বলল, 'সব কিছু যদি নস্যাত্ন করে দেওয়া যায়, তাতেই বা কী লাভ হবে, আমারই বা তাতে কী আসে যায় ওদের বাড়িতে কী ঘটল না ঘটল তাতে? সেটা সম্পূর্ণ ওদের ব্যাপার আর ওর ব্যাপার, আমার নয়। আমার কাজ শুধু তোমার সেবা করে যাওয়া যতদিন না তুমি ভালো হয়ে ওঠো, ঠিক যতটা তুমি আগে ছিলে কে তোমার ওপর অত্যাচার করেনি যতদিন।'

'তাহলে আমিন মশাই, আপনি আসছেন না,' বলল জারমিয়া কিন্তু এবার তাকে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছিল ফ্রিডা, কে-র দিকে একবারও ফিরে না তাকিয়ে। নিচের দিকে একটা ছোটো দরজা, বারান্দার অন্য দরজাগুলোর চেয়েও ছোটো।

শুধু জারমিয়া নয়, ফ্রিডাকেও নিচু হতে হলো তার মধ্য দিয়ে ঢোকান সময়। ভেতরটা মনে হলো উষ্ণ ও আলোকিম, দু একটি ফিসফাস শোনা গেল। সম্ভবত জারমিয়াকে বিছানায় শোয়াবার জন্য প্রেমপূর্ণ অনুনয় আর তারপরই দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ঠিক এইসময় কে লক্ষ্য করল বারান্দাটা কত নিব্বাণ হয়ে এসেছে, শুধু বারান্দার এই অংশটাই। যেথাসে মে ফ্রিডার সঙ্গে এতক্ষণ ছিল ও যেখানে সাধারণের জন্য নির্মিত ঘরগুলো রয়েছে এগুলোই শুধু নয়, লম্বা বারান্দার অন্য কোলাহল মুখর ঘরগুলোও একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছে। এর অর্থ হলো সমস্ত ভদ্রমহোদয়ই শেষ পর্যন্ত নিদ্রামগ্ন হয়েছেন।

কে-রও নিজেকে ভারি ক্লান্ত মনে হচ্ছিল, সম্ভবত এই ক্লান্তির কারণেই সে শেষ পর্যন্ত জারমিয়ার যথোপযুক্ত মোকাবিলা করে উঠতে পারল না অথচ যা করাটা তার উচিত ছিল। তার পক্ষে সেটা বেশি বিচক্ষণতার কাজ হতো। জারমিয়ার কাছ থেকে খেইটা ধিরে নেওয়া যেত নির্ভুলভাবে, সে নিশ্চয়ই তার ঠান্ডাজনিত অসুস্থতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেখিয়েছে-তার মধ্যে সে যে আর্তি দেখতে পেয়েছে তা আর যাই হোক ঠান্ডার

প্রকোপ নয়। সেটা এমনই স্বভাবজ যে কোনো চায়ের সাধ্য নেই তার প্রশমন করে। সে যদি জারমিয়ার উদাহরণটা নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করত, তারই মতো নিজের বিপুল ক্লান্তিকেও বহুগুণ ফাঁপিয়ে দেখাত, এই বারান্দাতেই এলিয়ে পড়ত-তাতে অবশ্য তার আরামও কম হতো না-একটু ঘুমিয়েও নিত।

কে জানে তার কপালেও কিছু শুশ্রূষা জুটে যেত কিনা। অবশ্য সে কোনোভাবেই তার অভিনয়কে জারমিয়ার মতো নিজের পক্ষে লাভজনক করে তুলতে পারত না। জারমিয়াই নিঃসন্দেহে এই সমবেদনা লাভের প্রতিযোগিতাটিতে জয়ী হতো। এবং সম্ভবত অন্যান্য দম্বযুদ্ধেও।

কে-র এত ক্লান্তি লাগছিল যে ভাবছিল কোনো একটা ঘরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করবে কিনা, কিছু ঘর এখানে নিশ্চয়ই খালি পড়ে আছে, এরপর শান্তিতে আরামাদায়ক ঘুম দারুণ একটা বিছানায় শুয়ে পড়ে। শুধু এতেই বহু কিছুই ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। তার সঙ্গে এমনকি একটা রাতটুপিও রয়েছে। মেঝেতে ফ্রিডা যে ট্রেটা ফেলে গিয়েছিল তাতে একটা ডিকেটারে কিছু রাম তখনো অবশিষ্ট পড়ে আছে, আবার কিছুটা ফিরে যাবার কষ্ট অগ্রাহ্য করে কে ট্রেটার কাছে গেল। এরপর সে গভীর তৃপ্তিতে পুরো মদটা গলায় ঢালে।

এবার আর্লিঙ্গারের কাছে যাবার মতো কিছুটা বল সঞ্চয় করা গেছে বলে তার মনে হলো। সে আর্লিঙ্গারের ঘরের দরজাটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করল কিন্তু চাকরটা আর গারস্টেকারকে ধারে কাছে দেখতে না পাওয়ায় আর সব দরজাগুলোই একরকম দেখতে মনে হওয়ায় সে দরজাটা খুঁজে পেল না। তবু তার যেন মনে হচ্ছিল এই লম্বা সরু বারান্দাটার কোনো জায়গায় দরজাটা আছে আর তা যেন তার জানা ও সে স্থির করল, যে দরজাটা তার কাছে সবচেয়ে সম্ভাব্য বলে মনে হবে সেটাই সে খুলে দেখবে! পরীক্ষাটা তেমন বিপদজনক হবারও কথা না; ঘরটা যদি আর্লিঙ্গারেরই হয় তাহলে তো তিনি নিঃসন্দেহেই তাকে গ্রহণ করবেন।

আর যদি দেখা যায় সেটা অন্য কারো তাহলে ক্ষমা টমা চেয়ে সরে পড়লেই চলবে। আর ঘরের মানুষ যদি ঘুমিয়ে থাকে, যেটা খুবই সম্ভব, তাহলে কে-র দরজা খোলাটা কেউ লক্ষ্যই করবে না। অবস্থাটা সবচেয়ে মন্দ দাঁড়াবে যদি দেখা যায় ঘরটা একদম খালি কারণ সেক্ষেত্রে ঘরে ঢুকে যুগ যুগান্ত ধরে বিছানায় ঘুমিয়ে থাকার প্রলোভন দমন করাটা কে-র পক্ষে অসম্ভবই হয়ে উঠবে। সে আবার বারান্দাটার ডান-বাঁদিক দৃষ্টিপাত করে দেখতে লাগল এমন কেউ আসছে কিনা যে তাকে এ বিষয়ে কোনো খবর দিতে পারে, সেক্ষেত্রে তার কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু লম্বা বারান্দাটা একেবারেই গুনশান ও মনুষ্যহীন।

এবার কে দরজার কান পাতল। ভিতরে কোনো মানুষের সাড়া শব্দ নেই। সে টোকা দেয় এত আস্তে যে ভিতরে কেউ ঘুমিয়ে থাকলেও তা শুনে জেগে উঠত না। কিন্তু এবারেও কিছু না ঘটতে দেখে সে দরজাটা খুলল খুব সাবধানে। কিন্তু এবার তার কানে এল মৃদু এক চিৎকার।

ঘরটা ছোটোমতো, তার অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে-পেন্সায় এক খাট, খাটের পাশে ছোটো টেবিলে একটা ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছিল, পাশেই ভ্রমণকারীদের একটা ছোটো ঝোলানো ব্যাগ। বিছানাতে, লেপে আপাদমস্তক ঢেকে কেউ অস্বস্তিতে নড়েচড়ে উঠল এবং লেপ ও চাদরের ফাঁক দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কে'?

এখন কে-র পক্ষে আর দ্রুত সরে পড়া সম্ভব নয়। একটু তিক্তভাবে সে অপূর্ব কেন্দ্র দুঃখজনকভাবে অধিকৃত বিছানাটা নিরীক্ষণ করতে থাকে, তারপর হঠাৎ তার প্রশ্নটির কথা মনে পড়ায় আত্মপরিচয় দেয়। এর প্রতিক্রিয়াটি বোধ হয় ভালোই হলো। বিছানায় শুয়ে থাকা লোকটি আগে লেপটি মুখ থেকে সরিয়েছিল এমন শঙ্কিতভাবে যেন কোনো গন্ডগোল দেখলেই আবার নিজেকে পুরোপুরি মুড়ে ফেলবে।

কিন্তু এবার সে লেপটা সরিয়ে দিয়েই উঠে বসে। এ নিশ্চিতভাবেই আর্লিঙ্গার নয়। লোকটি দেখতে ছোটোখাটো সুদর্শন হলেও মুখের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। এর গালগুলো শিশুদের মতো ফোলা ও চোখদুটি কৌতুকপূর্ণ কিন্তু অন্যদিকে তার দীর্ঘ কপাল, চোখা নাক, পাতলা ঠোঁট ও প্রায় অদৃশ্য খুতনিটি মোটেই শিশুজনোচিত নয় বরং পূর্ণ মানুষের মতো বুদ্ধিদীপ্ত। নিঃসন্দেহে বোঝা যায় স বিষয়েই তার তৃপ্তিবোধ ও একধরনের আত্মসন্তুষ্টির ফলেই সে শিশুর মতো সজীবতাটা ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে।

'আপনি ফ্রেডারিককে চেনেন,' সে প্রশ্ন করল কে-কে। কে বলল সে চেনে না।

'কিন্তু সে আপনাকে চেনে।' মৃদুহাস্য করে ভদ্রলোকটি বলল। কে মাথা ঝাঁকাল। তাকে চেনে এমন লোকের অভাব নেই দেখা যাচ্ছে। তার পথে এটাই এখন সবচেয়ে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, 'আমি তাঁর সেক্রেটারি, আমার নাম বুরগেল।'

'ক্ষমা করবেন' কে বলল, দরজার হাতলে হাত রেখে, 'আমি দুঃখিত, আপনার দরজাটা আমি অন্য লোকের মনে করে ভুল করে খুলে ফেলেছি। ঘটনাটা এই যে সচিব আর্লিঙ্গার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

'বড়োই দুঃখের কথা।' বলল বুরগেল, 'আপনাকে কেউ ডেকে পাঠিয়েছেন বলে না। আপনি দরজার ব্যাপারটায় ভুল করেছেন বলে। আসলে ব্যাপারটা হলো আমার ঘুম যদি একবার ভেঙে যায় আমি আর ঘুমতে পারি না। তবে এর জন্য আপনি অতটা দুঃখিত হবেন না, এটা আমার ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য মাত্র। দরজাগুলো ভিতর থেকে বন্ধ করা নাই বা কেন, অ্যাঁ? এর একটা কারণ আছে অবশ্যই, কারণটা হলো, পুরনো এক প্রবাদ অনুসারে, সচিবদের ঘরের দরজা সবসময় যাকে বলে উন্মুক্ত রাখতে হবে। কথাটা অবশ্য আক্ষরিকভাবে নেওয়াটা ঠিক হবে না।

বুঝলেন,' বেশ মজার ভঙ্গি করে সে কে-র দিকে, তাকাল, তার বিলাপ সত্ত্বেও তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, তার বিশ্রামটি পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। বুরগেল সম্ভবত সারা জীবন কখনো ততটা ক্লান্ত হয়নি কে যতটা এই মুহূর্তে বোধ করছিল।

'তো আপনি এখন কোথায় যাবেন বলে স্থির করেছেন?' বুরগেল প্রশ্ন করল। 'এখন চারটে বাজে। যার কাছেই আপনি যাবেন বলে মনস্থ করে থাকুন না কেন তাকে গিয়ে কিন্তু আপনাকে জাগাতেই হবে। বেশির ভাগই আমার মতো ঘুমের ব্যাঘাত সহ্য করতে অভ্যস্ত নন। অনেকে আমার মতো ঘুম ভাঙানোর ব্যাপারটাকে ক্ষমার চোখে

দেখবেনও না। এই সচিবরা খুবই ভীতু প্রকৃতির প্রজাতি। তাই এখানেই আর একটু থাকুন।

এখানে প্রায় পাঁচটার সময় থেকে লোকজন জেগে উঠতে শুরু করে, ঐ সময়েই যিনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তার কাছে যাওয়াটা আপনার পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হবে। অতএব দরজার হাতল ছেড়ে কোথাও বসে, অবশ্য ঘরে জায়গা টায়গা বেশি নেই, বিছানার এই ধারটাতে বসাই সবচেয়ে ভালো। আমার এখানে যে কোনো চেয়ার বা টেবিল নেই তাতে অবাধ হচ্ছেন তো?

আসলে আমাকে বেছে নিতে বলা হয়েছিল, হয় আসবাবপত্র সাজানো ঘর কিন্তু হোটেলের সরু বিছানা, অথবা সমস্ত বিছানা আর একটা বেসিন, আমি বড়ো বিছানাই পছন্দ করলাম। কারণ শোবার ঘরে বিছানাটাই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে দরকারী জিনিস। সত্যি, যে লোক হাত পা ছড়িয়ে ঘুমে একেবারে কাদা হয়ে যেতে পারে তার কাছে এমন বিছানা খুবই লোভনীয়। কিন্তু আমার কাছে পর্যন্ত, যে আমি ঘুমতে পারিনা বলে সবসময় ক্লান্ত হয়ে থাকি, সেই আমার কাছেও কিন্তু এটা একটা আশীর্বাদই বলা যায়। দিনের বেশির ভাগই আমি এই বিছানাতে কাটাই, এখানে বসেই সমস্ত চিঠি চাপাটি পড়ি বা লিখি।

সমস্ত আবেদনকারীরর সাক্ষাৎকারও এখানেই নিই। সবই খুব মসৃণভাবে ঘটে। অবশ্য আবেদনকারীদের জন্য এখানে বসার কোনো জায়গা নেই।

কিন্তু তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই এখানে আমি কাউকে শুধুমাত্র বিছানার এই ধারটাতেই বসতে বলতে পারি। জায়গাটা সরকারি কাজের পক্ষে অনুকূল না হলেও রাতের অতিথির সঙ্গে কথাবার্তার জন্য ব্যবহৃত হতে আপত্তি নেই।

কিন্তু আপনি যে চুপচাপ রয়েছেন আমিন মশাই? 'আমি অত্যন্ত ক্লান্ত' বলল কে। সে আহ্বান পাওয়া মাত্রই অভদ্রের মতো, অশোভন ভাবে বিছানায় বসে পড়েছিল ও ছত্রিতে হেলান দিয়েছিল, 'নিশ্চয়ই' বলল বুরগেল, হাসতে হাসতে।

'এখানে সকলেই ক্লান্ত, যেমন ধরুন, গতকাল আর আজ আমায় যে পরিমাণ কাজ করতে হয়েছে তা খুব ছোটোখাটো ব্যাপার না। এমন আমার ঘুম আসবে এমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কিন্তু সেই অসম্ভব ঘটনা যদি ঘটেই, আপনি এখানে থাকতে থাকতেই যদি আমি ঘুমিয়ে পড়ি আপনি অনুগ্রহ করে চুপ করে বসে থাকবেন, দরজাও খুলবেন না কিন্তু ভাববেন না, আমি ঘুমবো না, কিম্বা ঘুমলে কয়েক মুহূর্তের জন্য মাত্র, আমার ব্যাপারটা হলো কি জানেন এই আবেদনপ্রার্থীদের নিয়ে সবসময় চলতে চলতে আমি এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে আমার কাছে তারা থাকলে আমার ঘুমিয়ে পড়তে সুবিধে হয়।

'তাহলে আপনি বরং ঘুমিয়ে পরুন সচিবমশাই,' কে বলল ভারি খুশি হয়ে।

'সেক্ষেত্রে আপনার অনুমতি নিয়ে আমিও একটু চোখ বুজব।'

'না, না,' বুরগেল বলল আবার হাসতে হাসতে, 'দুঃখের বিষয় হলো, কেউ আমাকে অনুরোধ করলেও আমি ঘুমতে পারি না, শুধু কথাবার্তা বলতে বলতেই তেমন একটা সুযোগ দেখা দিতে পারে। কথোপকথনের মাধ্যমেই আমার ঘুম আসার একটা

সম্ভাবনা থাকে। হ্যাঁ, আমাদের কাজই হলো এমন যে স্নায়ু বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যেমন ধকন, আমি হচ্ছি যোগাযোগ সচিব। আপনি আমার কাজটা কী জানেন না বুঝি?

তাহলে শুনুন। আমি হচ্ছি সবচেয়ে শক্তিশালী সংযোগকারী,-এই সময়ে সে অবচেতনভাবেই হাতে হাত ঘষে দ্রুত-ফ্রিডারিক ও গ্রামের মধ্যে। দুর্গ ও গ্রামীণ সচিবদের মধ্যেও আমি যোগাযোগ রক্ষা করি। বেশির ভাগ সময় গ্রামেই কাটাই, পাকাপাকিভাবে অবশ্য নয়, যে কোনো মুহূর্তে আমাকে প্রস্তুত থাকতে হয় দুর্গের দিকে ছুট দিতে। আপনি ট্রাভেল ব্যাগটা দেখতে পাচ্ছেন তো? আমার জীবনটা খুবই অস্থির প্রকৃতির। সকলের জন্য এ জীবন নয়।

অন্যদিকে আবার এটাও সত্যি যে এমন জীবন ছাড়া আমি থাকতেও পারি না। অন্য সমস্ত কাজই আমার একঘেয়ে মনে হয়। আপনার কাজকর্ম কেমন চলছে আমিন মশাই?’

‘আমি কোনো কাজই করছি না।’ বলল কে, ‘আমাকে আমিনের কাজে এখনও নিযুক্তই করা হয়নি।’ সে এখন এসব নিয়ে ভাবতে চাইছিল না। সে শুধু মনে প্রাণে চাইছিল বুরগেল ঘুমিয়ে পড়ুক কিন্তু এ চিন্তাটিও তার মাথায় এল তার নিজের প্রতি এক ধরনের দায়িত্ববোধ থেকে, মনের গভীরে সে ভালোমতোই জানত যে বুরগেলের ঘুমের সম্ভাবনা একেবারেই সুদূরপর্যন্ত।

‘এ তো ভারি অবাক করা কথা বললেন।’ বলল বুরগেল মাথায় একটা ছোটো ঝাঁকুনি দিয়ে ও তারপর লেপের তলা থেকে একটা নোটবুক বার করে আনল কিছু লিখতে।

‘আপনি একজন আমিন অথচ বলছেন জরিপের কোনো কাজই পাচ্ছেন না?’ কে যান্ত্রিকভাবে মাথা নাড়ে। সে খাটের ছত্রির ওপর বাঁ হাত ছড়িয়ে দিয়ে তাতে মাথা ন্যস্ত করেছিল। এর আগে সে নানা ভঙ্গিতে আরাম পাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু বর্তমান বসার কায়দাটাই তার কাছে সবচেয়ে আরামদায়ক বোধ হয়। এবার সে বুরগেলের কথায় অধিকতর মনোনিবেশ করতে পারছিল।

‘আমি প্রস্তুত আছি,’ বুরগেল বলছি, ‘বিষয়টা নিয়ে আরো কিছু শুনতে। আমাদের এখানে এমন হতেই পারে না যে কোনো দক্ষ কর্মচারীকে খামোকা বসিয়ে রাখা হবে। আপনার কাছেও তো ব্যাপারটা বেশ কষ্টকর হবারই কথা আপনার এতে যন্ত্রণা হচ্ছে না?’

‘যন্ত্রণা হয় বৈকি,’ কে বলল আস্তে ও নিজের মনেই একটু হাসল কারণ এই মুহূর্তে তার কোনো রকম মর্মপীড়াই হচ্ছিল না। এছাড়া বুরগেলের সাহায্য করার ইচ্ছায় সে সামান্য অভিভূত হয়নি কারণ তার ইচ্ছেটা একেবারেই ঠুনকো ধরনের। কোনো কিছুই না জেনে-কোনো পরিস্থিতিতে তাকে কাজে নিয়োগ করা হয়েছে, তাকে ইতিমধ্যেই কী পরিমাণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে এই জায়গাটাতে ও দুর্গে, এখানে আসতে গিয়ে তাকে কত জটিলতা অভিজ্ঞতায় করতে হয়েছে-এসব কিছুই না জেনে, সচিবসুলভ কোনো কৌতূহলের চিহ্নমাত্র না দেখিয়ে সে কিনা সব কিছু মুহূর্তেই সমাধান করে দিতে চায় একটু ক্ষুদ্রে নোটবুক-এর সাহায্য।

‘মনে হচ্ছে আপনার যেন একটু আশাভঙ্গ হলো?’ বুরগেল বলল, যে মন্তব্যটি থেকে বোঝা গেল মানবচরিত্র বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা কম নয়। ঘরে ঢুকেই কে বারে বারে নিজেকে বুঝিয়েছিল এই বুরগেল নামক লোকটিকে খাটোভাবে দেখাটা ঠিক হবে না।

কিন্তু এমন বিপুল অবসাদে সে এখন চাপা পড়ে যাচ্ছিল যে কাউকে যে ঠিকমতো বিচার করবে এমন ক্ষমতাই তার ছিল না। ‘না,’ বলল বুরগেল, যেন সে কে-র হয়ে চিন্তার জবাব দিচ্ছে ও কে-কে তা মৌখিকভাবে উচ্চারণ করার কষ্ট থেকে মুক্তি দিচ্ছে, ‘হতাশায় নিজেকে আতঙ্কিত হতে দেবেন না। এখানে অনেক কিছুই এমনভাবে করা হয় যে লোকে ঘাবড়ে যা। আর নতুন কেউ এখানে এসে পড়লে তার কাছে এত রকম বাধা আসতে থাকে যে তার কাছে সে সমস্ত একেবারেই অনতিক্রমণীয় বলে মনে হয়।

এ ব্যাপারগুলো কেন ঘটে তা আমি কখনো অনুসন্ধান করে দেখিনি। হয়তো বাস্তবের সঙ্গে বাহ্যিক ঘটনার কোনো সামঞ্জস্য থেকে থাকবে, যে ধরনের নির্লিপ্ততা থাকলে তা যথাযথভাবে বিচার করা যায় তেমন মানসিক গঠন আমার হয়নি এই পদে থেকে। কিন্তু মন দিয়ে শুনুন, এমন সুযোগ কিন্তু সত্যিই মাঝে মধ্যে আসে যার সঙ্গে তৎকালীন ঘটনার যোগাযোগ থাকে না। এ এমন এক সুযোগ যা একটিমাত্র শব্দ, দৃষ্টিপাত কিংবা বিশ্বাসের কোনো চিহ্ন থেকেই কেউ পেয়ে যেতে পারে যদি সে জীবনব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করে যায়। এই হলো আসল ব্যাপার।

কিন্তু অন্যদিকে আবার এই সুযোগগুলির বাহ্যিক ঘটনাবলীর সঙ্গে কোনো যোগই থাকবে না যদি তাদের থেকে কেউ ফায়দা ওঠাতে না পারে। কিন্তু সুযোগগুলোর সদ্যবহার হয় নাই বা কেন? আমি নিজেকে প্রায়ই প্রশ্ন করি।’ কে-ও জানত না কিন্তু সে নিশ্চিতভাবে অনুভব করতে পারছিল বুরগেল যা কিছু বলছে তার সঙ্গে যেন কোথাও তার নিজের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়ে গিয়েছে।

কিন্তু তার নিজের সঙ্গে যুক্ত সবকিছুর উপরই সে গভীর বিতৃষ্ণা বোধ করছিল। সে তার মাথাকে অন্যদিকে সরাল। যেন বুরগেলের সমস্ত প্রশ্ন থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে। তাকে আর স্পর্শই করতে পারবে না কোনো প্রশ্নমালা। ‘এখানে,’ বুরগেল বলে যাচ্ছিল, হাতের আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলতে তুলতে, ভঙ্গিটা তার গভীর বক্তব্যের সঙ্গে একেবারেই বেমানান মনে হচ্ছিল, ‘এখানে সচিবরা ক্রমাগত অনুযোগ করে থাকে যে এই গ্রামে বেশির ভাগ জিজ্ঞাসাবাদের কাজই তাদের রাতে করতে বাধ্য করা হয়। তা তারা এমন অনুযোগ করে কেন? তাদের কাছে এটা খুবই কষ্টসাধ্য মনে হয় বলে? রাতের আরামে ঘুমতে চায় বলে? না, তাদের অনুযোগের কারণ মোটেই তা নয়। সচিবদের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমী লোক যেমন আছেন, তাদের চেয়ে কম কঠোর পরিশ্রমী লোকও তেমন আছে, সব জায়গাতেই যেমন থাকে আর কি।

কিন্তু তাঁরা কেউই কখনো অতিরিক্ত পরিশ্রম বিষয়ে কখনো অনুযোগ করেন না, জনসমক্ষে তো নয়ই। ওটা আমাদের পদ্ধতি নয়। এসব ক্ষেত্রে কাজের সময় ও অবসর সময়ের মধ্যে আমরা কোনো পার্থক্য করি না। এমন কোনো ভেদবৈধতার অস্তিত্বই আমাদের কাছে নেই। সেক্ষেত্রে সচিবদের রাতে জিজ্ঞাসাবাদ করার ব্যাপারে এত

আপত্তি কেন? সেটা বোধ হয় তাহলে আবেদনকারীদের অসুবিধার কথা ভেবে? না, না তাও নয়। আবেদনকারীদের ব্যাপারে সচিবরা খুবই নির্মম। নিজেদের ওপর যতটা, তার চেয়েও বহুগুণ বেশি। একেবারেই ক্ষমাহীন, বাস্তবিকপক্ষে এই নির্মমতার কারণ তাদের কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা ও কর্তব্য পালনে আগ্রহ।

আবেদনকারী সেটাই আশা করে। আর এ সব কিছু কারণ গভীর যদিও কেউ ওপর থেকে দেখলে বুঝতেই পারবে না। এসব এখানে সকলেই মেনে নিয়েছে সত্যি বলতে কি।

বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে আবেদনকারীরা এই রাত্রিকালীন জিজ্ঞাসাবাদটাই বিশেষ করে পছন্দ করে, তাহলে এতসব সত্ত্বেও একে সচিবরা এত অপছন্দ করেন কেন?’

এর উত্তরও কে-র জানা ছিল না, তার জ্ঞান এত সীমাবদ্ধ সে বুঝতেই পারছিল না কোথায় বুরগেল তার থেকে সত্যিই উত্তর আশা করছে আর কোথায় নয়।

‘একবার যদি আমাকে তোমার বিছানায় গুতে দিতে হে!’ সে ভাবছিল।

‘আমি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেব কাল দুপুরে কিংবা আরো ভালো, কাল সন্ধ্যায়।’

কিন্তু বুরগেলকে দেখে মনে হরো না কে-কে নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা আছে। সে তারই করা প্রশ্নটির মধ্যে যেন ডুব দিয়ে বসেছিল, ‘যদ্বদ আমি দেখতে পাচ্ছি আর আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে রাতে জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে সচিবদের অনিচ্ছার কারণগুলো এরকম: রাত্রিবেলা আবেদনকারীদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসাটা অনেক বেশি অসুবিধের কারণ রাতে এই জিজ্ঞাসাবাদ করা বা মীমাংসায় আসার সরকারি আবহাওয়াটা বজায় রাখাটা খুবই শক্ত অসম্ভব যদি নাও হয়।

এছাড়া রাতে শাসকদের ক্ষমতাও অনেকটা হ্রাস পেয়ে যায়। রাতে ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছু বিচার করার একটা প্রবণতা তাদের গ্রাস করে। আবেদনকারীদের অভিযোগ আসল গুরুত্বের চেয়ে অনেক বেশি বলে মনে হয়। বিচারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয় মূলের সঙ্গে জুড়ে যায় বলে। আবেদনকারীদের সঙ্গে কর্মচারীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবধান স্বরূপ যে দুঃখ কষ্ট ও আশঙ্কা থাকে তা লঘু হয়ে যায়। সচিবরা অন্তত এমন নালিশই করে থাকেন আর তারা তাদের অভিজ্ঞতা ও কাজের মাধ্যমে এসব বিষয়ে গভীর অন্তদৃষ্টি ও অসাধারণ সুক্ষতা লাভ করেছেন।

কিন্তু তারাও নিজেদের বৃত্তের মধ্যে এ নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করেন রাতের জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার প্রভাব তারা তেমন লক্ষ্য করেন না, বরং উল্টোভাবে তারা সেই অসুবিধা দূর করার জন্য আরো বেশি পরিশ্রম করেন। আর শেষ পর্যন্ত নিজেদের বোঝান যে তারা সবকিছুতেই কাম্য ফলই অর্জন করেছেন।

কিন্তু কেউ যদি পরবর্তিকালে রেকর্ড ঘাঁটে তো সে সেখানে চোখে আঙুল দেওয়া ভুল ভ্রান্তি দেখে বিস্ময়ে স্মৃতিভত হয়ে যাবে। সেইসব ভুলের ফলে আবেদনকারীদের প্রতি আধা সুবিচার মাত্র করা গেছে আর এখানকার নিয়ম অনুসারে সরাসরি সেগুলোকে শুদ্ধ করে নেওয়া আর সম্ভব নয়, এই অবস্থায় সচিবরা যে অনুযোগ করেন তা কি

‘অপনার যথার্থ মনে হয় না?’ ইতিমধ্যে কে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সে এবার পুরোপুরি জেগে উঠল, ‘এসব কিসের জন্য? এসব কিসের জন্য?’ সে অবাক হয়ে ভাবছিল।

নিদ্রাচ্ছন্ন চোখে বুরগেল কথা শুনতে শুনতে তার মনে হচ্ছিল না কোনো আমলা কোনো কঠিন সমস্যা তার সঙ্গে আলোচনা করছে বরং যেন কোনো বস্তু তার ঘুমের পক্ষে মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যার কথার কোনো অর্থই সে বুঝে উঠতে পরছে না।

কিন্তু বুরগেল নিজের চিন্তাতেই একক ডুবে থেকে মৃদুহাস্য করছিল যেন সে কে-কে বিপথে টেনে আনতে পেরেছে, অল্প একটু। তবু সে তাকে আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে প্রস্তুত আছে তখনই।

‘বেশ,’ সে বলল, ‘অন্যদিকে আবার কারো পক্ষে অনুযোগগুলোকে সম্পূর্ণ ন্যায্য মনে কারও সংগত হবে না। রাতে জিজ্ঞাসাবাদ করার বিষয়ে অবশ্য নিয়মগত কোনো নির্দেশ লিপিবদ্ধ হয়নি। সুতরাং কেউ যদি সেটা এড়িয়ে যেতে চায় তাকে নিয়ম ভঙ্গকারী বলা যেতে পারে না, কিন্তু পরিস্থিতি, অতিরিক্ত কাজের চাপ, যেভাবে কর্মচারীরা দুর্গে ব্যস্ত থাকেন, সেখানে তারা অপরিহার্য, এবং এই নিয়ম যে আবেদনকারীর সমস্ত কিছু তদন্ত করে দেখার পরই শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হবে।

এই সমস্ত এবং আরো কিছু মাথায় রাখলে রাতের জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারটাকে আপনার অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় বলেই মনে হবে। কিন্তু এটা যদি অপরিহার্যই হয়ে ওঠে তাহলে আমি মনে করি তাও। অন্তত পরোক্ষভাবে হলেও, প্রচলিত নিয়মেরই ফলশ্রুতি।

আর তাই রাত্রিকালীন জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে কোনো ক্রটি ধরার অর্থই হলো-আমি অবশ্য একটু বাড়িয়েই বলছি, আর সেজন্য আমার পক্ষে উচ্চারণ করাও সম্ভব হচ্ছে-তার অর্থই হলো গোটা নিয়মাবলীকেই অভিযুক্ত করা।

অন্যদিকে, সচিবদের পক্ষ নিয়ে বলা যায় তাদের উচিত নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা, নিয়মকানুনের মধ্যে থেকেই এই রাতের জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে সমস্ত রকম অসুবিধা থেকে মুক্তি পাওয়া, তারা কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঠিক তাই মনে করেন।

বহুদূর এগিয়ে গিয়েই। তারা বেছে বেছে মীমাংসা করার সেইসব ক্ষেত্র বেছে নেন যার থেকে সামান্যতম ভয়ের কিছুই নেই। কোনো আপোষ মীমাংসায় ঢোকার আগে তাঁরা নিজেদের ভালোভাবে যাচাই করে নেন, নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করে নেন কোনো আবেদনকারীকে কখনো বা দশবার পর্যন্ত ডেকে এনে তার সঙ্গে আসল আলোচনার আগে। কখনো তাঁরা সহকারীদেরও ডেকে পাঠান, যাদের হয়তো বিশেষ সেই ব্যাপারে যোগ্যতাই নেই কিন্তু সে কারণেই অনেক সহজে তা নড়াচড়া করতে পারে। তাঁরা মীমাংসার সময় ধার্য করেন হয় রাতের গোড়ার দিকে কিংবা শেষের দিকে, মধ্যরাতটা

বাদ দিয়ে, এরকম আরো নানা প্রক্রিয়া রয়েছে। সচিবদের ওপর টেকা দিতে পারে এমন মানুষ খুবই দুর্বল। তাঁরা যতটা অস্বাভাবিক ততটাই আত্মস্থ।’

কে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুমটা ঠিক আসল ঘুম নয়, সে আগের ক্লান্তিতে নিদ্রাতুর অবস্থার চেয়েও এখন অনেক স্পষ্টভাবে বুরগেলের প্রতিটি শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। প্রতিটি শব্দই তার কানে আঘাত করছিল। কিন্তু এখন আর তার সেই মহাক্লান্তিজনিত চেতনার কিছু অবশিষ্ট নেই। সে যেন এমন স্বাধীন, বুরগেল আর তাকে আটকে রাখতে পারেনি, যদিও অবশ্য বুরগেলকে সে মাঝে মধ্যে হাতড়ে পাচ্ছিল। সে এখনও নিদ্রার গভীরে ঢোকেনি বটে কিন্তু তার ওপর দিয়ে নিদ্রাপ্রবাহ নিশ্চিতভাবে বয়ে যাচ্ছিল। তাকে আর কেউ তা থেকে বঞ্চিত রাখতে পারবে না। তার মনে হলো যেন এর সাথে তার মস্ত বিজয় সম্পন্ন হলো আর ইতিমধ্যেই বহু মানুষের দল জমায়েত হয়েই জয়োৎসব পালন করতে এবং সে কিংবা অন্য কেউ শ্যাম্পেনের গ্লাস তুলে ধরল সেই জয়ের সম্মানে। আর সবাই যাতে বুঝতে পারে প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা কী ঘটেছে তাই ওই লড়াই ও বিজয়টির পুনরাবিনয় করা হলো। অথচ পুনরাবৃত্তি নয়।

সত্যিই তা অনুষ্ঠিত হলো এখনই আর জয়োৎসবটি পালন করা হয়েছিল আগেই যেহেতু লড়াইয়ের ফলাফল নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। কোনো গ্রীক দেবতার মূর্তির মতো দেখতে এক সচিবকে, সম্পূর্ণ নগ্ন, কে চেপে ধরেছিল লড়াইতে লড়াইতে। ব্যাপারটা ভারি মজার, ঘুমের মধ্যেই কে মৃদুহাস্য করল যখন দেখল তার প্রহারে সচিবটির গগনস্পর্শী অহংকার কেমন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে ও কেমনভাবে তাকে তার উত্তীর্ণ মুষ্টিবদ্ধ হাত ব্যবহার করতে হচ্ছে দেহের অনাবৃত উর্ধ্বাংশকে রক্ষা করতে।

কিন্তু তা সে করছে খুবই শ্রুতভাবে। লড়াইটা বেশিক্ষণ চলল না। লম্বা লম্বা পা ফেলে কে এগিয়ে এল। একে কি আদর্শেই কোনো লড়াই বলা যায়? বিশেষ কোনো প্রতিরোধও ছিল না, মাঝে মধ্যে শুধু সচিবটির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল কিচ্ কিচ্ ধরনের শব্দ। এই গ্রীক দেবতাটি অমন আওয়াজ করতে লাগল বালিকারা সুড়সুড়ি দিলে যেমন করে, তেমন ভাবে।

অবশেষে সে অদৃশ্য হয়ে গেল, বিরাট ঘরে কে এখন একা। আরো লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থেকে সে ঘাড় ঘোরায তার প্রতিপক্ষটি কোথায় গেল তা দেখতে কিন্তু কারো কোনো চিহ্ন নেই কোথাও, লোকজনও এলোমেলো হয়ে গেছে।

শুধু শ্যাম্পেনের একটা গ্লাস ভাঙা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে। কে সেটাকে মাড়িয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে।

কিন্তু তার পায়ে ভাঙা কাঁচের টুকরো ঢুকে যায়। ঝাঁকুনি খেয়ে সে আবার জেগে ওঠে, কেমন যেন অসুস্থ লাগে তার, শিশুর হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে। কিন্তু তার পায়ে ভাঙা কাঁচের টুকরো ঢুকে যায়। ঝাঁকুনি খেয়ে সে আবার জেগে ওঠে, কেমন যেন অসুস্থ লাগে তার, শিশুর হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে দিল যেমন হয়। এ সত্ত্বেও বুরগেল এর নগ্নগাত্র দেখে যে চিন্তাটা তার স্বপ্নের অংশ মাত্র ছিল তা জাগরণের সচেতনতায় চলে আসে।

‘এই তো তোমার গ্রীক দেবতা, সামনেই, এগিয়ে যাও । ওকে বিছানা থেকে টেনে তোলা ।’

‘সে যাই হোক,’ বুরগেল বলল, তার মুখ চিন্তিতভাবে ছাতের দিকে তোলা, যেন সে বৃথাই একটা উদাহরণ খুঁজে চলেছে কিন্তু পাচ্ছে না, ‘এসব সত্ত্বেও, সমস্ত সতকর্তামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হলেও আবেদনকারীদের কাছে একটা রাস্তা খোলা থাকেই যার দ্বারা তারা সচিবদের রাত্রিকালীন দুর্বলতাটার সুযোগ নিতে পারে-যদি অবশ্য সেটাকে দুর্বলতা বলা যায় ।

এমন সম্ভাবনা কিন্তু একেবারেই সুদূরপর্যন্ত’ অতীতে প্রায় কখনই ঘটেনি বলা যায় । সুযোগটা হলো আবেদনকারীর কিছু না জানিয়ে অতর্কিতে মাঝরাতে এসে হাজির হওয়া । আপনি হয়ত বিস্মিত হচ্ছেন এটাই যখন স্বাভাবিক তখন এটা কম ঘটার কারণ কী? হ্যাঁ আপনি তো আর এখানকার এই পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত নন ।

কিন্তু আপনি নিশ্চিতভাবে সরকারি ব্যবস্থার অনবদ্য নিশ্চিন্দতা দেখে অবাক হয়ে গেছেন । এই নিশ্চিন্দতা থেকেই এমন ফলশ্রুতি হয় যে প্রত্যেকে, যে আবেদন করেছে কিংবা অন্য কারণে যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে নানা কারণে, সঙ্গে সঙ্গে, বিন্দুমাত্র দেরি না করে, নিজে সবকিছু ভালোভাবে বুঝে ওঠার আগেই, সে কোনো কিছু আঁচ পাবার আগেই, এখানকার ডাক পেয়ে যায় । এর আগে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি, তার ব্যাপারটা এমনও সেই পর্যায়ে পৌঁছয়নি, তবু তাকে ডাকা হয়েছে, না খবর দিয়ে তার আর আসার উপায় নেই । বড়ো জোর সে একটু ভুল সময়ে আসতে পারে, সেক্ষেত্রে তার জন্য নির্দিষ্ট দিন ও সময়ের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, এরপর যদি পরে সে যখন ঠিক সময়ে আসে তাকে নিয়মানুসারেই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয় । এসবে কোনো সমস্যাই হয় না; এটা ঠিক আবেদনকারীর হাতে সমনের যে কাগজটা থাকে আর ফাইলে তার বিষয়ে যা কিছু লেখা থাকে, সেগুলো সবসময় যথেষ্ট নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওগুলোই সচিবদের হাতে আত্মরক্ষার অস্ত্র, বিশেষ করে সেসব সচিবদের ক্ষেত্রে যাদের যোগ্যতার উপর বিষয়টা নির্ভর করে আছে ।

অবশ্য রাতে অন্য সচিবের কাছে হঠাৎ গিয়ে হাজির হয়ে তাদের ভড়কে দেবার রাস্তাটা খোলা থেকেই গেল । তবু প্রায়ই কেউ-ই এ পথ বেছে নেয় না কারণ সেই চেষ্টাটা হবে নির্বোধের মতো । প্রথমত, এর ফলে যোগ্য সববিটি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠবেন । এটা সত্যি যে আমরা সচিবরা কাজের ক্ষেত্রে কেউ কারো ওপর ঈর্ষা পোষণ করি না যেহেতু প্রত্যেকের যোগ্যতার স্বভূমিতে অন্য কারো হস্তক্ষেপ আমরা সহ্য করি না । এর আগে অনেকেই খেলায় হেরে গেছে কারণ বিভাগীয় সচিবের কাছে বিশেষ সুবিধে না করতে পেরে তারা গোপনে অন্য সচিবের কাছে গিয়েছিল যে সচিবের তাদের বিষয়ে মীমাংসার কোনো যোগ্যতাই নেই ।

এছাড়াও এ ধরনের চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য কারণ অ-যোগ্য কোনো সচিব, মধ্যরাতে অতর্কিতে যাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাকড়াও করা হয়েছে, যদি সাহায্য করার চেষ্টাও করেন আন্তরিকভাবে তবু তিনি বিশেষ কিছু করে উঠতে পারবেন না । ঠিক কোনো দক্ষ আইনজীবির মতই তার নিজস্ব অপূর্ণতার কারণেই, মূল বিষয়ের হৃদিস তিনি কিছুতেই

করে উঠতে পারবেন না এসই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে ব্যক্তিগত দক্ষতার অভাব রয়েছে বলে। এছাড়া তাঁর যেটা সবচেয়ে অভাব তা হলো তার সময়। অন্যের জন্য ব্যয় করার মতো সময় তার হাতে একেবারেই থাকে না। তাহলে বলুন কে আর এসব জেনে অযোগ্য সচিবের কাছে গিয়ে রাত নষ্ট করবে?

সত্যি বলতে কি আবেদনকারীদেরও খুবই ব্যস্ত থাকতে হয় যদি, তাদের নিজের কর্তব্য পালন করা ছাড়াও, তারা আহ্বানকারীদের ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য থাকে আর ঘন ঘন শুনতে হয় ‘অত্যন্ত ব্যস্ত’। কে মাথা নাড়ল, হাসি হাসি মুখ করে, তার ধারণা হচ্ছিল এবার সে সবকিছুই অতি স্বচ্ছভাবে বুঝতে পারছে, তার আনন্দ এই জন্য নয় যে এসব কথার সঙ্গে তার নিজের অবস্থার কোনো সম্পর্ক রয়েছে বরং এই কারণে যে পরের দু এক মিনিটের মধ্যেই আবার সে ঘুমিয়ে পড়তে পারবে। এবার আর তাকে স্বপ্নও দেখতে হবে না, কেউ জাগিয়েও দেবে না।

একদিকে যোগ্য অন্যদিকে অ-যোগ্য সচিবদল ও তাদের সঙ্গে ব্যস্ত আবেদনকারীদের মধ্যে সে তলিয়ে যাবে গভীর ঘুমের মধ্যে, সবার থেকে নিস্তার পাবে। বুলগেলের শান্ত, আত্মসম্বৃত্ত কণ্ঠস্বরে, যা তার মালিককে নিদ্রিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে তার ঘুমে বিঘ্ন ঘটাবার পরিবর্তে বরং তার চোখে ঘুম টেনে আনছিল। ‘চালিয়ে যাও, বকবক কর, শুধু আমার জন্যই,’ সে মনে মনে বলছিল।

‘তাহলে কোথায়,’ বুরগেল বলছিল, নিজের চোঁটের নীচে দু আঙুল রেখে, চোখ এখন তার ঈষৎ বিষ্কারিত, ঘাড়টা বাঁকিয়ে রাখা, যেন খুব কষ্টসাধ্য দীর্ঘ পদযাত্রার পর সে অতি মনোরম এক দৃশ্যবলীর সম্মুখীন হয়েছে।

‘তাহলে একটু আগেই উল্লিখিত সেই অতি সদূল সম্ভাবনাটা হলো যেটা প্রায় কখনো ঘটে না? এর গুহ্যত্বটা রয়ে গেছে যোগ্যতা বিষয়ক নিয়মাবলীতেই, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে কোনো কিছুই এখানে ঠিক এমনভাবে বিন্যস্ত নয়, এত বিশাল সজীব প্রতিষ্ঠানে তা করা সম্ভবও নয়, যে জন্য নির্দিষ্ট প্রত্যেকটি কেস নির্দিষ্ট একটি মাত্র যোগ্য সচিবদের হাতে থাকে।

বরং ঘটনাটা এই রকম যে অন্য অনেকের ওপর একজন যোগ্য সচিব থাকেন। কিন্তু এই অন্যরাও প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে কোনো না কোনোভাবে দক্ষ, তার বৃত্ত যতই ছোটো হোক না কেন, তাহলে বলুন কি করে বিশেষ একজনের পক্ষে, তিনি যতই কঠোর পরিশ্রমী হোন না কেন, একা একা কোনো কেসের সমস্ত তথ্যগুলোই নিজের টেবিলে সংগ্রহ করা সম্ভব, তা সে কেসটি যতই অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন? এমন কি এই মাত্র যে আমি বললাম অন্য সবার ওপর একজনের চূড়ান্ত যোগ্যতার কথা, সেটাও বোধ হয় একটু বেশিই বলা হয়ে গেল।

কারণ ক্ষুদ্রতমকে ধরে নিয়েই কি সামগ্রিক যোগ্যতার সৃষ্টি হয় নয়? সব সময় কি তাই-ই থাকে না একইরকম তীব্রতা নিয়ে? সমস্ত কিছুতে সচিবদের মধ্যে হয়ত নানা পার্থক্য থাকে, সংখ্যাভীত এমন পার্থক্য রয়েছেও কিছু প্রচণ্ড আবেগের ক্ষেত্রে নয়। কেউই নিজেকে সংবরণ করতে পারেন না যদি তাকে আদেশ দেওয়া হয় যে তাঁকে

এমন কোনো বিষয় দেখতে হবে যাতে তাঁর যোগ্যতা রয়েছে, খুব ছোটোমাপের হলেও।

বাহ্যিকভাবে অন্তত একটা মীমাংসাসূত্র খুঁজে বার করতেই হবে, আর তাই কোনো বিশেষ সচিবকে সামনে এগিয়ে আসতেই হয় প্রতিটি আবেদনকারীর জন্য ও তার সঙ্গেই সংলগ্ন হয়ে থাকতে হয় সরকারিভাবে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় এই সচিবটিকেই সবচেয়ে যোগ্য হতে হবে ওই কেসটির ক্ষেত্রে, নির্ধারক ব্যাপারটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠান ও তার তাৎক্ষণিক চাহিদা, এই হচ্ছে সার্বিক পরিস্থিতি, তাহলে এবার, আমিন মশাই সেই সম্ভাবনার কথা ভাবুন, কোনো না কোনো পরিস্থিতির চাপ সত্ত্বেও, যে সুবিধাগুলো আপনাকে বললাম সেগুলো সত্ত্বেও, যে বাধাগুলো অনতিক্রম্য, কোনো আবেদনকারী সে সব কিছু অগ্রাহ্য করে কোনো সচিবের কাছে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে তাকে চমকে দিল, যে সচিবের তার কেস এর বিষয়ে কোনো না কোনো যোগ্যতা রয়ে গেছে? এমন সম্ভাবনার কথা নিশ্চয়ই আপনার মাথায় আসেনি? আমিও তা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত আছি।

অবশ্য এ নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজনও নেই, এমনটা তো ঘটেই না, ঐ অতুলনীয় চালুনির মধ্য দিয়ে গলে যেতে হলে আবেদনকারীকে কত অনবদ্য কৌশলী মিহি দানা বনে যেতে হবে একবার ভাবুন দেখি। আপনি ভাবছেন এমনটা তাহলে কিছুতেই ঘটবে না? ঠিকই ভেবেছেন, কোনো অবস্থাতেই এমন ঘটতে পারে না। কিন্তু কোনো রাতে, সবকিছু নিশ্চিততার সঙ্গে কে আর বলতে পারে-এমনই ঘটে। স্বীকার করি আমার পরিচিতদের কারো ক্ষেত্রেই এমনটা কখনো ঘটেনি। কিন্তু এটাও ঠিক তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। এখানকার মানুষজনের তুলনার আমার পরিচিতির বৃত্ত খুবই সীমাবদ্ধ। আর এটাও নিশ্চিত নয় যে সচিবের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেছে সে তা স্বীকার করবে কারণ এটা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার আর তার ধারণটা এমনই যে সরকারি মানসিকতাকে গভীর লজ্জায় ফেলে দিতে পারে।

কিন্তু এ সত্ত্বেও আমার অভিজ্ঞতা আমায় শিখিয়েছে যে আমরা যা নিয়ে ভাবছি তা এতই বিরল ঘটনা, শুধুমাত্র গুজবের মধ্যোই এর অস্তিত্ব, যে এ নিয়ে ভয় পাবার কিছু কখনোই ঘটেনি। সে যাই হোক, এটিকে ভয় পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে যদি কেউ লেপের তলায় আত্মগোপন করে একটু উঁকি মারার সাহস পর্যন্ত না দেখায় তাহলে তাকে কাপুরুষ ছাড়া আর কিছু বোধ হয় বলা যাবে না। আর এই অসম্ভবতম ঘটনাটি যদি ঘটেও থাকে তাহলেও কি বলা যাবে সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে? ঠিক উল্টো। সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে এই চিন্তাটাই বরং সবচেয়ে অসম্ভব। স্বীকার করতেই হবে আবেদনকারী যদি সত্যিই ঘরের ভেতর থেকে থাকে তাহলে পরিস্থিতি খুবই মন্দ। তাতে হৃৎকম্পনই হয়।

‘কতক্ষণ আর তুমি প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে পারবে?’ কেউ অবাক হয়ে ভাবতে পারে।

কিন্তু কোনো প্রতিরোধ সেখানেই নেই, এটাও সে জানে। নির্ভুলভাবে পরিস্থিতির ছবিটা দেখে নেওয়া দরকার, যাকে আগে কখনো দেখা যায়নি। কিন্তু সবসময় গভীর

প্রত্যাশায় কম্পমান এমন আবেদনকারীর জন্য গভীর তৃষ্ণা নিয়ে অপেক্ষা করা হচ্ছে। যদি যুক্তিসংগতভাবেই মনে করা হয় সে ধরা ছোঁয়ার বাইরে-সে বসে রয়েছে ওখানে। তার নির্বাক উপস্থিতি দিয়ে, অন্য কিছু বাদ দিলেও, আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সে যেন তার হতভাগ্য জীবনে প্রবেশ করতে। তাকে সম্পত্তির মতো নেড়েচেড়ে দেখতে ও তার তুচ্ছ দাবীর চাপে তারই সঙ্গে পীড়িত হতে! নিঝুম রাতে এমন আমন্ত্রণ খুবই প্রবঞ্চনাকর।

কেউ হয়ত এর কাছে আত্মসমর্পণ করে বসল আর সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবপক্ষে সরকারিভাবে কাজ করার শক্তি হারিয়ে বসল। এ এমন এক অবস্থা যেখানে খুব দ্রুতই কাউকে অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যানের শক্তি অসম্ভব হয়ে উঠে। নিখুঁতভাবে বলতে গেলে এখানে একজন মরিয়্যা; আরো নির্দিষ্টভাবে বললে, একজন খুবই সুখী। মরিয়্যা, কারণ তাকে অরক্ষিত অবস্থায় বসে থাকতে হয় আবেদনকারীর বক্তব্য উচ্চারিত হবার অপেক্ষায় এই জ্ঞান নিয়ে যে তার উচ্চারিত হওয়া মাত্রই তার অনুমোদন দিতেই হবে, তাতে যদি সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তেও আসে যে, এই অনুমোদনের ফলে সমস্ত সরকারির কাঠামোটাই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

এটাই হলো, আমার মনে হয়, সবচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার যা কারও ক্ষেত্রে ঘটতে পারে শুধুমাত্র সে কর্তব্যপালন করে বলে, সবচেয়ে বড়ো কথা, অন্য কিছু বাদ দিয়েও, যেহেতু এটা পদোন্নতিও বটে, সমস্ত ধারণাকে টপকে গিয়ে, উপস্থিত সচিবটি তাৎক্ষণিকভাবে বিধিবদ্ধ ক্ষমতার ওলট পালট ঘটায়, কারণ আমাদের পদের মধ্যেই নিহিত থাকে এই সত্য যে আমরা যে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সেখানে কোনরকম অনুগ্রহ দেখাবার অধিকারই আমাদের নেই, কিন্তু তবু রাত্রিকালীন আবেদনকারীর সংস্পর্শে এলেই আমাদের সরকারি ক্ষমতা বেড়ে যায়।

আমরা সিদ্ধান্ত নেই এমন কিছু করার যা আমাদের অধিকারের সীমার বাইরে; কখনো বাস্তবে তার রূপায়ণও করে বসতে পারি। আবেদনকারীরা রাতে এসে, ঠিখ জঙ্গলের ডাকাতদের মতোই, আমাদের কাছ থেকে বহু কিছু কেড়ে নেয়, অন্য সময় যা আমাদের দেবার সাধ্যই থাকত না; ঠিক আছে, এমনটাই ঘটে আবেদনকারী যখন সঙ্গে থাকে, আমাদের শক্তিশালী করে, বাধ্য করে, আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। সবকিছুই আমরা অর্ধচেতনভাবে করে যাই, কিন্তু এর পরে কী ঘটে যখন সব চুকে যায়? মুক্তভাবে আনন্দে আবেদনটা বিদায় নেয়।

আর আমরা তখন পরিত্যক্ত, প্রতিরোধহীন, আমাদের ক্ষমতার অব্যবহারের জন্য লজ্জিত-যার চিন্তা পর্যন্ত করা যায় না। তা হলেও আমরা সুখী। কি সাংঘাতিক আত্মহননকারী সেই সুখ! আমরা ইচ্ছে করলে আবেদনকারীদের কাছ থেকে আমাদের প্রকৃত ক্ষমতা গোপনও করতে পারতাম। সে নিজে থেকে কিছুতেই তা বুঝে উঠতে পারত না। তার নিজের ভাবনা মতো সে হয়ত এসেছে তুচ্ছ কিংবা আকস্মিক কোনো কারণে, সে এখন বিধ্বস্ত, হতাশ, অতিরিক্ত ব্যর্থতাবোধ থেকে নির্দয় ও নির্লিপ্ত যে ঘরে তার যাবার কথা তার বদলে সে অন্য ঘরেই ঢুকে পড়েছে, হাবার মতো সে বসে পড়েছে এক কোনে, নিজের চিন্তায় তলিয়ে গিয়ে, যদি অবশ্য হতাশা বা ভ্রান্তির কারণে

তার তলিয়ে যাবার শক্তি অবশিষ্ট থেকে থাকে, ওকে কি ঐ অবস্থাতেই ছেড়ে দেওয়া যায় না? না তা যায় না।

কোনো না কোনো সুখি বাকপটু লোক এগিয়ে আসবেই সবকিছু তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে। বিপুল কষ্ট স্বীকার করে সে তাকে বিস্তৃতভাবে বোঝাতে বসবে আসলে কী ঘটেছে, কী করণেই বা তা ঘটল। কত অসাধারণ, দুর্লভ সেই সুযোগ, তাকে বুঝিয়ে দেবেই যদিও আবেদনকারী নির্বোধের মতো একেবারে মোক্ষম সময়ে হোঁচট খেয়েছে অসহায়ভাবে যা কারো ক্ষেত্রেই ঘটা সম্ভব ছিল না কোনো অবস্থাতে, তবু সেই আবেদনকারী যদি ইচ্ছে করে, বুঝলেন আমিন মশাই, সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, আর এর জন্য তাকে কিছুই করতে হবে না, শুধু তার কৈফিয়তটা কোনোভাবে পেশ করে দিলেই চলবে, সাফল্য আগে থেকে নির্ধারিত হয়েই আছে, এসবই স্বতঃপ্রবৃত্ত বাগ্মী কর্মচারী তাকে বুঝিয়ে দেবে। এই হলো সরকারি যন্ত্রণার সময়। এবার কেউ ঐসব করে ফেললেই বুঝলেন আমিন মশাই সব মূল কর্তব্যই করা হয়ে গেল। এবার শুধু গা এলিয়ে অপেক্ষা করার পালা।

চতুর্দিকের ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কে গভীর ঘুমের দুর্গে ঢুকে পড়েছিল। তার মাথা; যেটি গোড়ায় ছত্রির ওপর বাঁ হাতের ওপর ন্যস্ত ছিল, গভীর ঘুমে ঝুলে পড়েছিল মাথার ওপর, অবলম্বনহীন আরো নামছিল ক্রমশ, হাতের ভর রেখে দেহের না বলে, সচেতনভাবেই কে তার ডান হাতটা লেপের ওপর শক্ত করে রেখে দেহের নতুন ভারসাম্য খুঁজে নিয়েছিল, এতে তার আঙুল কার্যত বুরগেলের পা আঁকড়ে ধরে। সেটা লেপ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। বুরগেল মাথা নামিয়ে তা দেখে কিন্তু নিজের পা টি কে-র জিম্মাতেই রেখে দেয়। তার পক্ষে সেটা একটু ক্লাস্তিকর হলেও।

এই সময় পাশের দেয়ালে বেশ জোরে কেউ আওয়াজ করছিল। কে চমকে উঠে দেয়ালের দিকে তাকাল। ‘আমিন মশাই এখানেই আছেন তো?’ কোনো কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

‘হ্যাঁ, বুরগেল জবাব দিল ও কের হাত থেকে নিজের পা ছাড়িয়ে নিয়ে প্রবলভাবে হাত-পার আড় ভাঙল ছোটো ছেলের, মতো ‘তাহলে ওঁকে বলুন উনি যেন এফুনি এখানে আসেন,’ কণ্ঠস্বর বলে চলল, বুরগেলের ব্যাপারে বক্তার কোনো মাথাব্যথা দেখা গেল না। কিংবা জিজ্ঞাসাও করা হলো না কে-র প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে কিনা।

‘আর্লেঙ্গরা এসেছেন,’ বুরগেল ফিসফিস করে বলল। পরের ঘরেই যে তিনি রয়েছেন এতে তার কোনো বিস্ময় আছে বলে মনে হলো না।

‘এখনি ওঁর কাছে যান, উনি বেশ চটেছেন মনে হচ্ছে, গিয়ে ঠান্ডা করুন। ওঁর ঘুম খুব গভীর অথচ আমরা খুব জোরেই কথাবার্তা বলেছি। কোনো বিষয়ে কথা বলতে গেলে নিজেকে কিংবা নিজের কণ্ঠস্বর সামলানো কারো কারো ক্ষেত্রে বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ঠিক আছে। তাহলে আসুন। আপনার ঘুম এখনও ছাড়েনি মনে হচ্ছে। যান, এখনো কী করছেন? না, ঘুমিয়ে পড়ার জন্য আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে না, কি দরকার? প্রত্যেকের শারীরিক ক্ষমতার একটা সীমা আছে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও ঠিক একই

ক্ষমতার সীমারেখা যে আছে এটাও সবার অজানা কথা না। কারও সাধ্য নেই তা অতিক্রম করতে পারে।

এভাবেই পৃথিবীর কক্ষপথকে সংশোধন করে নিয়ে তার আবর্তন চালিয়ে যেতে পারে। এ সবই অসাধারণ, বহুযুগ ধরে চলে আসা এক অকল্পনীয়, অনন্য অবস্থা। যদি এর ফল কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাংঘাতিক ও দুঃখজনক হয়েও থাকে। ঠিক আছে, যান। আমি অবশ্য বুঝতে পারছি না আমার দিকে এমনভাবে চেয়ে আছেন কেন? আপনি দেরি করলে আল্লিঙ্গার আমার ওপর খেপে যাবেন আর আমি তা মোটেই চাই না। এখনি যান, আপনার জন্য ওখানে কী অপেক্ষা করে আছি কে জানে? আসলে কি জানেন, এখানে সব কিছুই নানা সুযোগ সুবিধার পূর্ণ।

শুধু সুবিধাগুলো, তেমনভাবে বলতে গেছে, এত বিশাল যে তাদের কাজে লাগানোই শক্ত। হ্যাঁ এসব শুনতে আপনার অবাকই লাগবে। বাকি কথা হলো, আমি বোধ হয় এবার একটু ঘুমিয়ে নিতে পারব। অবশ্য এখন ভোর পাঁচটা, আবার হৈ চৈ আরম্ভ হলো বলে। শুধু আপনি যদি এবার গা তোলেন।

গভীর ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে কে যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল, তার আরো, অন্ত হীন ঘুমের প্রয়োজন। অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে শুয়ে তার দেহে প্রচণ্ড ব্যথা। বেশ কিছুক্ষণ বুরগেলের ক্রমাগত তাড়নাও তাকে নড়াতে পারছিল না, এই ঘরে আর একমুহূর্ত থাকাটাও যে অর্থহীন এই শ্লথ বোধ শুধুমাত্র তাকে নড়তে উদ্বুদ্ধ করল, এই ঘরটা তার মনে হলো অবর্ণণীয়ভাবে বিষণ্ণ। এটা এই মুহূর্তেই তার মনে হলো না কি ঘরে ঢোকার সময় থেকেই তার মনে হয়েছিল তা সে জানে না। সে যে এখানে আবার ঘুমতে পারবে এমন কোনো সম্ভাবনাও নেই।

এই ধারণাটাই তাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করল। মৃদু একটু হেসে সে উঠে দাঁড়াল হাতের কাছে সে অবলম্বন পেলো তাই ধরে, বিছানা, দেয়াল দরজা ও এরপর যেন অনেক আগেই বুরগেল এর কাছ থেকে সে বিদায় নিয়ে নিয়েছে এমনভাবে ঘর থেকে নিষ্কান্ত হলো কোনো বিদায় বা সম্ভাষণ না করেই।

১৯

একই নির্লিপ্ততা নিয়ে সম্ভবত সে আল্লিঙ্গারের দরজার সামনে দিয়ে চলে যেত যদি না স্বয়ং আল্লিঙ্গার খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে কাছে ডাকতেন তর্জনি তুলে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করে। বাইরে যাবার জন্য আল্লিঙ্গার এখন পুরোপুরি পোষাকদুরন্ত, গায়ে কালো রঙের একটা ফার কোট চাপানো। তার শক্ত কলার গলার কাছে বোতাম আঁটা। একটি চাকর সেই মুহূর্তে তাকে দস্তানা এগিয়ে দিচ্ছিল। অন্য হাতে তাঁর টুপিটি ধরে রাখা।

‘আপনার অনেক আগেই আসা উচিত ছিল, বললেন আল্লিঙ্গার, কে ক্ষমাপ্রার্থনার চেষ্টা করল।’

বিরক্তভাবে চোখ কুঁচকে আল্লিঙ্গার বুঝিয়ে দিলেন কোনো কৈফিয়তে তাঁর আগ্রহ নেই। ‘ঘটনাটা এই রকম,’ তিনি বললেন, ‘কোনো এক ফ্রিডাকে ট্যাপরুমে নিযুক্ত করা হয়েছিল। আমি শুধু তাকে নামেই চিনি। তাকে কখনো চাক্ষুষ দেখিনি, তাকে নিয়ে

আমার কোনে মাথা ব্যথাও নেই। এই ফ্রিডা মাঝে মধ্যে ক্ল্যামকে বিয়ার সার্ভ করত। এখন বোধহয় ওখানে অন্য মেয়ে এসেছে।

সে যাই হোক, এই পরিবর্তিটা বলা বাহুল্য কারো কাছেই খুব সম্ভব গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশেষ করে তো ক্ল্যামের কাছে নয়ই। কিন্তু কাজ যত বড়ো হয়, আর ক্ল্যামের কাজ সবচেয়ে বড়ো, ততই কারো পক্ষে বাইরের জগত থেকে নিজেকে রক্ষা করার মতো প্রয়োজনীয় শক্তি পড়ে থাকে অল্পই, আর এর ফলে সবচেয়ে গুরুত্বহীন সামান্যতম পরিবর্তনও বিপুল বিঘ্ন ঘটাতে পারে-লেখার ডেস্কটার সামান্য স্থানচ্যুতি, স্মরণাতিত কাল থেকে তাতে দেখে আসা কোনো কালো বিন্দুর মুখে যাওয়া, এ সবই মানসিক বিঘ্ন ঘটাতে পারে, ঠিক একই ভাবে একটা নতুন বারমেডও।

অবশ্য বলাই বাহুল্য, এসব অন্য কারো ক্ষেত্রে যত বাধারই সৃষ্টি করুক না কেন ক্ল্যামের কিছু যায় আসে না, তাঁর ক্ষেত্রে এমন কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তা সত্ত্বেও আমরা ক্ল্যামের আরামের দিকে এত কঠোর দৃষ্টি রাখি যে তার কাছে যত তাৎপর্যহীনই হোকনা কেন-সবই অবশ্য তাঁর কাছে তাৎপর্যহীন-আমরা তাঁর আরামের পক্ষে তুচ্ছতিতুচ্ছ বাধারও অস্তিত্ব রাখি না। শুধু তাঁর কিংবা কাজের কারণেই আমরা বাধাগুলো দূর করি তা নয়, তা করি আমরা নিজেদের স্বার্থেও। আমাদের বিবেক ও মানসিক শান্তির জন্য। এই কারণেই ফ্রিডাকে আবার ট্যাপরুমে ফিরে যেতেই হবে। সম্ভবত সে ফিরে গেলে স্থিতিাবস্থা আবারও বিঘ্নিত হবে; তখন আবার তাকে আমরা সরিয়ে দেব, কিন্তু আপাতত তাকে কাজে ফিরতেই হবে। আমার কানে এসেছে আপনি ওর সঙ্গেই রয়েছেন।

সুতরাং তাড়াতাড়ি ওর ফিরে যাবার ব্যবস্থা করুন। এখানে যে ব্যক্তিগত অনুভূতির কোনো স্থান নেই তা অবশ্য বলাই বাহুল্য, আর তা নিয়ে সামান্য আলোচনাও আমি করতে চাই না। যতটা প্রয়োজন তার বেশিই আমি করছি যদি আপনাকে জানাই যে আপনি যদি এই ছোটো কাজটাতে নিজেকে নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণ করতে পারেন তাহলে হয়ত তা কোনো উপযুক্ত সময়ে আপনার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর করে তুলতে পারে। আপনাকে আপাতত আমার বলার কথা এইটুকুই।’

তিনি কে-কে মাথা নেড়ে খারিজ করলেন, ভূতের এগিয়ে দেওয়া পশুচর্মের চুপিটি মাথায় দিলেন তারপর ভূতটি দ্বারা অনুসরিত হয়ে লম্বা বারান্দা ধরে দ্রুত অপসৃত হলেন, ঈষৎ খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

এখানে মাঝে মধ্যে যে নির্দেশ আসে তা পালন করা খুবই সহজ কিন্তু বর্তমান আদেশটিতে কে খুশি হলো না। শুধু এইজন্য নয় যে এর সঙ্গে ফ্রিডা জড়িয়ে রয়েছে আর আদেশ হলোও কে-র কানে তা আসলে এক ঘৃনার হাসি বলেই মনে হয়েছিল বরং এছাড়াও এই আদেশ তার ভূতপূর্ব সমস্ত চেষ্টার অকিঞ্চিৎকরতার মুখোমুখি তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত আদেশ, তা অনুকূল বা প্রতিকূল যাই হোক না কেন, তাকে গ্রাহ্য না করেই করা হয়। সবচেয়ে অনুকূল আদেশের ক্ষেত্রেও সম্ভবত অবশ্যম্ভাবী প্রতিকূল কোনো আশঙ্কার বীজ থেকে যায়।

কিন্তু সবক্ষেত্রেই তারা কেউ তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, আর তার নিজের অবস্থানও এত নিচে যে কোনো রকমভাবে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতাই তার নেই, তাদের নীরব করে দেওয়া বা নিজের হয়ে কথা বলার সুযোগ লাভ করা তো দূরের কথা। আর্লেক্সার যদি হাত নেড়ে বিদায় করে দেয় তুমি তাকে কী বলতে পার? আর সে যদি হাত নেড়ে বিদায় না করে তাহলেই বা তুমি কী বলতে পারো? যদিও এটা সত্যি যে কে ভালো ভাবেই বুঝতে পারছিল সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতি সামগ্রিক ভাবে তার যত না ক্ষতি করেছে তার অনেক বেশি ক্ষতি সাধন করেছে তার বিপুল ক্লান্তিভার কিন্তু তার তো বিশ্বাস ছিল নিজের দেহের সামর্থ্যের ওপর। তা না হলে তো সে বাড়ি থেকেই বেরোত না।

তবে কেন সে কয়েকটা কষ্টকর রাত ও একটি নিদ্রাহীন রাতেই কাবু হয়ে পড়ল? সে কেন ঠিক তাহলে এমন সাংঘাতিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ঠিক এখানে এসেই যেখানে কেউ ক্লান্ত থাকে না, কিংবা যথার্থ বললে সব সময়ই সবাই ক্লান্ত থাকে কিন্তু নিজেদের কাজের কোনো ক্ষতি না করে, দৃশ্যত বরং উন্নতিই করে? এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় এখানকার লোকদের ক্লান্তি কে-র চেয়ে আলাদা ধরনের। এখানারক অবসাদ নিঃসন্দেহে আনন্দে কাজ করার ফলশ্রুতি, বাইরে থেকে ক্লান্তি বলে মনে হলেও আসলে তা অবর্ণণীয় প্রশান্তি, কেউ যদি দুপুরে সামান্য ক্লান্ত হয়েও পড়ে তা সারাদিনের আনন্দময়, ঘটনা প্রবাহের একটি অংশ মাত্র, 'এখানকার ভদ্রলাকদের কাছে সময় মানে পুরো দুপুর।' কে বলল নিজেকে।

এই চিন্তাকেই যেন সাযুজ্য দিতে এখন, পাঁচটার সময় বারান্দার দু'ধারের ঘরগুলোতে সব কিছু সরব হয়ে উঠল। ঘরগুলো থেকে ভেসে আশা সম্মিলিত নানা কণ্ঠস্বরের মধ্যে বিপুল আনন্দসঙ্গীতের রেশ পাওয়া যাচ্ছিল। একবার মনে হলো চডু ইভাতির জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এমন একদল শিশুর কলকাকলি, আবার একবার যেন মুরগির খাঁচার মধ্যে দিনের আগমন ঘোষনার প্রতিযোগিতা, যেন অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় সঙ্গীত বেজে উঠেছে, সমতালে, লয়ে।

কোথাও সত্যিই এক ভদ্রলোক মোরগের গলায় ডেকে উঠলেন। বারান্দাটা এখনো খালি থাকলেও দরজার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, মাঝে মধ্যে কোনো দরজা একটু ফাঁক হয়ে আবার বন্ধ হয়ে যায়, বারান্দার দরজা খেলা ও বন্ধ করার আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠল। এরপর দেয়ালের ওপরের ফাঁক দিয়ে, ছাদ পর্যন্ত দেয়াল পৌছয়নি, কে দেখতে পেল সদ্য শয্যাভ্যাগীদের অবিন্যস্ত চুল, নিমেষেই তা অন্তর্হিত হয়। বহুদূর থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ফাইল ভরা ছোটো একটা হাতে ঠেলা গাড়ি, একটা চাকর সেটা ঠেলে আনছিল।

দ্বিতীয় এক চাকর এর পাশে পাশে আসছিল, তার হাতে একটা ক্যাটালগ ধরা, দরজা সংখ্যার সঙ্গে ফাইলের তুলনা করতে করতে ছোটো হাতে ঠেলা গাড়িটি অধিকাংশ দরজার কাছে গিয়ে স্থির হচ্ছিল, তখন দরজাটি উন্মুক্ত হয় এবং নির্দিষ্ট ফাইলটি-কখনো বা তাতে সামান্য কয়েকটি পাতা মাত্র রয়েছে-সেক্ষেত্রে ঘর ও বারান্দার মধ্যে কিছু কথোপকথন শ্রুত হয়, সম্ভবত ভৃত্যটিকে ভর্তসনা করা হয়-সেই

ফাইলটি ঘরের ভেতর চালান হয়ে যায়। কোনো দরজা বন্ধ থাকলে তার চৌখাটের বাইরে ফাইলগুলো যত্নে সাজিয়ে রাখা হচ্ছিল। আশেপাশের দরজা খোলার আওয়াজ কমছিল না, যদিও ইতিমধ্যেও সেই দরজাগুলোর মধ্য দিয়ে ফাইল চলন করা হয়ে গিয়েছে, বরং বেড়ে যাচ্ছিল।

সম্ভবত অন্যরা লোভীর মতো উঁকি মেরে দেখছিল দুর্বোধ্যভাবে কারো চৌখাটের সামনে পড়ে থাকা ফাইলগুলো। তারা বুঝতেই পারছিল না যখন সামান্য দরজা ফাঁক করেই সেগুলো ঘরের ভেতর টেনে নেওয়া যায়, তা করা হচ্ছে না কেন, এমনও সম্ভাবনা থাকতে পারে সেগুলো যদি গৃহীতই না হয় তাহলে তাদের অন্য ভদ্রলোকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। তারা ঘনঘন উঁকি মেরে নিশ্চিত হতে চাইছিল ফাইলগুলো চৌখাটের ওপরই পড়ে কিনা আর তাদের আশা করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে কিনা। ঘটনাক্রমে যে ফাইলগুলো সেখানে পড়ে ছিল তা বড়ো বড়ো বাড়িলে বাঁধা।

আর কে অনুমান করল ওগুলো ইচ্ছাকৃতভাবেই ওখানে ফেলে রাখা হয়েছে-হয় অহংকার থেকে কিংবা বিদ্বেষ থেকে কিম্বা সহকর্মীদের দেখিয়ে কৃতিত্ব উপভোগ করতে। যে ঘটনাটা তার এই অনুমানকে সুদৃঢ় করল তা হলো সে যখন অন্য দিকে তাকিয়ে রয়েছে তখনই ফাইলের বডিলটা অতক্ষণ ওখানে পড়ে থাকার পর হঠাৎ দ্রুতভাবে ভিতরে টেনে নেওয়া হলো, দরজা আগের মতোই অনড় থেকে গেল। চতুর্দিকের দরজাগুলোও আবার নিঃশব্দ হলো হতাশার কিংবা হয়তো স্বস্তিতে যে এতক্ষণ ব্যাপী প্রলোভনের বস্তুটি অবশেষে অপসৃত হয়েছে, কিন্তু কিছু পরে আবার গতি ফিরে আসে।

কে এ সমস্তই পর্যবেক্ষণ করছিল শুধু কৌতূহলবশতই নয়, সহানুভূতির সাথেও। এই কর্মব্যস্ততার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সে পরিস্থিতিটা উপভোগই করছিল। সে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, পর্যাণ্ড দূরত্ব থেকেই অবশ্য-চাকরগুলো একাধিক বার তার দিকে চোরদৃষ্টি হেনেছে-মাথা নামিয়ে ঠোঁট চেপে সে যখন তাদের ফাইল বিলোনের ঘটনাটা পর্যবেক্ষণ করছিল। কাজটা যত এগোচ্ছিল ততই কম মসৃণভাবে হচ্ছিল, হয় তালিকায় গভগোল দেখা যাচ্ছিল, নয় ফাইলগুলোকে তারা ঠিকমতো চিহ্নিত করতে পারছিল না, অথবা ভদ্রমহোদয়রা অন্য কারণে আপত্তি তুলছিলেন।

সে যাই ঘটুক না কেন, কিছু বিলিয়ে দেওয়া ফাইলকে আবার ফিরিয়ে নিতে হচ্ছিল। সেক্ষেত্রে ছোটো হাতে ঠেলা গাড়িটাকে আবার ফিরে যেতে হচ্ছিল ও দরজার ফাঁক দিয়ে ফাইল ফিরিয়ে নেবার বিষয়ে কথা কাটাকাটি শোনা যাচ্ছিল। এই বিসম্মদের ঘটনাটিই সমস্ত ঘুলিয়ে তুলল, এটা এমন ঘন ঘনই হচ্ছিল যে যখন ফাইল আবার চাকরটিকে ফিরিয়ে দেবার পরিস্থিতি আসছিল তখন যে দরজা একটু আগে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল তা কঠিনভাবে বন্ধ হয়ে রইল। যেন ভেতরের মানুষরা আর সামান্য কৌতূহলও নেই কী হয়েছে তা জানার। এখান থেকেই আসল বামেলা শুরু হচ্ছিল। যার মনে হচ্ছিল ফাইলের ওপর তার দাবি রয়ে গেছে সে চূড়ান্ত অধৈর্য্য হয়ে উঠছিল, ঘরের ভেতর সে নানা শব্দ করতে থাকে, হাতে সশব্দে চাপড় দিয়ে, মেঝেতে বার বার পা দাপিয়ে ও দরজার ফাঁক দিয়ে কোনো বিশেষ ফাইলের নম্বর চিৎকার করে

জানিয়ে। এই সময়টা ছোটো ঠেলা গাড়িটার ধারে কাছে কেউ নেই। এক চাকর অঐর্ধ্য আমলাটিকে খোসামোদ করতে ব্যস্ত থাকে আর অন্যজন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ফাইল ফেরত পাবার লড়াই চালিয়ে যায়। দুজনকেই বিস্তর ঝামেলা পোহাতে হয়। অঐর্ধ্য আমলাটি তাকে শান্ত করার চেষ্টায় আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তার পক্ষে চাকরের শূন্যগর্ভ শব্দাবলী সহ্য করা অসম্ভব। তার সান্ত্বনার কোনো প্রয়োজন নেই। সে শুধু চায় ফাইলগুলো।

এমনই এক ভদ্রলোক দরজার ওপরের ফাঁক দিয়ে বেসিনের সমস্ত পদার্থ এক চাকরের মাথায় ঢেলে দিলেন। কিন্তু অন্য ভৃত্যটি, পদমর্যাদায় অনেক উঁচু, অধিকতর ঝগড়াটো পোহাচ্ছিল। এখন কোনো ভদ্রলোক, যদি কথা বলতে রাজিও হন, কথা বলছিলেন খুবই ব্যবসায়িকভাবে। কথা প্রসঙ্গে ভৃত্যটি তার ক্যাটালগের উল্লেখ করছিল ও ভদ্রলোকটি নোটের ও বিশেষ করে সেইসব ফাইল, যেগুলো ফেরত দেবার কথা অতি শক্তভাবে আঁকড়ে রেখেছিলেন, এমনভাবে যে ভৃত্যের সন্ধানী চোখে সেগুলোর কোনোগুলো পর্যন্ত গোপন থেকে যাচ্ছিল। তখন ভৃত্যটিকে দৌড়ে যেতে হচ্ছিল হাতগাড়িটার কাছে, সেখান থেকে নতুন কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করে আনতে।

গাড়িটা ইতিমধ্যে বারান্দার ঢাল বেয়ে কিছুটা পিছিয়ে গেছে। কিংবা সে ভদ্রলোকের কাছেই এগিয়ে যায়, ফাইলগুলো দাবি করে, ভদ্রলোক আপত্তি জানান নানা যুক্তি দেখিয়ে ও সেও তখন বিরুদ্ধ যুক্তি সাজাতে থাকে। এইরকমভাবে কথা কাটাকাটি বহুক্ষণ ধরে চলে, কখনো মতানৈক্য হয়। ভদ্রলোক হয়ত কিছু ফাইল ছেড়ে দিলেন কিম্বা ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাকে অন্য কিছু ফাইল দেওয়া হলো যেহেতু যা কিছু ঘটেছে তা ভুলেরই ফলশ্রুতিমাত্র।

কিন্তু এমনও হচ্ছিল যে কাউকে হয়তো যত ফাইল দাবি করা হয়েছিল তার সবই বিসর্জন দিতে হলো। হয় সে চাকরের প্রমাণের ঠেলায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল কিংবা দীর্ঘ সময় ধরে দর কষে বেদম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এমন সময় সে ফাইলগুলো চাকরের হাতেও তুলে দেয় না, যেন আকস্মিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে সে ফাইলের পাঁজা সজোরে ছোঁড়ে বারান্দায়, এর ফলে ফাইলের দড়িগুলো খুলে কাগজপত্র অবিন্যস্ত ভাবে ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে ও চাকরদের বিপুল পরিশ্রম করে সেগুলো কুড়িয়ে এনে আবার সব যথাযথ সাজিয়ে নিতে হয়।

কিন্তু এও তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ ব্যাপার যে দরজা খুলছিলই না তার চেয়ে। ফাইল ফেরত চেয়ে কোনো কোনো বন্ধ দরজার কাছে ভৃত্যদের আবেদন নিবেদন করতে হচ্ছিল। কিন্তু বন্ধ দরজার ওপার থেকে কোনো সাড়া নেই। তখন সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অনুন্নয় বিনয় করতে থাকে। তার তালিখা পড়ে শোনায়, নিয়শ কানুনের নানা ধারা উল্লেখ করে, কিন্তু খামোকাই, বন্ধ দরজার ভিতর থেকে কোনো শব্দ আসে না আর অনুমতি ছাড়া ভিতরে ঢোকার অধিকারও অবশ্যই ভৃত্যটির নেই। এই ক্ষেত্রে এমন চমৎকার চাকরটিও আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসে। সে তার ঠেলাগাড়ির কাছে গিয়ে ফাইলের স্তূপের ওপর বসে পড়ে। জু থেকে শ্বেদবিন্দু মুছে নেয় ও বেশ

কিছুক্ষণ কিছুই না করে অসহায়ভাবে বসে বসে পা দোলায়। চতুর্দিকে ঘটনাটা নিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

নানাদিকেই ফিসফাস শোনা যায়, একটা দরজাও আর নীরব নয়, ছাদ ও দেয়ালের ফাঁক দিয়ে আবৃত নানা মুখ উঁকিঝুঁকি মারে। মুখগুলোর চোখ পর্যন্ত ঢাকা রুমাল ও স্কার্ফে, সতর্ক চোখে মুখগুলো ঘটনার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করছিল। চতুর্দিকের এই চাঞ্চল্যের মধ্যে কে-র দেখে অবাক লাগল যে বুরগেলের দরজা পুরো সময়টাই একেবারে বন্ধ রইল। আর তার দরজার সামনে দিয়ে চাকরগুলো ইতিমধ্যে একবার চলে যাওয়া সত্ত্বেও তাকে কোনো ফাইলই দেওয়া হয়নি। সে হয়ত এখনো গভীর ঘুমে অচেতন্য, এত কোলাহলের মধ্যেও যখন তা ভাঙা সম্ভব হলো না তখন ধরে নিতেই হবে যে তার ঘুম খুবই গাঢ়।

কিন্তু সে কোনো ফাইল পেল না কেন? অতি সামান্য কয়েকটি ঘরই, তাদের মধ্যে অধিকাংশই খালি, এইভাবে বাদ গেছে, অন্য দিকে আবার আলিস্বারের ঘরে অতি অস্থির প্রকৃতির নতুন অধিবাসী এসেছে, নিশ্চিতভাবে এই ভদ্রলোকই আলিস্বারকে অত রাতে ঘর থেকে বার করে দিয়েছে, আলিস্বার ঠান্ডা নিরাসক্ত প্রকৃতির লোক, তাঁর স্বভাবের সঙ্গে এটা খাপ খায় না যে বারান্দার বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি কে-র জন্য অপেক্ষা করবেন।

কিন্তু তাই যে তাঁকে করতে হলো তার অর্থই হলো তাকে ঘর থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল। প্রক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ থেকে নিজেই সরিয়ে এনে কে বারবারই ভৃত্যটির দিকে নজর দিচ্ছিল। বাস্তবিকপক্ষেই এর আগে চাকরদের সম্পর্কে সাধারণভাবে কে-র কানে যে সব কথা এসেছিল, যেমন তারা শ্রুত প্রকৃতির সহজ জীবনযাপন করে, স্বভাবে উদ্ধত, ইত্যাদি, এই চাকরটির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না। বিশেষ করে চাকরটির যে দিকটা তার পছন্দ হলো তা তার অপ্রতিরোধ্য উদ্যম। জেদি ক্ষুদ্র ঘরগুলোর সঙ্গে সংগ্রামে কে-র কাছে সংগ্রামটা ঘরগুলোর সঙ্গে বলেই মনে হচ্ছিল, যেহেতু গৃহস্থের কোনো চিহ্নই চোখে পরছিল না, চাকরটি কিছুতেই হার স্বীকার করছিল না।

মাঝে মধ্যে মনে হচ্ছিল তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে-কারই বা ক্ষমতার হ্রাস না হবে?-কিন্তু সে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠছিল, ক্ষুদ্রে গাড়িটা থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ছিল। দাঁতে দাঁত চেপে আবার দরজাটিকে আক্রমণ করতে ফিরে যাচ্ছিল, দরজাটা তাকে জয় করতেই হবে এমন দৃঢ়তা নিয়ে।

কিন্তু তবু তাকে দু তিনবার গো হারা হেরে আবার পশ্চাদপসারণ করতে হচ্ছিল, তার পরাজয়টা হচ্ছিল খুবই সহজ পদ্ধতিতে, সেই একই নিশ্চল নৈঃশব্দের কারণে, কিন্তু তবু সে হার মানছিল না। যখন সে বোঝে সম্মুখ আক্রমণে কোনো ফল হবে না তখন সে অন্য পথ নেয়। উদাহরণস্বরূপ, কে যদি ঠিক বুঝে থাকে, চাতুর্যের। সে যেন দরজা ছেড়ে চলে গেল এমন ভান করে, দরজাটির নৈঃশব্দের কারণে, কিন্তু তবু সে হার মানছিল না। যখন সে বোঝে সম্মুখ আক্রমণে কোনো ফল হবে না তখন সে অন্য পথ নেয়।

উদাহরণস্বরূপ, কে যদি ঠিক বুঝে থাকে, চাতুর্যের। সে যেন দরজা ছেড়ে চলে গেল এমন ভান করে, দরজাটির নৈঃশব্দসম্ভার নিঃশেষ হয়ে আসার সুযোগ দিয়ে, সে অন্য দরজাগুলোতে মনোযোগ দেয়, একটু পরে আবার ফিরে আসে, অন্য চাকরটাকে ডেকে আনে, সবকিছুই সে করে জাঁকজমকের সঙ্গে, চিৎকার করে কথা বলে ও বন্ধ দরজার সামনে ফাইলের স্তূপ সাজাতে সাজাতে, এমনভাবে যেন সে তার মন পরিবর্তন করেছে আর ভদ্রলোকটির কাছ থেকে ফাইলগুলো ফিরিয়ে নেবার যৌক্তিকতা শেষ হয়ে গেছে, বরং উল্টোভাবে তাঁকেই আরো বহু ফাইল বন্টন করা বাকি।

এরপর সে চলতে শুরু করে অবশ্য দরজাটির দিকে চোখ না সরিয়ে, আর তারপর যখন ভদ্রলোকটি সাবধানে দরজা খোলেন ফাইলগুলো ভেতরে টেনে নেবেন বলে, ঠিক সেই মুহূর্তেই কয়েকটা লাফ মেরে চাকরটি নিমেষের মধ্যে সেখানে গিয়ে হাজির হয়, দুটি দরজার পাল্লার মধ্যে পা গলিয়ে দেয় ও ভদ্রলোককে মুখোমুখি সমঝোতায় আসতে বাধ্য করে। যার ফলটা অধিকাংশ সময়েই তার পক্ষে বেশ সন্তোষজনক হচ্ছিল। পদ্ধতিটি সফল না হলে বা কোনো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এই পন্থাটি তেমন কার্যকর হবে না বলে মনে হলে সে অন্য কৌশল প্রয়োগ করছিল। সে এক্ষেত্রে তার মনোযোগ সরিয়ে দেয় সেই ভদ্রলোকটির দিকে যে ফাইলের জন্য চেষ্টাচ্ছিল, সে অন্য চাকরটিকে একপাশে সরিয়ে দেয়। সেই চাকরটি কাজ করছিল যন্ত্রের মতো, তার কাছে সহকারীটি থাকে, ফিসফিস করে গোপনে, বন্ধ দরজার দিকে মুখ ঝুকিয়ে, সম্ভবত তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও তাকে নিশ্চিতভাবে জানিয়ে যে পরের বার বন্টনের পালা এলে অন্য ভদ্রলোকটি যোগ্য শাস্তি পাবেন, অর্থাৎ মোট কথা সে তার প্রতিপক্ষের ঘরের দিকে নির্দেশ করে নানা কথা বলে ও বিদ্রূপের হাসি হাসতে থাকে। এরপরও অবশ্য এমন দু-একটা ক্ষেত্র রয়েছে গেল যেখানে সে রণে ভঙ্গ দেয়।

কিন্তু এখানে কে লক্ষ্য করল এই হার স্বীকারটাও হলো বাহ্যিকভাবে অনিবার্য কারণে। কারণ এবার সে শান্তভাবে হেঁটে যায়। পরিশ্রমসাধ্য কর্তব্য সারতে সারতেও সে মাঝে মধ্যে কে-র দিকে ঘাড় ঝুকিয়ে তাকিয়েছে। কখনো ক্রুদ্ধভাবে কখনো অধৈর্যভাবে। মাথা ঝুকিয়েছে কিছুটা বিচলিত ভাব নিয়ে। শুধু এখন সমস্ত কিছু বন্টন হয়ে যাবার পর মনে হলো সে কে-র অস্তিত্ব প্রায় ভুলে গিয়েছে যেহেতু সে এখন একেবারেই নির্লিপ্ত। কারণটা বোঝা অবশ্য শক্ত নয়। বিপুল ক্লান্তির ফলে সে আর শেষ কাগজটা নিয়ে তেমন মাথাও ঘামাচ্ছিল না, সেটা পড়েইনি পর্যন্ত। এই বারান্দায় কোনো ঘরের বাসিন্দা হয়ত কাগজটি পেলে খুব খুশি হতো, সে যদি তা বন্টন করত। কিন্তু সে অন্য রকম সিদ্ধান্ত নিল। ফাইল বন্টন করতে করতে তার সামর্থ্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে তার ঠোঁটের উপর তর্জনি স্থাপন করে তার সহকারীটিকে চুপ থাকতে নির্দেশ দিল।

তারপর, কে এখানে তার থেকে অনেক দূরে, হাতের শেষ কাগজটাকে কুঁচি কুঁচি করে ছিঁড়ে টুকরোগুলোকে পকেটে চালান করল। এখানাকর পরিচালন প্রক্রিয়াটির মধ্যে এই প্রথম কোনো বিচ্যুতি কে-র নজরে এল, সম্ভবত এ বিষয়ে ও তার ধারণা বেঠিকই। কিন্তু কাজটা যদি বেঠিক হয়েও থাকে তবু ক্ষমণীয়, এখানকার যা ব্যাপা

স্বাভাবিক, কখনো কখনো জমে থাকা বহু ক্ষোভ বহু অসন্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটাই তো স্বাভাবিক। আর তাই এই কাগজটা ছিঁড়ে ফেলার মধ্য দিয়ে যদি তা প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলেও একে তুলনামূলকভাবে নির্দোষই বলা যায়। যেমন বারান্দা তখনো উচ্চকিত ছিল রাগি ভদ্রলোকটির ক্রমাগত চিৎকারে ও তার সহকর্মীরা অন্যান্য ক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে সমমর্মীতা না দেখালেও, এই চিৎকারে মদত যোগাচ্ছিল একত্রে।

ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল সে যেন অন্য সকলের হয়েই সব সহ্য করে নিয়ে, কোনোদিকে দৃষ্টিপাত না করে, যে ভদ্রলোকটি তার ওপর অন্যায় করা হয়েছে বলে হট্টগোল জুড়ে দিয়েছিল তাকেও এ গ্রাহ্য না করে, মাঝে মধ্যে শুধু বহুক্ষণ চোখ মুদ্রিত করে থাকে, যাতে বোঝা যায় এই চিৎকারে তার বড়োই কষ্ট হচ্ছে, তারপর সেই ভদ্রলোকের চিৎকারও আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে আসে যেভাবে শিশুর শেষহীন কান্না শেষপর্যন্ত দীর্ঘ ফোঁপানিতে গিয়ে শেষ হয়।

কিন্তু এরপর সব শান্ত হয়ে এলেও হঠাৎ কারো চিৎকার শোনা যায় কিংবা কোনো দরজা খুলে গিয়ে অতি দ্রুত বন্ধ হয়। সে যাই হোক, স্পষ্ট বোঝা যায় ভৃত্যটা এখানেও তার যা করা উচিত ছিল ছবছ তাই করেছে। শেষ পর্যন্ত পড়ে রইল একটিমাত্র ভদ্রলোক যে কিছুতেই শান্ত হচ্ছিল না। সে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে, শক্তি সংগ্রহ করে। তারপর আবার বিস্ফোরিত হয়, আগের বারের চেয়েও প্রচণ্ডভাবে। তার এত চিৎকার ও নালিশের কারণটা যে কী তা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

সম্ভবত তা ফাইলের বটন বিষয়ে একেবারেই নয়। ইতিমধ্যে ভৃত্যটির কর্তব্যকর্ম সমাধা হয়ে গেছে। ছোটো গাড়িটাতে পড়ে আছে শুধু একটি মাত্র ফাইল, আসলে একটা পাতা, একটুকরো কাগজ মাত্র কোনো নোট প্যাড থেকে ছেঁড়া। দোষটা আসলে সহকারীটির তারা এখন বুঝতে পারছিল না এটা কাকে বটন করার কথা 'এই ফাইলটা নিশ্চয়ই আমার,' হঠাৎ কে-র মাথায় খেলে গেল।

গ্রামপ্রধান এরকম ছোটোখাটো ব্যাপারে উল্লেখ বেশ কয়েকবার করেছে। তার এই ধারণাটি একেবারেই যুক্তিহীন ও হাস্যকর হওয়া সত্ত্বেও কে চাকরটির কাছে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। সে খুব মন দিয়ে কাগজের টুকরোটা দেখছিল। কে-র কাজটা খুব সহজ হলো না, কারণ চাকরটির ওপর তার সহানুভূতি থাকলে কী হবে সে তাকে পাতা দেয় না সে বিশেষ ভদ্রলোকটিও বাকিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে।

তারা গর্জন করছিলেন, সম্মিলিত ক্রোধের একক বহিঃপ্রকাশ ঘটছিল যেন, বাকিরা তাকে চিৎকার চালিয়ে যেতে উৎসাহ দিচ্ছিল। কিন্তু এখন চাকরটি আর সেসব দিকে মনোযোগ দিচ্ছিল না। সে তার কর্তব্য সমাধা করেছে, ছোটো হাতে ঠেলা গাড়ির অভ্যন্তরে পুটলির দিকে সে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ও তারা যেভাবে এসেছিল সেভাবেই অদৃশ্য হয়।

শুধু অনেক বেশি সন্তুষ্টির সঙ্গে, দ্রুতভাবে। গাড়ি তাদের সাথে লাফাতে লাফাতে গড়ায়। একবার মাত্র শুধু তারা চমকে পেছন ফিরে তাকায় যে ভদ্রলোক একনাগাড়ে

চিৎকার করছিলেন তার দরজার পাশ দিয়ে যাবার সময়। তার দরজার কাছেই কে ঘুরঘুর করছিল ভদ্রলোক আসলে কী চান তা আন্দাজ করতে।

তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারেন চেষ্টায়ে ঠিক ফল হচ্ছে না ও হঠাৎ ইলেকট্রিক ঘন্টার অস্তিত্ব অবিকার করে উল্লসিত হয়ে উঠে চিৎকার করার পরিশ্রম থেকে নিস্তার পেয়ে ও চৈতান্যে থামিয়ে অবিশ্রাম ঘন্টা বাজিয়ে যেতে লাগলেন। এর ফলে অন্য ঘরগুলোতে ফিসফাস শব্দ প্রবল হয়ে উঠল যার থেকে বোঝা যাচ্ছিল তারা সবাই এই নতুন প্রতিবাদের পদ্ধতিটি উৎসাহের সঙ্গেই অনুমোদন করছে। যেন তাদেরও ঠিক একই কাজ করার ইচ্ছে বহুসময় আগে থাকতেই ছিল, শুধু কোনো অজ্ঞাত কারণবশত তা করা থেকে বিরত থেকেছে।

ভদ্রলোকটি কি ঘন্টা বাজাচ্ছেন কোনো চাকর কিম্বা ফ্রিডার জন্য? তা যদি হয় তাকে আরো বহুক্ষণই তা বাজিয়ে যেতে হবে। কারণ ফ্রিডা নিশ্চয়ই ব্যস্ত জারমিয়াকে ভেজা চাদরে জড়িয়ে রাখতে। আর যদি ধরেও নেওয়া যায় সে ইতিমধ্যে আগের মতো চাদা হয়ে উঠেছে তাহলেও ফ্রিডার সময় হবার কথা না কারণ সে নিশ্চয়ই সেক্ষেত্রে জারমিয়ার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে।

কিন্তু এই ঘন্টাবাদনের তাৎক্ষণিক ফল একটা ফলল। এই প্রত্যুষেও স্বয়ং হেরেনহফের মালিককে ব্যস্তপদে দূর থেকে আসতে দেখা গেল। চিরাচরিত ভাবে কোনো পোষাক ও শক্ত বোতাম আটা পোষাক পরা কিন্তু সে আসছিল এমন দ্রুতপথে যেন এই মুহূর্তে সে সবরকম আত্মমর্যাদাই বিস্মৃত হয়েছে, তার বাহুগুলো সম্মুখে প্রসারিত, সে আসছিল যেন উঠে এসে এই শব্দপ্রবাহের কণ্ঠরোধ করে চিরাচরিত শান্তি ফিরিয়ে আনবে। সামান্য পরে তার সহধর্মীনিটিও এসে হাজির। তার থেকে অনেকটা দূরে সেও হাত ছড়িয়ে দৌড়তে দৌড়তে আসছে, কিন্তু তার গতি তুলনায় শ্লথ ও কিঞ্চিৎ ব্যথাক্রিষ্ট।

কে নিজের মনে ভাবল সরাইওলা প্রয়োজনীয় সব কিছু করে ফেলার অনেক পরই এসে পৌঁছতে পারবে তার কাছে। সরাইওলা দৌড়ে যাবার সময় তাকে জায়গা ছেড়ে দিতে কে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। কিন্তু সরাইওলা হঠাৎ এসে স্থান হলো ঠিক তার সামনেই। যেন তার আসল লক্ষ্য ছিল কে-ই। কিছু পরে বাড়িওয়ালীও এসে হাজির হলো। সেখানে দুজনের যুগপৎ ধমকের চোটে কে-র বেহাল অবস্থা। আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়ে কে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। তার ওপর আবার ভদ্রলোকের ঘন্টাটি প্রবল শব্দে বেজে যাচ্ছিল ও এই ভর্ৎসনার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এর সঙ্গে যোগ হলো অন্যান্য ঘন্টাদ্বন্দ্বি জরুরি কিছু ঘোষণার জন্য নয়, শুধুমাত্র ফূর্তি ও বিপুল আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হিসাবে।

কে-র যেহেতু নিজেরও প্রবল আগ্রহ ছিল তার অপরাধটা ঠিক কী তা জানতে তার কোনো আপত্তিই দেখা গেল না যখন সরাইওয়ালী তার বাহু ধরে অসহনীয় শব্দবৃন্তের বাইরে টেনে নিয়ে এল। এই শব্দ এখন ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছিল। কে একবারও পিছন ফিরল না কারণ সরাইওয়ালী ও অন্যদিকে বাড়িওয়ালী তার সঙ্গে খুবই গুরুত্ব দিয়ে কথা বলছিল-দরজাগুলো এখন হাট করে খুলে যাচ্ছিল, বারান্দাটা চাঞ্চল্যে পূর্ণ হয়ে

উঠেছে, আগেকার দরজাগুলোও যেন কে-র জন্য অপেক্ষা করছিল অধৈর্য্যভাবে। আর ঘন্টা বেজেই যাচ্ছিল ক্রমাগত যেন কোনো জয়োৎসব পালিত হচ্ছে এমনভাবে।

এবার তারা শেষ পর্যন্ত নিঃশব্দ সাদা উঠানে ধীরে মাথায ঢুকল আসল ব্যাপারটা কী। সরাইওয়ালা বা বাড়িওয়ালী কেউই বুঝে উঠতে পারেনি অমন কাজ করার মতো সাহস কে পেল কোথা থেকে। কিন্তু সে করেছেটা কী? কে বার বার প্রশ্ন করতে লাগল কিন্তু বহুক্ষণ ঘরে কোনো উত্তরই সে পেল না কারণ তার অপরাধটা এতই বড়ো হয়ে তাদের কাছে দেখা দিয়েছিল যে তারা বুঝতেই পারে নি সে আন্তরিকভাবেই প্রশ্নটা করেছে। খুবই আস্তে আস্তে ঘটনার গতি প্রকৃতি তার মগজে ঢুকল। বারান্দায় তার থাকার কোনো অধিকারই ছিল না, বড়ো জোর সে ট্যাপরুমে থাকতে পারত। সেটাও একটা অনুগ্রহ হিসাবেই অনুমোদন লাভ করার পর। কোনো ভদ্রলোক যদি তাকে ডেকেই থাকেন তার উচিত ছিল তার কাছে গিয়েই হাজির হওয়া ও সেখানেই থাকা। সাধারণ বুদ্ধি তার নিশ্চয়ই আছে? তাকে যে তার পক্ষে অনধিগম্য জায়গায় ডাকা হয়েছিল গভীর অণীহায় তার কারণ সরকারি কারণেই তাকে ডাকাটা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছিল।

সুতরাং তার উচিত ছিল দ্রুত সেখানে উপস্থিত হওয়া, সম্ভব হলে আরো তাড়াতাড়ি। সেক্ষেত্রে সে যে বারান্দায় ঠায় রয়ে গেল সেটা কি তার কাছে চূড়ান্ত অসম্ভাব্য বলে মনে হয় না? তার সামান্য বেড়াচ্ছিল? সে কি রাত্রিকালীন জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই আহত হয়নি? আর তার কি জানা নেই এই জেরা জবানবন্দীর ব্যাপারটা রাতে চালু করার কারণ কী? এই রাতের জিজ্ঞাসাবাদের উদ্দেশ্যই হলো এমন সব লোককে ডেকে পাঠানো। এখানে কে আরো নতুন একটা ব্যাখ্যা লাভ করল— এমন সব আবেদনকারীদের পরীক্ষা করার যাদের দিনের আলোয় দেখাটা ভদ্রলোকদের কাছে অসহনীয় বলে বোধ হয় আর তাই দ্রুত, রাতে, কৃত্রিম আলোতেই জেরার পালা তার সেরে ফেলতে চান যাতে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে এই কদর্য অভিজ্ঞতা স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে পারেন।

কে-র ব্যবহার এই প্রকার সাবধানী আচরণকে জঘন্যভাবে বিদ্রূপ করেছে। ভূতেরা পর্যন্ত ভোর হলে অন্তর্হিত হয়। কিন্তু কে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। পকেটে হাত গুঁজে, যেন সে আশা করছিল যেহেতু সে সেখান থেকে নড়বে না পুরো বারান্দাটাই বরং সমস্ত ঘরগুলো ভদ্রলোকদের নিয়ে তার সামনে থেকে অন্তর্হিত হবে। আর এটাই, সে নিশ্চিত থাকতে পারে-ঘটত যদি তা কোনোক্রমে ঘটা সম্ভব হতো কারণ ভদ্রলোকদের সৌজন্য বোধ অন্তহীন। তাদের কেউ-ই কখনো মুখ ফুটে যে কে-কে যেতে বলবেন তা সম্ভব ছিল না, তারা কেউ-ই তা করবেন না যদিও শুধু কে-র উপস্থিতির কারণেই তারা ভিতরে ভিতরে থর থর করে কাঁপছিলেন উত্তেজনায় আর তাদের প্রিয় সকালটা শুধু তার জন্যই নষ্ট হয়ে গেল।

কে-র বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেবার বদলে তারা নিজেরাই বরং দুঃখবোধ করতে প্রস্তুত ছিলেন যার মধ্যে সম্ভবত এই প্রত্যাশা মিশে ছিল যে কে নিজে থেকেই হয়ত অল্পক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারবে তার ভ্রান্তি ও তখন ভদ্রলোকের সঙ্গে নিজেও

গভীরভাবে বেদনার্ত হয়ে উঠবে, অসহনীয় দুঃখবোধ করবে এটা চিন্তা করে যে সকালবেলা সকলের চোখের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে সে কি সাংঘাতিক অসৌজন্য প্রদর্শন করছে? বৃথা আশা, তারা জানতেন না, কিংবা সৌজন্যবোধ তাঁদের ভাবতে দেয়নি যে এমন ভয়ানক হৃদয়েরও অস্তিত্ব রয়েছে যা অপরের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন নিষ্ঠুর, সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবিরহিত। নৈশকালীন মত্ততা কি ভোর হলে চুপচাপ ফাঁক ফোঁকরে দেহ চ্যাপটা করে পড়ে থাকে না, বেরিয়ে যাবার তীব্র ইচ্ছে নিয়ে, বেরোতে পারছে না বলে গভীর বেদনা নিয়ে?

অথচ কে নিজে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল একেবারে প্রকাশ্য স্থানে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সে যদি সূর্যোদয় রোধ করতে পারতো সে তাও না করে ছাড়ত না। সে তা করতে পারেনি বটে কিন্তু তাকে দেরি করিয়ে দিয়েছে ও যতটা পারা যায় তাতে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। সে কি ফাইল গুলোর বন্টন পর্যবেক্ষণ করেনি? এ এমন একটা ঘটনা যা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো দেখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, যা সরাইমালিক ও তার স্ত্রীকে পর্যন্ত তাদের নিজেদেরই বাড়িতে কখনো দেখতে দেওয়া হয়নি।

তারা শুধু এ বিষয়ে শুনেছে বা অনুমান করে নিয়েছে মাত্র, যেমন আজকের ঘটনা তারা শুনেছে চাকরের মুখ থেকে। সে কি লক্ষ্য করেনি কত অসুবিধার মধ্য দিয়ে ফাইলগুলো বন্টন করা হয়েছে, যার প্রকৃতি অত্যন্ত দুর্বোধ্য, যেহেতু প্রত্যেকটি ভদ্রলোকই শুধু মাত্র একটিমাত্র পরিসেবাতেই নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন, কখনো নিজের সুবিধার কথা না ভেবে ও সেই কারণে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন এটা দেখতে ফাইলগুলোর বন্টন, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যাতে সুচারুরূপে করা হয় দ্রুত ও কোনো রকম ভুল না করে?

আর কে-র সামান্য অবাধতাও লাগেনি এটা ভেবে যে ফাইল বন্টনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত অসুবিধা হচ্ছিল তার আসল কারণ এই যে দরজাগুলো প্রায় বন্ধ রেখেই ফাইলের আদান প্রদান করতে হচ্ছিল, এক্ষেত্রে ভদ্রলোকদের পরস্পরের মধ্যে প্রায় কোনো সরাসরি সংযোগই সম্ভব ছিল না, থাকলে তাদের নিজেদের মধ্যে একধরনের বোঝাপড়া তৈরি হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকত শুধু পলকমাত্র ফেলে, আর সেটা ঘটলে ভৃত্যদের বখেরা অনেক কমে যেত।

ঘন্টার পর ঘন্টা তাদের কাটাতে হতো না অনুনয় বিনয় করে, মসৃণভাবে সব কিছুই ঘটতে থাকত, ভদ্রলোক ও ভৃত্য উভয়ের পক্ষেই, সমস্তটা অসীম কষ্টকর হয়ে উঠত না, ও এর ফল হিসাবে পরবর্তী কাজকর্ম চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হয়ে উঠত না। তাহলে ভদ্রলোকেরা সরাসরি ভাবে নিজেদের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করেননি কেন? কে কি এখনও বুঝতে পারছে না? বাড়িওয়ালীর অভিজ্ঞতায় এমনটা আর কখনো ঘটেনি- সরাইওয়ালীও ঘাড় নেড়ে তাতে সায় দিল-যদিও তাদের দুজনকে জীবনে কম ঝামেলাবাজ লোককে সামলাতে হয়নি। যে বিষয় এত বাক্যব্যয় করে বলার সাহস পর্যন্ত কারো নেই তাই কিনা তাদের করতে হচ্ছে তার জন্য, তা না হলে সে আসল ব্যাপারটাই ধরতে পারবে না।

বেশ, বলতেই যখন হবে, তাহলে বলা যাক :- শুধুমাত্র তার কারণেই, বিশেষভাবে তারই জন্য-ভদ্রলোকেরা তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি যেহেতু ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর কোনো অপরিচিতের সামনে আসতে হলে তারা বড়োই লাজুক ও দুর্বল প্রকৃতির হয়ে পড়েন। তাঁরা আক্ষরিকভাবেই নিজেদের মনে করেন যতই পোশাক দুরন্ত হয়ে থাকুন না কেন, অন্যের সামনে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে নগ্নপ্রায়। তাদের এমন লজ্জাবোধ কেন তা অবশ্য বলা কঠিন। সম্ভবত এই কঠোর পরিশ্রমী মানুষেরা লজ্জাবোধ করেন শুধুমাত্র ঘুমিয়েছেন বলে।

কিন্তু তারা নিজেদের প্রদর্শন করতে যতটা না লজ্জা পান তার চেয়ে বহুগুণ লজ্জিত হল অপরিচিত কাউকে দেখে। রাত্রিকালীন জবানবন্দির ফলে তাঁরা যে অপ্রিয় কাজটা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন, যেমন, সেই সমস্ত অপ্রিয় অসহ্য আবেদনকারীদের উপস্থিতি সহ্য করা, তাদেরই আবার সকালবেলা আকস্মিকভাবে কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই রাতের জঘন্য স্মৃতি বহন করে আবার তাদের ঘাড়ের ওপর অকাম্যভাবে এসে পড়লে তারা স্বাভাবিকভাবেই যে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে উঠবেন তাতে আশ্চর্য কী? এমন ঘটনার মুখোমুখি হতে তারা একেবারেই অসমর্থ।

কেমন ধরনের মানুষ সে যার এই সামান্য বিষয়েও শ্রদ্ধা নেই? হ্যাঁ, কে ঠিক তেমন প্রকৃতিরই মানুষ! সে সবকিছুর ওপরই নিজের দুর্মর খেয়ালখুশির জোয়াল চাপিয়ে দেয়। যেমন আইনকানুনের ওপর, তেমনই অন্য মানুষের বিষয়ে, কোনো বিচার বিবেচনার ক্ষেত্রেও। তার এই সামান্য কাণ্ডজ্ঞানটুকু পর্যন্ত নেই যে তার গোয়ারতুমির কারণে ফাইল বস্টনের কাজ কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে ও এর ফলে এই বাড়ির কত দুর্নাম হচ্ছে, সে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে যা এ বাড়িতে আগে কখনো ঘটেনি। তার জন্যই ভদ্রলোকেরা মরিয়া হয়ে নিজেদেরই রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। নিজেদের অসাধারণ অনুভূতিকে সংযমের বাঁধনে রাখতে অসমর্থ হয়ে ঘন্টা বাজাতে শুরু করেছেন, শুধু এই লোকটির হাত থেকে নিস্তার পেতে, যার কঠিন হৃদয়ে কিছুই রেখাপাত করে না।

তাঁরা, ভদ্রলোকেরা, সাহায্য চাইছেন! তাদের যদি সাহস থাকত তাহলে সরাইমালিক, বাড়িওয়ালী ও অন্যান্য সমস্ত কর্মচারীই কি অনেক আগেই ছুটে আসত না এই সকালে তাদের সাহায্য করতে ও তারপর কাজ সেরেই নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হতো না? কে-র প্রতি ঘৃণায় পূর্ণ হয়ে, নিজেদের অসহায়তার গ্লানিতে মরমে মরে তারা বারান্দার প্রান্তে অপেক্ষা করছিল ও এরপর ঘন্টা বাদনই, যা তারা শুনবে বলে ভাবেনি কখনো, তাদের কাছে যেন ঈশ্বর প্রেরিত বাণীর মতো ভেসে এসেছিল।

সে যাক, মস্ত ফাঁড়া কেটে গিয়েছে। কে-র হাত থেকে অব্যাহতি পাবার পর সেই ভদ্রলোকদের আনন্দের উচ্ছ্বাস যদি কেউ একবার দেখত এখন। কে-র অবশ্য নিজের বিপদ এখনও কাটেনি, যে সমস্ত ঝগড়াটের সৃষ্টি সে ওখানে করেছে তার সমস্ত জবাব তাকে দিতে হবে একে একে।

ইতিমধ্যে তারা এসে ট্যাপরুমে ঢুকেছিল, সরাইমালিক তার তীব্র ক্রোধ সত্ত্বেও কেন যে তাকে এখানে টেনে নিয়ে এল সেটা কে-র কাছে পরিষ্কার হচ্ছিল না, সম্ভবত

সে ভেবে থাকবে কে-র বর্তমান ক্লান্ত অবস্থার এই বাড়িটি ছেড়ে বেরোনোই সম্ভব হবে না। আসন গ্রহণের জন্য আহূত না হয়েই কে মুহূর্তের মধ্যে একটা পিপের উপর নিজীবের মতো বসে পড়ল। এই অন্ধকারে তার নিজেকে ঠিকঠাকই লাগছিল। বড়ো ঘরটাতে বিয়ারের পাত্রগুলোর ওপর একটা বড়ো ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছিল।

বাইরে এখনো চাপ চাপ অন্ধকার, মনে হলো সেখানে তুষারের ওড়াউড়ি চলছে। এখানে, এই উষ্ণতার মধ্যে বসে মনের মধ্যে এক ধরনের কৃতজ্ঞতার ভাব আসছিল। এখান থেকে যাতে কেউ তাড়িয়ে না দিতে পারে সে ব্যাপারেও যথেষ্ট সতর্ক হওয়া প্রয়োজন বলে মনে হলো তার।

সরাইওয়ালা ও বাড়িওয়ালা তার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল এমন একটা ভাব নিয়ে যেন এখনো সে একটা মস্ত বিপদস্বরূপ ও তার আগেকার অনির্ভরযোগ্য আচরণ মনে রেখে এটা ভাবা যেতেই পারে যে সুযোগ পেলেই এখান থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে সে আবার যে গিয়ে বারান্দাটা আক্রমণ করবে এমনটা অসম্ভব না। এছাড়া গভীর রাতে তাদের যে পরিমাণ আঘাত সামলাতে হয়েছে আর যদ প্রত্যুষে উঠতে হয়েছে তাতেও তারা বেদম হয়ে পড়েছিল।

বিশেষ করে বাড়িওয়ালা। তার পরণে ধূসর রঙের সিল্কের খসখসে একটা গাউন। তার বোতাম আটকানো দেখেই বোঝা যায় খুব তাড়াহুড়ো করেই সে পরেছে, অত ব্যস্ত তার মধ্যে সে তা এটা পেলই বা কোথেকে? সে দাঁড়িয়ে ছিল ঝুলে যাওয়া ফুলের মতো মাথাটা স্বামীর কাঁধে ন্যস্ত করে। সে চোখ মুছছিল সূতির দারুণ একটা রুমালে আর শিশুর মতো বজ্রাতির চোখে কে-র দিকে আড়ে তাকাচ্ছিল। এই দম্পতিটিকে শান্ত করতে কে জানাল তারা তাকে যা কিছু বলেছে একটু আগে সে সবই তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন, কিন্তু তবু ও সব ব্যাপারে তার অজ্ঞতা সত্ত্বেও বারান্দায় অতক্ষণ থাকাটা তার উচিত কাজ হয়নি। সেখানে তার কোনো কাজও ছিল না।

কিন্তু কারো কোনো কাজে অসুবিধার সৃষ্টি করার মতলবও তার ছিল না, তবু ওখানে যে থেকে গিয়েছিল শুধুমাত্র অসম্ভব ক্লান্তির কারণে। তারা যে বেদনাদায়ক পরিস্থিতির ইতি ঘটিয়েছে সে জন্য সে তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছে, যা কিছু ঘটেছে তার জন্য যদি তাকে দায়ীও করা হয় তাতেও তার কোনো ক্ষোভ নেই। তবে তার সাফাই শুধুমাত্র এই যে অত্যধিক ক্লান্তির ফলেই সে ওখানে থাকার ঠিকত্ব দেখিয়েছিল। এই ক্লান্তির কারণটা এই যে সওয়াল জবাবের কঠিন প্রক্রিয়াটিতে অভ্যস্ত ছিল না আগে।

তাছাড়া সে তো এখানে খুব বেশি সময়ও আসেনি। সে এখানকার ব্যাপার স্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার পর নিশ্চয়ই তার অমন ভুল আর হবে না। সে হয়ত জেরার ব্যাপারটাকে একটু বেশি গুরুত্ব দিয়েই ফেলেছে। কিন্তু তাতেও তো অসুবিধা হওয়ার কথা নিয়ে। তাকে দু-দুটো জেরার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। একটার পরেই ঠিক একটা, একটা বুরগেলের কাছে আর অন্যটা আর্লিসারের কাছে, বিশেষ করে প্রথমটিতেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয়টা অবশ্য সময় নিয়েছিল অল্পই। আর্লিসার তার থেকে শুধু একটা অনুগ্রহ চেয়েছিলেন।

কিন্তু দুজনকে এক সঙ্গে ধরলে তার স্নায়ুর ওপর এমন ধকল গিয়েছিল যে তা সামলানো তার সাধের অতিরিক্তই ছিল। এমন কঠিন অবস্থায় পড়লে যে কোনো শক্তপোক্ত লোকও তারই মতো কাবু হয়ে পড়ত। উদাহরণ স্বরূপ সরাইমালিককেই ধরা যেতে পারে। দ্বিতীয় জেরা শেষ হবার পর সে বাস্তবিকই হাঁটছিল এমন ভাবে যেন তখুনি অচৈতন্য হয়ে পড়বে।

তার অবস্থাটা তখন ঠিক কোনো মাতালের মতো কারণ এই প্রথম তাকে দু-দুজন ভদ্রলোকের কথা শুধু শুনতেই হয়নি তাদের জবাবও দিতে হয়েছে। তার যতদূর জানা আছে এই প্রশ্নোত্তর পর্বটি সন্তোষজনক ভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল, কিন্তু তারপরেই দুর্ভাগ্যজনকভাবে শুধু বুরগেল ও আর্লিস্টারই বুঝতে পেরেছিলেন সে কী পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে, তাই নিশ্চিতভাবে তারা তার ভার নিজেদের হাতেই তুলে নিনেন, বাকিদের নিবারণ করতেন কিন্তু জেরার ঠিক পরই আর্লিস্টারকে সেখান থেকে চলে যেতে হয়েছিল, স্পষ্টতই দুর্গের দিকে গাড়ি করে। আর বুরগেল সম্ভবত জেরা করার পর ক্লান্ত হয়েই ঘুমিয়ে পেরেছিলেন, ও ফাইলগুলো সমস্ত বন্টন হবার সময়টাতেও নিদ্রিত থাকেন।

সেই সুযোগ যদি কে-র থাকত তাহলে খুশি হয়েই সে তা করত, তার পক্ষে দেখা নিষিদ্ধ যা কিছু ঘটছে তা না দেখেই আর তারপর হালকা মনে সেখান থেকে সোজা বেরিয়ে আসত কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করে ও সেক্ষেত্রে অতি স্পর্শকাতর ভদ্রলোকদের পর্যন্ত তাকে দেখে বিব্রত হবার কোনো কারণ থাকত না।

এই দুটি জেরার উল্লেখ করার পর, বিশেষ করে আর্লিস্টারের, এবং ভদ্রলোকদের বিষয়ে যে ধরনের সম্মানের সঙ্গে কে কথা বলল, তাতে মনে হলো সরাইমালিক তার উপর একটু প্রসন্নই হয়েছে। পিপের ওপর একটা তজ্জা পেতে সেখানে ভোর পর্যন্ত তাকে ঘুমোতে দেবার যে প্রার্থনা সে সরাইমালিককে করল তাতে সে সম্মতি প্রকাশ করতে যাচ্ছিল কিন্তু বাড়িওয়ালী তাতে প্রবলভাবে বাদ সাধল তার অগোছালো গাউনটির এখান ওখান কামচে ধরে, যেন সে এই মাত্র পোশাকের বিস্মৃততা লক্ষ্য করল। সে ক্রমাগত মাথা নাড়তে লাগল। বাড়ির শৃঙ্খলা সম্পর্কিত একটা কলহ প্রায় নতুন করে শুরু হতে যাচ্ছিল।

কে-র ক্লান্ত অবস্থাতে দম্পতিটির তর্কাতর্কি অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়ে যাচ্ছিল। এখান থেকে বিতাড়িত হবার সম্ভাবনাটি তার কাছে এখন পর্যন্ত যত দুর্বোধ্য ঘটছে তার চেয়েও বেশি ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছিল। এমনটা কিছুতেই ঘটতে দেওয়া চলবে না। সরাইমালিক ও বাড়িওয়ালী যদি দুজনে তার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়, তাহলেও না। পিপের ওপর সঙ্কুচিত হয়ে বসে সে গভীর প্রত্যাশায় দুজনের দিকে চেয়ে থাকে ও হঠাৎ বাড়িওয়ালী তার অস্বাভাবিক স্পর্শকাতরতার সঙ্গে, সেটা আগেও কে-কে বিস্মিত করেছিল, হঠাৎ একপাশে সরে গিয়ে হঠাৎ টেঁচিয়ে উঠল ‘আমার দিকে কেমন ভাবে, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দেখ, এফুনি ওকে ফেরত পাঠাও বলছি।’

কিন্তু কে এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে ও চূড়ান্ত নির্লিপ্ততার সঙ্গে, সে যেন নিশ্চিন্তই যে সে এখানেই থাকবে, বলল, ‘আমি আপনার দিকে তাকাচ্ছি না, আমি দেখছি আপনার পোশাক।’

‘আমার পোশাক কেন?’ জিজ্ঞাসা করল বাড়িওয়ালী ক্রুদ্ধভাবে। কিন্তু কে উত্তর না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল মাত্র।

‘চলে এস’, বাড়িওয়ালী বলল বাড়িওয়ালাকে। ‘দেখতে পাচ্ছ না ও মাতাল অসভ্য গাঁইয়া একটা! এটাকে এখানেই ঘুমতে দাও।’

এবং সে এমনকি পেপিকেও ডাক দেয় ও যেন সঙ্গে সঙ্গে সে অন্ধকার ফুঁড়ে হাজির হয়, তার পোশাক বিস্রস্ত, ক্লান্ত, হাতে একটা ঝাঁটা ধরে রাখা ও এরপর বাড়িওয়ালী তাকে নির্দেশ দেয় সে যেন কে-কে তোষক টোষক কিছু একটা ছুঁড়ে দেয়।

২০

জেগে ওঠার পর কে-র মনেই হলো না সে আদৌ ঘুমিয়েছে। ঘরটা আগের মতোই ফাঁকা ও উষ্ণ। দেয়ালগুলো অন্ধকার, বারের সরঞ্জামের ওপর একটিমাত্র বাত্ব ও জ্বলছে না। আর জানলার বাইরে রাত। কিন্তু যখন সে হাত পায়ে আড় ভাঙছিল, এর ফলে গদিটা নিচে পড়ে গেল আর তক্তা ও পিপে মচমচ শব্দ তুলল, ঠিক তখনি পেপি এসে হাজির। সে তার কাছেই জানল যে ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে ও সে ঝাড়া বারো ঘন্টার ওপর ঘুমে অচেতন্য ছিল। দিনের বেলা বেশ কয়েকবার বাড়িওয়ালী তার খোঁজ করে গেছে, আর গারস্টেকারও, সে এখানেই অন্ধকারের মধ্যে অপেক্ষা করছিল বিয়ারের পিপেগুলোর গা ঘেঁষে যখন কে বাড়িওয়ালীর সঙ্গে ভোরে কথাবার্তা বলছিল, কিন্তু কে-কে বিরক্ত করার সাহস তার হয়নি। সে সকালে আরো একবার এখানে এসেছিল এটা দেখতে কে-র ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কী ঘটল, আর অবশেষে, শোনা গেছে ফ্রিডাও নাকি এসেছিল ও কে-র পাশে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিল, যদিও অবশ্য সে কে-কে দেখতে মোটেই আসেনি, তার আসার কারণ এখানকার বহু কিছু ঠিকঠাক করে রাখা কারণ এই সন্ধ্যাতেই তাকে আবার এখানকার পুরনো দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে। ‘সে বোধ হয় আপনাকে আর ভালোবাসে না?’ কফি ও কেক নিয়ে এসে পেপি প্রশ্ন করল। কিন্তু তার প্রশ্নের মধ্যে আগের মতো কোনো বিদ্বেষ ছিল না। বরং সে যেন কিছুটা বিষণ্ণই। যে ইতিমধ্যেই তার জ্ঞানোন্মেষ হয়েছে যে সারা বিশ্বের হিংস্রতার তুলনায় ব্যক্তিগত ঈর্ষা বিদ্বেষ ইত্যাদি একেবারেই নিষ্ফল ও তাৎপর্যহীন। সে কে-র সঙ্গে সমব্যথীর মতোই কথা বলছিল ও কে যখন কফি পান করছিল সে বুঝতে পারল কে-র রুচি অনুযায়ী তা মিষ্টি হয়নি। তখন সে দৌড়ে গিয়ে আস্ত চিনির পাত্রটাই নিয়ে এল।

তবে বিষণ্ণ হলেও অবশ্য তার পোশাক জমকালো ভাবের ঘাটতি তো ছিলই না বরং গতবারের তুলনায় একটু বেশিই দেখা গেল। তার চুলের বিনুনিতে ফিতের বড়ো বড়ো ফাঁস আর কপাল ও তালুর কাছে চিমটে দিয়ে পরিপাটি ভাবে কেশরাশি কুণ্ডিত রাখা হয়েছে আর তার গলায় ঝুলছে ছোটো একটা চেন, সেটা তার নিচু গলা ব্লাউজের কেন্দ্রস্থল স্পর্শ করে ঝুলছে। নিটোল একটি ঘুম দিয়ে তৃপ্ত কে-কে যখন এক কাপ গরম কফিও দেওয়া হলো, কে চোরা হাতে পেপির চুলের ফাঁস খোলার চেষ্টা করছিল। তখন পেপি শান্তভাবে বলল, ‘আমাকে আর জ্বালাবেন না তো।’

এরপর সে তার পাশেই একটি পিপের ওপর বসে পরে। তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করারই কে-র প্রয়োজন হলো না। সে নিজে থেকেই বকতে শুরু করল, কে-র কফি পত্রের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে যেন তার কিছুটা বিক্ষিপ্তভাবে প্রয়োজন। প্রথমেই কে জানল পেপির দুর্ভাগ্যের জন্য সেই দায়ী।

কিন্তু সেজন্য অবশ্য তার ওপর পেপির কোনো রাগ নেই ও কথা বলতে বলতে সে মাথা ঝাঁকাতে লাগল প্রবলভাবে যাতে কে কোনো আপত্তি না তুলতে পারে। সেই তো ফ্রিডাকে ট্যাপরুম থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে তার উত্থান সম্ভব হয়। এমন কোনো অবস্থার কথাই কল্পনা করা যায় না যা ফ্রিডাকে তার কাজ ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করত। জালের কেন্দ্রস্থল মাকড়সারমতো সেও ট্যাপরুমে চেপে বসে ছিল। সমস্ত সুতোই তার নিয়ন্ত্রণে, যেগুলোর অস্তিত্ব পর্যন্ত সে ছাড়া আর কারো জানা নেই। কারো ক্ষমতা ছিল না তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

শুধুমাত্র অনেক নিচু পর্যায়ে কোনো মানুষের প্রতি তার প্রেমই, যে মানুষের অবস্থান তার পদমর্যাদার অনেক নিচে, শুধুমাত্র তাকে স্থানচ্যুত করতে পারত। আর পেপি? সে কি স্বপ্নেও কখনো ভেবেছে নাকি তার ভাগ্যে কখনো এমন কাজ জুটবে? সে তো ছিল একটা শোবার ঘরের ঝি মাত্র, এমন এক তুচ্ছ কাজ যার কোনো ভবিষ্যৎ নেই বললে চলে। যে কোনো মেয়ের মতো সেও এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখত, স্বপ্ন না দেখে তো আর কেউ থাকতে পারে না, কিন্তু তা যে কখনো বাস্তব হতে পারে তা ভাবার সাহস পর্যন্ত তার ছিল না, সারা জীবনই তাকে তার কাজ করে যেতে হবে বলেই মনে নিয়েছিল।

আর ওইসময়ই ফ্রিডা ট্যাপরুম থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে গেল এত অতর্কিতে যে সরাইমালিক হাতের কাছে তার উপযুক্ত বিকল্প কাউকে হাতের কাছে খুঁজে পাচ্ছিল না। সেই মুহূর্তে। সে যখন চারদিকে তাকাচ্ছে তখনই তার চোখ পড়ে পেপির উপর। অবশ্য পেপিও অবস্থা বুঝে নিজেকে তার চোখের সামনে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছিল তার নজরে পড়তে। সে মুহূর্তেই সে কে-কে ভালোবেসে ফেলে। তেমন সে আগে কখনো কাউকে বাসেনি। মাসের পর মাস তাকে কাটাতে হয়েছে নিচের অন্ধকার ছোটো এক ঘরে।

আরো বহু বছর তাকে ওখানেই অতিবাহিত করতে হতো কপাল মন্দ হলে। সমস্ত জীবনটা তার ওখানেই ধ্বংস হয়ে যেত, সকলের চোখের অগোচরে অবহেলিত হয়ে। হঠাৎ এল কে, এক বীর, দুঃখী মেয়েদের উদ্ধারকর্তা। তার ওপরে আরোহনের রাস্তা সে খুলে দিল তার কাছে। অবশ্য মানতে হবে, সে তার বিষয়ে কিছুই জানত না। জেনে শুনে সে তার জন্য কিছু করেনি। কিন্তু তাতে পেপির কৃতজ্ঞতা কে-র প্রতি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। তার নিয়োগের ঠিক আগের রাত্টি-নিয়োগটি অবশ্য তখনো নিশ্চিত ছিল না, তবু সম্ভাবনার তো সৃষ্টি হয়েছিল-সে তার সঙ্গে কথা বলে অতিবাহিত করেছিল।

কখনো বা তার কানে কানে ধন্যবাদ জানিয়ে। আর তার কাছে যেটা সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল তা হচ্ছে, সে কিনা এত লোক থাকতে কাঁধে

চাপিয়ে নিল ফ্রিডাকেই পেপির পথ পরিষ্কার করতে! সে যে ফ্রিডাকে সঙ্গীনি করল এর মধ্যে দুর্বোধ্য এক ধরনের আত্মত্যাগও দেখা গিয়েছিল। সে বেহে নিল কিনা ফ্রিডাকে, অতি সাধারণ, বুড়োটে ধরনের হাড়সর্বস্ব একটা মেয়ে যার চুল ছোটো আর পাতলা, সবসময় ফন্দিবাজ, সবসময় যেন কি এক গোপন কথা লুকিয়ে রাখছে, অন্তত তার চেহারা দেখে এমনটাই মনে হয়। তার মুখে চেহারা যদি স্পষ্টভাবে দুর্দশার ছাপ পড়েও থাকে তার মনের গভীরে যে অনেক গোপন কথা লুকনো রয়েছে তা খুঁজে বার করার সাধ্য কারো নেই।

উদাহরণ স্বরূপ, ক্ল্যামের সঙ্গে তার তথাকথিত সম্পর্কটি। এমনকী সেই সময় পেপির মাথায় যে সব চিন্তার উদয় ও বিস্তার হয়েছিল তা এই রকমই। এটা কি সম্ভব যে কে ফ্রিডাকে সত্যিই ভালোবাসে। সে কি নিজেকেই ঠকাচ্ছে না? কিংবা ঠকাচ্ছে শুধু ফ্রিডাকেই, এ সব কিছুর ফলস্বরূপ হয়ত একটা ঘটনাই ঘটবে আর তা হলো পেপির উত্থান। আর তখন কি কে নিজের ভুলটা বুঝতে পারবে, তা আর চাপা দিয়ে রাখতে চাইবে না, ফ্রিডারও আর মুখদর্শন করবে না, শুধু চাইবে পেপিকে। এটা পেপির কোনো উন্মাদের মতো স্বপ্নবিলাস নয়। কারণ ফ্রিডার তুলনায় সেও একেবারে ফেলে দেবার মতো নয়। কেউ অস্বীকার করতে পারবে না তারা দুজনেই সমান সমান।

শুধু নিজের পদমর্যাদা ও তার সঙ্গে যুক্ত এক ধরনের গৌরবের জোরেই ফ্রিডা কিছু সময়ের জন্য কে-র মনোহরণ করতে পেরেছে মাত্র। আর তাই তখন পেপি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল তার যখন পদোন্নতি ঘটবে তার কাছেও কে আসবে, অনুনয় করবে ও তখন পেপির সামনে যে পথটা খোলা থাকবে তা হলো হয় সে কে-র ডাকে সাড়া দিয়ে কাজটা খোয়াবে কিংবা তাকে প্রত্যাখ্যান করে আরো উপরে উঠে যাবে। সে নিজেই ভেবে টেবে ঠিক করে নিয়েছিল সবকিছুই সে কে-র জন্য ত্যাগ করবে আর তাকে শিখিয়ে দেবে যথার্থ প্রেম কাকে বলে। প্রেমের স্বরূপ কখনোই কে ফ্রিডার কাছে শিখতে পারবে না, যে মহার্যা প্রেম জাগতিক কোনো মান সম্মানের তোয়াক্কা করে না।

কিন্তু এই সময়েই সবকিছু ঘটল অন্যরকম। আর এর জন্য দোষ দেওয়া যায় কাকে? কে অবশ্যই, এ ছাড়া, বলা বাহুল্য, ফ্রিডার ছেনালি। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো দোষী কে কারণ আসলে সে চাইছিলটা কী, আর কি ধরনের অদ্ভুত মানুষই বা সে? সে নিবিষ্টভাবে, কীই বা খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তা এমন কোনো বস্তু যার খোঁজে সে এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে হাতের কাছে সুন্দরতম প্রাণীটি তার চোখ এড়িয়ে গেল, সবার সেরা, সবচেয়ে সুন্দর যার রূপ? আসলে বলি প্রদত্ত হলো তো পেপিই, তার কাছে সবকিছুই নির্বোধ বলে বোধ হয়েছিল, যেন সব তার হারিয়ে গিয়েছে।

সেই তখন একমাত্র ব্যক্তি যে গোটা হেরেনহফ এ আগুন লাগিয়ে সব তছনছ করে দিতে পারত, এমনভাবে, যেন কোনো কিছুর চিহ্নমাত্র না থাকে, সব পুড়িয়ে যেন ঠিক অগ্নিকুন্ডে কোনো একটুকরো কাগজের মতো। তাকে পেপির নির্বাচিত প্রেমিক হতেই হবে, সব চুলোয় যাক। আজ থেকে ঠিক চার দিন আগে দ্বিপ্রহরিক খানার আগে পেপি ট্যাপরুমে এসেছিল। এখানকার কাজে খাটুনি হাড়ভাঙা। কিন্তু এ থেকে পাবারও অনেক কিছু আছে।

অতীতে যদিও পেপি স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি এই কাজ সে পাবে, তবু সে এখানকার সবকিছু খুব নিখুঁতভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছিল, সে জানত ট্যাপস্ক্রিমের কাজে কী কী দরকার হয়, প্রস্তুত না হয়ে সে এই কর্মভার গ্রহণ করেনি। আগে থাকতে প্রস্তুতি না থাকলে কারো পক্ষে এ কাজের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভবও না। তা করলে কার্যভার গ্রহণ করার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তা হারাতে হবে। বিশেষ করে কেউ যদি এখানে শয্যাকক্ষের পরিচারিকার মতো আচরণ করে। শয্যাকক্ষের পরিচারিকাকে কখনো না কখনো অনুভব করতেই হবে যে সে অভিশপ্ত ও একেবারেই পরিত্যক্ত। অনেকটা খনির ভেতরে কাজ করার মতো, অন্তত সচিবদের বারান্দায় তেমনটাই তো মনে হয়।

কারণ দিনের পর দিন ওখানেই কাটতে হয়, সেখানে মাঝে মধ্যে দিনের বেলা কয়েকটা ভীতু আবেদনকারী, চোখ পর্যন্ত তারা তোলে না, বাদ দিলে কারো দেখা মেলে না দু-চারটে পরিচারিকা ছাড়া, তারাও একই রকম তিক্ত, বিরক্ত। ভোরবেলায় কারো ঘর ছেড়ে বেরোবার হুকুম নেই। এই সময়টা সচিবরা নিজেরা একা থাকা পছন্দ করেন, সেই সময় রান্নাঘর থেকে তাদের জন্য খাবার দাবার নিয়ে যায় পুরুষ ভৃত্যরা। শয্যাকক্ষের পরিচারকের সাধারণত সেখানে কোনো প্রয়োজ থাকে না। আর খাবার সময়ও বারান্দায় বেরোবার নিয়ম নেই, শুধুমাত্র ভদ্রলোকেরা যখন কাজে ব্যস্ত থাকেন তখনই তাদের ঘরের কাজকর্ম করার অধিকার। কিন্তু সে সব ঘরে নয় যেখানে লোক রয়েছে।

শুধু সেগুলোই যেগুলো সেই মুহূর্তে শূন্য। কিন্তু সেখানেও কাজ সারতে হয় অত্যন্ত দ্রুত যাতে ভদ্রমহোদয়দের কাজকর্মে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে কিন্তু তাদের ঘর নিঃশব্দে পরিষ্কার করাটাই বা কি করে সম্ভব যখন দিনের পর দিন তারা তা একনাগাড়ে অধিকার করে থাকেন? নোংরা চাকরগুলো সেখানে সবসময় যাতায়াত করে, আর অবশেষে যখন চাকরানীদের ঘর পরিষ্কার করার সুযোগ ঘটে তখন ঘরগুলোর এমন অবস্থা যে বন্যার জলও তা কলুষমুক্ত করতে পারবে না? এটা সত্যি যে ভদ্রলোকেরা সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা।

কিন্তু তাদের ঘরগুলোর এমন অবস্থা হয়ে থাকে যে বমি চেপে সেখানে ঢুকে কাজ করতে হয়। এমন নয় যে পরিচারিকাদের সেখানে অন্তহীন কাজ করতে হয়, না, তা নয়। কিন্তু কাজের প্রকৃতি অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য আর একটা ভালো কথা কেউ বলে না। সবসময় ভর্ৎসনা আর দুর্বিষহভাবে যে কথা প্রায়ই শুনতে হয় তা এরকম-ঘর পরিষ্কার করার সময় ফাইল হারিয়ে গেছে। আসলে কিন্তু কিছুই হারায় না, একটা কাগজের টুকরো পাওয়া গেলে পর্যন্ত তা মালিকের হাতে জমা দেওয়া হয়। কিন্তু ফাইল তো মাঝে মধ্যে হারাতেই পারে।

কিন্তু তা তো আর এদের দোষে নয়? আর তখন তদন্তকারী দল আসে। পরিচারিকাদের ঘর ছেড়ে দিতে হয়। তখন দলের সদস্যরা তাদের সমস্ত জিনিস হাটকাতে থাকে। মেয়েদের তো তেমন কিছুই থাকে না, তাদের দু-চারটে জিনিস যা থাকে তা ছোটো একটা বাক্সেই ধরে যায়। কিন্তু তবু তদন্তকারীরা ঘন্টার পর ঘন্টা সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খোঁজে। স্বাভাবিকভাবেই তারা কিছুই পায় না। ওখানে ফাইল

আসবেই বা কী করে বলুন তো? কিয়েরা ফাইল নিয়ে করবেটা কী? কিন্তু সে কথা ভাবে কে? ফলাফল সবসময়ই একরকম। হতাশ, অনুসন্ধানকারী বলুন, মালিক বলুন সবাই মিলে এই পরিচারিকাদের, শাসতে থাকে, গালাগাল করে।

সকাল বিকেল রাত এক মুহূর্তের জন্য শান্তি নেই। সবসময় চিৎকার, হুটগোলে পাগল হবার অবস্থা তাদের, কেউ কেউ হয়ত ছাড় পায় এখান থেকে বেরোতে কিন্তু বাকিদের তো থাকতেই হয়, কারণ শয্যা পরিচারিকাদের আরেকটা কাজ হলো আদেশ অনুসারে রান্নাঘর থেকে হালকা খাবার দাবার নিয়ে আসা। বিশেষ করে রাতে। হঠাৎ তাদের কারো দরজায় ধাক্কার আওয়াজ হয়, আদেশ দেওয়া হয়, তখনি তাদের রান্নাঘরে দৌড়াতে হয়। সেখানে ঘুমন্ত পাচক বালককে ঠেলে জাগাতে হয়। তারপর দ্রুত খাবার দাবার সাজিয়ে চাকরের হাতে তা তুলে দিতে হয়, করুণ অবস্থাটা একবার ভাবুন। এটাই কিন্তু সবচেয়ে খারাপ নয়। সবচেয়ে মন্দ হয় যখন কোনো লুকুমই আসে না।

অর্থাৎ কিনা, সেই মাঝরাতে, যে সময়টা সবারই ঘুমে অজ্ঞান থাকার কথা। অনেকে ঘুমিয়েও পড়ে শেষ পর্যন্ত। হঠাৎ পরিচারিকাদের ঘরের বাইরে কারো পা টিপে টিপে চলার শব্দ শোনা যায়। তখন মেয়েরা সব বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। তাদের বান্ধগুলো একটার উপর আরেকটা, কারণ জায়গা সেখানে খুবই অপ্রতুল। পরিচারিকাদের জন্য নির্দিষ্ট পুরো ঘরটাই যেন একটা আলমারী, তাতে তিনটে তাক-তারপর তারা দরজায় কান পেতে শোনে। আতঙ্কে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে রাখে।

আর বাইরে যেই পা টিপে হাঁটুক না কেন ঘরের ভেতর থেকে তার শব্দ শোনা যায় সমস্ত সময় জুড়ে। সে যদি সরাসরি ঘরে এসে ঢুকত এই অজানা আশঙ্কার অবসান ঘটিয়ে তাহলেও তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, কিন্তু একই সঙ্গে এও স্বীকার করা দরকার বিপদের যে সত্যিই কোনো আশঙ্কা রয়েছে তা নাও হতে পারে। হয়ত কেউ নিরীহভাবেই দরজার বাইরে পদচারণা করছে চিন্তা করতে করতে কোনো নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন কিনা ও এ বিষয়ে কোনোভাবেই মনস্থির করতে পারছে না।

হয়ত ঘটনাটা ওরকমই কোনো কিছু। কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কিছুরও সম্ভাবনাও তো অস্বীকার করা যায় না। কারণ তারা তো ভদ্রলোকদের চেনে না। তাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবারই সাহস কারো নেই। সে যাই হোক, ঘরের ভেতর মেয়েগুলোর এখন আতঙ্কে মুচ্ছা যাবার যোগাড়। আর তারপর শেষ পর্যন্ত যখন বাইরেটা চূপচাপ হয়ে আসে তারা দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিরন্তর হয়ে, আবার যে বিছানায় ফিরে যাবে এমন শক্তিরূপে পর্যন্ত তাদের অবশিষ্ট থাকে না।

এই হচ্ছে সেই জীবন যেখানে আবার পেপিকে ফিরে যেতে হবে। আজ সন্ধ্যাতেই তাকে সেই ছোটো পরিচারিকাদের কুঠুরীতে গিয়ে ঢুকতে হবে। কিন্তু কেন? এওতো ফ্রিডার জন্যই, সেই জীবন থেকে মুক্তি পেতে না পেতেই আবার তাতেই ফিরে যাওয়া। এটা সত্যি যে কে-র সাহায্যেই সে ঐ জঘন্য জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছিল কিন্তু তাতে তার নিজের পরিশ্রমও কম ছিল না এটা বলাই বাহুল্য, কারণ ওখানকার পরিষেবার মেয়েরা নিজেদের বড়োই অবহেলা করে, এমনকী তারাও, যারা কাজের সময় খুব

পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। তারা সাজবে শুজবেই বা কার জন্য? তাদের তো কেউ দেখতেই পায় না, বড়োজোর রান্নাঘরের চাকর বেয়'রা কয়েকজন। তাদের জন্য যদি সাজার পরিশ্রম স্বীকার করতে চাও তো কর।

অন্যান্য সময় তো তাদের দিন কাটে নিজেদের ছোটো ঘরে বা ভদ্রলোকদের ঘরে। এক্ষেত্রে পরিষ্কার কাপড়-টাপড় পরাটা একধরনের নির্বুদ্ধিতা। আর সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। এর সঙ্গে রয়েছে কৃত্রিম আলো, দম বন্ধ করা গরম-সবসময় আগুন জ্বলছে চুল্লিতে আর সবসময় ক্লাস্তি, সপ্তাহে একটা ছুটির দিনের বিকেলটা তাই সবাই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয় মহাশান্তিতে, নিঃশব্দভাবে, রান্নাঘরের ঘুপচিতে ডাক পড়ার ভয় নেই। এই অবস্থায় কেউ আর সাজতে টাজতে যাবেই বা কেন? হ্যাঁ ওখানে কারো এমনকী ভালোভাবে পোশাক পরার পর্যন্ত স্পৃহা নেই। ঠিক এইসময় পেপিকে ট্যাপরুমে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

সেখানে পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে ঠিক উল্টোটাই করতে হবে, সেখানে মেয়েদের থাকতে হয় বহু মানুষের চোখের সামনে, তাদের মধ্যে সবকিছু মন দিয়ে লক্ষ্য করেন এমন ভদ্রলোকদের সংখ্যাও তো কম নেই, তারা সবচেয়ে সেরা জীবনধারণে অভ্যস্ত, সেখানে সবসময় যতটা সম্ভব চটপটে আর সুন্দর থাকাটাই দস্তুর। সুতরাং পেপির জীবনে একটা পরিবর্তন এল আর পেপিও নিজের সম্পর্কে এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারে যে নিজেকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলে তার পদের যোগ্য হয়ে উঠতে সে চেষ্টার কোনো ক্রটি করেনি। পরে তার ভাগ্যে কী ঘটবে তা নিয়ে সে মাথা ঘামায় নি। সে জানত বর্তমান পরিস্থিতির সামাল দেবার যোগ্যতা তার ভালোমতই রয়েছে, এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল।

এমনকী এখনো তার একই বিশ্বাস রয়েছে, কেউ তার থেকে এই আত্মবিশ্বাস কেড়ে নিতে পারবে না, এমনকী আজও, তার পরাজিত হবার দিন। একদম গোড়ায় তার সমস্যা দেখা দিয়েছিল কেমন করে সে। পরার মতো সামান্য অলঙ্কারও তার নেই। আর ভদ্রলোকদেরও এমন ধৈর্য্য নেই যে বহুসময় ধরে কাউকে তারা ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে উঠতে সময় দেবেন। তারা চান তাৎক্ষণিক উন্নতি, নিমেষের মধ্যে রূপান্তর। তাঁরা চান নিখুঁত বারমেড, তা না হলেই তাঁরা বার ছেড়ে চলে যাবেন। কেউ ভাবতে পারে তাদের চাহিদা বেশি কিছু ছিল না। ফ্রিডার মতো মেয়ে সেক্ষেত্রে তাদের সম্ভ্রষ্ট করত কী করে? কিন্তু এমন ভাবা ভুল। পেপি এই বিষয়টা নিয়ে অনেক ভেবেছে। সে একসময় ফ্রিডার সঙ্গে সময় কাটিয়েছে, তার সঙ্গে ঘুমিয়েছে পর্যন্ত বেশ কিছু সময়।

ফ্রিডাকে অবশ্য বুঝে ওঠা সহজ নয়-অবশ্য কোন ভদ্রলোকই বা তাকে বুঝতে চেয়েছে? তাকে বিচার করতে বসলে ভুল হবেই। তাকে যে কত বিশ্রী দেখতে তা ফ্রিডার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। যেমন ধরুন, কেউ তাকে প্রথম দেখলেই করুনায় পূর্ণ হয়ে যাবে, তার নিজীব চুল দেখে, তার শুকনো মুখ দেখে। অমন দেখতে যে মেয়ে তার শয়নকক্ষের পরিচারিকা পর্যন্ত হবার যোগ্যতা নেই, আর সে নিজেও তা জানে, বহু রাত সে তা নিয়ে কেঁদেছে পেপিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, তার চুলে নিজের মাথা আবৃত করে।

কিন্তু সে যখন কাজে যায় তার সমস্ত সঙ্কোচ দূর হয়ে যায়। সে নিজেকে যে কারো চাইতে বেশি সুন্দরী বলে মনে করে। আর তার এমন ক্ষমতা আছে যে অন্যদেরও ঠিক তাই ভাবিয়ে ছাড়ে। রোকে যে আসলে কী তা সে জানে আর এখানেই তার কৌশল। আর নিমেষের মধ্যে মিথ্যে বলে সে লোককে ঠকায় এমনভাবে যে কারো সাধ্যই নেই-ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণেও তা যাচাই করতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকাল তো আর এই ছলনা চলতে পারে না। প্রত্যেকের মাথাতেই দুটো করে চোখ বসানো আছে আর আজ হোক, কাল হোক সেই চোখ জোড়া ঠিকই বলে দেবে কী ভাবা দরকার। কিন্তু যখনই সে এই বিপদটা বুঝতে পারল সে অন্য একটা ফন্দি আঁটল, খুব সাম্প্রতিক কালেই, ধরুন ক্ল্যামের সঙ্গে তার সম্পর্ক।

ক্ল্যামের সঙ্গে তার সম্পর্ক! যদি বিশ্বাস না হয় আপনি গেলেই প্রমাণ পাবেন; ক্ল্যামের কাছে যান, তাকে জিজ্ঞেস করুন। কী ধুরন্ধর; ধুরন্ধর! আর এমন প্রশ্ন নিয়ে ক্ল্যামের কাছে যাবার সাহস যদি আপনার না হয়। কিংবা তার কাছে যদি পৌঁছতেই না পারেন তাঁর আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য, আর এমনতিতেও ক্ল্যামের কাছে আপনার পৌঁছবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তাহলেও আপনি ফ্রিডার দাবীর সমর্থনে প্রমাণ ঠিকই পেয়ে যাবেন, শুধু আপনাকে একটু অপেক্ষা করে থাকতে হবে মাত্র, কারণ ক্ল্যাম নিশ্চয়ই এমন মিথ্যে একটা গুজব বরদাস্ত করবেন না। ট্যাপরুমে বা সাধারণ গৃহগুলিতে তার বিষয়ে কী গালগল্প চলছে তা জানতে ক্ল্যাম খুবই উদগ্রীব থাকেন। তার কাছে এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। আর তাঁর বিষয়ে ভুল কোনো গুজব যদি তার কানে আসে তিনি তার প্রতিবাদ করবেনই।

লোকে শুধু যা দেখতে পায় তা হলো ফ্রিডা বিয়ার নিয়ে ক্ল্যামের ঘরের কাছে গেল আর টাকা নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু লোকে যা দেখতে পায় না সেটাই ফ্রিডা বলে থাকে ও লোকেও তাকে বিশ্বাস করে বসে। সে কিন্তু ঠিক খোলাখুলিভাবে কিছু বলে না, গোপন কোনো কথাই সে প্রকাশ করে না। গুপ্ত কথাগুলো নিজে থেকেই প্রকাশ পেতে থাকে সে যেখানেই যায় আর সেগুলো যখন নিজে থেকেই সর্বসমক্ষে বেরিয়ে এসেছে সেও আর তা বলতে কুণ্ঠিত বোধ করে না।

কিন্তু বলে অতি বিনীতভাবে, কোনো কিছুই নিশ্চিতভাবে না। সাধারণভাবে ততটুকুই যা লোকে জেনে ফেলেছে আর কি! সবকিছু অবশ্যই না। যেমন ধরুন, একটা বিষয়ে সে কখনো উচ্চবাচ্য করেনি, সেটা হলো ট্যাপরুমে সে আসার পর থেকেই দেখা গিয়েছিল ক্ল্যাম আগের চাইতে বিয়ার পানের মাত্রা কমিয়ে এনেছেন, খুব যে কম তা ঠিক না, কিন্তু দৃশ্যতই কম বিয়ার। আর তার কারণও অনেক কিছু হওয়া সম্ভব, যেমন, ক্ল্যামের হয়ত বিয়ার কিছুটা অরুচি এসেছে, কিম্বা ফ্রিডার কারণেই তিনি বিয়ার পান করতে ভুলে যাচ্ছেন।

যেভাবেই হোক, শুনতে যতই আশ্চর্য লাগুক ফ্রিডাই যে ক্ল্যামের প্রণয়িনী এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। আর সেক্ষেত্রে অন্য সকলেই বা এমন কাউকে শ্রদ্ধা না করে পারে কী করে স্বয়ং ক্ল্যাম যাকে পছন্দ করেন? তাই ব্যাপার স্যাপার আসলে যে কী তা ভালোভাবে বুঝে ওঠার আগে ফ্রিডা লোকের চোখে একেবারে সৌন্দর্যের রানি হয়ে

উঠল, ট্যাপরুমের পক্ষে একেবারে আদর্শ। বরং বলা যায় এমন সুন্দরী, এত শক্তিশালী একটি মেয়ের পক্ষে এই ট্যাপরুমটাই আসলে তার যোগ্যস্থান কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ দেখা দিল। লোকের অবাकই লাগছিল দেখে সে ওখানেই পড়ে আছে। বারমেড হওয়াটাই একটা সৌভাগ্যের কথা। আর তার যদি ক্ল্যামের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাহলে তো আর কথাই নেই।

কিন্তু ট্যাপরুমের কোনো মেয়ে যদি ক্ল্যামের প্রেমিকা হয়ে ওঠে তাহলে তিনি তাকে ট্যাপরুমেই বা ফেলে রেখেছেন কেন? অতদিন ধরে? তিনি তার আরো পদোন্নতি ঘটাচ্ছেন না কেন? তবে তার উত্তরেও লোককে হাজা রবার বলা যায় এখানেও কোনো বৈপরীত্য নেই, ক্ল্যামের প্রত্যেকটি কাজের পিছনে নির্দিষ্ট কারণ থাকে, যে কোনো দিন, হয়ত যে কোনো মুহূর্তেই ফ্রিডার পদোন্নতি ঘটাবেন তিনি; কিন্তু এ যুক্তিতে বিশেষ চিড়ে ভেজে না।

নানা লোকের নানা মত। বিশেষ করে কিছুদিন পর থেকেই আর তাদের এটা সেটা বলে বেকুব বানানোটো কঠিন হয়ে পড়ে, তা গল্প যতই নতুন ধরনের হোক না কেন। ফ্রিডা যে ক্ল্যামের প্রণয়িনী এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই, এমনকী যারা নিশ্চিতভাবে সব কিছুর খবর রাখে তারাও দীর্ঘকাল সন্দেহ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ক্ল্যামের ছুড়ি যদি হয়ে থাক তো হয়েছে, নিকুচি করেছে, তারা ভাবে, কিন্তু সত্যিই যদি হয়ে থাক আমরা তার লক্ষণ দেখতে চাই।

কিন্তু তার কোনো লক্ষণই দেখতে পাওয়া যায় না। ফ্রিডাও ট্যাপরুমে থেকে যায় আগের মতোই। গোপনে গোপনে তার নিশ্চয়ই আনন্দ হয় এই স্থিতিাবস্থায়, কিন্তু মানুষজনের কাছে তার সম্মান যে গেছে এটা সে ঠিকই লক্ষ্য করে। আসলে কোনো কিছু ঘটার আগেই সেটা লক্ষ্য করে ফেলে। সত্যিকারের এক সুন্দরী সর্বজনপ্রিয় মেয়ে একবার ট্যাপরুমের অধিষ্ঠিত হতে পারলে তার আর কোনো কারুকলার প্রয়োজন পড়ে না। যতদিন সুন্দরী থাকবে ট্যাপরুমের কাজ তার বাঁধা যদি না আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা ঘটে।

কিন্তু ফ্রিডার মনে তার কাজের স্থায়িত্ব বিষয়ে সদাসর্বদা দৃষ্টিভ্রান্তা নিশ্চয়ই ছিল। অবশ্য বুদ্ধিমানের মতো সেটা প্রকাশ করেনি, বরং সে ক্রমাগত তার কাটা বিষয়ে সবসময় অনুযোগ করে যাচ্ছিল, অভিশাপ দিচ্ছিল। কিন্তু গোপনে সতর্কভাবে সে পরিস্থিতির দিকে নজরও রাখে। সে দেখতে পায় লোকে কিভাবে তার বিষয়ে নির্বিকার হয়ে উঠছে। সে উপস্থিত হলে তার দিকে তাকানোর পরিশ্রম পর্যন্ত স্বীকার করছে না কেউ চাকরগুলো পর্যন্ত তাকে আর পাত্তা দিচ্ছে না। তারা বরং ওলগা বা অমন ধরনের মেয়েদের গায়ে সঁটে থাকতে পছন্দ করছে। সরাইমালিকের ব্যবহার থেকে পর্যন্ত সে আঁচ করে নিয়েছিল সে আর আগের মতো অপরিহার্য নেই। তার গুরুত্ব ক্রমশ কমে আসছে, ক্ল্যাম বিষয়ে কত আর নতুন নতুন গল্প ফাঁদা যায়, সব কিছুরই তো একটা সীমা আছে, আর তাই আমাদের ফ্রিডা দেবি নতুন একটা উপায় ঠাওরালেন।

শুধু যদি কারো এই নতুন প্যাঁচটা দেখবার চোখ থাকত! পেপি সেটা ঠিকই আঁচ করেছিলো। যদিও পুরোটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি তখনো। ফ্রিডা ঠিক করল সে

একটা কলহ রটাবে। সে ক্র্যামের প্রণয়িনী। নিজেকে ছুঁড়ে দেবে ছোটোর চেয়েও ছোটো কোনটিতে। এর ফলে আবার সব নড়ে চড়ে বসবে, বহুকাল ধরে এই ঘটনা বাজার সরগরম করে রাখবে আর শেষ পর্যন্ত-শেষ পর্যন্ত লোকে স্মরণ করবে ক্র্যামের প্রেমিকা হবার বিপুল গৌরব কেমন করে কেউ ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে শুধুমাত্র নতুন প্রেমের তীব্র আনন্দে। এতে একমাত্র মুশকিলটা হলো এমন একটা মানানসই লোক খুঁজে বার করা যার সঙ্গে এই চতুর খেলাটা খেলা যেতে পারে। একাজ ফ্রিডার কোনো পরিচিতকে দিয়ে হবে না, কোনো চাকর বাছলেও চলবে না, কারণ সেক্ষেত্রে সে হয়ত তার দিকে প্রশ্নের চোখে তাকাবে।

তারপর তাকে অগ্রাহ্য করে চলে যাবে। বাকপটুতা সত্ত্বেও তার পক্ষে এই গল্পটা প্রচার করা অসম্ভবই হয়ে দাঁড়াবে যে সে, ফ্রিডা, তার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, তার থেকে আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ হয়েছিল আর ঘটনাখানেকের মধ্যে সে কী করছে বোঝার আগেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে। যদিও তার দরকার হীনের চেয়েও হীনতর, কোনো মানুষকে, তাকে কিন্তু হতে এমন একজন যে তার স্থূল, কর্কশ প্রকৃতি সত্ত্বেও কামনা করবে শুধু ফ্রিডাকেই ও তার জীবনের একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা হবে-ঈশ্বর রক্ষা করুন-ফ্রিডাকে বিয়ে করা।

কিন্তু যদিও দরকার একটা নগন্য মানুষ, চাকরদের চেয়েও হীন, চাকরদের চেয়ে বহুগুণ হীন, তবু তাকে এমন মানুষ হতে হবে যাতে মেয়েরা তাকে দেখে ঘৃণায় নাক না কোঁচকায়। যাকে দেখে এমনকী বুদ্ধিসুদ্ধি সম্পন্ন কোনো মেয়ে পর্যন্ত মাঝে মধ্যে আকর্ষিত হবার মতো কিছু গুণ খুঁজে পেতে পারে।

কিন্তু এমন মানুষ পাওয়াই বা যাবে কোথায়? অন্য কোনো মেয়ে হলে হয়ত এমন কাউকে খুঁজে খুঁজেই জীবন কাবার করে দিত। কিন্তু ফ্রিডার কপালই আমিন মশাইকে সোজা তার কাছে ট্যাপরুমে টেনে নিয়ে এল। সম্ভবত সেই সন্ধ্যাতেই যখন তার মাথায় প্রথম এই পরিকল্পনাটা আসে। জরিপের আমিন! হ্যাঁ, আর ভাবনাটা কী? তাঁর মনে বিশেষ কোনো চিন্তা খেলা করছে? তিনি কি অসাধারণ কিছু লাভ করতে চলেছেন? বিশেষ কোনো পদমর্যাদা সম্মান? তিনি কি অমন কিছুরই পিছনে ছুটছেন? সেক্ষেত্রে তাঁর অন্যভাবে প্রথমদিকে সব সাজিয়ে নেওয়া উচিত ছিল না কি? যতই হোক আসলে তো তিনি একবারেই ফালতু একটা লোক। তার অবস্থা দেখলে চোখে জল আসে। তিনি একজন আমিন। সেটা হয়তো কে জানে একটা কিছুই হবে। তার মনে কাজ টাজ তার জানা আছে।

কিন্তু কেউ যদি না জানেতার জ্ঞান দিয়ে কী করতে হবে সেক্ষেত্রে তার জ্ঞানটাই তো বেফয়দা, ঠিক একই সময় তিনি নানা রকম ফরমাশও করতে শুরু করেছিলেন। অথচ তাঁর সামান্যতম পৃষ্ঠপোষকতা পর্যন্ত নেই, এই অবস্থাতেই হয়ত সরাসরি কোনো ফরমাশ-হয়ত করছিলেন না, কিন্তু দাবি যে করছেন সেটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। তাতেই তো মেজাজ গরম হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তিনি কি জানেন তার সঙ্গে কথা বললে একটার ঝি-র পর্যন্ত মর্যাদার হানি হয়? আর এই সমস্ত দাবি দাওয়া নিয়ে প্রথম সন্ধ্যাতেই তিনি সুন্দর করে পেতে রাখা ফাঁদটিতে সরাসরি গিয়ে ঢুকে পড়লেন। তাঁর

নিজেকে নিয়ে লজ্জা হয় না? ফ্রিডার মধ্যে এমন কোনো আকর্ষণ তিনি খুঁজে পেলেন? এই হাড়ের বস্তা চোপসানো বস্তুটা কি সত্যিই তার কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছিল? না, তা হতেই পারে না। তার দিকে তাকাননি পর্যন্ত। তার মুখ থেকে সে ক্ল্যামের প্রেমিকা এটুকু শোনাই তার পক্ষে যথেষ্ট মনে হয়েছিল। এটাই তার কাছে একেবারে অসাধারণ বলে বোধ হয় ও তিনি আত্মসমর্পণ করেন। এবার তো ফ্রিডাকে চলে যেতেই হবে।

হেরেনহফ এ তার আর স্থান নেই। তার বিদায় দিনের প্রভাতেই পেপি তাকে দেখতে যায়। সমস্ত কর্মচারীরা দৌড়ে এসেছে, যতই হোক, কি হচ্ছে জানার কৌতূহল তো আর কারো কম না। আর তার ক্ষমতা তখনো এতই বেশি ছিল যে সবারই তার জন্য মায়া হচ্ছিল, সকলেই তার জন্য দুঃখবোধ করছিল, তার শত্রুতা পর্যন্ত; সুতরাং একেবারে প্রথম থেকেই তার ছকটি নির্ভুলভাবে বাস্তবে অনূদিত হচ্ছিল। এমন এক মানুষের জন্য সে কি করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনল এটা সবার কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছিল। রসুইঘরের ঝিয়েরা পর্যন্ত, বারমেডদের ওপর তাদের প্রবল ভক্তি, দুঃখে সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছিল না।

এমনকী পেপি নিজেও বিচলিত হয়েছিল। যদিও তার মনোযোগটা অন্যদিকে আকৃষ্ট হয়। তার অবাক লাগে ফ্রিডা নিজে কত কম দুঃখিত হয়েছে এটা দেখে। আসলে তো তার পক্ষে এর চেয়ে বড়ো দুর্ঘটনা আর ভাবাই যেতে পারে না। আর সে ভান অবশ্য করছিল যে সে খুবই অসুখি, কিন্তু তার ভাঁওতা পেপির চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। সে এ সবার পিছনে আসল প্রেরণা পাচ্ছে কোথেকে? সম্ভবত নতুন প্রেমের আনন্দ? না, সেটা সম্ভব বলে মনে হয় না।

কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্য কিইবা হতে পারে? তাহলে সে চিরাচরিতভাবে হাসিখুশি ভাবটা বজায় রাখছে কিসের জোরে, এমনকী পেপির হাতে ছিল না, নতুন কাজের জন্য ভার নেবার আগে তার তখনো বহু প্রস্তুতি নেওয়া বাকি রয়েছে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সম্ভবত তাকে নতুন কার্যভার গ্রহণ করতে হবে। অথচ তখনো তার কেশবিন্যাস করা হয়নি, ভালো পোশাক নেই, পর্যাপ্ত অর্ন্তবাসের অভাব। ভদ্রগোছের জুতো পর্যন্ত তখনো জোগাড় করে উঠতে পারেনি। মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাকে সমস্ত সংগ্রহ করতে হবে। সবকিছু যদি ঠিকঠাক জোগাড় না করা যায় এর মধ্যে তাহলে তার নতুন কাজটার আশা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কাজে যোগ দেবার আধ ঘন্টার মধ্যেই সে বিভাড়িত হবে। সে যাই হোক, এ কাজে সে কিছুটা সফলই হয়। চুল বাঁধার ব্যাপারে তার বেশ কিছুটা হাতযশ আছে, এমনকী বাড়িওয়ালী পর্যন্ত নিজের চুল বাঁধার জন্য একবার তাকে ডেকে পাঠায়।

এ কাজে বিশেষ করে প্রয়োজন দক্ষ লঘু হাতের ঘেঁটা রয়েছে তার আর এ ছাড়া তার মাথায় এত চুল যে তা নিয়ে ইচ্ছেমতো বিন্যাস করা যায়। আর পোশাকের ব্যাপারেও সাহায্য পাওয়া গেল। তার দুজন সহকর্মী তার সাহায্যে এগিয়ে এল। তাদের কাছে এটা মস্ত সম্মানের ব্যাপারও বটে, তাদের দল থেকেও কাউকে বারমেডের পদ দেওয়া হলে, পরবর্তীকালে তার আরো শক্তি বৃদ্ধি হলে, সে তার পুরনো

সহকর্মীদের যে বহু সুযোগ সুবিধা দিয়ে সাহায্য করবে এমনটা তো ধরে নেওয়া যেতেই পারে। মেয়েদের একজনের কাছে বেশ কিছু মূল্যবান অলংকার ছিল, তার সম্পত্তি, বাকিরা সব নানাভাবে এগুলোর প্রশংসা করেছে আর সে স্বপ্ন দেখত তার জীবনে একদিন আসবে যখন সে ওগুলোর সদ্যবহার করতে পারবে প্রাণ ভরে। পেপির প্রয়োজনের সময় সে উদারভাবে এগুলো তাকে দিয়ে দিল।

এবার বাকি দুটো মেয়ে তাকে সেলাইয়ের কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। নিজেদের জন্য করলেও তারা যা করল তার চেয়ে ভালোভাবে করতে পারত না, বিপুল ফ্রুটি ও উৎসাহের সঙ্গে তারা সেলাইয়ের কাজগুলো করতে লাগল। নিচের বাস্কের একজন আর ওপরের বাস্কের অপরজন বসে গান গাইতে গাইতে রিপুকর্ম করে যেতে থাকে, পরস্পরকে ওপর ও নিচ থেকে বজ্রাংশ এগিয়ে দেয়, সেলাইয়ের সরঞ্জাম দেওয়া নেওয়া করে-এ নিয়ে ভাবতে বসলে পেপির মন ভার হয়ে যায় এ চিন্তায় যে তাদের এত উদ্যোগ ব্যর্থই হয়ে গেল, তাকে তো আবার তার বন্ধুদের কাছেই ফিরে যেতে হচ্ছে শূন্য হাতে। কতই না দুর্ভাগ্যের কথা আর এর জন্য দায়ি লঘুচিও কে।

সেই সময় সকলের নতুন পোশাকটি দেখে আনন্দের আর অবধি ছিল না, যেন তারা সার্থকতার চূড়ায় পৌঁছে গেছে, শেষে এমনকী যখন দেখা গেল একটা ফিতে পড়ে রয়েছে সেটাকে পর্যন্ত নিমেষের মধ্যে ব্যবহার করা হয়ে গেল। পোশাকটা যে কি সুন্দর হয়েছিল তা বোঝানো যাবে না। এখন অবশ্য সেটা দলামোচড়া হয়ে পড়ে আছে, দাগও প্রচুর লেগেছে, কিন্তু ঘটনা হলো পেপির তো অন্য কোনো পোশাকই ছিল না। এই একটা কাপড়ই দিনরাত তাকে পড়ে বেড়াতে হয়েছে।

কিন্তু তখনো এটা দেখতে অতি অপূর্ব ছিল। এমনকী সেই অভিশপ্ত বারনাবাসের বাড়ির মেয়েগুলো পর্যন্ত এর চেয়ে ভালো পোশাক কখনো দেখাতে পারেনি। অবশ্য এটাও ঠিক ভালো পোশাক সুন্দর দেখাতে হলে মানানসই চেহারাও প্রয়োজন। পেপির মতো স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের জন্য ভালো পোশাক বানানোটাও তেমন কঠিন নয় অবশ্য সে চেহারা নিয়ে সে অহংকার করতে চায় না। বরং শক্ত হয়ে দাঁড়াল অন্তর্বাস ও জুতো সংগ্রহ করা, এখানেই তাদের ব্যর্থতা শুরু হলো। তার বন্ধুরা অবশ্য এ ব্যাপারেও তাকে সাহায্য করার আশ্রয় চেষ্টা চালায়।

যদিও এখানে বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারে না। 'সস্তা মোটা কাপড়ের কিছু অন্তর্বাস জোগাড় করে তালি টালি মেরে তারা চালিয়ে দেয় বটে কোনো রকমে কিন্তু হাই ছিল ছোটো বুটের বদলে তাকে কাজ চালাতে হলো চপ্পল পরে, এমন সেটার চেহারা যে জনসমক্ষে বার করার চেয়ে তা ঘরে লুকিয়ে রাখাই উচিত। তার বন্ধুরা তাকে সান্ত্বনা দেয় এই যুক্তি দেখিয়ে যে ফ্রিডাও কখনো এত সুন্দর পোশাক গায়ে চাপায়নি। আর মাঝে মধ্যে সে এমন নোংরা ভাবে ঘুরে বেড়াত যে অতিথিদের কাছে তার বদলে চাকরদের পরিষেবা অনেক বেশি কাম্য ছিল, ফ্রিডার অবশ্য এসবে জরফৎ ছিল না। পরিস্থিতি তার অনুকূল। সম্মানও তার বিপুল। সে তো সম্মানীয় এক মহিলা, তার নোংরা পোশাক, আলুথালু বেশ বরং লোকের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় বোধ হতে পারে- কিন্তু পেপির মতো এক নরংগত যদি এমনভাবে সবার সামনে উপস্থিত

হয়? আর এছাড়া ফ্রিডা ভালোভাবে পোশাক পরতেও পারে না। তার কোনো রুচিবোধই নেই; কারো ভুক যদি ফ্যাকাশে হয় তাহলে সে আর কী করবে মেনে তো নিতেই হবে।

কিন্তু সে নিশ্চয়ই ফ্রিডার মতো নিচুগলা ব্লাউজ পরে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াবে না সকলের দৃষ্টিকে ফ্যাটফেটে হলুদ রঙে আঘাত দিয়ে? তার ভালো পোশাক না পরার পিছনে রুচিবোধের অভাব ছাড়াও রয়েছে তার কিপটে স্বভাব। যা কিছু সে উপার্জন করে সব সে জমায়, কী জন্য তা কেউ জানে না। মিথ্যে বলে আর কৌশলে সে এত রোজগার করে যে তাকে বেতন না দিলেও চলত, পেপি তার উদাহরণ কখনো অনুসরণ করতে চায়নি। চাইলেও পারত না।

এসব কারণেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল যে এমনভাবে সুসজ্জিত হয়ে সে সকলের কাছে হাজির হবে যে প্রথম থেকেই লোকের দৃষ্টি তার দিকে আকর্ষিত হবে সে যদি যথাযথভাবে এটা করতে পারত সে হয়ত, ফ্রিডার সমস্ত চারু্য্য কে-র আকাশ ছোঁয়া নির্বুদ্ধিতা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত ঠিকই জিতে যেত। কারণ শুরুটা তো হয়েছিল দারুণভাবেই। সে আগে থাকতেই ভালোভাবে জেনে, বুঝে গিয়েছিল তার কাজটাতে ঠিক কী কী গুণের প্রয়োজন।

ট্যাপরুমে পা রেখেই সে সেখানে স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে, এতটাই যে ফ্রিডার অভাব কেউ বোধই করেনি। দ্বিতীয় দিনে শুধু কিছু অতিথি ফ্রিডার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল, কোনো ভুলভ্রান্তি ঘটেনি, মালিক সম্ভ্রষ্ট হয়েছিল। প্রথম দিন মালিক এতটাই আশঙ্কিত ছিল যে পুরো সময়টা সে ট্যাপরুমে কাটায়।

পরবর্তীকালে সে মাঝে মধ্যে আসত মাত্র। আর অবশেষে সে যখন দেখতে পেল টাকাকড়ির হিসেব একেবারে যথাযথ-বরং ফ্রিডার সময়ের চেয়েও বিক্রিবাটা হয়েছে বেশি, সে সব পেপির হাতেই ছেড়ে দিল। পেপি কিছু কিছু রদবদলও ঘটায়। ফ্রিডা এমনকী চাকরদের ওপরও খবরদারি করত, আংশিকভাবে অন্তত, বিশেষ করে যখন কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। আর সে এটা করত কাজের ওপর অতিরিক্ত ভালোবাসা থেকে নয়, নিচতা থেকে, মাতব্বরির করার প্রবণতা থেকে, আর এই ভয় থেকে যে কেউ তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। পেপি ঠিক উল্টোভাবে এই ভৃত্যশাসনের দায়িত্বটা দিয়ে দিল পেপি ঘরের রক্ষকের হাতে। সেও কাজটা দক্ষতার সঙ্গেই করে। এর ফলে পেপির অনেক সময় বেঁচে যায়।

অতিথিদের ঘরগুলোতে অনেক বেশি, মনোযোগ দিতে সক্ষম হয়। অতিথিরা অনেক দ্রুত পরিষেবা পেতে থাকেন। আর তার নিজের হাতেও প্রত্যেকের সঙ্গে দু-একটা কথা বলার মতো যথেষ্ট সময় থাকে, ফ্রিডার মতো নয়, সে নাকি শোনা যায় নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখত ক্ল্যামের জন্য এবং অন্য কারো উচ্চারিত একটি কথা বা ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টাকে ক্ল্যামের প্রতি অপমান বলেই মনে করত। এটাও অবশ্য, বলা বাহুল্য তার একটা চালাকি, কারণ সে যদি কখনো কাউকে সামান্য কাছেও আসতে দিত সেটাকেই একটা মস্ত অনুগ্রহ বলে ধরে নেওয়া হতো। পেপি অবশ্য তার ছেনালিকে মনে প্রাণে ঘৃণা করত আর গোড়ার দিকে তার এ সবার প্রয়োজনও ছিল

না। সে সবার সঙ্গেই খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করে ও সকলেই তার ব্যবহারে অভিভূত হয়ে পড়ে।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল সকলেই পরিবর্তনে খুশি হয়েছে। কাজের পর শান্ত হয়ে ভদ্রলোকেরা যখন বিয়ারে একটু গলা ভেজাতে অল্প সময়ের জন্য এসে বসতেন তখন তাদের একটু চাঙ্গা করে তুলতে প্রয়োজন দু-একটা কথা, কটাক্ষ, কাঁধের একটু শ্রাগ। পেপির কোঁকড়া চুল এতটাই আবেগের সঙ্গে নড়াচড়া করতো যে তাকে দিনে অন্তত দশবার চুল ঠিক করতে হতো। তার কোঁকড়া চুল ও ফিতের ফাঁস-এর প্রলোভন জয় করা তাদের কাছে ভারি শক্ত ব্যাপার ছিল, এমনকী কে-র মতো অন্যমনস্ক প্রকৃতির মানুষ পর্যন্ত তা পারেনি। এইভাবে সেই উত্তেজক দিনগুলো যেন উড়ে কোথায় মিলিয়ে গেল, কাজে পূর্ণ, সাফল্যসম্ভূত তারা যদি অত দ্রুত না হারিয়ে যেত, যদি আরো কিছু দিন পড়ে থাকত! চারটে দিন খুবই নগণ্য সময়, তাদের যদি কেউ পরিপূর্ণভাবে ব্যবার করে ক্লাস্তিতে ভেঙেও পড়ে। হয়ত পাঁচ দিন পাওয়া গেলে যথেষ্ট হতো, কিন্তু শুধু চারটে দিন বড়োই কম।

স্বীকার করতে হবে এই সামান্য চার দিনের মধ্যেই পেপি বহু বন্ধু ও স্তাবক লাভ করেছিল, যদি তাদের তাকানোর ধরন ধারণাকে বিশ্বাস করতে হয়, যখন সে বিয়ার মগ নিয়ে বারে ঢুকত। বন্ধুত্বপূর্ণ এক আবহাওয়ার মধ্যে সে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছিল। বাটমিয়ের নামে এক কেরানি তো তার জন্য একেবারে খেপেই ওঠে। এই চেনটা আর লকেটটা তারই দেওয়া, লকেটের ভিতরে সে আবার নিজের ছবি সেঁটে দেয়। পাগলামি আর কি! এরকম নানা কিছুই ঘটে ঐ চারদিনে, শুধু ঐ চারদিনেই হয়ত লোকে ফ্রিডাকে ভুলে যেত, পুরোপুরি নয় হয়ত, কিন্তু অনেকটাই, লোকের স্মৃতি থেকে একেবারেই সে মুছে যেত, আরো অনেক আগেই যদি না সে মাথা খাটিয়ে নিজের কলঙ্কটা রটাত, লোকে তা নিয়েই মশগুল হয়ে উঠেছিল, সে তাদের কাছে এবার প্রতিভাত হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য রূপে, তারা তাকে আবার দেখতে চাইছিল শুধুমাত্র কৌতূহলবশতই। যেটা তাদের কাছে একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল চূড়ান্ত বিতৃষ্ণার সীমারেখা স্পর্শ করে তাই-ই তাদের কাছে ভারি উপাদেয় হয়ে উঠল আর এজন্য কে-র হস্তক্ষেপই সম্পূর্ণভাবে দায়ী, অন্যান্য ব্যাপারে সে যতই মামুলি হোক না কেন।

অবশ্যই তাদের সামনে পেপি সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকতে পারত, তারা তাকে বিসর্জন দিত না, সে তার প্রভাব ক্রমাগত বিস্তার করে যেতে পারত তাদের ওপর। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিলেন বয়স্ক ভদ্রলোক। পুরনো অভ্যাসে অভ্যস্ত, শ্লথ, নতুন বারমেডে অভ্যস্ত হবার জন্য তাদের কিছু সময়ের প্রয়োজন ছিল আর বারমেডের পরিবর্তনটা যতই সুবিধেজনক হোক না তাদের পছন্দ হয়নি। হয়ত পাঁচ দিন সময় পেলে তাঁরা তাকে মেনে নিতেন। আপাতত তাঁরা তাকে ক্ষণস্থায়ী বারমেড হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। আর তারপরই সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো দুর্ভোগটা আসে। ঐ চারদিনের মধ্যে প্রথম দুদিন গ্রামে থাকলেও ক্ল্যাম তাঁর খাস কামরায় ঢুকলেন না। তিনি যদি আসতেন তবে সেটা হতো পেপির অগ্নিপरीক্ষা-সে অবশ্য সে বিষয়ে ভীত ছিল না বরং সে অনেক আশা নিয়েই এর প্রতীক্ষায় ছিল। সে হয়ত-এসব চিন্তাকে

বাক্যে অনুবাদ না করাটাই শ্রেয়- ক্ল্যামের রক্ষিতা হতো না কিংবা মিথ্যে কথা রটিয়ে দিয়ে নিজের মর্যাদাও অন্যের চোখে বাড়িয়ে নিত না।

কিন্তু অন্তত ফ্রিডার মতোই সুন্দরভাবে বিয়ারের পাত্রটা তার সামনে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে পারত। ফ্রিডার ন্যাকামি না করে তাঁকে সুপ্রভাত ও বিদায় জানাত যথাযোগ্যভাবে। আর ক্ল্যাম যদি মেয়েদের চোখ থেকে বিশেষ কোনো দৃষ্টি কামনা করে থাকেন তাও তিনি তৃপ্তজনকভাবে পেপির চোখে নিশ্চয়ই দেখতে পেতেন।

কিন্তু তিনি এলেন না কেন? এ কি কোনো দৈবের খেলা? সেই সময় এ কথাটাও পেপির মনে এসেছিল, ঐ দুদিন তার সর্বক্ষণ মনে হয়েছে যে কোনো মুহূর্তে তিনি এসে পড়বেন, রাতেও তাঁর প্রতীক্ষার অবসান হয়নি। ‘ঠিক এখনই ক্ল্যাম আসছেন,’ সে ভেবেছে ক্রমাগত। সে এদিক ওদিক চঞ্চলভাবে দৌড়ে বেড়িয়েছে এই গভীর প্রত্যাশায় যে সে তাঁকে প্রথম দেখবে তার প্রবেশ মুহূর্তেই। এই ক্রমাগত আশাভঙ্গ তাকে ক্লান্ত করে তোলে আর ঐ কারণেই সে সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে উঠতে পারেনি।

সামান্য সময় পেলেই সে লুকিয়ে বারান্দায় হাজির হয়েছে, সেখানে কর্মচারীদের প্রবেশ কঠিনভাবে নিষিদ্ধ, সেখানে এক অন্ধকার কোণে মিশে গিয়ে শুধু অপেক্ষা করেছে। এখনি যদি ক্ল্যাম আসেন,’ সে ভেবেছে, তাকে যদি একবার আমি ঘর থেকে বেরোবার সময় বাহতে তুলে তাঁর খাস কামরায় নিয়ে যেতে পারতাম। তার ভারে আমি ভেঙে পড়তাম না, যতই দুর্বল সে ভার হোক না কেন। কিন্তু তিনি এলেনই না। ওপরের তলার বারান্দাটা এত নিঃশব্দ যে টেরই পাওয়া না কেউ সেখানে আছে কিনা। জায়গাটা এত চুপচাপ যে সেখানে কারো পক্ষে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাই সম্ভব নয়, সেখানকার ভয়াবহ নৈঃশব্দই তাকে তাড়িয়ে ছাড়বে। কিন্তু বার বার সেখান থেকে ফিরে আসতে হলেও দশবার করে পেপি আবার সেখানে গেছে। অবশ্যই অর্থহীনভাবে। ক্ল্যামের যদি আসার ইচ্ছে থাকত তিনি তো আসতেনই।

কিন্তু তিনি যদি আসতে না চান পেপি তাঁকে তো প্রলোভন দেখিয়ে টেনে আনতে পারে না, তার বুক যতই ধড়ফড় করুক না কেন সেখানে দাঁড়িয়ে। কাজটা নিরুদ্ভিক্ত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তিনি না এলে তো সবই অর্থহীন হয়ে পড়ে। এবং তিনি এলেন না। আজ পেপি জানে তিনি আসেননি কেন, ফ্রিডা নিশ্চয়ই ভারি মজা পেত যদি সে কোনোভাবে দেখতে পেত পেপি সেই বারান্দার কোণে বুকের ওপর দুটি হাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্ল্যাম যে আসেননি তার একমাত্র কারণ ফ্রিডা তাকে তা করতে অনুমোদন দেয়নি। সে এতে সকল হয়েছে কোনো অনুনয় বিনয় করে নয়, ও সব ক্ল্যামের কাছে একেবারে অর্থহীন।

কিন্তু মাকডুসার মতো তার চরিত্র তো-তার এমন সমস্ত যোগাযোগ রয়েছে যার খবর কেউ জানে না। কোনো খদ্দেরকে কিছু বলতে হলে পেপি তা খোলাখুলিই বলে। পরের টেবিলের লোক পর্যন্ত তা শুনতে পায়। ফ্রিডার কিন্তু বলার মতো কোনো কথাই নেই। শুধু শোনা যায় তার সিক্কের ঘাঘরার খসখস শব্দ, যে পরিধেয়টির জন্য শুধুমাত্র সে অর্থব্যয় করত। কিন্তু সে যদি কোনো বাক্যব্যয়ও করত তা সে করত খদ্দেরের

কানে ফিসফিস করে, ঝুঁকে পড়ে এমনভাবে যাতে পাশের টেবিলের লোকেরা কান খাড়া করত। যা সে বলল তা হয়ত খুবই তুচ্ছ কিন্তু তবু, সবসময় নয়, তার যোগাযোগ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এদিক ওদিকে তার নানা পরিচিত ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল-তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় সকলের না থাকলেও কিছু মানুষ তার পাশে ঠিকই অটল দাঁড়িয়ে ছিল। এই যোগাযোগগুলো সে কাজে লাগাতে শুরু করল।

কে-ই তাকে এই সুযোগ যুগিয়ে দেয়। তার কাছে বসে থেকে তাকে সর্বক্ষণ নজরে না রেখে সে ঘর ছেড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এর তার সঙ্গে নানা আলোচনা করতে লাগল। সবকিছু নজর করতে লাগল, শুধু ফ্রিডাকে বাদ দিয়ে। আর শেষে তাকে আরো স্বাধীনতা দিতে সে ব্রিজ ইন ছেড়ে গিয়ে উঠল গিয়ে ফাঁকা একটা স্কুল বাড়িতে। মধুচন্দ্রিয়া যাপনের পক্ষে একেবারে আদর্শ গুভারম্ভ। তবে, পেপিই শেষ ব্যক্তি যে কে-কে দোষ দেবে ফ্রিডার সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে সে ব্যর্থ হয়েছে বলে।

কারোপক্ষেই দীর্ঘদিন ফ্রিডার সান্নিধ্য সহ্য করা সম্ভব নয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে সে তাকে একেবারে ত্যাগ করল না কেন? বার বার কেন সে ফ্রিডার কাছে ফিরে গেছে? এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে সে কেন তাহলে লোকের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করল সে ফ্রিডার জন্যই লড়াই করছে? ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল এমন যে ফ্রিডার সঙ্গে সম্পর্কিত হবার পরই সে আবিষ্কার করেছে সে নিজে কত তুচ্ছ ও সেই কারণে আশ্রয় পরিশ্রম করে সে নিজেকে ফ্রিডার যোগ্য করে তুলতে চাইছে, যে ভাবেই হোক তাকে ওপরে উঠতেই হবে ও সেই কারণ স্বল্পকালের জন্য সে তার সান্নিধ্য সুখ বিসর্জন দিচ্ছে যাতে পরে অবসর পেলে এই ত্যাগের যন্ত্রণা সুদে আসলে উসূল করে নিতে পারে। এই সময় ফ্রিডাও সময় নষ্ট করছিল না। সে স্কুলটাতে চেপে বসে রইল। সম্ভবত সেই কে-কে সেখানে টেনে এনেছিল আর হেরেনহফ-ও কে-কে নজরে রাখল। তার গুণ্ডচরের অভাব নেই।

যেমন কে-র সহকারীরা, যাদের -এটা বোঝা বেশ শক্ত, যারা কে-কে চেনে তাদের পক্ষেও-কে তাদের হতে একেবারে ছেড়ে দিল, কোনো আক্কেলে কে জানে। ফ্রিডা তাদের পাঠাতে লাগল তার পুরনো বন্ধুদের কাছে। তার অস্তিত্বের কথা মানুষজনকে মনে করিয়ে দিতে লাগল। অনুযোগ করতে থাকল যে কার্যত সে কে-র কাছে বন্দি হয়ে আছে। লোককে পেপির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগল, আবার ফিরে যাবে এমন ঘোষণা করল, সাহায্যের জন্য আবেদন পাঠাতে থাকল, তাদের অনুরোধ করল তার যেন ক্ল্যামকে কিছু না জানায়। তার আচরণটা এমন হলো যেন কোনোভাবেই ক্ল্যামের মনে আঘাত না লাগে ও সেহেতু কে-কে যেন কোনো অবস্থাতেই ট্যাপরুমে ঢুকতে না দেওয়া হয়।

লোকের যখন মনে সে সরাইমালিককে আসলে, বোঝাতে চাইছিল ক্ল্যামের হেরেনহফে না আসার কারণ আসলে পেপি। তিনি আসবেনই বা কেন যখন পেপি না কে একজন সেবায় নিযুক্ত? ঠিকই যে সেটা মালিকের দোষ নয়, পেপির চেয়ে ভালো বিকল্প সে আর খুঁজে পায়নি। তবু বিকল্পটি মোটেই যথেষ্ট ভালো নয়, এমনকী সামান্য কয়েকদিনের জন্য হলেও। ফ্রিডার এ সমস্ত কাজকর্ম সম্বন্ধে কে-র অবশ্য কোনো

ধারণা থাকাই সম্ভব নয়, ঘুরে বেড়াবার পর বাকি সময়টা সেতার পদতলেই পড়ে থাকছিল, তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আর ফ্রিডা তখন মনে মনে হিসেব করছিল ট্যাপরুমে ফিরে যেতে কতঘণ্টা আর তার বাকি আছে।

তবে তার সহকারীরা যে শুধু ফ্রিডার ফাই ফরমশাই খাটছিল তা নয়। তারা কে-কে ঈর্ষান্বিতও করে তুলছিল যাতে ফ্রিডার ওপর তার আকর্ষণ না কমে যায়। তার শৈশব থেকেই ফ্রিডা এই সহকারীদেরকে চিনত। তাদের নিজেদের মধ্যে লুকোছাপা কিছু ছিল না। কিন্তু কে-র খাতিরে তারা পরস্পরের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল আর এমন সম্ভাবনা দেখা দিল এই আসক্তি গভীর ভালোবাসায় রূপান্তরিত হবে। আর কে ফ্রিডার জন্য সবকিছু করতেই প্রস্তুত ছিল, তা এলোমেলো যুক্তিহীন কিছু হলেও। সে নিজেকে এই সহকারীদের ওপর ঈর্ষান্বিত হতে দিল যেন ফ্রিডার অনুরোধেই, অথচ অন্যদিকে এই তিনজনকে একত্রে ছেড়ে দিয়ে সে একা চলতে বেড়িয়ে পড়ল। সে যেন ফ্রিডার তৃতীয় এক সহকারী, সুতরাং সব দেখে টেখে ফ্রিডা ঠিক করল এবার সে আঘাতটা হানবে ও আবার ফিরে যাবে তার প্রিয় জায়গায়। সময়টা সে একেবারে মোক্ষম বেছেছিলো।

এটা সত্যিই প্রশংসনীয় যে সেই চতুর ফ্রিডা কেমনভাবে এই তথ্যটা কাজে লাগিয়েছিল। এই পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও ঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নেবার শক্তিই ফ্রিডার অননুকরণীয় প্রতিভা-পেপির যদি এই শক্তি থাকত তাহলে তার জীবনের ধারাটাই বদলে যেত। ফ্রিডা যদি আরো দু-একদিন স্কুলটাতে থাকতো তাহলে পেপিকে তাড়ানো সম্ভব হত না। সে বরাবরের মতো বারমেড এর কাজে বহাল হয়ে যেত, সবার প্রিয় হয়ে, সবার দ্বারা সমর্থিত হয়ে। প্রচুর অর্থ উপার্জন করে সে তার প্রায় খালি আলনাটি চোখ ধাঁধানো মূল্যবান বস্ত্রাদিতে পূর্ণ করে তুলত। শুধুমাত্র আর দু-একটা দিন, তাহলেই আর কোনোভাবে ষড়যন্ত্র করে ক্ল্যামকে আলাদা রাখা যেত না তাঁর খাস কামরা থেকে। তিনি অবশ্যই আসতেন, পান ভোজন করতেন। ভারি আরাম বোধ করতেন আর ককনো ফ্রিডার অভাব বোধ করলেও পরিবর্তনে খুবই খুশি হতেন। শুধু আর দু একটা দিন। তার পরই ফ্রিডা তার কলঙ্ক নিয়ে, তার সমস্ত যোগাযোগ নিয়ে সহকারীদের নিয়ে-সবকিছু নিয়েই একেবারে বিস্মৃতির গভীরে চলে যেত। কখনই আর ফিরে আসতে পারত না তার পুরনো জগতে। সেক্ষেত্রে কি সে সমস্ত শক্তি দিয়ে কে-কে আঁকড়ে ধরে বসে থাকত? যদি এমনটা ধরে নেওয়াও যায় সে তা করতে সমর্থ, কে-কে ভালোবাসার চেষ্টা করত? না, তাও সে করত না। কারণ কে-র মতো মানুষও তার সাহচর্য্যে একদিনের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল এটা আবিষ্কার করে কি নির্লজ্জভাবে সে তাকে প্রবঞ্চনা করেছে।

সব বিষয়ে, তার তথাকথিত সৌন্দর্যের বিষয়ে, তার তথাকথিত বিশ্বস্ততা বিষয়ে, আর সবচেয়ে বড়ো কথা ক্ল্যামের সঙ্গে তার তথাকথিত প্রেম বিষয়ে। তার শুধু আর এক দিন দরকার ছিল, তার বেশি নয়, তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দেবার, তার নোংরা পরিকল্পনার সাথি ওই সহকারীগুলো শুদ্ধ। এই যখন তার বিপজ্জনক অবস্থা, যখন তার কবরের ঢাকনা প্রায় নেমে এসেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে-কে

তার সারল্যবশত তার জন্য সংকীর্ণপথ একটা খোলা রেখেছিল-সে হঠাৎ বেইমার্ন করল। হঠাৎ কেউ এটা আন্দাজ পর্যন্ত করেনি, এ তো প্রকৃতি বিরুদ্ধ-হঠাৎ বেইমার্ন করল।

হঠাৎ কেউ এটা আন্দাজ পর্যন্ত করেনি, এ তো প্রকৃতি বিরুদ্ধ-হঠাই সেই বরং উল্টে কে-কে তাড়াল, যে লোকটা তাকে তখনো ভালোবাসে, তার পিছন পিছন ঘোরে। আর বন্ধুবান্ধব ও সহকারীদের তাড়নায় ফ্রিডা গিয়ে হাজির হলো সরাই মালিকের কাছে এমনভাবে নিয়ে যেন সেই তাকে উদ্ধার করতে এসেছে ও তার কলঙ্কের ফলশ্রুতি হিসাবে সে নিচু ও উঁচু সকলের কাছেই ভারি কাম্য হয়ে উঠল। যেমনটা সে আগেই ছকে রেখেছিল। তাকে নিজেকে ছোটো করতে হয়েছে অতি অল্প সময়ের জন্য মাত্র। তারপর প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে গেলেই সে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ন্যায্যভাবেই ও ঠিক আগের মতোই সকলের কাছে অপ্রাপণীয় হয়ে উঠেছে। আবার তার উত্তরণ ঘটেছে সগৌরবে। আগে তার ব্যাপার স্যাপার সন্দেহীত ছিল না, কিন্তু এখন সবই সপ্রমাণিত, সকলেই তাকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করছে। অতএব সে আবার ফিরে এল। মালিক, পেপির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কিছুটা দ্বিধাম্বিত হয়ে পড়ল-সে কি তাকে বিসর্জন দেবে, নিজের যোগ্যতা সে ভালোভাবে প্রমাণ করা সত্ত্বেও?-কিন্তু দ্রুতই তাকে নানা ভুজুং দেওয়া হলো, ফ্রিডার পক্ষেও তো বলার কথা মন না। আর সবচেয়ে বড়ো কথা একমাত্র সে-ই ক্ল্যামকে আবার তাঁর খাস কামরায় ফিরিয়ে আনতে পারে। এই অবস্থার মধ্যেই এখন সে রয়েছে এই সন্ধ্যায়।

ফ্রিডা বিজয়ীনির মতো এসে পেপির হাত থেকে দায়িত্বভার তুলে নেবে সেটা দেখার জন্য পেপি এখানে অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নয়। সে ইতিমধ্যেই বাড়িওয়ালীর হিসেব বুঝিয়ে দিয়েছে। এবার সে যেতে পারে। নিচের তলায় ঝিয়েদের ঘরে একটি বাস্র তার অপেক্ষায় রয়েছে, সেখানে আবার ফিরে যাবে, মেয়েরা তাকে কাঁদতে কাঁদতে স্বাগত জানাবে। তার বন্ধুরা তার দেহ থেকে পোশাক হিঁচড়ে খুলে নেবে, তার চুল থেকে ফিতে আর এ সমস্ত নিয়ে গিয়ে এক কোনো লুকিয়ে রেখে দেবে যাতে করে ওগুলো দেখে অপ্রিয় অতীতের স্মৃতি আবার না উসকে তোলে যা একেবারে ভুলে যাওয়াই ভালো। মস্ত একটা বালতি আর ঝাঁটা হাতে তুলে নিয়ে দাঁতে দাঁত চিপে যে আবার কাজে লেগে যাবে। এর আগেই সে যা বলার সব কে-কে বলল যাতে সে অন্তত একবার বুঝতে পারে সে পেপির সঙ্গে কি ভয়ানক ব্যবহার করেছে। তাকে কত দুঃখ দিয়েছে। অবশ্য এটাও ঠিক, তাকেও পুতুলের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। তার অপব্যবহার ঘটেছে সব ক্ষেত্রেই।

পেপির বক্তব্য শেষ হলো। দীর্ঘ এক শ্বাস টেনে চোখ ও গাল থেকে কয়েক অশ্রুবিন্দু মুছে সে কে-র দিকে তাকাল। মাথা নাড়ল, যেন সে বোঝাতে চাইল সবকিছুর গভীরে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা একেবারেই তার ব্যক্তিগত বিপর্যয় নয়। সে তা যেভাবেই হোক সহ্য করে নেবে। এর জন্য কারো সাহায্য বা সাত্ত্বনার তার প্রয়োজন নেই।

কে-র থেকে তো নয়ই, অল্পবয়সী হলেও জীবনের স্বরূপ সে অল্পস্বল্প বোঝে আর তার জীভনে যে দুর্দশা ঘটেছে তা তার জ্ঞাত জীবনবোধকে সমর্থন করেছে মাত্র, যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে কে, সে শুধু চেষ্টা করেছে কে-র প্রকৃত রূপটা তার কাছে তুলে ধরতে, তার সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবার পরও তার মনে হয়েছে এটা করা দরকার।

‘তুমি যে পাগলের মতো কী যা তা ভাব পেপি,’ ‘কে বলল,’ ‘এটা মোটেই সত্যি নয় যে তুমি এসব ব্যাপার সদ্য আবিষ্কার করলে। তোমার এ সমস্ত চিন্তাই, বলা বাহুল্য, তোমরা শয়ন কক্ষের পরিচারিকারা ঐ অন্ধকার ছোটো ঘরে শুয়ে যেসব দুঃস্বপ্ন দেখে তারই প্রকাশ, ঐ সমস্ত স্বপ্ন ভারি কিস্তৃত হয়ে পড়ে। এমন মানসিকতা নিয়ে যে তুমি যে এই ট্যাপরুমে টিকতে পারবে না তা খুবই স্বাভাবিক।

এমনকী তোমার পোশাক, তোমার কেশবিন্যাস, যা নিয়ে তোমার গর্বের শেষ নেই, এসবও ভারি উদ্ভট প্রকৃতির যা তোমাদের ওই ঘরের অন্ধকার ও বান্ধের সঙ্গেই খাপ খায়, ওখানে নিয়ে হাসাহাসি করে, গোপনে বা প্রকাশ্যে। আর তোমার গল্পের বাকি অংশটা? আমাকে কাজে লাগানো হয়েছে, ঠকানো হয়েছে, এঁ্যা? না, প্রিয় পেপি আমাকে অপব্যবহারও করা হয়নি, প্রবঞ্চনাও করা হয়নি। এটা সত্যি যে ফ্রিডা আপাতত আমাকে ছেড়ে চলে গেছে কিংবা, তুমি যেমন বললে, আমার একজন সহকারীর সঙ্গে সরে পড়েছে। এখানে সামান্য সত্য তুমি দেখতে পেয়েছ, আর এটাও খুবই অসম্ভব যে সে কখনো আমার স্ত্রী হবে, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ অসত্য কথা যে সে আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছিল ঝিয়েদের অভ্যেস হলো দরজায় ফুটো দিয়ে গোয়েন্দাগিরি করা, আর সেই অভ্যাস থেকেই তোমাদের চিন্তাভাবনা এই প্রকৃতির হয়ে উঠেছে, অদ্ভুতভাবে আকস্মিক সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও তোমরা।

সামান্য যেটুকু তোমরা দেখতে পাও তা থেকেই মস্ত মস্ত ব্যাপার বুঝে উঠতে পেরেছ বলে মনে কর। এর ফল হয়েছে এই যে, ধর আমি নিজেই, ব্যাপারটা তোমার চেয়ে ঢের কম জানি দেখতে পাচ্ছি। তোমার মতো অত স্পষ্ট করে আমি কিছুতেই ব্যাখ্যা করতে পারব না ফ্রিডা কেন আমায় ত্যাগ করেছে। সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ বলে আমার যেটা মনে হচ্ছে, তুমি নিজেও সেটার উল্লেখ করেছিলে কিন্তু বিশদ করে বলনি, এই যে আমি তাকে অবহেলা করেছিলাম।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্যি কারণ তাকে আমি সত্যিই অবহেলা করেছিলাম। কিন্তু তার বিশেষ কারণও ছিল, তার সঙ্গে বর্তমান আলোচনার কোনো সম্পর্ক নেই। সে যদি আবার আমার কাছে ফিরে আসে তো আমি খুশিই হব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাকে অবহেলা করব। এটাই ঘটনা যে সে যখন আমার সঙ্গে ছিল আমাকে তখন এদিক ওদিক ছুটে বেড়াতে হয়েছে, এটা নিয়েও তুমি একটু আগে ঠাট্টা তামাশা করেছ।

কিন্তু এখন সে চলে যাবার পর আমি একেবারেই বেকার হয়ে পড়েছি। আমি ক্লান্ত, আরো বড়ো রকমের কর্মহীনতার জন্য আকুল, হয়ে উঠেছি। আমাকে তোমার কোনো উপদেশ দেবার নেই পেপি? ‘হ্যাঁ নিশ্চয়ই,’ পেপি বলল, হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, কে-র

কাঁধ আঁকড়ে, 'আমরা দুজনই প্রবঞ্চিত হয়েছি। আসুন আমরা পরস্পরের সহায় হই।
আমার সঙ্গে নিচের কিয়েদের ঘরে আসুন।'

'যতক্ষণ তুমি তোমার এই প্রবঞ্চনার বুলিটা না ছাড়বে আমি তোমার সঙ্গে কোনো
বোঝাপড়ায় আসতে পারব না।'

কে বলল, 'তুমি সব সময় এই প্রবঞ্চিত হবার কথা বলে যাচ্ছ কারণ এতে
তোমার অহমিকা তৃপ্ত হয়, একধরনের আত্মকরণা বোধ কর এতে। কিন্তু সত্য এই যে
তুমি এই কাজের যোগ্যই নও। তোমার চোখে তো আমি একেবারেই অজ্ঞ, সেই
আমার চোখেই যখন এ কাজে তোমার অযোগ্যতা ধরা পড়ে যাচ্ছে তাহলে বোঝ
তোমার অসম্পূর্ণতা কতখানি? পেপি তুমি ভালো মেয়ে, কিন্তু সেটাও বোঝা খুব সহজ
নয়, যেমন ধর আমি নিজেও, তোমাকে নিষ্ঠুর অহংকারী বলে মনে করেছিলাম। তুমি
কিন্তু আদর্শই তা নও। এই কাজটাই তোমার কান্ডজ্ঞান খুলিয়ে দিয়েছে কারণ এ
কাজের যোগ্যই তুমি নও।

আমি একথা বলতে চাইছি না যে এ কাজটা তোমার তুলনায় অনেক উঁচুদরের,
এটা, সত্যি বলতে কি, তেমন বলার মতো কিছু না, হয়ত তোমার আগের কাজের
তুলনায় একটু ভালো, কিন্তু সার্বিকভাবে দেখতে গেলে তফাতটা খুব উল্লেখযোগ্য নয়,
এমনকী তাদের মিল এতই বেশি যে কারো পক্ষে পার্থক্য করাই কঠিন হয়ে পড়ে।
তেমন ভাবে দেখতে গেলে ট্যাপরুমের চেয়ে শয়নকক্ষের পরিচারিকা হওয়া বরং
অনেক কাম্য। কারণ ওখানে সবসময় সচিবদের মধ্যে থাকা যায় আর এখানে
অন্যদিকে, যদিও সচিবদের কর্তাদের খাসকামরায় গিয়ে সেবার সুযোগ মাঝে মধ্যে
পাওয়া যায়, প্রায় সমস্ত সময়টাই এখানকার বারমেডকে কাটাতে হয় একেবারেই
মামুলি মানুষজনের সঙ্গে, যেমন ধর আমার মতো মানুষের সঙ্গে; বাস্তবিকই এই
ট্যাপরুম ছাড়া আমার অন্য কোথাও গিয়ে বসার প্রত্যাশিত নয় আর আমার সঙ্গে
মেশাটা কি মস্ত কোনো সম্মানের ব্যাপার বলে মনে কর? তোমার কাছে হয়ত তা মনে
হতে পারে, সেরকম ভাবার পিছনে কোনো কারণ কে জানে থাকতে পারে।

কিন্তু ঠিক সেই কারণেই তুমি অযোগ্য। এখানকার কাজটা যে কোনো কাজের
মতোই সাধারণ কিন্তু তোমার কাছে এটাই স্বর্গীয়। সবকিছুই তুমি ভাবাবেগে ফাঁপিয়ে
ফুলিয়ে দেখ। এই কাজ পাবার জন্য তুমি উত্তেজনা করো সারা হচ্ছিলে, তোমার
ধারণা হয়েছিল সবাই সর্বক্ষণ তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র শানাচ্ছে, আর তুমি বাড়াবাড়ি রকম
আন্তরিকতা দেখিয়ে সবাইকে খুশি করার চেষ্টা চালিয়ে গেছ যাতে কিছু কাম্য মানুষকে
সাহায্যকারী হিসাবে পেতে পার। কিন্তু এভাবে তুমি ক্রমাগত তাদের বিরুদ্ধই করে
গেছ, তোমার ওপর তাদের বিতৃষ্ণা এসেছে, কারণ তারা সরাইখানায় আসে কিছুটা
শান্তি, নীরবতার খোঁজে, কোনো বারমেডের দৃষ্টিভঙ্গি নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি মাথায়
চোকাতে নয়।

এমনটা হয়ত সম্ভব যে ফ্রিডা যখন এখান থেকে চলে গিয়েছিল বিশিষ্ট অতিথিরা
সেটা তেমনভাবে লক্ষ্য করেননি, কিন্তু এখন তারা সবই জানেন আর ফ্রিডার জন্য
অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করে রয়েছেন, কারণ ফ্রিডা নিঃসন্দেহে সবকিছু

পরিচালনা করত সম্পূর্ণ অন্যভাবে। প্রকৃতিগতভাবে সে যেমনই হোক বা তার কাজকে সে যে মূল্যই দিক না কেন, কর্মক্ষেত্রে সে অত্যন্ত অভিজ্ঞ, ঠান্ডা মাথা, সংযত, তুমি নিজেও তা জোর দিয়ে বলেছ, যদিও স্বীকার করতে হবে, তুমি তার থেকে কিছুই শেখনি। কখনো দেখেছ সে কেমনভাবে সবকিছু লক্ষ্য করে? সামান্য বারমেড কখনো ওভাবে সব লক্ষ্য করে না, তার দেখার ভঙ্গি ঠিক কোনো সত্বাধিকারিনীর মতো। সে বারে সমস্ত কিছু, সবাইকে অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করত, আর যেভাবে সে প্রত্যেকের দিকে দৃষ্টিপাত করে তাতেই সবাই কুঁকড়ে কেঁচো হয়ে যায়। সে যে একটু রোগা, একটু বুড়োতে তাতে কী এসে যায়? তার যা সম্পদ তার তুলনায় এসব ত্রুটি অতি তুচ্ছ। কারো কাছে যদি তার ক্ষুদ্র ত্রুটিগুলিই বড়ো হয়ে ওঠে তাহলে বুঝতে হবে বড়ো কিছু দেখবার বা বোঝবার বুদ্ধি তার নেই।

কেউ নিশ্চয়ই ক্ল্যামকে সে দোষে দোষী করবে না। অল্পবয়সী অনভিজ্ঞ মেয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুমি বিষয়টা দেখছ বলেই তোমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, যে ক্ল্যাম ফ্রিডাকে ভালোবাসেন। ক্ল্যামকে তুমি মনে করো, যথার্থভাবেই অবশ্য, সকলের আয়ত্তের বাইরে, আর সে কারণেই তোমার ধারণা ফ্রিডার পক্ষেও তাঁর কাছে যাওয়া অসম্ভব। এখানেই তোমার ভুল হয়েছে, আমি এ বিষয়ে ফ্রিডার কথা বিশ্বাস করাই সম্ভব মনে করেছি, চূড়ান্ত কোনো প্রমাণ না পেলেও। তোমার কাছে যতই অবিশ্বাস্য বলে মনে হোক না কেন, আর সরকারি মানুষ, ভদ্রসমাজ ও তার ওপর রমণীর প্রভাব একসঙ্গে মিলিয়ে দেখতে তুমি যতই অপারগ হও না কেন, এটা সত্যি, ঠিক ততটা সত্য এই যে এখানে আমরা পাশাপাশি বসে আছি, তোমার হাত আমার দুহাতের মধ্যে ধরা, ঠিক ততটাই, ক্ল্যামও ফ্রিডার পাশে এমনভাবে বসে থাকতেন। আসতেন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় খুব ব্যস্তভাবেই আর তখন কাজে ফাঁকি দিয়ে বারান্দার কোণে কেউ তার জন্য লুকিয়েও বসে থাকত না।

ক্ল্যাম এসে ঢুকতেন নিচের তলায় তাঁর খাস কামরায়, আর ঐ সময় ফ্রিডার পোশাকের ত্রুটি বিচ্যুতি, তোমার কাছে যেটা ভয়াবহ, ক্ল্যামকে সামান্যতম বিচলিত করত না। তুমি ওকে বিশ্বাসই কর না! তুমি জাননা এতে নিজের কত ক্ষতি করেছ, কি সাংঘাতিক ভাবে অনভিজ্ঞ বলে নিজেকে প্রমাণ করেছ। এমনকী ফ্রিডার সঙ্গে ক্ল্যামের সম্পর্কের কথা যার সম্পূর্ণ অজানা সেও ফ্রিডার চালচলন থেকেই বুঝে নিতে পারবে কেউ তাকে নিজের মনোমত ছাঁচে ঢালাই করে নিয়েছে আর সেই কেউ তোমার আমার বা গ্রামের যেকোনো মানুষের চেয়ে অনেক, অনেক বড়ো। আর তাদের কথোপকথনও অনে উঁচুদরের হতো সাধারণ ওয়েস্ট্রেস ও খদ্দেরদের মধ্যে হাসিতামাশার তুলনায়, যে লঘুতা তোমারও বড়োই প্রিয়।

কিন্তু আমি বোধহয় তোমার ওপর একটু অবিচার করে ফেলছি। ফ্রিডার গুণগুলো তুমিও যে লক্ষ্য করনি তা তো নয়, তুমি নিজেই লক্ষ্য করেছ তার ক্ষমতা, মানুষ জনের উপর তার প্রতিপত্তি আর তুমিই বোধহয় একমাত্র সেই স্ত্রীলোক যে তার সবকিছুকে বিকৃত করে দেখেছ এটা মনে করে যে সবকিছু করেছে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, শয়তানি উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে পৌঁছতে। আর ভেবেছ যে তোমার বিরুদ্ধে একটা

অস্বস্তিরূপ। না, পেপি, না, তার তেমন কোনো তীর থাকলেও সে এত কাছ থেকে তা ছুঁত না, আর তার স্বার্থান্বেষিত কথার বলহীন বরং উল্টোভাবে কেউ বলতে পারে না তার সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছিল শুধু আমাদের সুযোগ দিতে যাতে আমরা আমাদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে বহু উপরে উঠে যেতে পারি, কিন্তু আমরা দুজনেই তাকে হতাশ করেছি এক্ষেত্রে ও তাকে আবার ফিরে আসতে বাধ্য করেছি তার পুরোনো জায়গায়।

ঘটনাটা ঠিক এমনই কিনা তা অবশ্য আমার জানা নেই, আর আমার নিজের অপরাধও আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়, শুধু আমি যখন তোমার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করি আমার যেটা মনে হয় তা হলো। যেন আমরা দুজনেই প্রাণপণে চেষ্টা করেছি বড় বেশি হৈ চৈ করে, একেবারে বাচ্চাদের মতো, সংকীর্ণ অভিজ্ঞতা নিয়ে। সেই কাজটা করত ফ্রিডা খুবই শান্তভাবে, জাগতিকভাবে সম্পন্ন করতে পারত খুব সহজে কোনো জটিলতা ছাড়াই। আমরা একই কাজ করতে চেষ্টা করেছিলাম কান্নাকাট করে পরস্পরকে খামচে টানাটানি করে-যেভাবে শিশু টেবিলরূখ ধরে টানে, আর এসবের বিনিময়ে লাভ করেছি লবডঙ্কা। শুধু যা করেছি তা হলো সুন্দর জিনিসগুলোকে আমরা টেনে নামিয়েছি মাটিতে, আর সেগুলোও আমাদের আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে চিরদিনের জন্য। আমি ঠিক বললাম কিনা জানি না কিন্তু তুমি যেভাবে ঘটনার বিশ্লেষণ করলে তার চেয়ে যে আমার ভাবনাটা অনেক বেশি সত্যি এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।’

‘ঠিক আছে,’ বলল পেপি, ‘পালিয়ে গেছে বলে আপনি ফ্রিডাকে আরো বেশি করে ভালোবাসছেন, অবশ্য সে ধারে কাছে না থাকলে তাকে ভালোবাসাটা যে অনেক সহজ কাজ তা আমি জানি। বেশ তো যদি ধরে নেওয়া যায় আপনি যা বললেন সবই ঠিক, আমাকে নিয়ে হাসি, তামাশাগুলো অবধি, তাহলেও আপনি এবার কী করবেন? ফ্রিডা আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে, আপনার নিজের ব্যাখ্যা অনুসারেই তার ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই, আর সে যদি ফিরেও আসে, আপনাকে এর মধ্যে থাকার জায়গা তো একটা খুঁজে নিতে হবে।

এখন চতুর্দিকে সাংঘাতিক ঠান্ডা, আর আপনার না আছে কোনো কাজ, না একটা বিছানা কোথাও, আপনি আমাদের কাছে আসুন, আমার মেয়ে বন্ধুদের আপনার ভালো লাগবে, আমরা আপনার আরামের বন্দোবস্ত করে দেব, আমাদের কাজে আপনি সাহায্য করবেন, কাজ অবশ্য খুব পরিশ্রমের কিছু না, মেয়েরা নিজেরাই তা করে নিতে পারে, কিন্তু আপনি থাকলে রাতে আমাদের আর অসহায়ের মতো ভয়ে কুঁকড়ে থাকতে হবে না।

আমাদের কাছে আসুন, আমার মেয়ে বন্ধুরাও সবাই ফ্রিডাকে চেনে। আপনাকে আমরা ফ্রিডার এত গল্প বলব যে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। আসুন দয়াকরে। আমাদের কাছে ফ্রিডার ছবি পর্যন্ত আছে। আপনাকে দেখতে হবে। সেই সময় ফ্রিডা এখনকার তুলনায় অনেক বেশি বিনয়ী ছিল। সেই ছবি দেখলে তাকে চিনতেই পারবেন না। চোখদুটো খালি একরকম ছিল। সেই একই রকম সন্দ্বিধা ধৃত দৃষ্টি। তাহলে আপনি আসছেন তো?

‘কিন্তু তার কি কোনো অনুমোদন আছে? গতকালই তো তোমাদের বারান্দাটায় ধরা পড়ে কি বেইজ্ঞতাই হতে হলো জান তো?’

‘সেটা আপনি ধরা পড়েছিলেন বলে। ওখানে কেউ জানবে না, শুধু আমরা তিনজন। আঃ দারুণ মজা হবে। এখন তো আমার ওখানকার জীবনই অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে, একটু আগেও যেটা হচ্ছিল না। এখন থেকে চলে গিয়ে বোধহয় তেমন কোনো ক্ষতি হবে না। শুনুন সেখানে আমরা শুধু তিনজন বাস করলেও কখনো একঘেয়ে বোধ করি না। আমরা পরস্পরের তিক্ততাকে মিষ্ট করে তোলার চেষ্টা করি।

অল্প বয়সের কারণেই অবশ্য আমাদের মধ্যে কখনো এই তিক্ততা আসে, কিন্তু আমরা তিনজন থাকি একসঙ্গে। যতটা সুন্দরভাবে বাস করা সম্ভব সেইভাবে বাস করি, বিশেষ করে হেনরিয়েটাকে আপনার খুব ভালো লাগবে। কিন্তু এখানেও খারাপ লাগবে না। ওদের আমি আপনার কথা বলেছি, ওখানে অবশ্য সবাই খুব অবিশ্বাসের সঙ্গেই সমস্ত গল্প শোনে, যেন ঐ ঘরের বাইরে সত্যিকারের কিছু ঘটতেই পারে না, ওখানে সমস্তই উষ্ণ, ঘননিবদ্ধ, না, যদিও আমরা শুধু পরস্পরের ওপরই নির্ভরশীল তবু আমাদের অপরকে কখনো ক্লান্তিকর মনে হয় না, বরং উল্টোভাবে, আমি যে আমার বন্ধুদের কাছে আবার ফিরে যেতে পারবো এটা ভেবেই বরং আনন্দ লাগছে। তাদের চেয়ে আমার আরো ভালো থাকা দরকারটাই বা কী।

কারণ এটাই তো আমাদের তিনজনকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছিল, এই সত্য যে আমাদের তিনজনেরই ভবিষ্যৎই একই রকম অন্ধকার। আমিই বরং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি। অবশ্য আমি তাদের ভুলিনি। আর আমার একমাত্র চিন্তা ছিল কী করে তাদের কোনো উপকার করা যায়। আমার নিজের কাজের অবস্থাই তখন অনিশ্চিত-কতটা যে অনিশ্চিত তখনো আমার জানা ছিঁর না-অথচ আমি মালিককে হেনরিয়েটা ও এমি বিষয়ে বলতে শুরু করে দিয়েছিলাম। হেনরিয়েটার বিষয়ে মালিকের মনোভাবটা বেশ নরমই ছিল কিন্তু এমি বিষয়ে-অবশ্য স্বীকার করতে হবে, আমাদের মধ্যে ওর বয়েস সবচেয়ে বেশি, প্রায় ফ্রিডার বয়সীই হবে, তো তার বিষয়ে মালিক কোনো আশা দেয়নি।

অথচ ভাবুন, ওরা নিজেরা কিন্তু সেখান থেকে আসতে চায় না, ওখানকার জীবন যে কত জঘন্য তা ওদের চেয়ে ভালো কেউ জানে না, অথচ ঐ জীবনই তারা মেনে নিয়েছে, এতটাই ভালো তাদের মন। আমাদের ছোটো ঘরটা ছেড়ে চলে আসার সময় যখন আমি বিদায় জানাচ্ছিলাম তখন তাদের চোখের জলের কথা আমার মনে পড়ছে, তারা কিন্তু তা ফেলেছিল আমি ঐ ঘর ছেড়ে এক বন্ধুহীন পৃথিবীতে পা রাখতে যাচ্ছি বলে-ওখানে আমাদের ঘরের বাইরের সবকিছুকেই আমরা বিপদজনক বলে মনে করি-আর আমাকে অজানা অচেনা এক মস্ত ঘরে মস্ত চেহারার অচেনা মানুষদের মধ্যে দিনযাপন করতে হবে বলে। শুধুমাত্র জীবিকা অর্জনের জন্য, যেটা এতদিন আমি তাদের সঙ্গে একত্রেই করে আসতে পেরেছি।

এবার আমি তাদের কাছে যখন ফিরে যাব তখনো তারা অবাক হবে না। শুধু আমাকে কিছু সাহায্য দিতে হয়ত একটু কল্লকটি করবে মাত্র, আর আমার ভাগ্যে অভিষাপ দেবে। কিন্তু এইসময় তারা যদি আপনাকে দেখে তারা বরং খুশিই হবে আমি চলে এসেছিলাম বলে। তাদের আনন্দই হবে যে এতদিন পর আমাদের একজন মানুষ জুটল যে আমাদের সাহায্য করবে, রক্ষা করবে, আর তাদের আনন্দের শেষ থাকবে না এটা জেনে যে ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে যে গোণীয়তার ফলে আমরা আগের চেয়েও অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠব।

আসুন, দয়া করে আমাদের কাছে আসুন। আপনার কোনো রকম বাধ্যবাধকতাই থাকবে না, আমাদের ঘরে আপনাকে আটকে থাকতেও হবে না আমাদের মতো। বসন্ত কালে আপনি অন্য কোথাও থাকার জায়গাও একটা খুঁজে নিতে পারেন যদি আমাদের সান্নিধ্য আর আপনার পছন্দ না হয়। তখন আপনি চাইলে চলে যাবেন। শুধু তখনো দয়া করে গোপনীয়তাটা রক্ষা করে যাবেন, আমাদের কথাটা চতুর্দিকে রট্ট করে দেবেন না যেন কারণ তার অর্থ হবে হেরেনহফে আমাদের সময় আপনাকে সতর্ক হতে হবে। আমরা নিরাপদ মনে না করলে কোনো জায়গাতেই নিজে থেকে প্রকাশ করবেন না।

আর সব ব্যাপারে আমার উপদেশ নেবেন, আপনার বন্ধন বলতে এতটুকুই, এতে আপনার আপত্তি করার কারণই নেই, এটুকু বাদ দিলে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমাদের সঙ্গে ভাগ করে যে কাজ আপনাকে করতে হবে তা মোটেই পরিশ্রমসাধ্য নয়, তা নিয়ে ভয় পাবেন না। তাহলে, আসছেন তো?

“বসন্ত আসতে আর কত দেরি?” কে জিজ্ঞাসা করল।

‘বসন্ত?’ পেপি পুনরাবৃত্তি করল।

‘শীত এখানে খুব লম্বা, খুবই, এবং একঘেয়ে। কিন্তু এ নিয়ে আমরা কখনো অনুযোগ করি না। শীতের কামড় থেকে আমরা নিরাপদ এখানে। ‘হ্যাঁ, বসন্ত আসে বৈকি কোনো এক দিন, তারপর গ্রীষ্মও, তাদের আসার ভিন্ন সময়ও আছে, বোধহয় কিন্তু স্মৃতি হাতড়ে মনে হচ্ছে বসন্ত ও গ্রীষ্ম এত অল্প দিনের জন্য আসে যেন তারা এসেছিল দু-দিনের জন্য মাত্র, আর ঐ দুদিনের সবচেয়ে সুন্দর দিনেও মাঝে মধ্যে বরফপাত হয়েছিল?’

ঠিক এই মুহূর্তে দরজার খুলে গেল। পেপি চমকে উঠল, কল্লনার জগতে সে বহুদূর চলে গিয়েছিল এই ট্যাপরুম ছেড়ে। কিন্তু যে ঢুকল সে ফ্রিডা নয়, বাড়িওয়ালী। কে যে এখানে এখানে রয়েছে এতে সে বিস্মিত হবার ভান করল। কে ক্ষমা চেয়ে জানাল যে সে আসলে তারই অপেক্ষা করছিল ও একই সঙ্গে ধন্যবাদ দিল রাতে তাকে এখানে থাকার অনুমতি দেবার জন্য। বাড়িওয়ালী বুঝতে পারেনি কে তার জন্য অপেক্ষাই বা করছিল কেন। কে বলল তার ধারণা হয়ে ছিল বাড়িওয়ালী তার সঙ্গে আবার কথা বলতে চায়। ধারণাটা যদি ভ্রান্ত হয়ে থাকে সে মাপ চাইছে।

তবে সে এবার সত্যিই চলে যাবে, স্কুলটাও সে ছেড়ে এসেছে, ওখানে সে কেয়ারটেকারের কাজ করেছে একটু বেশি সময়ই বোধহয়, গতকালের ডাকই সমস্ত

কিছুর জন্য দায়ী, এরকম ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু কখনো আর গুরুত্ব কিছুর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না যাতে বাড়িওয়ালীর কোনো অসুবিধা ও অশান্তি হতে পারে ও বিদায় নেবার মুহূর্তে সে অভিবাদন জানাল। বাড়িওয়ালী তার দিকে তাকাল যেন সে রয়েছে এক স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে। এই দৃষ্টির ফলেই কে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়ে রইল। এই সময় বাড়িওয়ালী একটু মৃদুহাস্যও করে।

কিন্তু কে-র মুখে বিহ্বল ভাবটাই যেন তাকে জাগিয়ে তুলল। যেন সে তার মৃদুহাসির কোনো প্রত্যুত্তর আশা করছিল এবং সেটা লাভ না করেই সে জেগে উঠল। ‘আমার মনে হচ্ছে গতকাল আপনি অসভ্যের মতো আমার পোশাক বিষয়ে কিছু একটা মন্তব্য করেছিলেন?’ কে স্মরণ করতে পারল না।

‘আপনার মনে পড়ছে না? তাহলে তো শুধু অসভ্যতাই নয়, তার সঙ্গে কাপুরুষতাও মিশে রয়েছে দেখছি।’ ক্ষমা চাইতে গিয়ে কের আগের রাতে তার অক্ষম ক্লান্তির কথা উল্লেখ করল ও বলল সে কারণে সে অর্থহীন কিছু কথাও বলে থাকতে পারে। তা যাই হোক এখন তার কিছুই মনে পড়ছে না। বাড়িওয়ালীর পোশাক বিষয়ে সে বলতেই বা কী পারে? জীবনে অমন সুন্দর পোশাক সে কোথাও দেখেনি। অন্তত কোনো বাড়িওয়ালীকে অমন পোশাক পরে কর্মরত অবস্থায় কখনো দেখেনি।

‘যথেষ্ট বাজে কথা বলা হয়েছে,’ বাড়িওয়ালী বলল অতি দ্রুত ভাবে। ‘আমার পোশাক বিষয়ে আর একটা কথাও আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই না। আমার জামাকাপড়ের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?’ শেষবারের মতো সাবধান করে দিচ্ছি ও নিয়ে আর একটাও কথা বলবেন না।’ কে আবার অভিবাদন জানিয়ে দরজার দিকে এগোল। ‘আপনি ঠিক কী বোঝাতে চাইলেন।’ চিৎকার করে তার পেছনে বলল বাড়িওয়ালী, ‘এই বলে যে কখনো কোনো বাড়িওয়ালীকে অমন ধরনের পোশাক পরে কাজ করতে দেখেননি? এমন একটা বোকার মতো মন্তব্যের অর্থ কী? সম্পূর্ণ অর্থহীন এই মন্তব্যে আপনি ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন বলুন।’

কে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়িওয়ালীকে অনুনয় করল সে যেন উত্তেজিত না হয়।

তার মন্তব্যটা অবশ্যই নির্বোধের মতো হয়েছে। পোশাকটোশাক বিষয়ে আসলে তার জ্ঞান প্রায় শূন্য। পরিষ্কার ও আস্ত যে কোনো পোশাকেই তার ভারি মনোরম বলে বোধ হয়। সে শুধু বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল যখন অতরাতে স্বপ্নবাস পরিহিত অত মানুষের মধ্যে বাড়িওয়ালী গিয়ে হাজির হয়েছিল অমন সুন্দর একটা ইভিনিং ড্রেস পরে, ব্যাপার শুধু এই মাত্র।

‘বেশ’ বাড়িওয়ালী বলল, ‘তাহলে শেষ পর্যন্ত আপনার মনে পড়ল গতকাল আপনি কী মন্তব্য করেছিলেন। তবে এই মুহূর্তে তাতে জুড়ে দিয়েছেন আরো কিছু বোকার মতো কথা। পোশাক বিষয়ে আপনি যে কিছুই জানেন না সেটা একটা খাঁটি কথা। সেক্ষেত্রে দয়া করে-আমি হাতজোড় করে আপনাকে অনুরোধ করছি-কোনো ইভিনিং ড্রেস উপযুক্ত বা কোনোটি অনুপযুক্ত, সে বিষয়ে বিচার করতে যাবেন না...আপনাকে

স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই,-এ সময় মনে হলো সে যেন ঠান্ডায় কেঁপে উঠল।
'আমার পোশাকের কোনো ব্যাপারে আপনার নাক গলানো আমি বরদাস্ত করব না,
বুঝলেন?'

এবং আবার যখন কে নিঃশব্দে পেছন ফিরতে যাচ্ছে সে জিজ্ঞাসা করল,
'পোশাকটোশাক বিষয়ে আপনার জ্ঞানের উৎসটা কী শুনি?'

কে কাঁধ ঝাঁকাল এই বলে যে তেমন কোনো জ্ঞানই তার নেই।

'সত্যি তা নেই,' বাড়িওয়ালী বলল, 'ঠিক আছে তাহলে অমন মন্তব্য আর করবেন
না কখনো। অফিসে আসুন, আপনাকে একটা জিনিস দেখাবো, সেটা দেখলে ভবিষ্যতে
আপনি কখনো আর কোনো বিষয়ে অমন অসভ্য মন্তব্য করবেন না।'

এরপর সে কে-র আগেই দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। পেপি বিল বানাবার ছুতোয়
কে-র দিকে ছুটে গেল, তার দ্রুত একটা পরিকল্পনা ছকে ফেলল, খুবই সহজ, কে
উঠোনটা তো ভালোরকমই চেনে, তাতে পাশের রাস্তায় গিয়ে পড়ার একটা গেট আছে,
সেই গেটটার পাশে একটা ছোটো দরজা, ঘন্টাখানেক পর পেপি গিয়ে তার পিছনে
দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে ও তিনটে টোকার শব্দ শুনলেই দরজা খুলে দেবে।

অফিসটা ঠিক ট্যামরুমের উল্টোদিকেই, তাদের গুধু হলটা অতিক্রম করতে হলো,
ইতিমধ্যেই বাড়িওয়ালী তার আলোকিত অফিসে দাঁড়িয়ে কে-র দিকে অধৈর্য্যভাবে
তাকিয়ে ছিল।

কিন্তু সেখানে আরেকটা অশান্তি অপেক্ষা করছিল। হলঘরে গারস্টেকার অপেক্ষা
করে রয়েছে। সে কে-র সঙ্গে কথা বলতে চায়। তার হাতথেকে নিস্তার পাওয়াটা খুব
সহজ হলো না, বাড়িওয়ালী পর্যন্ত কে-র সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে বকাবকি করল সব
ব্যাপারে তার মাথা গলানোর অভ্যাসের জন্য 'আপনি চললেন কোথায়? চললেন
কোথায়?'

গারস্টেকারের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল দরজা বন্ধ হয়ে যাবার পরেও, এই
শব্দগুলোর সঙ্গে বিশ্রীভাবে মিশে ছিল হাঁপানির টান ও ঘরঘড়ে কাশির আওয়াজ।

ঘরটা ছোটো, বাড়াবাড়ি রকম গরম, একপ্রান্তের দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে খাড়ামতো
একটা ডেস্ক ও লোহার সিন্দুক, পাশের দেয়ালে একটা জামা-কাপড়ের আলমারি ও
গদি আঁটা পালঙ্ক, ঘরের অধিকাংশ জায়গা নিয়ে নিয়েছে আলমারিটা, লম্বা দেয়ালের
পুরোটা জায়গাই যে সে গুধু অধিকার করেছে তাই নয়, তার গভীরতাও যেন ঘরটাকে
অনেক ছোটো করে দিয়েছে, এর তিনটে দরজাই পুরোপুরি খোলা যায়।

বাড়িওয়ালী কে-কে পালঙ্কটার ওপর বসতে ইঙ্গিত করে নিজে গিয়ে বসল ডেকের
সামনে একটা রিভলভিং চেয়ারে। 'আপনি একবার দরজার কাজ শিখেছিলেন না?'

বাড়িওয়ালী জিজ্ঞাসা করল, 'না, কদাপি না,' কে বলল।

'তাহলে আপনি আসলে কী?' 'জমির আমন,' সেটা কাকে বলে?' কে ব্যাখ্যা করে
বোঝাল, সেই ব্যাখ্যা শুনে বাড়িওয়ালী হাই তুলতে লাগল।

‘আপনি কিন্তু সত্যি কথা বলছেন না। আপনি সত্যি বলেণ না কেন?’ ‘আপনিও তো সত্যি বলেন না’,

‘আমি?’ আবার আপনি অসত্য মন্তব্য করতে শুরু করেছেন? সত্যি কথা যদি নাও বলি তার জন্য কি আপনার কাছে সেজন্য জবাবদিহি করতে হবে? আমি কোনো মিথ্যেটা বলেছি শুনি?’

‘আপনি আসলে বাড়িওয়ালীই নন, যতই ভান করুন না কেন।’

‘শোনো কথা একবার। কত কিছুই না আপনি আবিষ্কার করতে পারেন। আমি তাহলে আরো কী শুনি। কিন্তু বলে দিই আপনার স্পর্ধ কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।’

‘আপনি যে আর কী তা জানি না। আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি আপনি বাড়িওয়ালী হয়েও এমনসব কাপড় চোপড় পড়ছেন যা বাড়িওয়ালীর সাধারণত পরে না, আর তা এমন ধরনের যে, আমার যতদূর জানা আছে, এই গ্রামেও কেউ পারে না।’

‘বেশ, তাহলে আমরা আসল বিষয়ের কাছাকাছি এসেছি। ঘটনা হচ্ছে আপনি কিছুই চেপে রাখতে পারেন না, আপনি হয়ত ঠিক দুর্বিনীতও নন। আপনি ঠিক শিশুর মতো যে দু-চারটে সস্তা জিনিস শিখেই তা নিয়ে বকতে থাকে।

থাকগে, খোলসা করে বলুন। আমার পোশাকে কী বিশেষত্ব আপনি খুঁজে পেয়েছেন?’

‘তা যদি বলি আপনি রেগে যাবেন।’

‘না, আমি বরং তা শুনে হাসব। কারণ সেটা হবে শিশুর মতো কথামাত্র। বলুন পোশাকটা তাহলে কী ধরনের?’ ‘আপনি তাহলে শুনবেন বলে গোঁ ধরেই আছেন? বেশ, তাহলে বলি, ওটা ভালো উপাদান দিয়ে বানানো, বেশ দামি কিন্তু খুব পুরানো ধাঁচের, বড্ড চড়া ধরনের, বহুবার মেরামত করা হয়েছে আর আপনার বয়স বা দেহ কিংবা পদমর্যাদার পক্ষে মানানসই হয়নি। প্রথমদিকে আপনাকে দেখেই সে কারণে আমার অদ্ভুত লেগেছিল, প্রায় সপ্তাহ ধরেই আমি এখানে এসে এই হলঘরে।’

‘ও, তাহলে এখানে গিয়েই ব্যাপারটা ঠিক হল? এই পোশাক পুরনো ধাঁচের চড়া রকম, আরো কী সব বললে শুন? তা কোন জ্ঞানে জোরে বিচারটা করলেন?’

‘নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছি। এর জন্য কোনো জ্ঞানের দরকার হয় না।’ আপনি তাহলে সরাসরি সবই বুঝতে পারেন? কে খবর করে কিছু নেবারও আপনার দরকার পড়ে না। ফ্যাশন সম্বন্ধে আপনার উপার্জন জ্ঞান দেখছি। তাহলে তো আপনি আমার কাছে একেবারে অপরিহার্য হয়ে উঠলেন দেখছি, কারণ আমি স্বীকার করছি সুন্দর পোশাকের ক্ষেত্রে আবার দুর্বলতা রয়েছে। আর আমি যদি বলে এই আলমারিটা জামাকাপড়ে একেবারে ঠাসা রয়েছে আপনি কী বলবেন?’ সে একটা পাল্লা খুলে ফেলে।

দেখা গেল কাপড়ের উপর ঠেসে অন্য কাপড় রাখা আছে। কাপড়ে কাপড়ে পেঁলায় আলমারিটার ওপর নিচ একেবারে ঠাসা। তাদের বেশির ভাগই গাঢ়, ধূসর, খয়েরি কালো রঙের, যত্ন করে পাট করে বুলিয়ে রাখা হয়েছে।

‘এগুলো সবই আমার পোশাক, সবই পুরনো কালের, চটকদার-আপনার মতো। এই কাপড় চোপড়ের জন্যই কিছু ওপরের ঘরে আমার জায়গার অভাব। সেখানেও ভর্তি দুটো আলমারি রয়েছে। ঠিক এটারই মতো বড়ো। খুব অবাক হলেন কি?’

‘না, আমি এমন ধরনেরই কিছু একটা আশা করেছিলাম। এটুকু আগেই আমি বলিনি কি আপনি শুধু একজন বাড়িওয়ালীও নন, আপনার লক্ষ্য অন্য কিছু হবার?’

‘আমার লক্ষ্য শুধু সুন্দর সুন্দর পোশাক পরার আর আপনি হয় নির্বোধ, কিংবা শিশু মাত্র অথবা অত্যন্ত দুষ্ট বিপদজনক কোনো মানুষ। যান, এফুনি চলে যান।’

ইতিমধ্যেই কে হলঘরে গিয়ে পৌঁছেছিল, গারস্টেকার এগিয়ে এসে তার জামার আস্তিন ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছিল। এই সময় বাড়িওয়ালী তার পিছনে চোঁচিয়ে বলল, ‘কালকে আমি একটা নতুন পোশাক পাব, তখন আপনাকে ডেকে পাঠাতেও পারি ॥’